

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ebong Prantik*

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৯, মে ২০২৫



এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.311

Vol. 12th Issue 29th, May, 2025

DOI : 10.5281/zenodo.15868113

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন



এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেইটপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)]
DOI : 10.5281/zenodo.15868113
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 29th, 12th May, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১২ তম বর্ষ ও ২৯ তম সংখ্যা

১২ মে, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)

2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রাস্তিক

প্রকাশক

এবং প্রাস্তিক

আশিস রায়

রেজিস্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

- ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অর্জিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. রূপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি. এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।
২. বাংলা হরফে লিখলে অত্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।
৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com
৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।
৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,

Kestopur, Kolkata - 700102

Ph. No. : 8250595647

E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাগসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর,

কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা /

এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাবনা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান	
<i>শিউলি বসাক</i>	১১
মধ্যযুগে বাংলা ভাগবত অনুবাদের ধারায় রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ও দুঃখী শ্যামদাস	
<i>মুসী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ</i>	১৭
ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্র ভাবনা	
<i>নিবেদিতা গুহ</i>	২৬
নীরব অভিব্যক্তির শিল্পিত সাযুজ্য : দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল	
<i>ইরা আহমেদ</i>	৩২
বাংলা ধাঁধায় বিজ্ঞানের উপাদান	
<i>শান্তনু ভট্টাচার্য</i>	৪০
‘অলীক মানুষ’ : সত্তার ভিন্নতর বয়ান	
<i>লক্ষ্মী নাথ</i>	৪৭
সম্প্রীতির পরম্পরায় : সত্যপীর সাধনা	
<i>ধনঞ্জয় গড়াই</i>	৫৪
জ্যোতির্ময়ী দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে নারী-পরিসর	
<i>প্রিয়াঙ্কা দে</i>	৫৮
রাসেলীয় দৃষ্টিতে ‘শব্দ’ : একটি অনুধ্যান	
<i>মুম্ময় ঢালী</i>	৬৩
অপারেশন বর্গার প্রেক্ষাপটে অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ : লোকসংস্কার থেকে	
জনচেতনার উত্তরণ	
<i>সুতপা পাল</i>	৭০
গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ : মানবীবিদ্যা চর্চা ও বিষয়গত অভিনবত্ব	
<i>নূর-ই-নুসরাত</i>	৭৬
সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর হলদে গোলাপ	
<i>অরিজিৎ ভট্টাচার্য</i>	৮৪
একুশ শতকের নারী উপন্যাসিকের চোখে প্রথা ও সংস্কারের প্রতিফলন :	
বাণী বসুর খারাপ ছেলে	
<i>সায়নী কুণ্ডু</i>	৮৯
চড়ক উৎসব : বাংলার লোকজ সংস্কৃতির এক বর্ণিল উৎসব	
<i>অরিন্দম গায়ন</i>	৯৪
বঙ্কিম প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদ	
<i>সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী</i>	১০২
বাণী বসুর ‘ক্ষত্রবধূ’ উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্ক	
<i>অর্ণব মল্লিক</i>	১১১
মন্দাক্রান্তা সেনের একবিংশ শতকের কবিতায় নারীর জীবনকথা	
<i>এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা</i>	১১৯
ক্লাসিক্যাল জীবনানন্দ ও পপুলার নজরুল : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ	
<i>কালিপদ বর্মণ</i>	১২৮

নবজাগরণের অগ্রগামী শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর ছোট্ট দাস	১৩৪
বাংলা কবি জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশ : প্রসঙ্গ আনিসুল হকের 'এতদিন কোথায় ছিলেন' দিব্যেন্দু দে	১৪১
শ্রী মা সারদাদেবী ও নারীপ্রগতি নীলেন্দু দাস	১৪৭
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' : সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সূক্ষ্ম যৌনচেতনার আলোকে অভিনব শিল্পসৃষ্টি পাণ্ডু ছাতাইত	১৫১
আদিবাসী কবিদের কবিতায় আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সংকট মকর মুর্মু	১৫৬
সধবার একাদশী ; একটি নির্দিষ্ট কালের সমাজদর্পন মৌসুমী পাল	১৬৩
জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে (নির্বাচিত) মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিফলন মন্দিরা ঘোষ	১৬৮
ভাসপ্রণীত ব্যাযোগ শ্রেণির নাট্যপ্রয়োগ-রীতি লিটন মিত্র	
অনিন্দিতা দাশ	১৭৪
শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম' : উপন্যাসের আধারে ইতিহাসের নবনির্মাণ শিল্পী বকসী	১৮৪
বিদ্যাসাগরের রসবোধ রুবেল পাল	১৯০
বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা : বর্তমান উপযোগিতা শংকরদেব মণ্ডল	১৯৭
'রবীন্দ্রনাথ ও লাইব্রেরি-ভাবনার নবদিগন্ত' দীপঙ্কর দেবনাথ	২০৪
বাঙালির সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিতাই প্রসাদ ঘোষ	২০৮
শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পুরাণ ও মহাকাব্যিক চরিত্রের অনুসৃজন পীযুষ পোদ্দার	২১৭
নতুন মানবিক সমাজ গঠনে সমন্বিত শিক্ষার ভূমিকা : শ্রী অরবিন্দের দর্শনভিত্তিক চিন্তাধারা প্রিয়াঙ্কা নক্সর	২২৬
বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রেম কুমার মণ্ডল	২৩৫
পরিবেশ রক্ষার্থে মানবের প্রাণীদের প্রতি মানবের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ প্রতিমা ঢালী	২৪৫
পুরাতত্ত্ব ও মন্দির : পুরাকীর্তির আলোয় পাড়া মঙ্গল মণ্ডল	২৪৮

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মুসলিম নীতিশাস্ত্র ও বাংলা সাহিত্য <i>মহ আজিম আলি</i>	২৫৩
ইতিহাসের আলোকে ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল বঙ্গসমাজে সতীদাহ প্রথা : একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান <i>রাতুল দে</i>	২৬০
জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কলহ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (১৯২১-১৯৩৯) <i>শান্তনু সরকার</i>	২৬৬
ভবভূতির উত্তররামচরিত-এ 'ছায়া-সীতা'র নাটকীয় তাৎপর্য <i>মেহাশিস রায়</i>	২৭৩
তিলোত্তমা মজুমদারের কথাসাহিত্যে অবদমিত নারীর পদসংগর <i>সীমা মণ্ডল</i>	২৭৭
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে সমাজবিযুক্ত যুবসমাজের চিত্র (নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে) <i>বৈশালী ঘোষ চৌধুরী</i>	২৮৭
সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস, সাম্যবাদী ভাবাদর্শ ও মুক্তির লড়াই <i>সঙ্গীতা পাঁজা</i>	২৯৫
একশো দিনের কাজে নিয়োজিত সাগরদ্বীপের মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ <i>সৈকত জানা</i>	৩০২
উচ্চশিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিক অবস্থা ও বাস্তব চিত্র <i>অজিত কুমার সিংহ</i>	৩০৬
The Role of Peace Education in Shaping Young Minds <i>Dola Sarkar</i>	৩১২
Implementation of Vedic Philosophy in Indian Education System <i>Prasenjit Das</i>	৩১৫
From Arakan to Exile : A Historical Analysis of Rohingya Migration Patterns from the 19th Century to the Present <i>Samina Khatun</i>	৩২১
Pseudo-Secularism : A Hindu Nationalist Perspective on the Indian National Congress <i>Taslima Akter</i>	৩২৭
National Education Policy : School Education Structure <i>Sk. Ruby Akhter</i>	৩৩৪
Navigating the Fog of Reason : Kant's Search for Certainty <i>Souvik Dutta</i>	৩৪০
Impact of flood hazards on fruits and flowers cultivation in Nadia district <i>Ujjal Roy</i>	৩৫০

A Study on Student Teachers Attitude Towards ICT in the Teacher Education Programme	
<i>Lipika Das</i>	
<i>Ripa Mazumder</i>	୭୬୧
Environmental ethics and cosmology in Ancient Indian Literature	
<i>Monalisa Dutta</i>	୭୭୦
The Role of Early Christian Monasticism on the Establishment of Indian Christian Ashrams	
<i>Ajoy Ghosh</i>	୭୭୬
The Universal Moral Values and the Teachings of <i>Bhagavadgita</i>	
<i>Debasree Sadhu</i>	୭୮୦
Natural Disasters and Colonial Response : Scientific Interventions in Floods and Famines in Medinipur	
<i>Dipankar Das</i>	୭୮୧
Upaniṣadic Influence in the Modern Indian Society	
<i>Ram Pada Roy</i>	୭୯୭
The British Army Diet in Colonial India : Nutritional Policies for Soldiers and Their Effects	
<i>Sanchari Chaulya</i>	
<i>Rinky Behera</i>	୭୯୯
Empowering Tribal Women in Junglemahal : Achieving Social and Financial Self-Reliance through Forest Resource Utilization	
<i>Sanchayita Sasmal</i>	୮୧୦
The Burden of the Past : Intergenerational Trauma and Patriarchal Oppression in 'The Dark Holds No Terrors'	
<i>Sangita Halder</i>	୮୧୮
Exploring Teacher Perspectives on NEP 2020 in Indian Higher Education	
<i>Sital Sing</i>	୮୨୫
Concept of Yogāṅga Svādhyāya in the Indian Knowledge Tradition in the light of Manusmṛti	
<i>Santosh Mandal</i>	୮୩୦
Communication as Resistance : A Critical Analysis of Badal Sircar's Third Theatre	
<i>Nazrul Ahmed Zamader</i>	
<i>Santwan Chattopadhyay</i>	୮୩୮
AI Integration in Teacher Education in the Light of NEP-2020	
<i>Subhajit Saha</i>	୮୫୬

সম্পাদকীয়



সময়টা ক্ষয় হয়ে গেলেও চিহ্নটা থেকে যায়। চিহ্নকে সঠিকভাবে চিনতে গেলেই সঠিক চেতনার প্রয়োজন। গভীর চেতনা থেকেই চিন্তনের রসদ তৈরি হয়। রসদ সব সময় অনুসন্ধানের আগ্রহ তৈরি করে। আগ্রহই কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে। ত্বরান্বিত কাজই আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তবে লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েই থেমে থাকা উচিত নয়। থামার আগে আপনার বিচার করা প্রয়োজন। আপনার চেতনার গভীরতা অন্যদেরকে কতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। আপনার উপলব্ধি অন্যদের কতটা বুঝতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি আপনার অনুসন্ধান যেন অন্যদেরকে আপনার কাজের প্রতি অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এবারের ‘এবং প্রান্তিক’ সেই অনুসন্ধানের দিকেই দৃষ্টি রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাবনা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান

শিউলি বসাক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কালীগঞ্জ সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া

সারসংক্ষেপ: ভাষাবিজ্ঞানী সোস্যুর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত হলেও, তাঁর অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করেছিলেন। লন্ডনে প্রবাসকালে এক বিদেশিনীকে বাংলা শেখাতে গিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বানান ও উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রথম লক্ষ্য করেন। সেই সময় থেকেই তাঁর ভাষাতত্ত্ব জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এরপর ১৮৮৫-১৯০৪ (১২৯২-১৩১১ বঙ্গাব্দ) সময়পর্বে বালক, সাধনা, ভারতী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। এই প্রবন্ধগুলিই ‘শব্দতত্ত্ব’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে এবং আরও কিছু প্রবন্ধ সংযোজিত হয়ে ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ নামে প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। পরবর্তীকালে তিনি ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ (১৯৩৮) গ্রন্থে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ভাষা-প্রতীক (‘Signifier’), ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ভাষা-ঋণ, বাংলা ভাষার দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি (Diglossia) ও তার পরিণতি, ভাষাবৈচিত্র ইত্যাদি নানাবিধ দিক নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বের জটিল তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহজ-সরল ভাষায় এই দুটি গ্রন্থে যেভাবে তুলে ধরেছেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করাই বর্তমান প্রবন্ধটির অস্তিত্ব।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, অন্বয়তত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান।

মূল আলোচনা:

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চাতেও বিপুল অবদান রেখেছেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর ‘শব্দতত্ত্ব’ (১৯০৯) ও ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ (১৯৩৮) গ্রন্থদুটি সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure, ১৮৫৭-১৯১৩) বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের (Descriptive Linguistics) প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত হলেও, তাঁর অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ণনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষার বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই বিশ্লেষণে তিনি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিলেন, সেপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ODBL গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন, “...the first Bengali with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore.” সোস্যুরের ‘Course in General Linguistics’ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শব্দতত্ত্ব’ প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। তবে এই দুটি গ্রন্থ-প্রকাশেরই পূর্ব ইতিহাস রয়েছে। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সোস্যুর ভাষাবিজ্ঞান পড়ানোর সময় যে নতুন মতবাদ ব্যাখ্যা করেন, সেগুলিই তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯১৫ সালে তাঁর ছাত্র Charles Bally ও Albert Sechehaye গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ‘জীবনস্মৃতি’ থেকে আমরা জানতে পারি যে, লন্ডনে থাকাকালীন ডাক্তার স্কটের কন্যাকে বাংলা শেখাতে গিয়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বানান

ও উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রথম লক্ষ্য করেন, “ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিখাইবার সময় গর্ব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্মজ্ঞান আছে— পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, ইংরেজি বানানরীতির অসংখ্য নিতান্তই হাস্যকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদেরগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্ব টিকিল না। দেখিলাম, বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন এই নিয়ম-ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম।”^২ সেই সময় থেকেই তাঁর ভাষাতত্ত্ব জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। ১৮৮৫ সালে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর প্রথম প্রবন্ধ ‘বাংলা উচ্চারণ’ প্রকাশিত হয় ‘বালক’ পত্রিকায়। এরপর ১৮৮৫-১৯০৪ (১২৯২-১৩১১ বঙ্গাব্দ) সময়পর্বে বালক, সাধনা, ভারতী, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকায় একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। অর্থাৎ বর্ণনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাতত্ত্বচর্চা নিঃসন্দেহে সোস্যুরের পূর্ববর্তী। এই প্রবন্ধগুলিই ‘শব্দতত্ত্ব’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। পরবর্তীকালে আরও কিছু প্রবন্ধ সংযোজিত হয়ে ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ নামে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি ‘ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে’ বাংলা ভাষা সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করছেন ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থে। ভাষাবিজ্ঞানীদের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি নিজেকে ‘পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী’ রূপে পরিচয় দিলেও, এই গ্রন্থে এক চিন্তাশীল ভাষা-ভাবুক মনের পাশাপাশি তাঁর দার্শনিক মনোলোকের পরিচয় পাই। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, “ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল।”^৩ বাংলা ভাষার উৎপত্তি থেকে শুরু করে তার ক্রমবিকাশ, ভাষা-প্রতীক (যাকে সোস্যুর বলেছিলেন ‘Signifier’), ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ভাষা-ঋণ, বাংলার দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি (Diglossia) ও তার পরিণতি, ভাষা বৈচিত্র্য ইত্যাদি নানাবিধ দিকে তিনি আলোকপাত করেছেন এই গ্রন্থে। উল্লেখ্য, ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ এবং ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থদুটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন যথাক্রমে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে। এছাড়া তাঁর ‘শিক্ষা’, ‘পরিচয়’ ইত্যাদি গ্রন্থের কিছু প্রবন্ধে আমরা ভাষা বিষয়ক আলোচনা পাই, যা মূলত প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। তাঁর ‘ছন্দ’ গ্রন্থটিও ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য। বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিপুল অবদান রেখেছিলেন, আলোচনার সুবিধার্থে তা ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, অস্বয়তত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে ভাগ করে আলোচনা করা হল।

‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থের ‘বাংলা উচ্চারণ’, ‘স্বরবর্ণ অ’, ‘স্বরবর্ণ এ’ প্রবন্ধগুলি বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আকর। ‘বাংলা উচ্চারণ’ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, বাংলা বর্ণমালার তিনটে ‘শ’, দুটো ‘ন’ ও দুটো ‘জ’ শিশুদেরকে কীভাবে বিপাকে ফেলে। তিনটি ‘শ’-এর প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে, উচ্চারণ সর্বত্রই /শ/ ধ্বনির মতো কিন্তু যুক্তাক্ষরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। লক্ষণীয়, সেই সময়ে (১৮৮৫) স্বন (Phone) ও স্বনিম (Phoneme) সংক্রান্ত ধারণার জন্মই হয়নি ঠিক করে। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছেন যে, বাংলায় /শ/ ধ্বনিটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনিমূল (Phoneme) এবং অন্য /শ/ ধ্বনিগুলি আসলে বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-পরিবেশে শর্তসাপেক্ষে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ /স/ ও /য/ হল পূরকধ্বনি

(Allophone)। এছাড়া /অ/ ধ্বনিটি যে বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-পরিবেশে /ও/ ধ্বনিতে পরিণত হয়, সেবিষয়ে আটটি সূত্র নির্দেশ করেছেন এই প্রবন্ধে। এভাবেই তাঁর হাত ধরে উদ্ঘাটিত হয়েছে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের গভীর তাত্ত্বিক সূত্রগুলি। ‘স্বরবর্ণ অ’ প্রবন্ধে তিনি লক্ষ্য করেছেন, “সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়।”^৪ বিশেষ ধ্বনি-পরিবেশে /অ/ ধ্বনি কীভাবে /ও/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, সে বিষয়ে তিনি আরও কয়েকটি দিকে আলোকপাত করেছেন এই প্রবন্ধে। ‘স্বরবর্ণ এ’ প্রবন্ধে তিনি দেখান, ‘এ’ স্বরবর্ণের অন্য আরেকটি উচ্চারিত রূপ হল ‘অ্যা’। অর্থাৎ আমাদের /অ্যা/ স্বনিমিটি, যেটি ধ্বনিমালায় রয়েছে কিন্তু বর্ণমালায় যার কোনো লিখিত রূপ নেই, সেটিকেও তিনি চিহ্নিত করছেন। ‘টা টো টে’ প্রবন্ধটিতে ‘টা’ নির্দেশক প্রত্যয় কীভাবে বিশেষ ধ্বনি-পরিবেশে ‘টো’ কিংবা ‘টে’তে পরিণত হয় অর্থাৎ ধ্বনি-পরিবেশের জন্য মূলধ্বনির পরিবর্তনকে (Coarticulatory Effect) ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখিয়েছেন, /ই/ ও /উ/ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণ-বিকারের মূল কারণ। এভাবেই তিনি স্বরসাম্যের (Vocalic Harmony) কথা বলছেন।

‘বাংলা বহুবচন’, ‘সম্বন্ধে কার’, ‘বাংলা শব্দদ্বৈত’, ‘ধ্বন্যাশ্রক শব্দ’, ‘বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত’, ‘ভাষার ইঙ্গিত’, ‘উপসর্গ সমালোচনা’, ‘বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ’, ‘বাংলা নির্দেশক’ ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে আমরা পাই বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। ‘বাংলা বহুবচন’ প্রবন্ধটিতে তিনি দেখিয়েছেন, শ্রেণীবাচক শব্দযোগে বহুবচন কীভাবে হয়। এখানে তিনি বাংলা ভাষার সঙ্গে হিন্দি, নেপালি, অসমীয়া, মৈথিলী, ওড়িয়া ভাষার বহুবচনের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। ধ্বন্যাশ্রক শব্দের আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ধ্বন্যাশ্রক শব্দ কেবলমাত্র ধ্বনির অনুকরণই নয়, এগুলি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির প্রকাশেও সাহায্য করে। জন বীমসের ‘Grammar of the Bengali Language, Literary and Colloquial’ গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীমসের সমালোচনা করতে গিয়ে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের নানাবিধ দিকে আলোকপাত করেছেন। ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত ছাঁচটিকে তুলে ধরেছেন। কারক প্রসঙ্গে আমরা দেখি, তিনি সম্প্রদান কারককে বাংলা ব্যাকরণে স্থান দিতে চাননি, কারণ তা আসলে কর্ম কারকের মধ্যেই লুপ্ত।

‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থের শেষে তিনি চলিত বাংলার বাক্যবিন্যাস রীতির বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “যারা সাধু ভাষায় গদ্যসাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিন্যাসের একটা ধারা বাঁধা হয়েছিল। তার প্রয়োজন নিয়ে তর্ক নেই। আমার বক্তব্য এই যে এ বাঁধাবাঁধি বাংলা চলতি ভাষার নয়।”^৫ তিনি উদাহরণস্বরূপ বেশকিছু বাক্য উল্লেখ করে চলতি বাংলার নানা রূপ তুলে ধরেছেন। সাধু ভাষার তুলনায় চলিত ভাষার বাধাবন্ধনহীন বাক্যবিন্যাসে বেশি জোর আছে বলে তিনি মনে করতেন। চলিত ভাষার পদক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে বিপর্যাস ঘটে, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। ‘সহজপাঠে’ও আমরা দেখি তিনি বাক্যের পদক্রমে নানা রকমের বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। যেমন, “বনে থাকে বাঘ, গাছে থাকে পাখি, জলে থাকে মাছ।”^৬ এই আশ্চর্যকর বৈচিত্র্য শিশুদেরকে নান্দনিকতার আনন্দ দেয়।

তাঁর ‘সংজ্ঞা বিচার’, ‘নিছনি’, ‘পছঁ’ ইত্যাদি প্রবন্ধে আমরা বাংলা ভাষার শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা পাই। ‘সংজ্ঞা বিচার’ প্রবন্ধে তিনি এমন কিছু শব্দ বেছে নিয়েছেন যে শব্দগুলোর একটি নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ আছে কিন্তু বাক্যে প্রযুক্ত হলে তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা পরিভাষা নির্মাণ, বানান সংস্কার, ভাষাশিক্ষা, ভাষার মান্যায়ন ইত্যাদি প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের নানাবিধ দিকে বিপুল অবদান রেখেছেন। বাংলা পরিভাষা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তিনি ‘প্রতিশব্দ’ প্রবন্ধটির শুরুতেই বলেছেন, “ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা কারবার চলিয়াছে। সেই কারবার-সূত্রে বিশ্বের হাটে আমাদের ভাবের লেনা-দেনা ঘটিতেছে। এই লেনা-দেনায় সবচেয়ে বিঘ্ন ভাষায় শব্দের অভাব।”^৮ যথার্থ পরিভাষা নির্মাণ কাঠামোর অভাবে বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা যে ব্যাহত হচ্ছে তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, “দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় যে-সকল শব্দের দরকার তাহা আমাদের ভাষায় জন্মে নাই। এইজন্য আমাদের ভাষায় শিক্ষার উচ্চ অঙ্গ কানা হইয়া আছে।”^৯ ‘কালচার ও সংস্কৃতি’, ‘ভাষার খেয়াল’, ‘শব্দচয়ন’ তাঁর পরিভাষা নির্মাণের সাক্ষ্য বহন করছে। ‘কালচার ও সংস্কৃতি’ প্রবন্ধে ‘কালচার’ শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে ‘কৃষ্টি’ শব্দটির পরিবর্তে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি ব্যবহারের কথা বলেছেন তিনি। কারণ ‘কৃষ্টি’ শব্দটি ইংরেজি কালচার শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ। দ্বিতীয়ত, জমির চাষ ও মনের চাষ এই দুটো বিষয়কে তিনি আলাদা রাখতে চেয়েছেন। এছাড়া কৃষ্টি শব্দটি থেকে বিশেষণ তৈরি করতে হলে ক্রৈষ্টিক বা কৃষ্টিমান ভালো শোনায় না। তবে প্রয়োজন অনুসারে তিনি ভাষা-খণের কথাও বলেছেন। ‘প্রতিশব্দ’ প্রবন্ধটিতেই তিনি দেখিয়েছেন যে, ইংরেজি ‘নেশন’ শব্দটির প্রতিশব্দ রূপে বাংলায় ‘জাতি’ শব্দটির প্রয়োগ যথাযথ নয়, কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, “আমি নেশন শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার না করিয়া ইংরেজি শব্দটাই চলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ইংরেজি Nation, race, tribe, caste, genus, species— এই ছয়টা শব্দকেই আমরা জাতি শব্দ দিয়া তর্জমা করি। তাহাতে ভাষার শৈথিল্য ঘটে।”^{১০} অবশ্য এই প্রবন্ধে তিনি উক্ত ছটি ইংরেজি শব্দের জন্য পৃথক পৃথক বাংলা পরিভাষার প্রস্তাব রেখেছেন।

একটি নির্দিষ্ট বানানবিধিরও প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, তাঁরই প্রস্তাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৫ সালে বানান সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সর্বদাই সংস্কৃত বানানের অনুকরণকে তিনি সমর্থন করেননি। অর্থভেদ বোঝানোর জন্য তিনি ‘কি’ ও ‘কী’— এই দুই রকম বানানের প্রস্তাব রেখেছেন। এছাড়া তাঁর ‘অনুবাদ চর্চা’, ‘কাব্যিক প্রয়োগ’, ‘চিহ্নবিদ্রাট’ ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞানের নানাদিকে আলোকপাত করা হয়েছে। যতি চিহ্নের প্রয়োগে তিনি ছিলেন মিতব্যয়ী। ‘চিহ্নবিদ্রাট’ শীর্ষক লেখাটিতে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, “চিহ্নের অকারণ উৎপাত সহিতে পারি নে।”^{১১} যথার্থ বাংলা অভিধানের অভাবও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই দুঃখ ধ্বনিত হয়েছে ‘বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত’ শীর্ষক প্রবন্ধে, “আজ পর্যন্ত বাংলা অভিধান বাহির হয় নাই।”^{১২} তাঁরই আহ্বানে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’।

ভাষাশিক্ষা সম্পর্কেও তিনি যে অসাধারণ চিন্তাশক্তি ও তাত্ত্বিক মননের পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনারহিত। মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেও তিনি বারবার ইংরেজি শেখার কথা বলেছেন। ‘পরিচয়’ গ্রন্থের ‘শিক্ষার বাহন’ প্রবন্ধে তিনি বলছেন, “বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই — শুধু পেটের জন্য নয়। ... বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।”^{১৩} তিনি একদিকে ‘সহজপাঠ’ যেমন লিখেছেন, তেমনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষাশিক্ষার জন্য লিখেছেন ‘ইংরাজি-সোপান’, ‘ইংরেজি-শ্রুতিশিক্ষা’, ‘ইংরেজি-সহজশিক্ষা’, ‘অনুবাদ চর্চা’, ‘ইংরাজি পাঠ’-এর মতো গ্রন্থ।

সাধু-চলিতের দ্বন্দ্ব ও ভাষার মান্যায়ন নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাই ‘ভাষার কথা’ প্রবন্ধে। ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থে তিনি সাধুভাষাকে সুয়োরানী ও চলিতভাষাকে দুয়োরানীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, “আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজসনে।”^{১৩} রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য তথা উপভাষাগুলিকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন। এই বৈচিত্র্যগুলির মধ্যে কোনটি মান্যতা পাবে সে বিষয়ে তাঁর মত ছিল, “যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলাভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধুভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম লাভ করবে।”^{১৪} অর্থাৎ তিনি এখানে মান্য চলিত বাংলার (Standard Colloquial Bengali) কথা বলেছেন। জাতিসত্তার নির্মাণে ভাষার ভূমিকাকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন, “সমাজ এবং সমাজের লোকেদের মধ্যে প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদান-প্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে।”^{১৫}

এভাবেই বাংলা ভাষার অনেক রহস্যের কিনারা পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভাবনায়। ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’ গ্রন্থে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি, বাংলা ভাষার সংগঠনিক বিচার-বিশ্লেষণে (Structural Analysis) তিনি আলোকপাত করেছেন, যথাযথ নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বহু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। পবিত্র সরকার তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, “পৃথিবীর ভাষাবিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি ভাষার চালু নিয়ম কারণসুদ্ব বিশদ করে বলেছেন।”^{১৬} তাঁর ভাষা-ভাবুক মনের পাশাপাশি তীক্ষ্ণ বিচার শক্তির পরিচয় আমরা পাই এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে। আবার ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থটিতে আমরা ভাষার দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রচিন্তার পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করি। ‘বাকপতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে, সত্যই তাকে বাকপতি বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়।”^{১৭} তিনি আরও বলেছেন, “এমন করে তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আর কারও চোখে পড়েনি! ... বাংলা ভাষাতত্ত্বের বা বাংলাভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।”^{১৮} ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়।”^{১৯} তবে তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষা বিশ্লেষণ থেকে ভাষার নাড়ীনক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগটি খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

- ১। Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi-110002, 1993 (First Published by Calcutta University, 1926), p. xvi
- ২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৪৭৬
- ৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাভাষা-পরিচয়, বিশ্বভারতী, কলিকাতা-১৭, ১৯৩৮, পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৫, পৃ. ৯

১৬ | এবং প্রান্তিক

- ৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-১৭, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯১, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪২৩, পৃ. ২২
- ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ১২৩
- ৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজপাঠ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, পৃ. ৪৪৪
- ৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১৮৩
- ৮। তদেব, পৃ. ১৮৩-১৮৪
- ৯। তদেব, পৃ. ১৮৪
- ১০। তদেব, পৃ. ২৯০
- ১১। তদেব, পৃ. ৮৯
- ১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-১৭, সুলভ সংস্করণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৬২৩-৬২৪
- ১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৪১
- ১৪। তদেব, পৃ. ৪৯
- ১৫। তদেব, পৃ. ১৫
- ১৬। ক্ষুদিরাম দাস ও অন্যান্য (সম্পাদিত), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৫, পৃ. ২৮৪
- ১৭। অলিভা দাস্কী (সম্পাদিত), ভাষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, কলিকাতা-১০, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১৩০
- ১৮। তদেব, পৃ. ১৩২
- ১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮-৯।

মধ্যযুগে বাংলা ভাগবত অনুবাদের ধারায় রঘুনাথ ভাগবতাচার্য

ও দুঃখী শ্যামদাস

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম

সারসংক্ষেপ: মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ ও অনুসারী ধারার সাহিত্যের দুটি শ্রেণি—সংস্কৃত পুরাণ অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্য-ধারা এবং ইসলাম অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্য ধারা। হিন্দুর পৌরাণিক ভাবদর্শকে সমাজ-জীবনে আরোপ করার জন্য এবং ইসলামি আগ্রাসনের সময়কালে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর সমন্বয়ের প্রয়োজনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং স্মৃতি, শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করা হতে থাকে। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে ভাগবত অনুবাদের পরম্পরাকে বিষয় করে এই ধারার দুই বিশিষ্ট কবি কবি—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ('শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী') এবং দুঃখী শ্যামদাসের ('গোবিন্দমঙ্গল') সাহিত্যিক মানদণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র রচয়িতা মালাধর বসু বাংলা ভাগবত অনুবাদ সাহিত্য ধারার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কবি; তিনি ছাড়াও এই ধারার কবিদের অনুবাদ-বৈচিত্র্য, ভক্তির প্রবণতা, চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে কৃষ্ণকথার ধারাবাহিকতা ও গুরুত্ব—প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য দুইজন কবির সাহিত্যিক তাৎপর্য অবলম্বন করে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ভাগবত পুরাণের সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা ভাগবত অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্যের যেমন তুলনা হয়েছে, একইসঙ্গে আলোচ্য দু-জন কবির রচনারীতি ও কবি-স্বভাবেরও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : কৃষ্ণলীলা কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, তুলনামূলক সমালোচনা, ভাবানুবাদ, পুরাণ, ভাগবত, চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা: মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের ধারায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের মতোই ভাগবতের অনুবাদের একটি বলিষ্ঠ প্রবণতা দেখা যায়। মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার মধ্যে দিয়ে এই ধারার সুত্রপাত করেন, তিনিই ভাগবত অনুবাদের শ্রেষ্ঠ কবি, যা আমরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বত্রই পড়ে এসেছি। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আমরা এই ভাগবত নির্ভর অনুবাদ সাহিত্য-ধারার রচনারীতির দিক থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বভাবধর্মে বিপরীত দুই কবি—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য এবং দুঃখী শ্যামদাসের সাহিত্যিক মানদণ্ডের তুলনামূলক আলোচনা করব। একই সঙ্গে ভাগবত অনুবাদ বা অনুসারী সাহিত্য পরম্পরার সামগ্রিক পরিসরে আলোচ্য কবিদের অবস্থানও নির্ণয় করব।

বাংলা সাহিত্যে যখন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় তখন অনুবাদের প্রথম সহায় হয়ে উঠেছিল সংস্কৃত সাহিত্য। এছাড়া, তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালে ইসলামের আগ্রাসনের হাত থেকে বাঙালির হিন্দুধর্মকে বাঁচাতে দরকার ছিল হিন্দুর পুরাণ ও মহাকাব্য অনুবাদের। আবার ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশের শাসন ভার গ্রহণ করেই অনুভব করতে পারেন যে, বাংলাদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হলে দেশের অগণিত হিন্দু প্রজাকে জানা ও তাদের সহানুভূতি লাভ করা একান্তভাবে জরুরি। তাই তারা হিন্দুর সঙ্গে মিত্রতার নীতি

অবলম্বন করে, আর তারই সঙ্গে দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক রূপে কাজ করে।^১ বলা যায়, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের জন্ম হয়েছে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ কৃত্তিবাস ওঝা রচিত ‘শ্রীরাম-পাঁচালী’। যার মূলে ছিল রাজা গৌড়েশ্বর গণেশের পৃষ্ঠপোষকতা। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ মালধর বসুকৃত ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যও মুসলমান শাসক গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় অনূদিত হয়। বিজয় গুপ্তের ‘পদ্মপুরাণ’ রচনা এবং শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ‘মহাভারত’-এর অনুবাদ পরোক্ষভাবে সম্রাট হুসেন শাহের উৎসাহেই ঘটেছিল।

বাংলা অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্য ধারায় যে বৈচিত্র্যময় গ্রন্থাবলী, তা ভাষাগত উৎসের ভিত্তিতে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি—ক) সংস্কৃত পুরাণ অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্য ধারা এবং খ) ইসলাম অনুবাদ ও অনুসারী সাহিত্য ধারা। সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থগুলির ভাবপ্রেরণার উৎস হিসাবে পাওয়া যায় হিন্দুর পৌরাণিক ভাবাদর্শকে। সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থগুলিকে আবার উৎস গ্রন্থের মানদণ্ডে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল যথাক্রমে—মহাকাব্য অনুবাদ (রামায়ণ ও মহাভারত), পুরাণ অনুবাদ (ভাগবত) এবং স্মৃতি, শাস্ত্র ও অন্যান্য অনুবাদ।

তুর্কি তথা ইসলামের আগ্রাসনের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের জন্য হিন্দুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা যায়। এই সময়কালকে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দীনেশচন্দ্র সেন ‘সংস্কার-যুগ’ বলে চিহ্নিত করেছেন। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এতদিন সংস্কৃত ভাষাকে বেশি আদর ক’রে, দেশি লোকভাষা ও তার লোকায়ত সাংস্কৃতিক পরিচয়কে অবহেলা করেছিল। নিম্নবর্ণের লোকদের কাছে টানতে তাদেরকে সেইসময় লোকভাষা ও লৌকিক সংস্কৃতির উপর জোড় দিতে হয়। নিম্নবর্ণের অনার্য দেবতাকে কাছে টেনে নিয়ে তার আর্থীকরণের প্রবণতা আসে। ভারতের সনাতন ধর্মগ্রন্থ, মহাকাব্য, পুরাণ, শাস্ত্রকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার প্রবণতাও যুক্ত হয়। ফলে মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্য পুরাণ-মহাকাব্যের ঘটনা-চরিত্রের প্রভাবে রচিত হতে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই সব জাতীয় ঐতিহ্যের বাণী এবং সনাতন ধর্মীয় আবেগকে বাংলার তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দিতে তখন অনুবাদ তাদের সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকরী মাধ্যম হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে কথা-কেন্দ্রিক যে শ্রুতি-গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়, তাকে ‘পুরাণ’ নামে অভিহিত করা হয়। পুরাণের মধ্যে ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, কাব্যরস সবই থাকে। পুরাণের স্বরূপ বিষয়ে গিরীন্দ্রশেখর বসু বলেছেন—

“পুরাণের অভিধেয় বা বক্তব্য কি, পুরাণ নিজেই তাহা নির্দেশ করিয়াছেন।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনবন্তরাণি ছ।

বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ বা। ৪। ১০।।

অর্থাৎ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। আধুনিক গ্রন্থকার যেমন মুখবন্ধে তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেন, সেইরূপ পুরাণকার এই শ্লোকে তাঁহার বক্তব্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। সর্গ অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি বুঝায়। প্রতিসর্গ প্রলয়ের নামান্তর। রাজা, ঋষি, প্রধান প্রধান ব্যক্তি, দেবতা, দৈত্যগণের বংশের উৎপত্তি, স্থিতি, বিলোপ ও বংশানুক্রমই বংশ শব্দের অভিধেয়; ইংরেজীতে dynasty বলিলে যাহা বুঝায়, বংশ তাহারই সম্যক বিবরণ। মনবন্তর অর্থে মনুকাল, কালগণনার জন্য যুগকাল ও মনুকাল কল্পনা করা হয়। বংশানুচরিত অর্থে বিখ্যাত রাজা বা মহাত্মাদিগের জীবনচরিত ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা।”^২

সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারোটি পুরাণ বা মহাপুরাণ এবং আঠারোটি উপপুরাণ বা অর্বাচীন পুরাণ আছে। আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণকে অন্য সতেরটি পুরাণের নির্ধারিত রূপে গ্রহণ করা হয় এবং এটি বৈষ্ণব ধর্মের সার গ্রন্থ। ‘শ্রীমদ ভাগবতম’-এর বারোটি স্কন্ধ, তিনশ পঁয়ত্রিশ অধ্যায় এবং শ্লোক সংখ্যা আঠারো হাজার। মূল ভাগবতের দশম এবং একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণকথা বর্ণিত হয়েছে। তবে, ভাগবতের রচয়িতা এবং রচনাকাল নিয়ে যে সমস্যা, তা এখনও নিরসন হয়নি। মহাকাব্যের মতো ভাগবতের রচনাও কোনো একক কবির নয়, ভাগবত বৃহৎ সম্প্রদায়ের সার্বিক অভিজ্ঞতার রূপায়ন। একালের গবেষকদের মতে, ভাগবত-পুরাণ অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, আর এর আদি রচয়িতা ব্যাসদেব।

মধ্যযুগে বাংলা ভাগবত অনুবাদের ধারা

বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগবতের ভক্তধর্ম নিয়ে আসেন, কৃষ্ণরসে ভরপুর মাধবেন্দ্রপুরী। তিনিই প্রথমে ভাগবতকে বাংলাদেশে প্রচার করেন। তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাগবতের প্রথম অনুবাদ করেন কুলীনগ্রামের কায়স্থ মালাধর বসু। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্য রচনা করে গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে ‘গুণরাজ-খান’ উপাধি লাভ করেন। তার ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ ভাগবতের দশম এবং একাদশ স্কন্ধের মূলানুগ অনুবাদ। ভাগবতে আছে সত্ত্ব-গুণের প্রাধান্য; এবং এটি বিষু, নারদীয়, গডুর, পদ্ম ও বরাহ পুরাণের মতোই বৈষ্ণব পুরাণ, এখানে আছে বিষু ভগবানের প্রাধান্য।^৭

মধ্যযুগে ভাগবত অনুবাদের পরম্পরাটি একটি সাহিত্যিক অনুবাদ ধারায় পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থগুলি হল—রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী’, মাধব আচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, দৈবকীনন্দন সিংহের ‘গোপালবিজয়’, দুঃখী শ্যামদাসের ‘গোবিন্দমঙ্গল’, কৃষ্ণদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, গীতাঙ্গর দাসের ‘ভাগবত’ প্রভৃতি। পঞ্চদশ শতকে মালাধর বসুর হাতে ভাগবত অনুবাদের যে ধারার সূচনা হয়, তা চৈতন্যদেবের প্রভাবে আরও ব্যাপকভাবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

“চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ভক্তধর্মের প্রতি জনচিন্তের আকর্ষণ বৃদ্ধির ফলে কৃষ্ণলীলার মূল আকর ভাগবতের প্রতিও দৃষ্টি পড়িল। চৈতন্যের অনেক ভক্ত ও অনুচর ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ-ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন।”^৮

মালাধর বসু ভাগবতীয় ভক্তধর্মকে বাঙালি সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভাগবতের অনুবাদ করেন। চৈতন্য সমসাময়িককালে চৈতন্যদেবের প্রভাবে মূলত ভাগবতকে মূলানুসারী অনুবাদ করেন ভক্ত বৈষ্ণবগণ। তবে, ধীরে ধীরে ভাগবতের অনুবাদে লৌকিক গ্রাম্য কৃষ্ণকথা স্থান দখল করতে থাকে।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী’

বিমানবিহারী মজুমদার ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ‘পাঁচশত বৎসরের পদাবলী’ গ্রন্থে প্রথম রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের দুটি পদ সংকলিত করেছিলেন। পদদুটি হল—‘কঙ্কণ-কিঙ্কিনী নূপুরের বনবানি’ (রাসলীলা) এবং ‘সকুৎ অধরমধু করাইয়া পান’ (দিব্যোন্মাদ)। এই পদদুটি ভাগবতের রঘুনাথ কৃত অনুবাদ এবং ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী’ থেকে নেওয়া। চৈতন্য সমসাময়িক কালে ভাগবতের প্রভাব যার কাব্যে সবচেয়ে বেশি পড়ে তিনি হলেন ভাগবতচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত। গ্রন্থে কবি

কোনো আত্মপরিচয় দেননি; তবে ভণিতায় ‘ভাগবতাচার্য’ অভিধার সঙ্গে ‘রঘুনাথ’ ও ‘রঘুপণ্ডিত’ ব্যবহার করেছেন।

রঘুনাথ পণ্ডিত চৈতন্যপার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের অন্ত্যলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেব একবার পুরী থেকে ফেরার পথে বরাহনগরে রঘুনাথ নামক এক বৈষ্ণবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তার মুখে ভাগবত পাঠ শুনে মহাপ্রভু তাঁকে ‘ভাগবতাচার্য’^৫ উপাধি দেন। তিনি মহাপ্রভুর উৎসাহে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গ্রন্থেই ভাগবতের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তিনি সম্পূর্ণ ভাগবত পুরাণের মূলানুবাদ করেছেন।^৬ বিশেষত দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ প্রায় আক্ষরিক। এ প্রসঙ্গে, বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক সুখময় মুখোপাধ্যায় ভাগবতাচার্যের সম্পর্কে বলেছেন—

“এদেশে ভাগবত পুরাণের জনপ্রিয়তা রামায়ণ বা মহাভারতের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। ...যে ক’খানি অনুবাদ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে রঘু পণ্ডিত নামে পরিচিত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্যের অনুবাদই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এই রঘুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগরে। ইনি ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী’ নাম দিয়ে ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত এবং তিন স্কন্ধের পূর্ণাঙ্গ আকারে অনুবাদ করেন। রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত।”^৭

আবার তাঁর কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী’ সম্পর্কে সমালোচক মণীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন—

“১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনীর রচিওয়িতা ভাগবতাচার্যের উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

নির্মাতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী।

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যো গৌরাঙ্গআত্যন্ত বহুভঃ।।”^৮

তিনি কোথাও ভাগবত-পুরাণ বহির্ভূত কাহিনি, ঘটনা ও চরিত্রকে তাঁর কাব্যে স্থান দেননি। কারণ তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সমাজের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

“সকল ধর্মের সার কৃষ্ণ-আরাধন।

মহাভাগবত বলি, এই সে কারণ।।

কেবল বৈষ্ণব-ধর্ম, কৃষ্ণগুণ-গাথা।

মহাভাগবতে না কহিব অন্ন-কথা।।”^৯

তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, ভাগবত-অতিরিক্ত কোনো গ্রাম্যকথাকে তাঁর কাব্যে স্থান দেননি। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী’ গ্রন্থটি ভাগবত পুরাণের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও মূলানুগ অনুবাদ। পয়ার-ত্রিপদী সঙ্গেই তিনি মূল ভাগবতের শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। ভাগবতের অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী’ গ্রন্থটি আক্ষরিক অনুবাদ হয়েও সরল ও কাব্যগুণান্বিত। তাঁর গ্রন্থের পয়ারগুলির সঙ্গে ভাগবত পুরাণের বিভিন্ন শ্লোকের হুবহু মিল পাওয়া যায়। আমরা একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। ভাগবত পুরাণের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে ভাগবতের মহিমা বর্ণনায় ব্যাসদেব লিখেছেন—

“নিগমকল্পতরোগলিতিং ফলং

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং

মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।”^{১০}

রঘুনাথ পণ্ডিত তাঁর কাব্যে এই শ্লোকটিকে একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। যথা—

“নিগমকল্পতরু-বিগলিত-ফলে।

শুকমুখে পতিত অমৃত মধুতর।।

ক্ষিতিতলে অবতরি ভাগবত নাম।

পিবয়ে ভাবুক ভাই, রসিক সুজান।।”^{১১}

ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবত পুরাণকে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, তা আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করি। তার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল কৃষ্ণকথা, তাই তিনি প্রথম থেকে নবম স্কন্ধের কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করে দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণকথাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। এপ্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন—“রঘু পণ্ডিতের ‘কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী’ও স্কন্ধ-অধ্যায় ধরিয়া ভাগবতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।”^{১২} তিনি প্রথম থেকে নবম স্কন্ধের কাহিনিকে কতটা সংক্ষিপ্ত করেছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়—

স্কন্ধ	ভাগবত	শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী
১	১৯ টি অধ্যায়	৫ টি অধ্যায়
২	১০ টি অধ্যায়	২ টি অধ্যায়
৩	৩৩ টি অধ্যায়	৯ টি অধ্যায়
৪	৩১ টি অধ্যায়	৮ টি অধ্যায়
৫	২৬ টি অধ্যায়	৮ টি অধ্যায়
৬	১৯ টি অধ্যায়	৩ টি অধ্যায়
৭	১৫ টি অধ্যায়	৫ টি অধ্যায়
৮	২৪ টি অধ্যায়	৭ টি অধ্যায়
৯	২৪ টি অধ্যায়	৯ টি অধ্যায়
১০	৯০ টি অধ্যায়	৯০ টি অধ্যায়
১১	৩১ টি অধ্যায়	৩১ টি অধ্যায়
১২	১৩ টি অধ্যায়	১৩ টি অধ্যায়

তিনি প্রথম থেকে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ভাগবতের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনিকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করতে গিয়ে অধ্যায় সংখ্যা হ্রাস করেছেন। তবে, তিনি মূল ভাগবতের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত কোনো কাহিনিকে বর্জন করেননি, সংক্ষিপ্ত করেছেন—যা কবির পরিমিতবোধ ও শিল্পীসুলভ সংযমের মৌলিক পরিচয় হয়ে উঠেছে। সমালোচক গীতা চট্টোপাধ্যায় কবির অনুবাদের প্রকৃতি ও প্রবণতা বিচার করে প্রসংসার সুরে বলেছেন—

“প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেরণা অন্তরে বহন করে তাঁকে কলিযুগের পরমোপাস্যরূপে জেনে রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ভাগবতের যে অনুবাদ করলেন, তা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গিনী ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব? রঘুনাথের গ্রন্থ তাই অনুবাদ হয়েও অনুবাদ নয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী একান্তভাবে চৈতন্যযুগসাহিত্যেরই লক্ষণাক্রান্ত, অর্থাৎ তা অনুবাদ হয়েও ভাষ্য; আবার ভাষ্য হয়েই তা ভাগবত-বাণীর শ্রেষ্ঠ মর্মানুবাদ।”^{১৩}

দুঃখী শ্যামদাস রচিত ‘গোবিন্দমঙ্গল’

‘শ্রীমুখ জনমদাতা, সুমতী ভবানী মাতা, যার পুণ্যে সিরজিল তনু’—দুঃখী শ্যামদাসের এই সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, দুঃখী শ্যামদাস সপ্তদশ শতাব্দীর^{১৪} কবি এবং কবির পিতা ছিলেন শ্রীমুখ ও মাতা ভবানী। মেদিনীপুরের হরিহরপুরে কবিদের বাস ছিল এবং মেদিনীপুরের রাজার থেকে ভূমিবৃত্তি পেয়েছিলেন তাঁরা। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যচরিতামৃতের মতো গ্রন্থের সাথে পরিচিত ছিলেন; যার প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনায়। তিনি বৈষ্ণব-ভক্তদের উৎসাহে ভাগবতের অনুবাদ শুরু করেন। তাঁর অনুবাদকর্মের উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্তনপ্রিয় বৈষ্ণবদের মধ্যে ভাগবতীয় কৃষ্ণকথা প্রচার করা। চৈতন্যদেব ভাগবতীয় কৃষ্ণকথাকে প্রাধান্য দিতেন বলে দুঃখী শ্যামদাসও ভাগবতের প্রভাবে ‘গোবিন্দমঙ্গল’ কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ভাগবত পুরাণের মূল কাহিনি কাঠামো, ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র নির্মাণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়েছেন দুঃখী শ্যামদাস। ‘গোবিন্দমঙ্গলের’ কাব্যের ভূমিকায় সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু জানিয়েছেন—

“দুঃখী শ্যামদাস কাশীরাম দাসের ন্যায় সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না। আর তিনি কৃষ্ণগুণকীর্তন দ্বারা ভক্তোচিত কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং ইহাতে তিনি কেবল রচনা-নৈপুণ্য দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। গোবিন্দমঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ; কাব্য গ্রন্থ নহে।”^{১৫}

দুঃখী শ্যামদাস ভাগবতে ব্যবহৃত কাহিনি বর্ণনের আঙ্গিকে অর্থাৎ পরীক্ষিত ও শুকদেবের প্রশ্নোত্তরের রীতিতেই কাব্য কাহিনি বর্ণনা শুরু করেছেন। মূল ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ বর্ণিত পরীক্ষিতের রাজত্ব, রাজ্য, দর্শন, কলি, ও ধর্মের সঙ্গে পরীক্ষিতের সাক্ষাৎ, কলিদমন, ব্রহ্মশাপ লাভ, শাপমোচনের জন্য গঙ্গা যাত্রা, ধর্মসভায় বিমূঢ় ঋষিগণের আলোচনা, শুকদেবের আগমন, রাজার শাপ মুক্তির উপায় নিয়ে প্রশ্ন, এরপর শুকদেবের মূল ভাগবত কথার সূত্রপাত করেন। দুঃখী শ্যামদাস ভাগবতের এই সমস্ত ঘটনাকে তার ‘গোবিন্দমঙ্গল’ কাব্যে প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কবি নিজের সুবিধামত কোথাও কোথাও কাহিনিকে পরিবর্তন করে নিয়েছেন।

কৃষ্ণকথা বর্ণনায় কবি আক্ষরিক অনুবাদকে প্রাধান্য দেননি। তিনি ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং লোকপ্রচলিত কৃষ্ণকথাকে তাঁর অনুবাদে অবলম্বন করেছেন। ‘গোবিন্দমঙ্গল’ কাব্যের কাহিনি বিন্যাসে তিনি নিজের সুবিধামত ও লোকসমাজের মনোরঞ্জন দিকে লক্ষ্য রেখে ভাগবতের কাহিনিকে নানা স্থানে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। দুঃখী শ্যামদাস রচিত ‘গোবিন্দমঙ্গল’ কাব্যে ভাগবতের যে সকল কাহিনিকে নিজ কল্পনা শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত করছেন, সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—পুতনাবধ কাহিনিতে পুতনার মধ্যে মাতৃত্ব আরোপ, ফল বিক্রয়িনীর কাহিনি, বরুণালয় নদের উদ্ধার প্রসঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের মিলন বর্ণনা, কালীয়ানাগ দমন বর্ণনায় সুকৌশলে গজ-কচ্ছপ ও অরুণ-গড়ুরের কথা ইত্যাদি।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুতনাবধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা আলোচনা করলে কবির কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতে পুতনা ভয়ংকরী রাক্ষসী। তার কাজই ছিল শিশুদের হত্যা করা। পুতনা নিজ ইচ্ছা মত এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ধারণ করে গোকুলে আসে। কিন্তু, দুঃখী শ্যামদাস পুতনা চরিত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। শ্যামদাসের বর্ণনায়

পুত্রের মৃত্যুতে পুতনা পাগলের মতো হয়ে যায়। এই অবস্থায় সে গোকুলে এসে উন্মাদিনীর মতো নিজের সন্তানহীনতার দুঃখ বিলাপ করে বলতে লাগলেন—

স্বর্গ বিদ্যাধরীপুতনা প্রবেশে গোপে

মোহিনী সন্ধান ধরি যায়।

গোপ-গোপী শত শত নগরে নাগরী যত

পুতনা জিজ্ঞাসা করে তায়।।

হাম নারী দুঃখমতী পুত্র মৈল কাল রাতি

ঠুনকায় না রহে পরাণ।

জিজ্ঞাসি তোমার কাজে কার ঘরে পুত্র আছে

কহ তারে দিব স্তন পান।।

হৈয়া মহাশোকাতুর তেয়াগিনু নিজ পুর

পুত্র বিনা প্রাণে কিবা কাজ।

না দেখি পুত্রের মুখ অন্তরে বিদরে বুক

সত্য কহি সবার সমাজ।।^{১৬}

পুতনার দুঃখ শুনে ব্রজবালা পুতনাকে যশোদার গৃহে যাওয়ার উপদেশ দেয়। যশোদার কাছে এসে পুতনা নিজের সন্তানহীনতার যন্ত্রণার কথা বলে। সন্তানহীন জীবনের দুঃখ যশোদাও জানে, তাই সে পুতনার প্রতি সহানুভূতি দেখায়। সে পুতনাকে কৃষ্ণের ধাত্রী করে রাখবে ভেবে তার কোলে কৃষ্ণকে দেয়। পুতনা তখন কৃষ্ণের মুখ চুম্বন করে এবং মুখে বিষ-স্তন দেয়। এরপর কৃষ্ণ দ্বারা পুতনার প্রাণহরণ ও পুতনার ভয়ঙ্কর দেহ সংকারের ঘটনা শ্যামদাস ভাগবত পুরাণের প্রভাবে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পুতনা চরিত্রের আগমন ও তার মধ্যে জনম দুঃখিনী নারীর মাতৃত্বের বাসনা আরোপ করে কবি ভাগবত পুরাণকে অতিক্রম করেছেন। তাছাড়া এতে চরিত্রটিও মানবিক ও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে। শ্যামদাস তার কাব্যে কৃষ্ণ চরিত্রে আদিরসাত্মক আচরণ আরোপ করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রে এই মানবীয় আচরণের সংযোজন কবির ভাগবত পুরাণের প্রভাব অতিক্রমণের চেষ্টা বলা যায়।

দুঃখী শ্যামদাসের কাব্যের বাহ্যিক কাঠামো ভাগবত অনুসারী হলেও ভাগবতের কাহিনিকে তিনি নিজ কল্পনার শক্তির দ্বারা নবরূপ প্রদান করেছেন। দানলীলা ও রাসলীলার কবিত্বময় বর্ণনা ছাড়াও তাঁর মৌলিকতার প্রধান দৃষ্টান্ত হল ভাগবত বহির্ভূত কাহিনি ও চরিত্রকে ভাগবতের কৃষ্ণকথায় স্থান দেওয়া। তবে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবির সম্পর্কে বলেছেন—

“ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে দুঃখী শ্যামদাস ‘গোবিন্দমঙ্গল’ নামক আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন স্থলে অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ হইতে দুই-চারিটি আখ্যান গৃহীত হইলেও মূল ঘটনা কিন্তু দশম স্কন্ধেরই সংক্ষিপ্তসার। অবশ্য কবি প্রায় কোথাও অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেন নাই, শুধু আখ্যানটিকে বিবৃত করিয়াছেন। কবিত্ব বিচারে ‘গোবিন্দমঙ্গল’ এমন কোনো প্রশংসা দাবি করিতে পারে না—পরিচ্ছন্ন ঘটনাবিবৃতিই ইহার একমাত্র গুণ।”^{১৭}

উপসংহার:

বর্তমান আলোচনায়, প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য পরম্পরার মিথীজীবীত্বের সত্যতাও আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। আর এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য আমাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য—

“তুলনামূলক সাহিত্য পাঠপদ্ধতি তুলে আনে এই অনুরূপতা ও আন্তঃসম্পর্কগুলিকে। আর এই তথ্যগুলি দিয়ে রচিত হয় ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রের বহুরূপতা ও বৈচিত্র্য। তুলনামূলক সাহিত্য আমাদের সচেতন করে তোলে এ বিষয়ে যে ভারতীয় ভাষাসাহিত্য সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে নয়, সম্পর্কের মিথোজীবীত্ব দিয়ে হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত।”^{১৮}

পূর্বে কথিত ‘সংস্কার-যুগ’-এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক বিশেষ কালখণ্ডে মধ্যযুগের অনুবাদক-কবিরা ভাগবতের বাংলা অনুবাদ কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখলাম, সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশের মতো রঘুনাথ ভাগবতাচার্যও ভাগবতের মূলনুগ অনুবাদ করেছেন; বারোটি স্কন্ধই সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ অনুদৃত হয়েছে। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ভাগবতের মূল কাহিনি, ঘটনা, চরিত্রকে অবিকৃত রেখে নিজের কল্পনাশক্তির দ্বারা কৃষ্ণকথাকে পল্লবিত করে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার কাব্যে লৌকিক কৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও লক্ষণীয়। তবে, ‘শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী’তে মৌলিকতা দেখা যায় না, আবার স্থানীয় জীবনচিত্র বা বৃহত্তর জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়ও দেখা যায় না।

দুঃখী শ্যামদাসের ‘গোবিন্দমঙ্গল’, মাধবাচার্যের ‘ভাগবতসার’, কৃষ্ণদাসের ‘কৃষ্ণমঙ্গল’, পরশুরামের ‘কৃষ্ণমঙ্গল’, অভিরাম দাসের ‘গোবিন্দমঙ্গল’ প্রভৃতি গ্রন্থের মতোই ভাগবতের আংশিক অনুবাদ কাব্য। দুঃখী শ্যামদাসের অনুবাদের আধার মূলত দশম স্কন্ধ। তবে, ভাগবতের নানান স্কন্ধের কাহিনি ও লৌকিক কাহিনিকে আশ্রয় করেছেন তিনি—এখানেই কবির বিশেষত্ব। যদিও একই কাজ করেছেন মালাধর বসু; তবে কবিত্বশক্তির পরিচয়ে, সমাজ ও জীবনের রূপাঙ্কনে তিনিই ভাগবত অনুবাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলে বিবেচিত। বর্তমান নিবন্ধে রঘুনাথ পণ্ডিত (ভাগবতাচার্য) ও দুঃখী শ্যামদাসের তুলনামূলক আলোচনায় ভাগবত অনুবাদের ধারার বৈচিত্রময় পরিচয় যেমন পেলাম, তেমনিই ভিন্ন ভিন্ন কবির ভক্তিতাবনা ও শিল্পতাবনার পরিসর এবং সামঞ্জস্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম।

তথ্যসূত্র:

- ১। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৪, ‘বাংলা সাহিত্যের কথা’, ঢাকা, প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ-১১।
- ২। বসু, গিরীন্দ্রশেখর, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৯, ‘পুরাণপ্রবেশ’, কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, পৃ-১২-১৩।
- ৩। বসু, গিরীন্দ্রশেখর, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৯, ‘পুরাণপ্রবেশ’, কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, পৃ-২।
- ৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (দ্বিতীয় খণ্ড: চৈতন্যযুগ), কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-৪৮৮।
- ৫। চট্টোপাধ্যায়, গীতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭, ‘ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, কবি ও কবিতা, পৃ-৪৭৯।
- ৬। দাস, ক্ষুদিরাম, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬, ‘বৈষ্ণব রসপ্রকাশ’, কলকাতা, বইগ্রন্থ, পৃ-২২।

- ৭। মুখোপাধ্যায়, সুখময়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম', কলকাতা, জী. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, পৃ-৭৫।
- ৮। বসু, মণীন্দ্রমোহন, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬, 'বাঙালা সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, কমলা বুক ডিপো, পৃ-১৭৩।
- ৯। ভাগবতাচার্য, রঘুনাথ, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী', নদীয়া, শ্রীচৈতন্যবানী প্রেস, পৃ-৪।
- ১০। দেব, ব্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ-পুনর্মুদ্রণ ২০১১, 'শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ', গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, পৃ-১২।
- ১১। ভাগবতাচার্য, রঘুনাথ, প্রথম সংস্করণ ২০০৪, 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী', নদীয়া, শ্রীচৈতন্যবানী প্রেস, পৃ-৩।
- ১২। সেন, সুকুমার, ২০১১, 'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-৩৭৭।
- ১৩। চট্টোপাধ্যায়, গীতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭, 'ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য', কলকাতা, কবি ও কবিতা, পৃ-৪৮৯।
- ১৪। বসু, মণীন্দ্রমোহন, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬, 'বাঙালা সাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, কমলা বুক ডিপো, পৃ-২১৬।
- ১৫। শ্যামদাস, দুঃখী, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৩, 'গোবিন্দমঙ্গল', ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত), কলকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, পৃ-৩।
- ১৬। শ্যামদাস, দুঃখী, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৩, 'গোবিন্দমঙ্গল', ঈশানচন্দ্র বসু (সম্পাদিত), কলকাতা, বঙ্গবাসী প্রেস, পৃ-২৯।
- ১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড: চৈতন্যযুগ), কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ-৪৮৮।
- ১৮। সেন, নবেন্দু (সম্পাদ.), প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', কলকাতা, রত্নাবলী, পৃ-৪১২।

ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্র ভাবনা

নিবেদিতা গুহ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শিলিগুড়ি কলেজ

সারসংক্ষেপ: শিক্ষাকে কোনো কৃত্রিম বা আরোপিত বিষয় নয় বরং তাকে সজীব-সচল-স্বতস্কূর্ত জীবনের সহচর বলেই গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শৈশব থেকেই তাঁর মনে তৎকালীন শিক্ষাদানের পরিকাঠামোকে নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। নিজের জীবনেও তিনি তৎকালের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্থান দিতে চাননি। তাই তো রবীন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন- সেই প্রথাগত ডিগ্রীধারীদের দলের বাইরে। বয়স তাঁর যত বেড়েছে ততই ভারতবর্ষের তৎকালের শিক্ষা ব্যবস্থা যা ইউরোপিয় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থ অনুকরণ ছিল তার প্রতি বিরাগ জন্মেছে। এই বিরাগ তাঁকে একাধারে যেমন শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, বিশ্বভারতী স্থাপনে উদ্যোগী করেছিল তেমনি তাঁকে দিয়ে নানান ধরনের প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্র তথা অন্যান্য সাহিত্যকর্মও লিখিয়ে নিয়েছিল। ‘শিক্ষা’ নামক একটি গোটা প্রবন্ধ সংকলন তাঁর রয়েছে যাতে তাঁর ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি সংবদ্ধ আকারে আছে। তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যকার দুর্বলতাগুলোতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তার সংস্কার ঘটাবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির ভিত্তি স্বরূপ। এই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার রূপ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর ভাবনাগুলোকে ফিরে দেখার চেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: শিক্ষা ব্যবস্থা, ভারতবর্ষ, জনগণ, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, সমীকরণ, দেশ ও জাতির আত্মা, আত্মশক্তির জাগরণ, বনশায়ী, মুক্তপ্রাণ।

মূল আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথ এই নামটির সঙ্গে মিশে আছে আবেগ, কল্পনা, মনন, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, আলো, বিজ্ঞান আর কত কি? একটা মানুষের দৃষ্টির বিস্তার কতটা হওয়া সম্ভব তার একটি মূর্তিমান উদাহরণ হিসেবে তাকে গ্রহণ করা চলে। একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক হয়েও অসংখ্য সৃষ্টির রাজ্যে নিজেকে নিমগ্ন রেখেও কীভাবে তিনি দেশ-জাতি-সভ্যতা-সংস্কৃতি মানুষ এই সবকিছুকে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে ভেবেছেন তা ভাবলেও অবাক হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। তাঁর দৃষ্টির গভীরতা স্পর্শ করেছিল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মর্মমূলকে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে যে শিক্ষা পদ্ধতি চলছিল এবং আজও যা চলছে তাকে রবীন্দ্রনাথের টবে লাগানো শৌখিন গাছ বলে মনে হয়েছিল, তার শিকড় মাটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে না বলেই তিনি অনুমান করেছিলেন। এই কারণে বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতির একটা পথ খোঁজ খুব ছোটো থেকেই তিনি খুঁজে বেরিয়েছেন এবং তার সন্ধান তিনি রেখে গেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তার গোড়ায় এবং তাঁর অসংখ্য শিক্ষা সংক্রান্ত লেখা-লেখির মধ্যে। ‘শিক্ষা’ নামক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ছাড়াও ‘কালান্তর’, ‘রাশিয়ার চিঠি’, ‘জাপান যাত্রীর ডায়রি’, প্রভৃতি গ্রন্থ এবং কবিতাতেও তাঁর ভাবনার মূল মন্ত্র সঞ্চিত রেখেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর শিক্ষাদর্শের ছোটো একটি রূপরেখা তৈরি করে তাঁর শিক্ষাচিন্তার গভীরতাকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ আসলে সব সময় প্রশারিত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। চলতি হাওয়ায় পাল তোলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই যখন বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার দৃষ্টি ছিল কলকাতা শহরকেন্দ্রিক এবং লক্ষ্য ছিল মূলত কলে ছাঁটা কেরাণীর জাত তৈরি করা তখন রবীন্দ্রনাথের ভাবনা। ভারতবর্ষের সনাতনী জীবনধারাকে অবলম্বন করেছিল। তিনি ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের ইতিহাসকে খুব গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। এবং এই অনুধাবনই তাকে একটি দেশ ও মাটি তথা সেখানকার মূল্যধার, সেখানকার জনমানসকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। তিনি তাঁর গভীর প্রজ্ঞায় বুঝেছিলেন ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মাটিতে আসলে টবে লাগান বনসায়ী গাছের মতো। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মাটিকে সামগ্রীকভাবে সিঁধিত করতে পারবে না। তাই ভারতবর্ষকে তথা তার জনমানসকে মেরুদণ্ড দান করে, তাকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য দরকার প্রাচীন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি-ধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সমবায় স্থাপন। ভারতীয় শিক্ষা-দর্শনের ঐহিত্য অতি প্রাচীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতের মাটি থেকে উদ্ভূত। এই মাটিকে অস্বীকার করা মানে গোটা জাতটাকেই পঙ্গু করে দেওয়া। তাই ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি, বিষয় ভাবনা তথা শিক্ষার্থী এই সব কিছুকে মাথায় রেখে ভারতবর্ষের মতো বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশে শিক্ষাদান করার নির্ধারণ করা পদ্ধতি দরকার। তার জন্য প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা একটি সহানুভূতিশীল মন এবং ধৈর্য্য। দেশের প্রত্যেকটি জনগণের মুখে যদি ভাষা দেওয়া না যায়, সকলের বুকে যদি শক্তি সাহস এবং অধিকারবোধ জাগানো না যায়, যদি শুধুমাত্র পুঁথি পড়া একদল নকল নবিশ তৈরি করে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করার কথা ভাবা হয় তবে যা হবে, তা হল ভারতবর্ষের মধ্যে নতুন ধরণের শ্রেণী বৈষ্যম, সে বৈষ্যম ভারতবর্ষের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে কালে কালে। এতবড় দেশ, এত ধরণের মানুষ, এত ধরণের ভাষা এবং জীবনধারা, তার আবহওয়া, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি তাকে স্বীকৃতি দিতেই হবে তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে। এই স্বীকৃতির সঙ্গে মিশে থাকবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টি। ভারতের সনাতনী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন ইংরেজী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মহা মিলনেই তৈরি হবে নতুন ভারতবর্ষের শিক্ষা কাঠামো। এই কাজ একদিকে যেমন সহজ তেমনি কঠিন কারণ তার জন্য চাই ইতিহাসের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সচেতন মন। সমন্বয় - সমবায় এবং মিলন ভারতবর্ষের চিরকালীন শক্তির আধার। এই শক্তিকেই অনুধাবন প্রয়োজন আজকের নবীন ভারতবর্ষের বুকে। রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশ ঘুরে এবং সেখানকার ইতিহাসকে অনুধাবন করে একটি দেশ নির্মাণের প্রক্রিয়া, সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা আহরণ করেছিলেন। তিনি ইউরোপ-আমেরিকা-রাশিয়া প্রভৃতি দেশের শিক্ষা-নৃতত্ত্ব-সংস্কৃতিকে খুব গভীরভাবে বুঝেছিলেন। মূলত রাশিয়ার দেশ গঠন কৌশল তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে অন্তর থেকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি একটি সার কথা বুঝেছিলেন একটি দেশের সমস্ত জনগণ যদি সমানভাবে এগিয়ে না চলে তাহলে সেই দেশের সার্বিক মঙ্গল সম্ভব হবে না। তাই তো তিনি বলেন - “যারে তুমি পিছে রাখ সে তোমারে টানিবে সে পিছে।” তাই সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। যেভাবে রাশিয়া দেশ করেছে। তাদের জোরের জায়গাটা আসলে সর্বার্থে হিতসাধন। ভারতবর্ষের সেই পথেই এগিয়ে চলতে হবে। শহর-গ্রাম-মফঃস্বল সর্বত্র সমান দৃষ্টি দিতে হবে। নারী-পুরুষ-শিশু-প্রবীণ সবাইকে শিক্ষার আলো দিতে হবে। সেই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয় তার সঙ্গে মিশে থাকবে জীবনে অভিজ্ঞতা যা প্রকৃতি থেকে জাত। শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিশাল সমন্বয়ী ব্যবস্থাকে তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন। তাই শিক্ষা সংক্রান্ত তার যে কাজ এবং লেখা

তাতে বারবার সেই কথাই ফুটে উঠেছে। ‘শিক্ষা’ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির নাম যেমন --- ‘জাতীয় বিদ্যালয়’, শিক্ষার বিকিরণ, মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা, বিদ্যা সমবায়। এই নামকরণ থেকেও তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। তেমনি গ্রামে গ্রামে যে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাতেও সেই চেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তিনি যেমন একাধারে শিক্ষাসত্র তৈরি করেছিলেন তেমনি নারী শিক্ষা কেন্দ্র, বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়, ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। গ্রামের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের দিকেও তার দৃষ্টি ছিল। তিনি ভূমিলক্ষী, ভাঙার নামে পত্রিকার প্রকাশ করেছিলেন যা গ্রামের নিজস্ব পত্রিকা। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যধার ছিল দেশের ধনী নির্ধনের ব্যবধান হ্রাস করে আত্মিক যোগ স্থাপন, আত্মশক্তির জাগরণ, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে স্বাধীনতার বীজ বপন, চেতনার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা নারীর স্বাধিকার স্থাপন, অস্পৃশ্যতা জাতপাতের মধ্যে সাম্য স্থাপন, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই গুণগুলো না থাকলে ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড নির্মাণ সম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করতেন, তাঁর শিক্ষা চিন্তার বিশাল ব্যুটি বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। খুব সীমিত আকারে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোন পথের দিশা দিয়েছিলেন তাই সূত্রাকারে বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনের সঙ্গে তার শিক্ষা-দীক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যা নতুন মানব-সভ্যতার ধ্বজাধারী হবে। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা চিন্তাকে সূত্রাকারের বুঝে নিয়ে তাঁর ভাবনার সামান্য তাল পাওয়ার চেষ্টা করা গেল।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা চিন্তার ক্ষেত্রে একাধারে ছিলেন স্বভাববাদী অন্যধারে ছিলেন ভাববাদী। শিক্ষাকে তিনি বুঝেছিলেন অশক্তকে শক্তি দেবার একমাত্র উপায় হিসেবে। শিক্ষাকে হতে হবে মাটি যে মাটিতে মানুষ, জাতি, দেশ সোজা ও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। একটি দেশের শিক্ষা কাঠামোতে একটি সভ্যতার ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি সমস্ত কিছুই নির্ভর করে। দেশ মাটি ও জাতির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম কোনো দীর্ঘকালীন সুস্থ ও সামগ্রিক সুফল আনতে পারেনা বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষাকে তিনি একটি কৃত্রিম বিষয় নয় বরং একটি সজীব বিষয় হিসেবে দেখেছেন। তাই তার আত্মা, তার শ্বাস প্রশ্বাসকে তিনি বাদ দিয়ে তার রূপকে চিন্তা করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা এই দেশের শিক্ষাবিদদের কতটা ভাবিয়েছে তার প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বিদেশের তাবড় তাবড় শিক্ষাবিদদের অন্তর নাড়িয়ে দিয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। অধ্যাপক J. J. Findley ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ডিউক সাহেবের তুলনা করেছেন। তাঁর The foundation of education নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন-“আমাদের বর্তমান যুগে দুইজন বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব হয়েছে; পাশ্চাত্য দেশে ডিউক এবং প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”^১ ডিউক এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় মিল অমিলকে তিনি দেখিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। এই প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপনের উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনার গুরুত্বটা কতখানি যতার পরিমাপ করার চেষ্টা। তাকে বিদেশের শিক্ষা পদ্ধতির নির্ধারণকরা অনুসরণ করেন অথচ আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা সেই বিদেশকে অনুসরণ করি। এইরকম কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম কিল প্যাট্রিক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (স্যাডলার কমিশন) কমিশনের রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের বোলপুরের বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতার কথা বার বার তুলেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনকে সম্মান করলেও, গ্রহন করেনি। তার ফল ভারতবর্ষের বর্তমান চেহাড়াই স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে বলেছিলেন "ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা, জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাব।"^২ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার আলোতে বর্তমান ভারতবর্ষকে আলোকিত করতে না পারলে এই প্রাচীন সভ্যতার ক্ষয় অনিবার্য। তাই তাঁর শিক্ষা চিন্তার মূল সূত্রগুলোকে আর এক বুকে নিতে চাইছি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে সূত্রাকারে নাতিদীর্ঘ আলোচনায় বুকে নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবন দর্শন বিষয়ক নয় বরং একীভূত। তিনি বাইশ বছর বয়স থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন এবং আমৃত্যু বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনাকে যদি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে আলোচনা করতে, চাই তবে তিনি যে যে পথের দিশা দিয়েছেন সেই পথ ছাড়া মুক্তির আলো পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রথমত, তিনি শিক্ষাকে শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিধির মধ্যে আটকে রাখতে চাননি। শুধুমাত্র চাকুরির উপযুক্ত কল হিসেবে একজন ছাত্রকে গড়ে তোলায় তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি শিক্ষা প্রসঙ্গে 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে বলেন "শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটি কৃত্রিম জিনিস নয়। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের বিকাশ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে সম্ভব। মনের দাসত্বকে মোচন করে আত্মশক্তির জাগরণ যা পূর্ণ মানবসত্তার প্রকাশে সাহায্য করে তেমন শিক্ষাই আমাদের প্রকৃত শিক্ষা, কিন্তু এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কালে সেই আত্মশক্তির জাগরণ হচ্ছে না বরং বিদ্যার সঞ্চয় চলছে তার আত্মিকরণ হচ্ছেনা।" তিনি বলেন নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়ে পূর্ণতর রূপে নিজেই উপলব্ধি করিতে হইবে।"^৩

দ্বিতীয়ত, তিনি শিক্ষার ছোঁয়া দেশের সর্বত্র পৌছাতে চান। শিক্ষা যেমন মানুষের একক সত্তার উন্নতি করবে তেমনি তা জাতীয় সত্তারও উন্নতি করবে। বিদ্যায়তন সবার জন্য সমান ভাবে উন্মুক্ত থাকবে। দেশের মঙ্গল যদি অভিষ্ট হয় তবে শিক্ষার আলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের সবার ঘরে পৌঁছানো। দরকার। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক শিক্ষার ক্ষুদ্র পরিধি যা কিছু সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করেছে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ রূপে দেখেছেন। মুষ্টিমেয় মানুষকে শিক্ষিত করে তুলে ভারতীয় ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

তৃতীয়ত, প্রকৃত শিক্ষা তাঁর মতে যা জীবনচর্চা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিক্ষার বিষয় যেমন জীবন থেকে উঠে আসা দরকার তেমনি তার ভাষাও হওয়া দরকার মাতৃভাষা, বিষয় ও ভাষার দূরত্ব থাকলে সে শিক্ষা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে পারবে না, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধ সম বলে গ্রহন করতে চান। এই মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সম্পর্কে প্রথম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'কালিজী শিক্ষা' প্রবন্ধে কমল ধরেছিলেন। বাংলা ভাষায় বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা চলুক এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন আনন্দ মোহন বসু, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার আশুতোষ, বিবেকানন্দ সকলেই এক মত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষার শিক্ষা প্রসঙ্গে এক স্থানে বলেন- ব্যাকরণ শিক্ষা ভাষা শিক্ষার একটি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিকের প্রতি কি অনায়াস উৎপীড়ন করা হয়।"^৪ শুধুই কথা

বলে বক্তৃতা করেই তারা ক্ষান্ত হননি। কাজেও করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা'।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 'ইংরেজী সোপান', 'ইংরেজী শ্রুতিশিক্ষা', সংস্কৃত শিক্ষা প্রভৃতি বই। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করায় তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আর ইংরেজীতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা চালানো এক ব্যাপার নয়। মাতৃ ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা না চললে তা আমাদের রক্ত মজ্জায় রূপান্তরিত হবে না বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের এই মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে সমর্থন জানিয়েছেন স্যাডলার কমিশন (১৯১৯), রাধাকৃষ্ণন, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ শিক্ষাবিদরা।

চতুর্থত, শিক্ষা ক্ষেত্রে সত্য ও আনন্দের মিশ্রণ ঘটানোর দরকার। আর এই মিশ্রণ সম্ভব কল্পনা এবং বাস্তব বুদ্ধির সংমিশ্রণে। শুধু মাত্র সাহিত্য চর্চা করলে চলবেনা বলেছেন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ। তার সঙ্গে চাই বিজ্ঞানচর্চা। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান সব কিছুকেই তিনি বিজ্ঞান বলে মনে করেছেন। মানুষ এইসব পাঠের মধ্যে দিয়ে পূর্ণ রূপে শিক্ষিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস, জীববিদ্যা না শিখলে কি হয় তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-"যে দেশে বসন্তরোগের কারনটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা জেনেছে এবং সে কারনটি বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেছে সে দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে দৌড় মেরেছে। আর যে দেশের মানুষ মা শীতলাকে বসন্ত রোগের কারণ বলে চোখ বুজে চুপকরে বসে থাকে, সে দেশে মা শীতলও থেকে যান বসন্ত যাবার নাম করে না।"^৫ বিজ্ঞান ও কল্পনার মিশ্রণই মানব মুক্তির পথকে প্রশস্ত করবে তাই আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দুই বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। অন্যদিকে দেশকে জানা এবং পৃথিবীকে বোঝা একান্ত প্রয়োজন তাঁর মতে। 'ভারতবর্ষ' নামক একটি ইতিহাস ভূগোল মিশ্রিত গ্রন্থ ছাত্রদের পাঠ্য হওয়া দরকার বলে তাঁর অভিমত। শান্তিনিকেতনে ইতিহাস শিক্ষার ভার তিনিই নিজেই নিয়েছিলেন।

পঞ্চমত, শিক্ষারও বাল্য, শৈশব এবং যৌবন আছে বলে তিনি মনে করেন। শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর অনুযায়ী তার শিক্ষা প্রণালী নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন প্রাচীন ভারতীয় তপোবান শিক্ষা প্রণালীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব আছে। তিনি ইট কাঠের স্কুল নামক কারখানাকে কোনদিনই পছন্দ করেননি। প্রকৃতি ও গুরুর মিলিত শিক্ষাই পূর্ণ শিক্ষা। প্রকৃতি বিবর্জিত পুঁথি পড়া শিক্ষায় আসলে কিছুই হচ্ছেনা বলে তাঁর অভিমত ছিল। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে ও বিশ্বভারতীতে শিক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণ তৈরি করেছেন দেশের সামনে।

ষষ্ঠত, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা যে শিক্ষায় শক-হুন-পাঠান, মোগোল মিলে আছে তার সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার যথার্থ সমন্বয় চাই বলে তিনি মনে করেন। আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা ইউরোপিয় শিক্ষাকেই শুধু মাত্র গুরুমন্ত্র রূপে গ্রহণ করায় সে শিক্ষা পরগাছা বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে এবং তাতে গোটা দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হচ্ছে না বলেই তার অভিমত।

শিক্ষার চলন হওয়া দরকার সর্বগামী। শিক্ষায় কোনো জাতিভেদ, স্তরভেদ, আঞ্চলিক ভেদ, লিঙ্গ ভেদ থাকবে না। তার বিচরণ হবে জল-হাওয়া, আলোর মতোই প্রাকৃতিক স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজ। শিক্ষা সংক্রান্ত তাঁর এইসব মৌলিক চিন্তা ভাবনা পৃথিবীর বড় বড় শিক্ষাবিদদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তিনি তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মধ্যে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণ

হয়ে উঠেছিল। বিশ্বের মধ্যে। ভারতীয় শিক্ষা ধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার যথার্থ সম্মিলন ছাড়া শিক্ষার সম্পূর্ণতা আসবে না তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি থেকে শুরু করে শিক্ষকের আদর্শ, পাঠ্য বিষয়, পাঠ্যের ধরণ, পরীক্ষার পদ্ধতি সব বিষয়েই তাঁর কড়া নজরে অধীন ছিল। ছাত্রদের সামগ্রিক উন্নতি তাদের ভেতর ও বাইরের শক্ত বর্ম প্রস্তুত করার উপায় খুঁজেছেন তিনি গভীর চিন্তা ভাবনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই গভীর ভাবনা চিন্তা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারকগণ প্রশংসা করলেও গ্রহণ করেনি। এই গ্রহণ না করার ফল যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিচ্ছে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে খুব দ্রুত গতিতে।

তথ্যসূত্র:

১. ভূজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য; রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ-১৩৬৪, পৃষ্ঠা-৪।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩৪৮, পৃষ্ঠা-১৯।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩১৫, পৃষ্ঠা-৭১।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩১৫, পৃষ্ঠা-৪৮।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, সমাধান, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩৪৪, পৃষ্ঠা-১৯।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, প্রকাশকাল - প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, মে ৯, ১৩৬৮ বৈশাখ ২৫, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯১।
২. ভূজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩৪৮।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩১৫।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৩৪৪।

নীরব অভিব্যক্তির শিল্পিত সাযুজ্য : দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল

ইরা আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: মাইম বা প্যান্টোমাইম নাট্যকলার এমন একটি ক্ষেত্র যে ধরনের পরিবেশনায় শব্দকে ছাপিয়ে অভিনেতার শারীরিক ভঙ্গি ও মুখাবয়ব এর মাধ্যমে নির্মিত ভাষা তথা নির্বাক অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থ নিহিত হয়। সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও মাইম বা প্যান্টোমাইমের দুটো ধরনই একই উদ্দেশ্য সাধনে নাট্যাভিনয়ে সহগামী। এ দুটির সমন্বিত আরো একটি প্রত্যয়ের পরিচিতি ধরন হলো ফিজিক্যাল পারফরম্যান্স বা শারীরিক অভিনয়। বস্তুত মাইম বা প্যান্টোমাইম শারীরিক অভিনয় নির্ভরতা কেন্দ্রিক পরিবেশনা। শারীরিক অভিনয় বা ফিজিক্যাল পারফরম্যান্স উপজীব্যে নীরব অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যে নির্মিত একটি সাম্প্রতিক প্রযোজনা হলো *দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল* নাটক। যেখানে মাইম ও প্যান্টোমাইমের যুগপৎ উপস্থাপন প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এ গবেষণায় মাইম ও প্যান্টোমাইমের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রেক্ষাপট সমেত এর প্রয়োগ কৌশলে কীভাবে নির্বাক অভিনয় ভিত্তিক নাটক *দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল* প্রযোজনায় সাযুজ্যতা প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ উপস্থাপনে প্রয়াস চালনা হয়েছে।

সূচক শব্দ: মাইম, প্যান্টোমাইম, ফিজিক্যাল বা শারীরিক পরিবেশন, দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল, নির্বাক অভিনয়, মুক অভিনয়।

মূল আলোচনা:

অভিনয় জগতে শিল্পচর্চা মাধ্যম হিসেবে যে বিষয়গুলো গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে তন্মধ্যে একটি হলো অভিনেতার শরীর। কোন একটি নাট্যচর্চা মঞ্চে অভিনেতা কখনো তার শারীরিক ক্রিয়া সহিত বাক্য সংযোজন অর্থাৎ সংলাপ এর মাধ্যমে গল্প বা পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করে আবার কখনো বা সংলাপবিহীন শারীরিক মুভমেন্ট প্রতিকৃতি উপস্থাপন সহিত পরিবেশনা করে থাকে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান উদঘাটনে পাওয়া যায় যে নামের তা হলো নির্বাক বা মুক অভিনয়। যেটির ইংরেজি নামকরণ হলো প্যান্টোমাইম, কখনো কখনো এটি মাইম নামান্তরেও পরিচিত।

শাব্দিক ব্যাখ্যায় মাইম শব্দটির আভিধানিক অর্থ খুঁজলে অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে যেটি পাওয়া যায় তা হলো: “The use of movements of your hands or body and the expressions on your face to tell a story or to act something without speaking”^১ অন্যদিকে প্যান্টোমাইম এর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, “Pantomime refers to a form of theatrical performance where communication is achieved through gestures, facial expressions, and movements without the use of spoken dialogue. It emphasizes visual storytelling and physical comedy, often incorporating elements of exaggeration and fantasy, which are key features of Roman theater performances, blending entertainment with cultural commentary”^২ এছাড়াও এতদ বিষয়ে আরো ভিন্ন মতামত রয়েছে। মাইম বিষয়ে আহমেদ ইব্রাহিম বলেছেন, “মাইম শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রহসনের অভিনয়, ভাঁড়, অঙ্গভঙ্গি দ্বারা

অভিনয় যাতে কোন চরিত্রের হাস্যোদ্দীপক ভাবে অনুকরণ করা হয় এমন প্রহসন। মাইম পরিবেশিত হতো ছন্দোময় নৃত্য, গীত এবং সংলাপের সমন্বয়ে”।^৭

জিঙ্কুর রহমান জন তাঁর শিল্পচেতনা ও মূকাভিনয় বইটিতে এর সংজ্ঞায় ব্যবহার করেছেন, “Pantomime এমন এক ধরনের নাট্যকলা যাতে অভিনেতা কোনরূপ সংলাপ ছাড়াই কেবল শারীরিক অভিব্যক্তি ও একশন দ্বারা কোনো ঘটনা, কাহিনী বা বক্তব্য প্রকাশ করে থাকে”।^৮

উপর্যুক্ত বিষয় আলোকপাতে বোঝা যায় মাইম ও প্যান্টোমাইম দুটো প্রত্যয়ই এমন এক নাট্য প্রক্রিয়া যেখানে দর্শকের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত পরিবেশনার গল্প বা বার্তা নিগূঢ়ভাবে শারীরিক অভিব্যক্তি এবং অঙ্গভঙ্গিকে আশ্রয় করে নির্মিত হয়। যে সূক্ষ্ম প্রভেদ এ দুটি ধারনাকে বিভাজিত করে তা বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, মাইমের ক্ষেত্রে মূক সংযোগে শারীরিক চলন (movements), মুখ অভিব্যক্তি এবং হাতের ভঙ্গিমা গুরুত্ব পায় যেখানে কখনও কখনও কল্পিত বস্তু এবং অদৃশ্য দেয়াল ব্যবহারে শারীরিক অবয়ব তৈরি করা হয়। অন্যদিকে প্যান্টোমাইম এ মাইম, নৃত্য, সঙ্গীত (music) এবং কমেডি সহযোগে বৃহৎ পরিসরের পরিবেশনাকে বোঝায়। যেখানে উচ্চারিত সংলাপ, অতিরঞ্জিত চলন এবং দর্শকের অংশগ্রহণও ভূমিকা রাখে। দুটো প্রসঙ্গেই শারীরিক উপস্থাপন এবং অভিব্যক্তি গুঢ়ার্থ বহন করে যেখানে মাইম নীরব গল্প বলনে কেন্দ্রীভূত হয় আর প্যান্টোমাইম নাট্যিক উপহাস বা কমেডিতে আশ্রয় নেয়। এছাড়াও মাইমে কালো পোশাক ও সাদা ফেস পেইন্টিং এর সঙ্গত হয় দ্রব্যসামগ্রী এবং প্যান্টোমাইম এ দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার্য হয়ে ওঠে রঙ্গীন পোশাক বা কস্টিউম সাহচর্যে মিউজিক ও সাউন্ড ইফেক্ট এর কার্যকরী প্রয়োগে। এ দুটির সমন্বিত রূপের প্রচলিত আরো একটি প্রত্যয় হলো ফিজিক্যাল পারফরম্যান্স। ফিজিক্যাল থিয়েটার বা শারীরিক পরিবেশন বিষয়ে পাওয়া যায়, “Physical theatre is a genre of theatrical performance that encompasses storytelling primarily through physical movement. Although several performance theatre disciplines are often described as "physical theatre", the genre's characteristic aspect is a reliance on the performers' physical motion rather than, or combined with, text to convey storytelling. Performers can communicate through various body gestures (including using the body to portray emotions)”।^৯ অর্থাৎ ফিজিক্যাল থিয়েটার বিশ্লেষণে প্রাপ্ত হয় মাইম এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ গল্পবলন এবং শারীরিক চলনের উপর ভিত্তি করে অভিনয় প্রক্রিয়ার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার যেটি একইসাথে প্যান্টোমাইমে দৃশ্যমান।

মাইমের সূত্রপাত ঠিক কীভাবে হয়েছিল তা উদ্ঘাটনে প্রাথমিকভাবে যে তথ্যটি উপস্থাপন করা যায় তা হলো গ্রীক নাটকের কোরাসের মাধ্যমে। যা পরবর্তীতে রোমানদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত লাভ করে প্যান্টোমাইম নামকরণে। মাইম শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ ‘mimos’ শব্দ থেকে যার অর্থ অনুকারক (imitator) এবং প্যান্টোমাইম শব্দের উৎপত্তি দুটি গ্রীক শব্দ ‘Pantos’ এবং ‘Mimeomai’ হতে। গ্রীক-রোমান মাইম এর ধরন ছিল ফার্স প্রকৃতির। যেখানে মাইমেটিক ক্রিয়া সহিত কখনও বা গীত ও সংলাপের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ক্লাসিক্যাল স্টক বা টিপিক্যাল চরিত্রের কমেডি ভিত্তিক মাইমের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় ১৬শ শতকে ইটালীর কমেডিয়া ডেল আর্টে-তে। যেটি অনেকাংশেই গ্রীক ও রোমান মাইম হতে অনেক আধুনিক। পাশ্চাত্য ধারার মাইম প্রবর্তনের অনেক পূর্বেই এশিয়ায় ভারত বর্ষে খ্রিস্টপূর্ব

৩য় শতকে নৃত্য নাট্য নামে যে ধরনের মাইমেটিক নাটক পাওয়া যায় তা হলো ভারত মুনি প্রবর্তিত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী ভারত নাট্যম। যেটি ৪ টি প্রকারান্তরে অভিনয় প্রক্রিয়ার কথা প্রকাশ করে। তন্মধ্যে আঙ্গিক ধরনটি হলো মাইম অভিনয়। এছাড়াও চীন ও জাপানে মাইম এর যে ধরন পরিলক্ষিত হয় তা পশ্চিমে কিছুটা ধূসর হলেও বেশ গুরুত্ব বহন করে স্ব-দেশের মূল নাট্যরীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে। ইংলিশ প্যাটোমাইম এর উদ্ভব ঘটে ১৮শ শতকের গোড়ার দিকের নাট্য প্রযোজনাগুলিতে। যেখানে ফরাসী আর্লেকুইন কমেডি নৃত্য ও কমেডিয়া ডেল আর্টে এর চরিত্রসমূহের মত করে সংগীত ও নৃত্য অনুযুগে পরিবেশন হতো। যেটি প্রাথমিকভাবে শব্দবিহীন হলেও পরবর্তীতে কিছু কথা যুক্ত হয় পরিবেশনে। আধুনিক পশ্চিমা মাইমের বিকাশ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, এটি বিশুদ্ধরূপে একটি অনুচ্চারিত বা নিঃশব্দ শিল্প। যেখানে অর্থ উপনিত হয় কেবলই শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, চলন ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে। যার দৃঢ় দৃষ্টান্ত ব্যালে; যেখানে ক্লাসিক্যাল অঙ্গবিন্যাসের বিধিবতে আধুনিক নাট্য-নৃত্য চলনের নির্বাক চিত্রানুগ সম্মিলন ঘটে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের মধ্যে মুকাভিনয় পরিচয় ঘটে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে। যার হাত ধরে এ অঙ্গনের পরিচিতি ঘটে তাঁর নাম পার্থ প্রতিম মজুমদার। যদিও দেশব্যাপী মাইম বা প্যাটোমাইমের নাট্যপ্রচেষ্টার ধারা অব্যাহত রয়েছে তথাপি স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে চর্চিত ইতিহাস অপ্রতুল।

দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল নাটকটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রযোজিত ইম্প্রোভাইজ বা তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত এমন একটি নাটক যেটি নির্মিত হয়েছে নির্বাক অভিনয় এর কৌশল অবলম্বন করে যেখানে দর্শকের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে বড় ভূমিকা রাখে অভিনেতার শারীরিক অভিব্যক্তিসমূহ। নাটকের ছয়টি অংকে বাস্তবতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সামাজিক অসঙ্গতির বিভিন্ন দিক তথা অন্যায়তা, ক্ষমতার অপব্যবহার, ডিজিটাল প্রতারণা, মানব যান্ত্রিক জীবন, নারী সহিংসতা, পুঁজিবাদ এর ওপর ভিত্তি করে দৃশ্যসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে তথাপি অধিবাস্তবিক স্টাইলের আশ্রয়ে নাট্যক্রিয়ায় রূপান্তর প্রক্রিয়া লক্ষ্যণীয়।



নাটকের শুরুতেই টম এণ্ড জেরি (ইদুর-বেড়াল চরিত্রের কার্টুন) রূপক-এ এক ব্যক্তি (চরিত্র) তার খাবারের চুরির খোঁজে চোরকে ধরার উদ্দেশ্যে দৌড়ে মধ্যে প্রবেশ করে। ব্যক্তির পিছনে চোরও দৌড়াতে থাকে কিন্তু কোন ক্রমেই চোরকে ধরা যায় না। ধোকা দিয়ে চোর বিদ্যমান ব্যক্তির হাতে থাকা কলাটিও খেয়ে নেয় কৌশলে। অতঃপর ব্যক্তিটি অতিশয় রাগান্বিত হয়ে চোরকে অবশেষে ধরতে সক্ষম হলে পেটাতে শুরু করে। যুক্ত হয় আশেপাশে থাকা

মানুষগুলো (চরিত্রসমূহ)। সেখানেই ক্ষান্ত নয়, চোর ব্যক্তিটি (চরিত্রটি) মারা গেলে তাকে ঘিরে সেলফি ও ফেসবুক লাইভও সম্প্রচারিত হয়। দৃশ্যটি বাস্তব থেকে সংগৃহীত এবং আপাতভাবে করুণ রসের উপলব্ধি জাগালেও কমেডি ও প্রহসন আকারে উপস্থাপিত হয়। প্যান্টোমাইমের শর্তসাপেক্ষে প্রাপ্তি ঘটে পুরোদস্তুর শারীরিক কমেডির অঙ্গভঙ্গি ও মুখায়বয়বে। যেখানে সঙ্গত ভূমিকা রাখে মিউজিক। ভাষার ব্যবহার না করেও সমগ্র দৃশ্যটি দর্শকের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে শারীরিক ভঙ্গিমার বিমূর্ত পরিস্ফুটনে। বস্তুতপক্ষে শারীরিক কমেডির উপস্থাপন ঘটে দর্শক অভিমুখে যেটি প্যান্টোমাইম এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।



দর্শকের প্রতি অভিনেতাদের দৃষ্টিলব্ধ প্রভাব বিস্তারে পোশাক এবং মেক-আপ মাইম ও প্যান্টোমাইমে অর্থবোধক অবদান রাখে। যদিও মাইমের ক্ষেত্রে সাদা বা কালোর নিরপেক্ষ পোশাক ব্যবহৃত হয় এবং যেন কালো ক্যানভাস ছাপিয়ে অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তির ওপর দর্শকের মনযোগ স্থাপিত হয়। প্যান্টোমাইমে রঙ্গীন পোশাক চরিত্রাভিনেতার চারিত্রিক ভূমিকা প্রকাশে ব্যবহার্য হয়। রাজন রিজোয়ান পোশাকের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, “সাধারণত মুকাভিনয়ে শীতল রঙ এর প্রতি এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। এই ধারণা পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে উভয় জায়গাতেই সমভাবে প্রযোজ্য। সুপ্রাচীনকালে থেকেই মুকাভিনয়ের পোশাক হিসেবে কালো, নীল, ধূসর বা এই জাতীয় রঙ এর পোশাক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে”।^১ *দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল* নাটকের ক্ষেত্রে কালো টি-শার্টের ওপর ক্রিস্টাল বা কাঁচের দুটি ভিন্ন রং ব্যবহার করা হয়েছে শার্ট ও প্যান্ট এর রং নির্বাচনে। এক্ষেত্রে কাঁচ রং হালকা ও গাঢ় রং এর দুটি প্রভেদ এ সকল কলাকুশলীর একই পোশাকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন সাপেক্ষে চরিত্রের ভূমিকা প্রকাশে বিভিন্ন আভরণী পোশাক ও দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও দৈনন্দিন পোশাকের সামঞ্জস্যতা ভাঙতে শার্টের হাতা ও প্যান্টের পায়ের দিকের খোলা সেলাই সহজেই অতিরঞ্জন ভাব প্রকাশ করে যেটি অধিক স্পষ্ট হয় পোশাকের সাথে কালো লেইসের সংযুক্ততায়।



আহমেদ ইস্রাফিল এর লেখনী হতে জানা যায় “প্যান্টোমাইমে পাঁচ ধরনের মুখোশ ব্যবহৃত হতো। এই অভিনয়ে কোন সংলাপ ব্যবহার হতো না বিধায় মাইমের মতো মুখোশের মুখ খোলা রাখার প্রয়োজন পড়তো না। প্যান্টোমাইমে সাধারণত একজন অভিনেতা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর অভিনয় করত। এজন্যে মূকাভিনেতা প্রয়োজন হলে মঞ্চ থেকে বের হয়ে পর্দার আড়ালে মুখোশ পরিবর্তন করতেন”।^৭ মাইম-প্যান্টোমাইম এর ক্ষেত্রে চরিত্রের প্রয়োজন বোধে রং বা মুখোশ এর গুরুত্ববহ ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও *দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল* নাটকে রঙ্গীন রং এ সৃষ্ট লাইনগুলো চরিত্রায়ণ অপেক্ষা বিমূর্ততা তৈরিতে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করে। দর্শকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে অতিরঞ্জন এবং উজ্জ্বল ও রঙ্গীন মেকাপ নাট্যিক ডিজাইনে মুখ অভিব্যক্তি প্রকাশ সমেত নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে। উজ্জ্বল মেকাপের ব্যবহারে খুব সহজেই মুখাবয়ব এবং মুখ ভঙ্গিমা মুখ্য হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যের ‘ক্ষমতা’ শীর্ষক দৃশ্যে সংবেশক (Hypnotist) হিসেবে সম্মোহন তৈরি করা এবং ভ্রম তৈরি করার ক্ষেত্রে যথার্থতা প্রকাশ পায়। কারণ মেকাপে ব্যবহৃত ডিজাইনের লাইনগুলিই প্রতীকী অর্থে এক প্রকার মোহ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যাতে একইসাথে পরোক্ষভাবে অভিনেতার প্রতি দর্শক আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।



মাইম ও প্যান্টোমাইম উভয়টি অবাচনিক সমাযোজনে (Communication) নির্ভর করে গড়ে ওঠে। যদিও গল্প বলন ও আখ্যান উপস্থাপন ক্রিয়ায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মাইমের

ক্ষেত্রে বিমূর্ত বা কাব্যিক ছন্দোময়তা, প্রতিকী ভঙ্গিমা ও চলন আবেগ ও ধারণাকে বহন করে চলে। যেখানে ঘটনা দর্শনে দর্শকের নিজ অর্থে উদ্ভূত চিন্তার ব্যাখ্যা দর্শকের জন্য উন্মুক্ত থাকে। অন্যদিকে প্যান্টোমাইমের ক্ষেত্রে পরিচিত বা জ্ঞাত ঘটনার গঠনগত ধারাবাহিক বর্ণনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। অতিরঞ্জিত শারীরিক ভঙ্গিমা ও কমেডি প্রদত্ত ঘটনা উপস্থাপন পরিবেশনাকে আরো চমকপ্রদ করে তোলে দর্শক সমীপে যেটি একইসাথে দর্শকের বিনোদনের হেতু ধারণ করে। ডিন এবং কারা হতে পাওয়া যায়, “One of the greatest source for inspiration in the creation of pantomime is the dialogue...We give life, clarity, and emphasis to a line by the use of gestures or bits of business...In creating such business from dialogue we go to the imaginary behind language and then translate this imaginary in terms of action.”^৮

দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল নাটকে ছয় অংকের বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর ধারাবাহিকতা উত্তর আধুনিকতা ও অধিবাস্তবতা (Surrealism) আশ্রয়ে গড়ে ওঠে যা প্রকৃতপক্ষে অতিরঞ্জন বৈশিষ্ট্য উপজীব্য। যেখানে প্যান্টোমাইম এর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৃহত্তর জীবনের অংগভঙ্গি ও অতিরঞ্জন প্রকাশে অধিবাস্তবতা যথার্থ গুরুত্ব বহন করে। ভাষা তৈরিতে মুখ্যভাবে প্রয়োগ ঘটেছে শারীরিক ক্রিয়ার ও ভঙ্গিমার যা দর্শকের কাছে বাচনিক অর্থ ছাপিয়ে বরং ক্রিয়ার কাল্পনিক ব্যাখ্যাতে রূপান্তরিত করে। মৃত বাবার প্রতি মেয়ের সক্রিয় অব্যক্ত আত্মনাদ; নিজের ছায়ার সাথে নিজের বোঝাপড়া; বিভ্রমের দ্বারা সম্মোহিত করে ফেলা; ক্ষমতার অপব্যবহারে চেয়ার ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গকে বিরক্তিভরে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া; নারীর স্বাধীন সত্ত্বায় হস্তক্ষেপ এবং পুঁজিবাদের ভয়াল থাবার প্রতিযোগিতামূলক আরোহণী ফ্রেমবন্দী জীবন প্রভৃতি অবাচনিক দৃশ্যসমূহকে দর্শককে ভিন্ন ভাষায় ভাবতে শেখায়।

একটি র‍্যাপ গান নাটকটির চলমান ধারা পরিবর্তনে ও শ্রুতিনন্দনিক করতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও যে গুটিকতক শব্দ নাটকজুড়ে শুনতে পাওয়া যায় তা চরিত্রের অব্যক্ত আত্মউপলব্ধির রণিত ধ্বনি যা প্যান্টোমাইম এর ধারায় সহজাত বৈশিষ্ট্যে অবগাহিত হয়।



মাইম-প্যান্টোমাইম এ কখনও একজন ব্যক্তি বা চরিত্র স্বতন্ত্রভাবে বা বৃহৎ এককের অংশ হিসেবে পরিবেশন করা যেতে পারে। মাইমের ক্ষেত্রে একটি চরিত্র প্রাথমিকভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশে স্বাধীন শারীরিক ভঙ্গিমার সহিত নৃত্য ও বাদ্য বা মিউজিক সঙ্গত হিসেবে কাজ করে যদিও শারীরিকতার মাধ্যমে অর্থ প্রকাশ করার ব্যক্তির দক্ষতার দিকে মনোনিবেশ করা হয়। প্যান্টোমাইম এর ক্ষেত্রে পরিবেশনাকারী দলীয় একা তৈরি হয় যারা সমবেতভাবে একটি গল্প উপস্থাপন করে।

মাইম-প্যান্টোমাইমের পরিবেশন উপস্থাপনের ন্যায় *দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল* নাটকে একগুচ্ছ পারফরমার বা পরিবেশনকারী বিদ্যমান বিভিন্ন অংকের দৃশ্যগুলোর শারীরিক ক্রিয়া উপস্থাপন করে থাকে। একটি দৃশ্যে যখন ডিজিটাল জালিয়াতি এর শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে দুস্থপ্রাণ চরিত্রটি তার অস্তিত্বের সংকট সীমায় নিজেকে আর খুঁজে না পায় তখন আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ট্রেনের নিচে নিজেকে সপে দেয়। উল্লেখ্য চরিত্রটি শুধুমাত্র তার নিজেকে খোঁজার প্রয়াস অংশে একক উপস্থাপন হলেও তার পরের অংশেই শারীরিক কোরিওগ্রাফির চলমান ট্রেন হয়ে মঞ্চ প্রবেশ করে একদল অভিনেতা এবং প্রতারণার শিকার অভিনেতার ওপর দিয়ে মানব শরীরের চলমান ভয়ংকর ট্রেনের থাবায় প্রাণ নাশ ঘটে তার। এভাবে সম্পূর্ণ নাটকটিই মিউজিক সহযোগে বিভিন্ন আবহ তৈরি করে এবং নাট্য ছন্দের বৈচিত্র্যতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও নাটকের শুরুতে ও শেষে নৃত্যবিন্যাস ও অন্যান্য দৃশ্যাবলীতে সুরিয়েলিস্টিক (Surrealistic) কোরিওগ্রাফির ব্যবহার মাইম-প্যান্টোমাইমের বৈশিষ্ট্যমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও জটিল মিথক্রিয়া তৈরিতে যথাযথ অবদান রাখে যার প্রভাবে একটি গতিশীল এবং দৃশ্যত ইন্টারেক্টিভ পারফরম্যান্স তৈরি করে।



দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল নাটকে নির্বাক অভিনয়ের শর্তসাপেক্ষ চোখের যোগাযোগ এবং সূক্ষ্ম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার সাথে একটি সংযোগ স্থাপিত হয় যা দর্শকের মানসিক ও আবেগগতভাবে পারফরম্যান্সে প্রতিক্রিয়াশীল হতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক। মাইম-প্যান্টোমাইম পারফরম্যান্সের মত চরিত্রসমূহের সাথে দর্শকের সরাসরি মিথক্রিয়ায় জড়িত থাকতে এবং একইসাথে ঘনিষ্ঠতা এবং সংযোগের অনুভূতি তৈরিতে নাটকে চরিত্রসমূহের

শারীরিক অঙ্গভঙ্গির সক্রিয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নৃত্য, মিউজিক, কমিক ক্রিয়া এবং কমেডির মাধ্যমে ভাগ করে নেওয়া হাসির মুহূর্তগুলি শ্রোতাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেয়। একইসাথে মৌখিক ভাষার গৌণ ব্যবহার এবং বিভিন্ন বস্তু, ক্রিয়া এবং আবেগের মোহ তৈরিতে সূক্ষ্ম ও যথাযথ শারীরিক ভঙ্গিমা এবং শারীরিক ভঙ্গিমায়ে সৃষ্ট কমেডির মাধ্যমে অদৃশ্য ও কাল্পনিক জগতের অতিরঞ্জিত নান্দনিক উপস্থাপন প্রক্রিয়া ও রসে দর্শক দৈনন্দিন জীবন বহির্ভূত ভিন্ন আঙ্গিক অনুভবে উদ্দীপিত হয়। দর্শক-শ্রোতাদের এই সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি প্রাণবন্ত নাট্যিক পরিবেশ তৈরি করে যেটি দর্শক বিনোদনের ক্ষেত্রে মাইম-প্যান্টোমাইমে কার্যত অপরিহার্য।

মাইম বা প্যান্টোমাইম দুটি ধারার সূক্ষ্ম পার্থক্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও অধিকতর ক্ষেত্রে তথাপি নির্বাক অভিনয় ও শারীরিক ভঙ্গি প্রকাশে একই সূত্রে গাঁথা। *দ্য ডার্ক ক্রিস্টাল* নাটকেও দুটি ধারার অবিমিশ্র বৈশিষ্ট্য ধারণ সাপেক্ষে পরিপূর্ণ একটি নীরব ভাষার নাট্য প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে গুরুত্বের সাথে ব্যবহার্য নির্বাক অভিনয় বৈশিষ্ট্যের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় কৌশল। শারীরিক অভিনয় নির্ভর এ নাট্য প্রয়াসে অনুভূত হয় ভাষার যৎসামান্য শাব্দিক প্রয়োগ ও বৃহদার্থে শারীরিক ভঙ্গিমা মাধুর্য যা দর্শকের হৃদকোঠরে পৌঁছাবার জন্য যথোপযুক্ত। কারণ শব্দকে ছাপিয়ে নিরবতার ভাষা গভীরভাবে অর্থ প্রকাশ ও চিত্তাকর্ষক অনুধাবনে সক্ষম।

তথ্যসূত্র:

- ১। Retrieved from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mime_1
- ২। Retrieved from <https://library.fiveable.me/keyterms/introductionhumanities/pantomime>
- ৩। আহমেদ, ইয়াফীল, ২০০৫, মুকাভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, নভেল পাবলিশ, পৃ নং ১৩।
- ৪। জন, জিল্লুর রহমান, ২০০৭, শিল্পচেতনা ও মুকাভিনয়, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ নং ২১।
- ৫। Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_theatre
- ৬। রাজন, রিজোয়ান, ২০১৭, মুকাভিনয় জানা অজানা, ঢাকা, প্যান্টোমাইম মুভমেন্ট, পৃ নং ৩৩।
- ৭। আহমেদ, ইয়াফীল, ২০০৫, মুকাভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা, নভেল পাবলিশ, পৃ নং ১৫।
- ৮। Dean, Alexander & Carra, Lawrence, 1965, Fundamentals of Play Directing, USA, The Dryden Press, P. 259।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

- ১। হায়দার, জিয়া, ২০০৮, থিয়েটারের কথা, ঢাকা, পড়ুয়া।
- ২। জন, জিল্লুর রহমান, ২০১০, মুকাভিনয় শিল্পী ও শিল্পচিত্তা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ।
- ৩। জন, জিল্লুর রহমান, ১৯৯৮, মুকাভিনয় দর্পণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।
- ৪। চক্রবর্তী, রণেন (সম্পাদিত), ২০০৮, মুকাভিনয়, কলকাতা, মুকাভিনয়।
- ৫। বাঙলা মুকাভিনয় জার্নাল, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, বাঙলা মুকাভিনয় গবেষণা কেন্দ্র।

বাংলা ধাঁধায় বিজ্ঞানের উপাদান

শান্তনু ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাণী বিড়লা গার্লস কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: বাক্যকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির ধারাটি মুখে মুখে রচিত ও মুখে মুখে প্রচলিত। এই ধারাটি স্মৃতিবাহিত এবং শ্রুতি নির্ভর। বাক্যকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য একটি ধারা ধাঁধা। ধাঁধায় পরিচিত বিষয়কে অপরিচয়ের মোড়কে প্রকাশ করা হয়। ধাঁধা মূলত প্রশ্নমূলক। ধাঁধার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি লুকিয়ে থাকে। ধাঁধার বিষয়বস্তু খুব বিস্তৃত। দেবদেবী, নরনারী, প্রকৃতি, জীবজন্তু, গার্হস্থ্যজীবন, পৌরাণিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ— এমনি নানা বিষয়ের কথা ধাঁধায় উঠে আসতে দেখা যায়। বিজ্ঞানচেতনার নানা দিকও ধাঁধায় লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটেনি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েই ধীরে ধীরে বিজ্ঞানচেতনা লোকমানসে গড়ে উঠেছে। সভ্যতার প্রথমদিকে লোকসমাজেই বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। লোকজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠে আসা ধাঁধাগুলোতেও তাই বিজ্ঞানের উপাদান সহজলভ্য। শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, গণিত— এমনি সব বিজ্ঞানের শাখাগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা লোকসমাজে গড়ে উঠেছে ধাঁধার হাত ধরে। নির্বাচিত কিছু ধাঁধার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের উপাদানগুলির অনুসন্ধান ও অনুপুঞ্জ বিচার-বিশ্লেষণ আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: ধাঁধা, বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, লোকসমাজ, লোকসাহিত্য।

মূল আলোচনা:

ধাঁধা শব্দটির উৎপত্তি ‘ধন্দ’ বা ‘ধন্ধ’ শব্দ থেকে। ধন্ধ শব্দের আভিধানিক অর্থ সংশয়, ধোঁকা। হেঁয়ালি, কউটো, কিচ্ছা, কলই, রাতকথা, ফোর, ভাগ্যানী, শোলক, প্রহেলী, পুদুর, কড়সার, উখানা ইত্যাদি নামে ধাঁধা বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত। ধাঁধার প্রায় ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ‘Riddle’। Riddle শব্দটা এসেছে ‘Readin’ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ ‘to give advice’। জার্মান ভাষায় ধাঁধাকে বলে ‘Rat(h)sel’, ল্যাটিনে ‘Aenigma’ ফরাসিতে ‘Enigma’, গ্রিক ভাষায় ‘Ainigma’। সংস্কৃত প্রহেলিকা শব্দ থেকে ‘হেঁয়ালি’ শব্দের উৎপত্তি মনে করা হয়।

ধাঁধার উপস্থাপনে থাকে প্রশ্নমূলকতা। পরিচিত বিষয়কে অপরিচয়ের মোড়কে তুলে ধরা হয়। ধাঁধা প্রশ্নের আকারে উপস্থাপিত হয়। ধাঁধায় প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতার উপস্থিতি একান্ত আবশ্যিক। একজন প্রশ্ন করবেন এবং অপরজন বুদ্ধি খাটিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারলে উত্তরদাতার জয়ের আনন্দ এবং ভুল উত্তর দিলে প্রশ্নকর্তার হারিয়ে দেওয়ার নির্মল আনন্দ ফুটে ওঠে। ধাঁধা হল— ‘A Periphrastic Presentation of an unmentioned subject the design of which is to excite the reader or hearer to the discovery of the meaning hidden under a studied obscurity of expression’^১ অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, ‘ধাঁধা হল সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মৌখিক রচনা যা প্রজন্ম পরম্পরায় ঐতিহ্যকে নির্ভর করে টিকে থাকে, যাতে আপাতভাবে যে বিষয়কে

উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে শোভা মনে করে, প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ কিন্তু ভিন্নতর বিষয়কে কৌশলে উপস্থাপিত করা হয় প্রশ্নাকারে, যার উদ্দেশ্য শোভার বুদ্ধি পরীক্ষা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের স্বীকৃত সমাধানটি ইতিপূর্বে জানা কিনা তার পরীক্ষা, প্রশ্নকর্তা ও শোভার যৌথভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে যার ফলশ্রুতি কৌতুক রসাস্বাদন, তাকেই বলে ধাঁধা।^{১২} ধাঁধার ব্যবহার বহু প্রাচীন। মিশরীয় ‘বুক অব ডেড’ স্বকবেদ সংহিতা, ওল্ড টেস্টামেন্ট, গ্রিক পুরাণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে ধাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিভিন্ন প্রকার মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য ইত্যাদিতে ধাঁধার বহু দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়।

ধাঁধার বিষয়বস্তু বহু বিস্তৃত। দেবদেবী থেকে নরনারী, প্রাণীজগৎ থেকে উদ্ভিদ জগৎ, জীবজন্তু থেকে কীটপতঙ্গ, পারিবারিক জীবন থেকে কর্মজীবন, ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ থেকে পৌরাণিক প্রসঙ্গ— এমন সবই ধাঁধার বিষয় হয়েছে। এই বিষয়ের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বিজ্ঞান ভাবনা। এই বিজ্ঞান ভাবনা আধুনিক জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক তত্ত্ব-তথ্যধর্মী নয়। এই ভাবনা সহজ সরল লোকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ লোকশিক্ষামূলক। এমন কিছু বিজ্ঞানভাবনা মূলক বা বলা ভালো যাতে বিজ্ঞানের উপাদান বর্তমান, তেমন কিছু ধাঁধাকে বিশ্লেষণ করে আলোচনা করা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে বিজ্ঞানের নির্বাচিত কয়েকটি শাখা, যেমন— গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনাটি আবর্তিত হবে।

ধাঁধায় গণিতের উপাদান লক্ষিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনে হাট-বাজার ও ব্যবসায় প্রয়োজনীয় হিসাব সংক্রান্ত ধাঁধা পাওয়া যায়।

সিকি আধুলি নটা/ টাকা হবে তিনটা।

ছয়টি সিকি আর তিনটি আধুলি মিলিয়ে নয়টি মুদ্রা। ছয় সিকিতে দেড় টাকা ও তিনটি আধুলিতে দেড় টাকা। মোট হচ্ছে তিনটাকা।

যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ— এই সকল গাণিতিক নিয়মের প্রয়োগও ধাঁধায় আমরা দেখতে পাই।

তিন তেরো মধ্যে বারো চার দিয়ে পূরণ কর,

এতে হচ্ছে স্বামীর নাম, বাড়ি হচ্ছে নন্দীগ্রাম।

এখানে তিনকে তেরো দিয়ে গুণ করে বারো দিয়ে যোগ করার কথা বলা হয়েছে। যোগফলকে আবার চার দিয়ে যোগ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ $3 \times 13 = 39 + 12 = 51 + 8 = 59$ । উত্তর হল পঞ্চগম্ব। এখানে পঞ্চগম্ব পঞ্চগনন অর্থে ধরা হয়েছে। ফলে স্বামীর নাম পাওয়া গেল পঞ্চগনন, যার বাড়ি নন্দীগ্রাম।

ধাঁধায় গাণিতিক বুদ্ধিরও পরীক্ষা করা হয়েছে। যেমন—

যোগ ফল যত, গুণফল তত, ভাগফল এক,

বিয়োগ ফল শূন্য, দুইটি সংখ্যা কত?

এই ধাঁধার উত্তর হল ২, ২। দুটো দুই এর যোগফল এবং গুণফল দুটোই হল চার। ভাগফল এক। বিয়োগফল শূন্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন কবি তাঁদের আবির্ভাবকাল কিংবা তাঁদের গ্রন্থের রচনাকালকে সরাসরি না জানিয়ে সাক্ষেতিক শব্দে বলবার চেষ্টা করেছেন। হেঁয়ালির আকারে পরিবেশিত এই সকল তথ্য বিশ্লেষণে পাঠককে বেশ বেগ পেতে হয়। কবি ভারতচন্দ্র তাঁর

অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনাকাল হেঁয়ালির আকারে পরিবেশন করেছেন।

‘বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিতা।

যেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।’

এখানে বেদ ৪, ঋষি ৭, রস ৬ এবং ব্রহ্ম ১। সংখ্যাটি— দাঁড়াচ্ছে ৪৭৬১। নিয়ম ‘অঙ্কস্য বামাগতি’। তাই এই নিয়মে সংখ্যাটিকে উল্টে নিতে হবে। তাতে সংখ্যাটি দাঁড়াবে ১৬৭৪ শক। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৬৭৪ শকাব্দ।

উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে বেশকিছু ধাঁধা পাওয়া যায়। উদ্ভিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গঠনকে ভিত্তি করে এই ধাঁধাগুলি গড়ে উঠেছে।

পাতা হতে কোন গাছ বিশ্বে জন্ম লয়।

এখানে পাথরকুচি গাছের কথা বলা হয়েছে। পাথরকুচি গাছের পাতা থেকেই এই গাছের চারা জন্ম লাভ করে।

আবার,

মাংসাশী উদ্ভিদ বল কি আছে ভরে।

পোকা ধরে যারা নিত্য আহার করে।

কলসপত্রী গাছ একটি পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। এই গাছের পাতার সামনের দিকে কলসির মতো অংশ থাকে। এই অংশে কীটপতঙ্গ ধরা পড়ে, যার রস উদ্ভিদটি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

আকাশেতে থাকে নারী নাম ধরে নহে ও কামিনী।

আকাশেতে গঙ্গা বন্দী হইল কেমনি।

এখানে নারকেল-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। নারকেল গাছ অনেক উঁচু হয়। নারকেলের ফল যেন আকাশেতেথাকে। আর ফলের মধ্যে জল থাকে। গঙ্গাকে বন্দি করে রাখা এই অর্থে ফলের মধ্যে জল থাকা বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

আষাঢ়ে জন্ম তার ভাদ্রেতে মরণ।

তিনদিন তিনরাত জলেতে শয়ন।

জল খায় মাংস তার হাড় খায় অগ্নি।

কথাটি বলে গেছেন কালিদাসের ভগ্নি।

এখানে পাট-এর কথা বলা হয়েছে। পাট-গাছ আষাঢ় মাসে জন্মায় এবং ভাদ্র মাসে তোলা হয়। তারপর তিনদিন তিনরাত পাটকে পচানোর জন্য জলে ফেলে রাখা হয়। জলের মধ্যে পাটের আঁশ আলাদা করা হয় আর পড়ে থাকে পাটকাঠি। যে পাটকাঠি পরে আবার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কোন গাছ আছে বল, ভূমে মূল নাই।

পরগাছা শ্রেণির উদ্ভিদকে এই ধাঁধায় চিহ্নিত করা হয়েছে। পরগাছা উদ্ভিদ অন্য কোনো উদ্ভিদকে অবলম্বন করে বেড়ে ওঠে। সেই উদ্ভিদের রসই গ্রহণ করে পুষ্ট হয়। তাই ভূমিতে এইসকল পরগাছা উদ্ভিদের মূল থাকে না।

অরণ্যেতে জন্ম তাহা অরণ্যেতে রয়

ভুলেও তার কাছে কেহ নাহি যায়।

স্পর্শ মাত্র তার সর্ব অঙ্গ জ্বলে।

দ্বিগুণ আগুন হয় তাতে জল পেলে।

এই ধাঁধাটির উত্তর বিছুটি গাছ। বিছুটি গাছের গায়ে একটা রোয়া জাতীয় আন্তরণ থাকে। এই রোয়াগুলি শরীরের সংস্পর্শে এলে জ্বালা করে। জল দিলে এই জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়।

কোন গাছের পাতা নাই

কাঁটা কিন্তু আছে।

ফণিমনসা গাছটি ক্যাকটাস জাতীয়। এই গাছের পাতা নেই কিন্তু সর্বাস্থে কাঁটা বর্তমান।

ডগা আগা খসখস্যা

মাইঝে মাইঝে ধর্যে দেখি

বড়ো ধুস ধুস্যা।

চালকুমড়ো প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। চালকুমড়ো গাছের ডাঁটা ও পাতা খুব খসখসে। সরু ডাঁটার মধ্যে মধ্যে বড়ো বড়ো চালকুমড়ো ধরে। লোকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই গাছটি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

তেল চুকচুক পাতা ফলের উপর কাঁটা

পাকলে হয় মধুর মতো বীচি গোটা গোটা।

কাঁঠাল গাছ প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। কাঁঠাল গাছের পাতা চকচকে হয়। কাঁঠালের গায়ে কাঁটার মতো অংশ থাকে। কাঁঠাল পাকলে মিষ্ট হয় এবং ভিতরে গোটা গোটা বীচি থাকে।

শারীরবিদ্যা বিষয়েও ধাঁধা পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাণীদের দেহ-সংক্রান্ত ও মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই শ্রেণির ধাঁধার উপজীব্য।

এতটুকু বিলে বত্রিশ হালের চাষ।

অথবা,

একটু গর্তে বত্রিশ ছেলে হাসে।

এখানে দাঁতের কথা বলা হয়েছে। বত্রিশটা দাঁতকে বত্রিশটা হালের বা ছেলের সঙ্গে তুলনা টানা হয়েছে।

একবার আসে, একবার যায়, আবার আসে

কিন্তু আবার যে যায়, আর আসে না।

এখানেও দাঁতের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। দাঁত ছোটোবেলায় একবার আসে। তার পর দুখে দাঁত পড়ে যায়। তারপর আবার দাঁত গজায়। এই পরিণত বয়সের দাঁতগুলো একবার পড়ে গেলে আর গজায় না বা ফিরে আসে না।

কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে।

এই ধাঁধাটির উত্তর হল নাড়ি। গর্ভবতী নারীর সঙ্গে গর্ভস্থ সন্তানের নাড়ি যুক্ত থাকে। সন্তান জন্মের পর এই নাড়িকে কেটে দিতে হয়। না হলে উভয়ের মৃত্যু হতে পারে।

কালো রং/জোয়ান কালে

বুড়া অইল/রং ধলা

কও চাই/আকোল করি

কি চিজ ইলা।

চুল প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। কম বয়সে চুল কালো থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো চুল সাদা হতে থাকে। বহু চেষ্টা করলেও চুলের এই কালো রঙ ধরে রাখা যায় না।

একটি দণ্ড/তার চাইরটা খণ্ড

মাথায় তার অর্ধচন্দ্র/বোঝাতো বোঝ

না বোঝ তো ঐ।

এখানে হাতের পাঁচটা আঙুলের কথা বলা হয়েছে। হাতকে দণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার ওপর চারটি আঙুলের কথা বলা হয়েছে। বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অর্ধচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আতা গাছে তোতা নাচে/কথাকলি আরও নাচে।

জিভ এর প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। এখানে জিভ-এর সঞ্চলনকে নাচের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাগযন্ত্রে জিভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। জিভের ওঠা নামাতে যে শ্বাসবায়ু আটকায় তার ফলেই ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

প্রাণীবিদ্যার ওপর বহু ধাঁধা তৈরি হয়েছে। প্রাণীদেহের গঠন, প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সবই ধাঁধার বিষয় হয়েছে।

জন্মকালে এত ছোটো মার কোলে লুকায়

বড় হয়ে এক লাফেতে দশ বারো ফুট যায়।

ক্যাঙারু প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। ছোটোবেলায় ক্যাঙারু মায়ের পেটের খলির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আর বড়ো হয়ে গেলে এক লাফেতে অনেকটা দূরে যেতে সক্ষম হয়।

বালু দিয়া নাও যায়/চাইর ঠাংএ দাইড় বায়

এখানে উটের কথা বলা হয়েছে। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। বালির ওপর দিয়ে উঠের অবাধ যাতায়াত। চার পা দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা যেন দাঁড় বেয়ে চলা।

বড় গাঙ্গে বড় গাছ/লেজে ভরা কাঁড়া

এই পুন্নি ভাঙ্গাইতে পারে/আজ খাঁর ব্যাটা।

কুমির প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। জলের মধ্যে বড় কাঁটা গাছ পড়ে থাকার সঙ্গে কুমিরের তুলনা করা হয়েছে।

জন্মদাতা জন্ম দিল না/জন্ম দিল পরে

যখন সন্তান জন্ম নিল/মা ছিল না ঘরে।

কচ্ছপ জল থেকে ডাঙায় উঠে ডিম পাড়ে। তারপর আবার জলে চলে যায়। কচ্ছপের সন্তানের যখন জন্ম হয় তখন কচ্ছপের মা পাশে থাকে না।

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা, পক্ষীর নাই ডিম

এরে যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম।

বাদুড় প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। বাদুড় পাখির মতো উড়ে বেড়ায় কিন্তু ডিম না পেড়ে বাচ্চা প্রসব করে। বাদুড়ের এই বৈশিষ্ট্যকে ধাঁধায় ভুলে ধরা হয়েছে।

হাত নাই তার, পা নাই তার/নাইকো দুটো কান

চলে যায় নাড়িয়া সন্তান

কেঁচো হাত, পা থাকে না। কানও থাকে না। তাই কেঁচোকে নেড়া-সন্তান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাণীকুলের মধ্যে যে কীটপতঙ্গ আছে তাদের নিয়েও অনেক ধাঁধা পাওয়া যায়। যেমন—

গায়োন লয়, বায়েন লয়, তবু গুণগুণ করে

বৌ লয়, বিটি লয়, থাকে সব ঘরে।

অর্থাৎ গায়কও নয়, বাদকও নয় তবু মশা গুণগুণ করে। বাড়ির বৌ নয় কিংবা মেয়েও নয় কিন্তু সব ঘরে থাকে।

এমন বেটা বীর/রাজার পাতে বসে মারে ক্ষীর।

মাছি প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। মাছি রাজার পাতেও বসে ক্ষীর খাওয়ার সাহস রাখে।

পশু নয়, পক্ষী নয়, জীব মধ্যে ধরি

অগণন বাণ তার পৃষ্ঠের উপরি
না জানিয়া কেহ যদি স্পর্শ করে তারে
সেই ক্ষণে লক্ষ বাণে বিদ্ধ করে তারে।

শূঁয়োপোকা প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। শূঁয়ো পোকা পশুও নয়। পাখিও নয়। সারা গায়ে আত্মরক্ষার
জন্য তার তীক্ষ্ণ লোম। না জেনে কেউ তাকে স্পর্শ করলে ওই তীক্ষ্ণ লোমে সে বিদ্ধ হয়।

আশমানেতে তিড়িবিড়ি চৌডালেতে বাসা
গাই বড়ো হাটিছটি দুধ বড়ো মিঠা।

এই ধাঁধার উত্তর মৌমাছি। মৌমাছি আকাশে ওড়ে, উঁচু ডালে বসে। মৌচাকে যে মধু সঞ্চয়
করে তা খুব মিষ্টি। এখানে গোরুর সঙ্গে মৌমাছির তুলনা করা হয়েছে।

অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু/বসে আছে রাম ঠাটু।
শুকনো মাটিতে পেতে জাল/আহার করে চিরকাল।

মাকড়শার আটটি পা, পাগুলির যে ষোলোটা ভাঁজ তাকে হাঁটু বলা হয়েছে। শুকনো মাটিতে
মাকড়সা জাল তৈরি করে। এই জালে নানা পোকামাকড় আটকা পড়ে। মাকড়শা সেগুলিকে
খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

জ্বলে চলে ছোঁয় না পানি/বল দেখি কোন প্রাণী?

এখানে জোনাকির কথা বলা হয়েছে। জোনাকি যে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে সে বিষয়টিকে তুলে
ধরা হয়েছে।

উড়ে যায় ঘাস খায় নয় সে গোরু
ছয়খানি পা তার চারখানি সরু
হাতির মতো দাবনা তার উটের মতো পিঠ
কচ্ছপের মতো বুক তার ঘোড়ার মতো মুখ।

ফড়িং প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। ফড়িং উড়ে বেড়ায়, ঘাস খায়। ছয়খানা তার পা। চারখানা সরু।
হাতির মতো বড়ো দাবনা, উটের মতো পিঠ, কচ্ছপের মতো বুক এবং ঘোড়ার মতো তার মুখ।
এমনি নানা প্রাণীর প্রসঙ্গ এনে উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এটুখানা ছ্যামড়ারা দুধভাত খায়
আড়াই হাত মাটির তলায় যুদ্ধ অরতি যায়।

পিঁপড়ে প্রসঙ্গে এই ধাঁধাটি। পিঁপড়ে দুধভাত জাতীয় মিষ্টি খাবার খায়। মাটির নীচে বাসা বেঁধে
বসবাস করে থাকে।

এমনিভাবে ধাঁধাগুলির মধ্যে উঠে এসেছে লোকসমাজের বিজ্ঞানচেতনার নানা
উপাদান। লোকসমাজ হয়তো বিজ্ঞানচর্চার জন্য এই ধাঁধাগুলো তৈরি করেনি। তারা নিখাদ
নির্ভেজাল আনন্দের জন্যই এই ধাঁধাগুলো সৃষ্টি করেছে। তাদের এই সৃষ্টির পিছনে থেকেছে
তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণী-উদ্ভিদ ইত্যাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষত অভিজ্ঞতা। কিন্তু পরবর্তীকালে
যখন ধাঁধাগুলো বিকল্পিত হয়েছে তখন তাতে ধরা দিয়েছে বিজ্ঞানের নানা ধারার উপাদান।
ধাঁধার মাধ্যমে লোকসমাজ লোকশিক্ষা দিয়েছে, যে শিক্ষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে কিছু প্রশ্নচিহ্ন
তৈরি করে দিয়েছে। যে প্রশ্ন থেকেই বিশেষরূপে জ্ঞান অর্জনের প্রতি আগ্রহের একটি ক্ষেত্র
প্রস্তুত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, ড. দুলাল (সম্পা.), বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অফ ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৮৮।
২. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), ধাঁধা : স্বরূপ সন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮ খ্রি. পৃ. ৫৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), ধাঁধা : স্বরূপ সন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮ খ্রি.।

‘অলীক মানুষ’ : সত্তার ভিন্নতর বয়ান

লক্ষ্মী নাথ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
লালা রুয়াল কলেজ, লালার, আসাম

সারসংক্ষেপ: সত্তা ও অপরতার দ্বৈতযোগে সম্পূর্ণ হয় অস্তিত্বের দ্বিরালাপ। সময়ের সাথে সাথে মানুষের পরিচিত পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটে। তেমনি এই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে কথাবীজে রেখে রচিত সাহিত্যিক বয়ানের ভাব-বস্তু, আঙ্গিক, দৃষ্টিকোণ, সবকিছুই লেখকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও ভাবনামূলক নিরীখে বিনির্মিত হয় প্রতিনিয়ত। মানুষের যাপিত জীবন ও চর্চিত মিথের টানা-পোড়েন, লৌকিক-আলৌকিক, বিশ্বাস-সংস্কার ও বাস্তব বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে যে তাৎপর্যময় পরিধি সৃষ্টি হয়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’-এর কথাবস্তু তেমনই এক সত্য অনুসন্ধানের দিকে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। সেই সূত্র ধরে আলোচিত আখ্যানের সত্যের সন্ধানই এই প্রস্তাবিত প্রতিবেদনটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: সত্তা, অপরতা, অলীক, মিথ, সত্যের সন্ধান।

মূল আলোচনা:

মানুষ সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলা সহযাত্রী। জীবনের চলার পথে খুঁটিনাটি সহ সমস্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি গড়ে তোলে, জীবনের তাৎপর্য। প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার মাঝখানেই তৈরি হয়, জীবনের নতুন-নতুন পাঠ। শিল্পীসত্তার দেখার দৃষ্টি নিঃসন্দেহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সৃজনশীল উপলব্ধিতে পূর্ণ। জীবনের পাঠকে তিনি তৈরি করেন, অজুত সম্ভাবনায়। এক রোমাঞ্চকর দার্শনিক প্রত্যয়ে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’-এর আখ্যান, পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে নিয়ে আসে সেই বোধের মাত্রা। উনিশ থেকে বিশ শতকের প্রায় একশো বছরের পটভূমিতে তিনি, কাহিনির যে বিশাল পরিধি তৈরি করেন, এক মুসলমান ফরাজি ধর্মগুরুর যাযাবর জীবন চর্যার সূত্র ধরে, তাতে খুব সহজ ভাবে গল্পে ওঠে এসেছে, দেশ-কাল-সমাজ ও তার বাস্তবতা।

ফাঁসির আসামী শফিউজ্জামানের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের শুরু। প্রথাসিদ্ধ পথে না হেঁটে মুস্তাফা সিরাজ, কাহিনির বুননকে অতীত, বর্তমান, এই দু-সময়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যান, সৃষ্ট চরিত্রের জীবনবন্দীতে। কথকতার সূত্রধার হিসেবে প্রথমই শফির আত্মপ্রকাশ। লেখক তার কৈশোর জীবনের নানা ঘটনা ও কাহিনি সূত্র ধরে একে একে সমস্ত চরিত্র, কথাবস্তুকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন বৃহৎ সময়ের প্রেক্ষাপটে।

আখ্যানের শুরু থেকেই পাঠক অনুভব করেন, বাস্তব ও পরাবাস্তবের এক আলো-আঁধারি উপস্থিতি। যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত বদিউজ্জামান, তার চলমান সংসার নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, গ্রাম থেকে গ্রাম, স্থান থেকে স্থানান্তরে। সেইসূত্রে কুতুবপুর থেকে খয়রাডাঙাতে তার আগমন, এবং সেখানে হানাকি সম্প্রদায়ের পিরের থান ভেঙে দিয়ে, ফরাজি মতকে চালু করতে চেষ্টা করেন, সেখান থেকে, বসতি উঠিয়ে দিতে হয় কার্যকারণ সূত্রে। বদুপীরের চলমান পরিবার রওয়ানা হয় সেকেন্ডার পথে। সেই যাত্রাপথে শফির বয়ানেই সামাজিক ও কালোজিনের অলৌকিক ধারণাটিকে পাঠক প্রত্যক্ষ করে। কালোজিনের কারসাজিতে পথ ভুলে যাওয়া ও অবশেষে বদিউজ্জামানের প্রচেষ্টায় সাদাজিনের সাহায্যে সঠিক পথ নির্দেশে মৌলাহাটে

মৌলানা ও তার গোটা পরিবারের আগমন। সম্ভবত, কোনো কালো মানুষ অথবা ফর্সা সাদা মানুষের দ্বারা তাদের সঠিক রাস্তা ভুলে যাওয়া ও উদ্ধার পাওয়ার ঘটনা ঘটে। কিন্তু দুটো ঘটনাই সমান্তরাল ভাবে কোনো আকস্মিক অলৌকিকতার আবর্তে ঢেকে যায়, যা বদিউজ্জামানের স্ত্রী সাইদা সহ সমস্ত অনুগামীদের চোখে হজুরের মোজেজায় রূপান্তরিত হলো।

তার দ্বিতীয় মোজেজা ঘটে মৌলাহাটে। যেখানে মানুষদের চোখে, তার অবয়ব বা বাণী ঐশী নিদর্শনেরই স্বরূপ। একে মোজাজাই বলা চলে। কেননা—

“... তিনি যে ভাষণটি দেন, মৌলাহাটের মুসলমানদের কাছে বংশ পরম্পরায় একটি কিংবদন্তি ভাষ হয়ে ওঠে। তারা বলত, হজুর আমদের কানে গরম সীসার মতো কিছু কথা ঢেলে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমরা অন্য কথা শুনতে পাই না।”^১

সেকেডা যাওয়ার পথে, বদিউজ্জামান এভাবেই মৌলাহাটে তার অনুগামী মোমেনদের কাছে, আমৃত্যু বাঁধা পড়ে যায়। কারণ, সেসব ধর্ম নির্ভর, সংস্কার লালিত মানুষের কাছে ছিল— ‘মুখে চোখে ঐশী নিদর্শন অনুসন্ধানের প্রচণ্ড আকুলতা ... তারা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো স্থির আর শব্দহীন। ‘এতো দিনের পর, তাদের জন্য জীবনের অসাড়তায় এল বদিউজ্জামান যার আসল নাম সৈয়দ আবুল কাশেম মুহাম্মদ ওয়াদি-উজ্জামান আল-হুসায়নি আল-খুরাসানি। তার নামের মতোই এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এবং বলা বাহুল্য আজীবন এই দীর্ঘনামের খ্যাতির গুরুভার তাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিলো। ভেতর ও বাইরের আত্ম-সংঘাতে।

বদিউজ্জামানের উপর এই আরোপিত, অলৌকিক শক্তির পুরুষের মহিমা, কোথাও যেন তাকে, ভেতরে ভেতরে, অসহায় করে দিয়েছিলো। আমরা উপন্যাসে দেখতে পাই, নিজেকে ক্ষমতা ও একছত্র আধিপত্যের শিখরে টিকিয়ে রাখতে, ব্রাহ্মণী নদীতে স্থিত শতাব্দী পুরোনো পীরের সাঁকোটা ভেঙে গুড়িয়ে দেন। সম্ভবত, সেই নির্বাক স্তম্ভ ও সেই স্তম্ভের পাশের মানত করতে আসা স্ত্রী অলৌকিক পুরুষের সন্তাকে অসাড় করেছিল। মৃদু ঈর্ষা ও তাচ্ছিল্যে লোক পরিচিত বদুপীর, স্তম্ভের প্রদীপগুলো চটিজুতো দিয়ে উল্টে স্তম্ভের গায়ে যেখানে সিঁদুরের ছোপ, সেখানে জুতো ঘষে তার আরোপিত ‘ঐশী মানুষের’ কিছুটা অভিমান শান্ত করার চেষ্টা করেন।

এ কথা ঠিক জীবনের অভিঘাতেই জীবন জাগে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমস্ত ভাঙা-গড়া, দার্শনিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই তৈরি হয় জীবনের কথকতা। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিসময়ে বাংলার বুকে যে সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক নানা ঘটনার সংঘাত ও সহাবস্থান একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম দু-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এর অভিব্যক্তি ও উপস্থিতি দুটো যে একেবারে পৃথক। মুস্তাফা সিরাজের ‘অলীক মানুষ’-এর আখ্যান সেই বাস্তব প্রেক্ষিতটুকু নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়।

খুব অদ্ভুতভাবে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগ্রত চেতনাকে সংগ্রহ করে ধর্মাত্ম মানুষেরা আধুনিকতায় সেখানে পৌঁছাতে চাইছে একসাথে চেতনার সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছে অলৌকিকতা ও গোঁড়া ধর্মাত্মদের ইন্দ্রজালকেও নিজের অজান্তেই।

হরিণমারার বড়গাজি, সইদুর রহমান, রীতিমতো ‘স্যাটম্যান’ পত্রিকায় ‘পৃষ্ঠা উল্টে দেশের খবর রাখেন। মৌলাহাটের মতো অজপাঁড়া গাঁয়ে, তার ছোট ভাই যিনি বুজুর্গ পীর বদিউজ্জামানের একনিষ্ঠ অনুগামী সহ গ্রামবাসী, তাদের চেতনায় যে ধর্মভীরু ভাবাবেগ ছিল। সেই আরোপিত মোহগ্রস্ত আবেগ ও বিশ্বাস বদিউজ্জামানকে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের চোখে অসাধারণ কোনো মহামানবে পরিণত করেছিলো।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো বলিষ্ঠ লেখক, প্রথাসিদ্ধ লেখনীর পথে না হেঁটে যে মহতী কৌশলে গল্পের বাঁধন তৈরি করেন, তাতে প্রায় একশো বছরের বাংলার জনজীবনের মহাসময়ের পরিবর্তনের চেহারাটুকু আমাদের সামনে স্পষ্ট ওঠে। মোল্লাতন্ত্র যে কঠোর হাতে লাগাম ধরে ছিলো তার স্বরূপ প্রকাশ পায়।

সাধারণ মানুষের বোধের গভীরে যেখানে ব্যক্তিমানুষের জীবনে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ ক্ষেত্রে, কেবল মাত্র কোনো একক মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, ধর্মীয় নিয়মকানুনও শৃঙ্খলার আঁধারে, সিরাজের মতো সমাজ সচেতন লেখক সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোল্লাতন্ত্র নির্ভর ধর্মীয় বাতাবরণের যে নিজস্ব বীক্ষণ ভূমি রয়েছে। সিরাজ তাকেই আখ্যানের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। এবার মনে হতে পারে কেন?

এই উপন্যাসে হয়তো আপাত মিথ্যার ছদ্ম আভারণ থেকে সত্যের কিনারায় পৌঁছানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা লেখক অনুভব করেন। তাই তৈরি হয়, কখনও মায়-বাস্তবতা থেকে বাস্তবের ভূমিতে অনিবার্য অবতরণ। এ ক্ষেত্রে আখ্যান ভাগে বদুপীরের ছেলে শফির স্বগত উক্তি হয়ে ওঠে জ্বলন্ত সাক্ষী। সে যখন বলে—

“... যে কোনও ঘটনার দুইটি দিক আছে। একটি বিষয়গত, অপরটি বিষয়ীগত। দ্বিতীয় দিক হইতে দেখিলেই দুঃখ ত্রাস অনুতাপ প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিক্রিয়া জাগবে। প্রথম দিক হইতে বোধ হইবে, নিশ্চয় ইহা উদ্দেশ্যমূলক। তোমার আগোচর কোনও হিতের নিমিত্ত ঘটিয়াছে।”^২

আর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে বিষয়ীগত দিক থেকে যেকোনো পরিস্থিতি ও পরিবেশের ভরকেন্দ্র থেকে আমরা সাধারণ মানুষ মুক্ত হতে পারি না। প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের মানবিক সত্তাকে এভাবেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

জিন, ফেরেস্টা, আল্লার আলৌকিক মোজেজা সম্পন্ন বুজুর্গপীর বদিউজ্জামানও আরোপিত, মহামানবের আদর্শ থেকে মাঝে মধ্যে মাটির পৃথিবীতে, বাস্তব, খড়-কুটোর চাওয়া-পাওয়ার সংসারে নেমে আসতে চাইতেন। ঠিক তখনই যেন আদর্শ মানব বদুপীর বদিউজ্জামানের সাথে মানবিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বদিউজ্জামানের একটা আত্ম-দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের স্বার্থকাতর পরিস্থিতি তৈরি হয়। যখন তার ব্যক্তিসত্তার সাথে আরোপিত, বলাবাহুল্য অনুগামী মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত হজরত বদিউজ্জামানের ধর্মগুরুর সত্তার একটা টানা-পোড়েন সৃষ্টি হয়। আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারি তার বয়ান—

“সাইদা! তোমার জীবনের মরুবালুকার ওপর সুন্দর তাঁবু বেঁধেছ। আর আমি আকাশের ওপর ছোট্টাছুটি করে বেড়াচ্ছি জীবনভর। আমি এক অলীক ঘোড়ার সওয়ার, তার দুটি ডানা আছে। সফেদ জিনগুনলান আমাকে আসমানে উঁচা জায়গায় শাহী তখতে বসাইল। লেकिन আমার দেল বনু-আদমের তাকিয়া জাইল! উহা গোশত আর খুন দ্বারা তৈয়ারী।”^৩

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ‘Behold the world, and curse your victories’. ‘অলীক মানুষ’ আখ্যানটি মূলত মানুষের সময়ের স্বরাক্ষেপে একটু একটু করে এক বোধ থেকে অন্য বোধে উত্তরণ অথবা কোনো ক্ষেত্রে অর্ন্তদ্বন্দ্ব জর্জরিত মানুষের আত্ম-কথার কাহিনিও বটে। এই প্রতিবেদনটির সামাজিক ও সাহিত্যিক অভিব্যক্তি যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি উপন্যাসের চরিত্রগুলোর জীবনকে দেখার ক্রমাগত রূপান্তরমুখী দার্শনিক প্রত্যয়ও আমাদের সম্বন্ধে আঘাত করে।

রক্তমাংসের গড়া এ পৃথিবীর কামনা বাসনায় মানুষের যে ছোট ছোট আকৃতি ছড়িয়ে থাকে, বদুপীরের মহামানবের নিয়তি সেক্ষেত্রে তাকে অনেক উঁচুতে তুলে রেখেছিল। স্ত্রী সাইদাকে সংসার, সন্তান সমবে মসজিদে বসবাসকেরও সেই ঐশী পুরুষ বাস্তব-সংসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে যতবারই অসহায় বোধ করেছেন, তখনই নিয়েছেন একাকীত্বের একান্ত 'ইত্তেকাফ'। এমনকী উপন্যাসে পাঠে লক্ষ্য করি, তার এবাদতখানায় প্রতিপালিত জুলেখার সাথে নাতি রুফিউজ্জামানের বিয়ে হওয়ায়, তিনি অন্তর্দহনের যজ্ঞায় 'ইত্তেকাফ' নেন।

এই জুলেখা সম্ভবত ডাকাতের স্ত্রী ইকরা ও বদিউজ্জামানের কন্যা, যাকে এক সময় প্রৌঢ় প্রাপ্তে এসে বিয়ে করে, তালাক দেন। ইকরা বা ইকরাতন ছিল সেই হিন্দু নারী যাকে, মৌলাহাটে ব্রাহ্মণী নদীর পাশে পীরের স্তম্ভে সিঁদুর দিয়ে প্রণাম করতে দেখেন। আবদুল যাকে সতীদাহের চিতার আগুন থেকে তুলে এনেছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, তার ফরাজি সাম্রাজ্যের একছত্র রাজত্বে এ হেন হিন্দু আচারকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না, যথারীতি ফতোয়া জারি করে, এই কালো সাকোঁ, স্তম্ভ সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হয়।

কিন্তু রাতের গভীর অন্ধকারে, এবাদতখানায় চোখ বুজলেই বুজুর্গ পীর দেখতে পেতেন, সিঁদুর মাখা সেই নিশ্চিহ্ন থাম অবিকল দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিস্পর্ধী দস্তে এবং তার সাথে অবিরত ভাবে সামনে এসে প্রকট হতো থামের গায়ে মাথায় প্রদীপ নিয়ে নগ্ন সে স্ত্রী। যাকে তার পবিত্র 'হুশিয়ার নামাহ' কেভাবে বর্ণিত সেই কুৎসাকারিণী 'হাম্মালাতাল হাতাব' এর মতো বেপরোয়া- বে-শরম আওরত।

তবে কী বুজুর্গ পীর বদিউজ্জামানের নিভৃত সত্তা ঐ জড় পাথরের স্তম্ভের পাশে ভেতরে-ভেতরে অসহায় হয়ে পড়েছিলো? কায়মী স্বার্থ ও পীরতন্ত্রের মূল ধূলিসাৎ করতে গিয়ে সে একদিন নিজেই পীর পুরুষে পরিণত হয়ে যান। তার কী কোনো গোপন অপরাধ বোধের তাগিদ ভেতরে ঘুনপোকার মতো বাসা বেঁধে ছিল মনে?

সহোদর সুফি ছোট ভাই ফরিদুজ্জামানের প্রতি তার দুর্ব্যবহার যে নিজেকে আল্লারসেবক বলতো। তাকে বদুপীর জুতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, জঙ্গল আস্তানা থেকে। তার প্রতি জেগেছে অনুশোচনা বোধ। ধীরে ধীরে শূন্যমার্গের প্রতি ধাবিত পীর পুরুষ কী বুঝতে পারছিলেন? আরোপিত ঐশী ব্যক্তিত্ব ও অন্ধ আবেগে ধর্মগুরু হয়ে নিজস্ব মতানুযায়ী ধর্মভীরু মানুষকে প্রকৃতির সহজ সান্নিধ্যে থেকে দূর করে, নিতান্ত একমুখী ভাবে ফরাজি পন্থায় বিশ্বাসী করে তোলার জোরালো ও প্রতিষ্ঠিত ফরমানে অন্ধ হয়ে পড়া মানুষের ভেতরের দুর্বল গ্রন্থীগুলোকে? তার মনের এই আত্ম-দ্বন্দ্বের অনিবার্য সংঘাতকে তার মনে হয়েছিল শয়তানের কারসাজি। অসহায় ভাবে বলেছেন, 'আল্লাহ। শয়তানের জাদু থেকে আমাকে বাঁচাও।' 'আমাকে আল্লাহ কোন রাস্তায় নিয়ে চলেছেন? আমি যে সত্যিই পীর বুজুর্গ হয়ে পড়লাম। বুকের ভেতর আত্ননাদ উঠল, আমি মানুষ! আমি মানুষ! নিতান্ত এক মানুষ।'

মাটির জগত থেকে উঁচুতে থাকার নিয়ত অভ্যাস, তাকে সবার মাঝে থেকেও আলাদা করে দিয়েছিলো। আলো আর অন্ধকারের মাঝখানে হেঁটে গিয়ে পরমার্থ লাভের যে এক অদম্য ইচ্ছা তার ছিল, প্রকৃতির অনিবার্য আঘাত তাকে বারবার কর্ষণ করে নিয়ে আসত মানুষের দুনিয়ায়। লৌকিক জগত থেকে অলৌকিক জগতে। নির্বাসিত মানুষ থেকে অলীক মানুষে পরিণত হয়ে যাওয়া, তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলো তার আহত অহং-এর দিকটি। তিনি উপলব্ধি করেন,—

“উঁচুতে উঠে গেলে যেন মানুষের সবটুকু চোখে পড়ে না নিচে থেকে। ওরা ভাবে আমার ঘর গেরস্থালি নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, আমি অন্য এক মানুষ। অথচ আমার মধ্যে এইসব জিনিস আছে। টিকে থেকে গেছে সবকিছুই।”^৪

সংসারী মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-বিরহের সমীকরণের সূক্ষ্ম অনুভব মানুষকে আটকে রাখে, প্রকৃতির সহজ নিয়মে, তার থেকে পুরোপুরি মুখ ফেরাতে গেলেও সে সাহস ও চেষ্টা কিছুটা দাহ্য ও দাহক, উভয়ই হয়ে নিজেই নিজেকে আঘাত করে।

মুস্তাফা সিরাজের ক্ষুরধার লেখনী ও ভাবনার বন্ধনে ধর্মগুরু বদিউজ্জামান এমনই এক কঠিন সত্যের তীর্থক রূপ হিসেবে উপন্যাসে দেখা দেন আমাদের কাছে।

“Each text is the preface to the next”। তাত্ত্বিক এই উচ্চারণকে মাথায় রেখে, উক্ত উপন্যাসটি যাচাই করি, তাহলে দেখতে পাই এই আখ্যানটি মুখ্যত দুটো মানুষের ক্রম পরিবর্তিত সত্তার আলো-আঁধারের মাঝখানে, হওয়া আর না হওয়ার কথা। একদিকে বুজুর্গ পীর হওয়া মৌলানা বদিউজ্জামান যিনি ধর্মীয় বিধি নিষেধ মান্যতার কাছে বন্দি, অন্যদিকে তারই সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান শফিউজ্জামান যে ক্রমাগত এক প্রকার ধর্মবিদ্বেষী হয়ে প্রকৃতির বিশাল উদারতার রহস্যের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে আত্মিক মুক্তির লক্ষ্যে।

যার প্রকৃতির সাথে ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে যাওয়াকে লেখক চিহ্নিত করেন এভাবে — ‘I go and come with a strange liberty in nature, a part of herself’।

যে শফি ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছে তার বাবা একজন ফরাজি ধর্মগুরু, যার জিনদের সাথে কথাবার্তা, যিনি যে কোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতিতে মোজেজা ঘটিয়ে দিতে পারেন। তাঁর ভবঘুরে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির কাছে পাওয়া স্বাধীন মনুষ্যত্বের সহজপাঠ যেই অন্ধ-সংস্কার ও ধর্মীয়বোধের কঠিন শৃঙ্খলকে ভেঙে দিয়েছিলো। নুরপুর বানুকের কুঠিয়াল রিচার্ড স্ট্যানলিকে হত্যা করে আসার পর তার উদাত্ত উচ্চারণ— ‘ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা। ধর্ম নিপাত যাক। ধর্মই মানুষের জীবনে যাবতীয় কষ্ট আয় গ্লানির মূলে। ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে। ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক চেতনা আর বুদ্ধিকে ঘোলাটে করে।’

সৈয়দ বংশীয় পীর পরিবার ভুক্ত শফিউজ্জামান প্রকৃতির এই মুক্ত জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছিলো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত উদার স্বভাবে মুক্ত মনের মানুষ ইন্দ্রাণী কাছারির দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরীর কাছে। তার আত্ম-চৈতন্য জেগে ওঠার প্রাথমিক ঘটনাটাকে লেখক পয়গম্বরের ছোটবেলার একটি কাহিনির সাথে সাযুজ্য করে দেখালেন। পয়গম্বরের বালক অবস্থায় দুজন ফেরেশতা এসে তাঁকে চিত করে কলজে থেকে অসৎ টুকরোটিকে কেটে নিয়ে সং এবং স্বর্গীয় একটি টুকরো জুড়ে দিল। এই ঘটনাটির নাম ‘সিনা-চাখ’ বা বক্ষ বিদারণ। ঠিক একই ভাবে বারি চৌধুরী উলুখরার তৃণভূমিতে নিয়ে প্রকৃতি থেকে তার চেতনায় সংস্কারহীন স্বাধীনতার প্রথম ফুস-মস্তুর দেন যেন তার কানে কানে। শফির বয়ানেই সেই তাৎপর্য ফুটে ওঠে—‘আমার কলজে আমার অজান্তেই বদলে গিয়েছিল। আমার ‘সিনা চাখ’ বুঝতে আরও বহু বছর লেগে গিয়েছিল। আমি বুঝতেই পারিনি আমি কী হয়ে গেছি সেদিন থেকে।’ বারি চৌধুরী সেই ফেরেশতা যার সংস্পর্শে তারও উলুখরার জঙ্গলে ‘সিনা চাখ’ অনুষ্ঠান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। যদিও তার মানসিক বিরাট পরিবর্তনটিকে বুঝতে আরও সুদীর্ঘ সময় লেগে ছিলো।

সত্যদ্রষ্টা বারি চৌধুরী শফির মধ্যে হয়েতা পীরপন্থী চেতনার বাইরে এক অন্য মানুষের হয়ে ওঠায় সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই দিলরুখের সাথে বিয়ে করে অল্প বয়সে প্রথাসিদ্ধ নিয়মে বেঁচে থাকায় এক ঘেঁয়ে জীবন থেকে বের করে আনতে চেয়ে ছিলেন।

তারই চেষ্টায়, প্রথম হিরণমারা প্রসন্নময়ী ইংলিশ স্কুলে ভর্তি এবং পরবর্তী সময়ে লালাবাগে নবাব বাহাদুরেদের নিজস্ব স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। এখান থেকেই শফির জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে অন্যদিকে। রুকুর সাথে ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়েকে ভেঙে পালিয়ে এসেছিল, সম্ভবত তারপর একবারই শুধু গেছিলো তার বাসভূমি মৌলাহাটে ফাঁসির আগে। চল্লিশ বৎসরের জীবনে ফাঁসির আসামী হিসেবে এরকমই হাজারো কথা তার ডায়েরী পাতায় ভরে উঠেছিল, যে ডায়েরী তাঁর ফাঁসির পর দিলরুখ মারফৎ তার নাতনি কচির সাথে কথোপকথনে কিছু ঘটনা ফ্ল্যাশব্যাকের মতো, পাঠকের সামনে এসে হাজির হয়।

এ কথা ঠিক, রুকুকে পছন্দ করে অস্বীকার করা এবং তাকেই ভোলার ছলে মাত্র ষোলো কিংবা আঠারো বছর বয়সে, জেলে মেহেরুর স্ত্রী আসমার কাছে প্রথম নারী শরীরের স্বাদ পাওয়া নিছক কী অভিমান বা আক্রোশ? নিজের উপর না যে উদার জীবনের ‘সিনা চাখ’ ইতিমধ্যেই তার সত্তায় ঘটেছিল, সেটা টিকিয়ে রাখে ক্ষুদ্রতর চাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে। আর এই নিষ্ফল হয়ে যাওয়া বিধ্বংসী অভিমানী মুহূর্তের একই প্রবল ক্রোধ, তার ভেতর ঘাতক সত্তার জন্ম দেয়। সে লালবাগে কাল্লুর স্ত্রী সিতারার জন্য পান্নালাল পেশায়ারীকে আঘাত করে। পক্ষকাল পরে সেই আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটে। যদিও তা জানতে পারে অনেক পরে।

সেখানে পালিয়ে এসে, ব্রহ্মপুরে দেবনারায়ণের আশ্রয়ে ব্রাহ্ম সমাজের আবহাওয়ায় বাস করতে করতে শফির ভেতর এক অদ্ভুত দার্শনিক বোধ তৈরি হয়। দেবনারায়ণ মহাশয় ‘স্ট্রেনজলিবাটি’ পড়তে দিলে শফির চেতনায় যেন প্রকৃতিজাত অদ্ভুত ও স্বাধীনতার স্বাদ আরো তীব্র মাত্রায় বিকশিত হয়।

শফিউজ্জামান ব্রহ্মপুর নিবাসী হওয়ার থেকে অফসর বাবু ওরফে ছবিলালে পরিণত হয়ে যায়। প্রকৃত সৌন্দর্য যা স্বভাবত প্রাকৃতিক যা আরোপিত নয়। সেই স্বাধীনতার দিকে তীব্র আকাঙ্ক্ষা শফির আপাত নির্লিপ্ত চেতনায় জীবন ভর সক্রিয় ছিল। বা এমনকী বলা যায় যে, আবার প্রকাণ্ড ছায়ায় কবল থেকে বেরিয়ে জীবনের অবাধ স্বাধীনতা ও জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞ পাঠ শফির সত্তাকে স্বয়ংক্রিয় হিসেবে তৈরি করেছে নিজের অজান্তেই। ফলে এই স্বাধীনতার ধারণায় সিতারা, স্বাধীনবালা, রত্নাময়ী বলাবাহুল্য যাদের জন্য সে খুনের আসামীতে পরিণত হয়েছে কোনো ব্যক্তি স্বার্থ ছাড়াই, তারা ছিল তার মুক্ত সৌন্দর্য। যখনই এইসব নারীরা সামান্য মানুষের হাতে বন্দি হয়েছে তার তৈরি করা সংজ্ঞায় বাইরে। ঠিক ততবারই তার ঘাতক সত্তা সমস্ত শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। শফির বয়ান এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—

“নিজের রূপান্তরশীল অংশের প্রাপ্ত হইত অসহায় বিদ্রোহের বার্তা শুনিতেছি। এ আবার এক সন্ধিকাল জীবনে। কবেই বুঝতে পারিয়াছি আমি বিদ্রোহের ধাতু নির্মিত একটি সত্তা। অথচ মাঝে মাঝে আমার মধ্যে এক প্রকারটাগ অফ ওয়ার’ চলিতে থাকে। উষ্ণতা এবং শীতলতা, জাঢ় এবং গতির বড়ই জটিল টানাপোড়েন।”^৫

এই ‘টাগ অফ ওয়ার’ এর দ্বন্দ্ব কী শফিকে ধর্মদ্রোহী ঘাতক নৈরাজ্যবাহী চেতনায় পরিণত করেছিল? অথবা সৌন্দর্য স্বাধীনতাময় প্রকৃতি-স্থিতিজাত ও অভিজাত্যের অবিরাম সংঘর্ষ এবং জড় ও চেতনের দ্বন্দ্ব অবতীর্ণ হয়ে শফিও যেন একসময় নিজেই নিজের কাছে অলীক হয়ে ওঠে।

বদিউজ্জামানের ঠিক বিপ্রতীপ মেরুর মানুষ করে, মুস্তাফা সিরাজ শফিকে তৈরি করেন, কিংবা হয়ত এমনও বলতে পারি, সিরাজ তার ব্যক্তিসত্তায় যে প্রকৃতির সহচর্য ও

সহযোগী সত্তার উপস্থিতিকে অনুভব করতেন, তা-ই শফির মধ্যে প্রসারিত করেন। তাঁর ‘আত্মকথা’ অংশে উল্লেখ করেন,— ‘প্রকৃতি সঞ্জাত এই স্বাধীনতার স্বাদ মানুষকে প্রেমিক করে দার্শনিক করে, আবার যোদ্ধাবেশধীর হত্যাকারীও করে। ... সে তখন নিজেই এমন এক বিশেষ বাসিন্দা করে, সেখানে রাষ্ট্র নেই, আইন নেই, শাসন নেই, সমাজ নেই, তথাকথিত ধর্ম নেই। ... এবং যে প্রকৃতির সন্তান বলে তার স্খলিতা-অস্খলিতা নেই। শুধু আছে জীবন-মুক্ত উদ্দাম জীবন।’

তবুও লেখক নিঃশব্দে শফির মধ্য দিয়ে কথকতায় আদলে আখ্যানের মধ্যে তাঁর প্রকৃতিজাত উপলব্ধিকেই কিছুটা হলেও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যেন সে চেয়েছে- ‘Stand out of my way, you are blocking the Sun.’

নিজ ধ্যান ও ধারণায় জীবনকে চালিয়ে নিতে, শফিউজ্জামান কোথাও না কোথাও, বিকল্প পথ খুঁজে দিতে গিয়ে ঠিক যেন দিশা খুঁজে পায়নি। কিছুটা উদ্দেশ্যহীন ও উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে বদিউজ্জামান সে অর্থে অলীক মানুষে পরিণত হয়ে যান, যদিও তিনি ভেতরে অনুভব করেছিলেন সত্তার অন্তর্ঘাত— ‘আমি যে সত্যিই পীর বুজুর্গ হয়ে পড়লাম! বুকের ভেতর আত্ননাদ উঠল, আমি মানুষ ! আমি মানুষ ! নিতান্ত এক মানুষ!’ শফিউজ্জামান কৃষ্টিনেতা হবার সমস্ত যোগ্যতা নিয়ে অতি মানব হয়ে উঠতে পারেনি, শুধু অধরা ও অলীক থেকে যায়। সময়ের ছাঁই ভঙ্গে। দিলরুখ বেগমের মারা যাওয়ার আগে শফির সমস্ত ডাইরী পাতা যা একদিন সযত্নে রাখাছিল। গোপণে পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে কী তার কোনো ইংগিত লুকানো থাকে? যে জিজ্ঞাসা আলো-আঁধারী অলীক হয়ে থেকে গেলো, এবং সে উত্তর সময় প্রত্যাশী।

তথ্যসূত্র:

১. ‘অলীক মানুষ’, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৮ইং, পৃঃ ২৭।
২. তদেব, পৃঃ ১৯০।
৩. তদেব, পৃঃ ২৭৪।
৪. তদেব, পৃঃ ১৫৪।
৫. তদেব, পৃঃ ২৩৮।

আকরঞ্জ:

১. ‘অলীক মানুষ’, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দে’জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৮ইং।

সম্প্রীতির পরম্পরায় : সত্যপীর সাধনা

ধনঞ্জয় গড়াই

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

পূর্নিদেবী চৌধুরী গার্লস কলেজ

বোলপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় সমাজ কাঠামোই ভক্তি ধর্ম ও ভক্তি সাহিত্যের চলাচল বহুকালের। নানা ভাষা নানা ধর্ম মতের বসবাস এই দেশে। এরই মাঝে যা বিরাজমান তা হল সমন্বয়। আর এই সমন্বয় সাধনাকে অগ্রসর করতে যেসব উপাদান অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম এক দিক ছিল 'সত্যপীর' এর সাধনা। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যুক্ত সাধনায় এর ভূমিকা যে তাৎপর্য ছিল তারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

সূচক শব্দ: সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, সমন্বয়, হিন্দু, মুসলমান।

মূল আলোচনা:

ভারতীয় সমাজ কাঠামোই ভক্তি ধর্ম ও ভক্তি সাহিত্যের চলাচল বহু কালের নানা পথ ও নানা মতের এই দেশে লোকসাধারণের যে সাধনা তা মূলত সমন্বয়ের 'সাধনা'। সাধনা কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' গ্রন্থে শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন এক কথায় সত্য দর্শন বা স্বরূপ উপলব্ধির জন্য যে প্রয়াস তাহাকেই আমরা সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাই। ভারতীয় সাধনার ধারায় সমন্বয়ের স্বরূপ, সত্যের স্বরূপ সেই বেদ উপনিষদের সময় থেকেই দেখা গিয়েছে নানা ভাবে। প্রাচীনকাল অতিক্রম করে। ভারতবর্ষ যখন মধ্যযুগে প্রবেশ করে এবং ভারতবর্ষের বুকে শুরু হয় সুলতানি শাসন, সেই শাসনের হাত ধরেই বাংলায় বখতিয়ার খলজির আক্রমণের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ইসলামের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বহু মানুষ ধর্মান্তরিত হয় ইসলাম ধর্মে। এই ধর্মান্তরিত মানুষজন তাদের মন থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যকে কোনক্রমেই দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। যার ফলে বঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিতে মধ্যযুগের এক সমন্বয়রূপী ধারণার আবির্ভাব ঘটে, যে ধারণা প্রথম প্রবেশ করে সুফি সাধকদের হাত ধরে পরবর্তীকালে ভক্তি সাধনার মাধ্যম দিয়ে। মধ্যযুগের এই ধারা তথা দর্শন বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় লোকসাহিত্যের নানা শাখা প্রশাখা তে। এই দর্শনকে অবলম্বন করেই মানুষ নতুন করে বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছে, পেয়েছে জীবনের আনন্দ। আর এই ধারাকে অবলম্বন করেই উৎপত্তি হয়েছে 'সত্যপীর সাধনা'।

ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় ইসলাম সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে তা সমগ্র বাংলায় বিস্তার লাভ করে। হিন্দু পাশাপাশি বসবাসের ফলে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ প্রচেষ্টায় সত্যপীর সাধনার আবির্ভাব হয় আনুমানিক চতুর্দশ শতকে, অনেকেই মনে করেন বাংলার সুলতান হোসেন শাহ আমল (১৮৯৪-১৫১০) থেকেই সত্যপীর সাধনার শুরু হয়। ডক্টর অতুল সুর তার 'বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন' গ্রন্থে বলেছেন- "হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনায় পীর পূজায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। 'পীর' শব্দটি ফারসি শব্দ এর অর্থ হল ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ। ইসলাম ধর্মের জাত পাতহীন উদারতা অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে পীর ফকিরদের বা সুফি ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে

বহু পীরের বন্দনা আছে। পীরের দরগা সমূহের প্রতি হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমানভাবে শ্রদ্ধা ও অর্থ্য নিবেদন করত। পীর পূজাকে অবলম্বন করে হিন্দু সমাজে অনেক দেবদেবীর উদ্ভব হয়েছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সত্যপীর, গাজী সাহেব, বনবিবি ইত্যাদি। এর মধ্যে সত্য পীরের পূজা বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে। সত্য পীরের প্রজা, কথায় বলা হয়েছে যে সত্য পীর ও সত্য নারায়ণ অভিন্ন। সত্য পীরকে অবলম্বন করে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাজ অনেক পাঁচালী রচনা করেন।” মধ্যযুগী বাংলা কাব্য সাহিত্যের মধ্যে হিন্দুর সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানের সত্য পীরের কাহিনীকারগণ জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বাঁধ ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। শতকে বাংলা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটি বড় অংশ মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের এক সহজ যোগ সাধিত হয়। সুফি সাধকরা বা পীর ও ফকিরেরা গ্রাম বাংলার সহজ-সরল মানুষদের মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের অন্তরকে জানতে এবং বুঝতে পেরেছিলেন তাই তারা তাদের অন্তরের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছিলেন সম্প্রীতির ধারণা, যে ধারণারই অন্যতম রূপ ছিল 'সত্যপীর সাধনা'।

সম্ভবত মনে করা হয় খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে সত্যপীরের গান বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী লেখা হয়। তবে এই পাঁচালীর প্রথম লেখক কে ছিলেন এ নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ডক্টর এনামুল হকের মতে হাওড়ার ফয়জুল্লাহর সত্য পীরের পাঁচালী সর্বপ্রাচীন। অন্যদিকে সুকুমার সেন বলেছেন ভৈরব চন্দ্র ঘটকের রচনা প্রাচীনতম। সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাপ্ত (Jatindra Mohan Bhattacharya, CALOG us Catalogurum of Bengali Manuscripts, Vol-1, Pashupati Sasmal and Buddhadev Acharya, Vishwa Bharti 1984) এই সংগ্রহগুলিতে তিনশরও বেশি সত্যপীর সত্য নারায়ণ বিষয়ে হাতের লেখা পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলার সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলা সাহিত্যের যে চরমতম উন্নতি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং তার রাজত্বকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে ভাবধারা বিস্তার লাভ করেছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ছিল। এই অনুকূল পরিবেশে সম্প্রীতির অন্যতম দিক ছিল যে সত্যপীর সাধনা, সেটা অস্বীকার করা যায় না। মতপার্থক্যও যাই থাক না কেন বঙ্গে সম্প্রীতির সুর দেখা দিয়েছিল সুফি আন্দোলনে, ভক্তি আন্দোলনে, বাউল গানের মধ্য দিয়ে, নিরক্ষর কবিদের ভাবনায় বিশিষ্ট কবিদের লেখায় যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ। সত্যপীরের গান গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া হতো এবং মানুষের মধ্যে ভেদভেদ ও বিভেদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মেলবন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা হত। এই নিয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সত্যপীর এরসাধনা বঙ্গে শুরু হয়েছিল। ডক্টর সুকুমার সেন এর বক্তব্য এ সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে তিনি বলেছেন- “পীর মাহাত্ম্য রচনার মধ্যে প্রধান হইল সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী। এই পাঁচালীর বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে অদ্ভুত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছে।” স্কন্দ পুরাণে প্রথম সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে পরবর্তী সময় বাংলার হিন্দুদের ঘরে ঘরে সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন ছিল এখনো আছে। বাংলায় মুসলিম আগমনের ফলে অনেক হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়। এই ধর্মান্তরিত মুসলমানরা নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলতে পারেনি। লোক চক্ষুর অন্তরালে এরা সত্যনারায়ণের পূজার সঙ্গে যুক্ত ছিল, পরবর্তী সময় কারো ক্ষোভের কারণ না হওয়ার জন্য এরাই সত্যের পর 'পীর' শব্দটি যোগ করে দেয় এবং 'সত্যনারায়ণ হয়ে ওঠে সত্যপীর'। পীর ও নারায়ণ শব্দ দুটি সঙ্গে সত্য যুক্ত করে সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ, অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যে অথবা অন্ধকার থেকে

আলোয় নিয়ে যাওয়ার ভাবনাটি এখানে দেখা যায়। যে ধারণা উপনিষদে উল্লেখিত 'অসতো মা সাময় তমসো মা জ্যোতির্গময় অর্থাৎ জীবনকে প্রকৃত সত্যে পৌঁছনোয় মনুষ্যত্বের যে মূল লক্ষ্য বা আদর্শ সেই দর্শনটি এখানে স্থান পেয়েছে। ইসলামে সুফি মতে পীর শব্দটির অর্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞানী বা সৎ ব্যক্তি এবং হিন্দু মতে নারায়ণ শব্দটির সর্ব জীবের কল্যাণে ঈশ্বরের প্রতীক। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই 'সত্যপীর সাধনা', সেই জন্য উভয় সম্প্রদায় সমানভাবে মান্যতা দেন সত্যপীরকে।

দশম শতাব্দী থেকে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মপ্রচার শুরু হয়, যা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে বাংলায় ইসলাম দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুসলমান শাসনকালে প্রভাব বিস্তারের কোন এক সময় সত্যপুরের আবির্ভাব হয়। গোপেন্দকৃষ্ণ বসু সত্যপীরের উৎপত্তির চারটি মতের উল্লেখ করেছেন যথা এক ধর্ম ঠাকুরের পূজা থেকে সত্যনারায়ণ সত্যপীরের পূজা এসেছে। দুই. মহাভারতের সত্য বিনায়ক কিংবা স্কন্ধ পুরাণের সত্যনারায়ণের থেকে পরবর্তী সময় সত্য পীরের পূজার প্রচলন হয়। তিন, আদি মধ্যযুগের সাধক পীর মনসুর হাল্লাজ নিজেকে সত্যদর্শী বা সত্য বলে ঘোষণা করতেন তাকে সত্যপীর হিসেবে পূজার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন তার শিষ্যরা। মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন সত্য পীরের পূজার যে প্রচলন হয়েছিল কোন এক সময়ে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই সত্য পীরের সাধনা এখনো গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে এবং তার প্রমান পাওয়া যায়। 'শিবায়ন' রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্র রায় তাদের রচনায় সত্য পীরের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আরেক রূপ সত্যপীর তা বলেছেন। মুসলমান কবি যেমন ফয়জুল্লাহ ও ওয়াজিদ আলী প্রমুখ তাদের কাব্যে দুই দেবতার অভিন্নতার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে অষ্টাদশ শতকে রচিত শংকর আচার্যের সত্যনারায়ণের পুঁথিতে বলা হয়েছে -

একদা বৈকুণ্ঠ ধামে চিনতে নারায়ণ।

মর্ত্যোতে কলহ সকল ধর্মের কারণ।।

মিলাতে সকল ধর্ম কামনা আমার।

সত্যপীর রূপে আমি হব অবতার।।

কেহ বা ডাকিবে মোরে সত্যপীর বলি।

পীর আর নারায়ণ একই সকলি।।

নানা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে সমগ্র বঙ্গভূমিজুড়ে একদিন যে ধর্ম কলহ চলেছিল তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল নানাদর্মমতের। নানা ধর্মের এই ভাঙ্গা গড়ার খেলায় মানুষ যেমন মেতেছিল, তেমনি নানা ধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। এই সমন্বয়ের প্রতিচ্ছবি ছিল।

'সত্যপীর সাধনা'। সমন্বয়ের বিভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পাই সত্য পীরের গানের মধ্য দিয়ে। কিছু গান নীচে উল্লেখিত হল-

১। সত্যকালে জন্ম মোর নাম সত্যপীর

কলিকালে জন্মিয়া হইনু জাহির।

হিন্দু দেবতা আমি মোমিনের পীর

যে যাহা কামনা করে তাহারে হাসিল।

২। সত্যপীর বলে মোর জাতিভেদ নাই

যে জন ভক্তি করে তারই হাতে খাই।

- ৩। সত্য সত্য পীর সর্ব সিদ্ধিদাতা
বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ণীতে ব্রত কথা।
- ৪। দ্বিজ বরে দিতে বর
হরি হলেন সত্য শ্রী মাধব হইলেন পীর।
ফকিরের সাজে জগতে ব্রজে অডুত কৃষ্ণের শরীর।
- ৫। ফকির শরীর ধরি হরি হইলা অবতরী
এক বৃক্ষ তলে কইল অবস্থান।

উপরে উল্লেখিত এইরকম বহু সত্যপীর পাঁচালী ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রতির এক অন্যতম দিক। সত্য পীর সাধনার মধ্য দিয়ে 'সত্যপীর' ছিল লোক ধর্মের প্রতীক। এটি এমন একটি লোক ধর্ম যা সকল নিম্ন শ্রেণীর বা জাতির মানুষকে আকর্ষণ করেছে। এই লোক ধর্ম হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে এক সূত্রে প্রথিত করেছে। জাতি-ধর্ম, পবিত্রতা- অপবিত্রতার কঠিন বাস্তবকে এক লহমায় বিলীন করেছে। তৎকালীন গ্রাম্য কবির ও ছড়াকারেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিশেষ ভাবধারা তাদের গ্রামীণ কাব্য প্রতিভায় সকলের দৃষ্টিগোচর করেছেন। এই সকল কাব্য ধারা এবং গাথা-গীতিকা সবই সত্য পীরের বন্দনা এবং তার মাহাত্মকে জনমনে প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এমনভাবে একদিকে সুফি ফকিরদের প্রচেষ্টায় এবং সত্যপীর গানের গায়ক দলের নিষ্ঠা ও মননশীলতায় সত্যপীর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই আকর্ষণ করেছিল। গ্রাম বাংলার মিশ্র ধর্মের সাধারণ মানুষের কাছে 'সত্যপীর সাধনা' হয়ে উঠেছিল সম্প্রীতি ও মিলনের আর এক নাম।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অতুল সুর- বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৪
২. গোপেন্দকৃষ্ণ বসু- বাংলার লৌকিক দেবতা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯৪
৩. গীরিন্দ্রনাথ দাস- বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৮
৪. তুণ্ডি ব্রহ্ম- লোক জীবনে বাংলা লৌকিক ধর্ম সঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম, ১৯৮৯
৫. মোহাম্মদ এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৫৫
৬. সুকুমার সেন-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৪,
৭. R M Eaton-rise of Islam and Bengal Frontier, 711-1204, University of California Press, 1993
৮. R M Eaton (Ed.)-India's Islamic Traditions, Oxford University Press, 2003।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর নির্বাচিত উপন্যাসে নারী-পরিসর

প্রিয়াঙ্কা দে

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১

সারসংক্ষেপ: সমাজ-পরিবারের বাঁকে বাঁকে, একান্তবর্তী সংসার-বৃত্তের অন্দরে-কন্দরে, নাগরিকবোধে, পল্লীর বিস্তারে, দাম্পত্যের প্রবাহে, কর্মক্ষেত্রে নারীর আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধিকার ভঙ্গ হওয়া; শেষ পর্যন্ত নারীর সচেতন সংগ্রামী পদযাত্রায় আত্মপ্রতিষ্ঠার আখ্যানই হল জ্যোতির্ময়ী দেবীর অন্যতম স্মারক-চিহ্ন।

সূচক শব্দ: ইতিহাস নির্ভরতা, পণপ্রথা, কন্যাদায়, ব্ল্যাক ফেমিনিজম, দেশভাগের যন্ত্রণা।

মূল আলোচনা:

প্রথমত বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। তার ওপর বাঙালি নারীর ইতিহাস পুরুষের শাসনাধীন, নিয়ন্ত্রিত। সভ্যতা বিকাশের ধারায় যেকোন কালে, যেকোন দেশে নারীর ইতিহাসের প্রতি পুরুষের যে আচরণ বা মনোভাব তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সময়ের সৃষ্টি না হয়ে কখনো কখনো কেউ কেউ তো সময়ের স্রষ্টা হয়েই জন্মায়। সেই ধারার অন্যতম বাঙালি সাহিত্যস্রষ্টা জ্যোতির্ময়ী দেবী। বাঙালি বলে তার সাহিত্য ভাবনার পরিসরকে ছোট করা উচিত নয়। আসলে জ্যোতির্ময়ী দেবী ভারত সাহিত্যের এক হার না মানা জেদ। নিজের ইতিহাস নারী নিজেই লিখেছে এমন হৃদয় জাতির কাছে ঐতিহাসিককাল থেকেই ছিল বিরল। নেই বললেই চলে। তার সুখ-দুঃখ, মর্মবেদনা, তার সামাজিক ভালোমন্দের ইতিহাস নির্ণীত হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিতে। পুরুষ তার নিজস্ব প্রেক্ষিত থেকেই নারীর ইতিহাসের মূল্যায়ন করেছে। এও এক ইতিহাসের বিস্তার ফাঁক। মস্ত ফাঁকিও বটে। মানতে পারেননি লেখিকা। তিনি লিখছেন – “বক্ষিমচন্দ্র বলেছিলেন, ‘বাঙালির ইতিহাস নাই’। ... আমরা একালে মনে মনে ভাবছি কেনো নারীর কোনো ইতিহাস নেই। মানবজাতির অর্ধেকটা হলে কি হয়, তার সুখ-দুঃখের, মর্মের, বেদনার, আনন্দের, সামাজিক ভালো-মন্দ বিচারের কোনো ইতিহাসই তাদের নিজের মুখে বলা বা লেখা নেই।”^১

সে-কারণেই অকৃপণ ওদার্যে সারাজীবন নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-শিল্পের সাধনায় যুক্ত থাকলেন লেখিকা। বাংলাদেশ থেকে দূরবর্তী রাজস্থান রাজ্যের জয়পুরে এক দেওয়ানের ঘরে জ্যোতির্ময়ী দেবীর জন্ম। যদিও কৈশোরের তারুণ্যের সময়গুলো কেটেছিল বাংলায়। খুব ছোট বয়সেই বিবাহ তাঁর। কিন্তু বিবাহিত জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকার। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হন। বৈধব্যের যন্ত্রণা, ছটি নাবালক সন্তানকে নিয়ে চলে যেতে হয় পিতৃগৃহে। বড়টির বয়স নয় বছর। আর ছোটটি তখন তিন মাসের। চূড়ান্ত একা হয়ে পড়েন লেখিকা। বিত্তবান পিতৃগৃহে কোনো কিছুই অভাব ছিলনা। তবু নিঃসঙ্গতা যেন একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছিল জীবনে। আপনজনের মাঝেও এই বিবিজতা তাকে দংশন করতে থাকে। মনজুড়ে একটিই আকাঙ্ক্ষা। নারীর এই পতনকে, একাকীত্বকে, ইতিহাসহীনতাকে লিখতেই হবে। মেয়েদের অবস্থানকে খুঁজতে চাওয়ার এই আর্তি বিধবা জ্যোতির্ময়ীকে বিত্তের মুখে নিমগ্ন হতে দেয়নি। তা কেবলই মনের মধ্যে কিছু পরিপ্রস্নের জন্ম দিয়েছে – “মেয়েদের দাম শুধু তাকে

একজন মানুষের দরকারে ? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই ? দরকার নেই ? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনও সে মানুষ হিসেবে পরিচিত হল না কেন ?”^২ তার থেকেই হাতে তুলে নিলেন কলম। একে একে লিখলেন জনপ্রিয়তম গ্রন্থ। ‘ছায়াপথ’ (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ), বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। সেই একা মেয়ের লড়াই সাহিত্যকে করে তোলে অনুসন্ধানী। নারীর এক দীর্ঘ ইতিহাস উঠে আসে তার সাহিত্যে। পণপ্রথা, কন্যাদায়, কালো মেয়ের বিবাহ, পতিতালয়ের নারীদের জীবন, প্রান্তিক সমাজে নারীর অবস্থান। ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে ওঠে তার রচিত সাহিত্য। সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তোলেন লেখিকা।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম উপন্যাস ‘ছায়াপথ’ (১৩৪১ বঃ)। বাঙালি সমাজ ও পরিবারের একেবারে চেনা একটি সমস্যা এই উপন্যাসের বিষয়। পণপ্রথার ঘৃণ্যতা ও কন্যাদায়ের দুর্বলতা এই উপন্যাসের কাহিনিতে মিলেমিশে একাকার হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়া কোনোভাবেই পণ-প্রত্যাশী কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে উঠতে পারবে না। - একথা সে জানিয়ে দেয় দৃঢ়তার সঙ্গে। পুরুষকে প্রত্যয়ের সঙ্গে উপেক্ষা করতে সে পিছু হটে না। সাহসের সঙ্গে সে জানিয়ে দেয় বৌদিকে। - “আমাকে বাংলাদেশের পাত্রদের - সং পাত্রদের কনে দেখিয়ে বিয়ে দিতে আর পারবে না। আমার মনে হয়, যাদের সঙ্গে তোমরা আমাদের বিয়ে দাও, ওরা পুরুষ মানুষ নয়। ওরা মা’র কোলে জন্মায় বিয়ের পাত্র হয়ে, আর তারপরে হয় পিতা, অর্থাৎ পাত্র ও পিতা এই দুটো মাত্র অবস্থা ওদের, সুতরাং আমরাও থাকি পাত্রী, তারপর হই ছেলে বা মেয়ের মা। আমার পক্ষে ঐ ধরণের পাত্রীত্ব বা মাতৃত্ব দুয়ের একটাও আর সম্ভব হবে না। কেন না, আমি মন যোগাতে পারব না। আর তাছাড়া মানুষের মন যে এমন একটা জিনিস তা দেব কাকে? ওরা তো মনের কিছুই বোঝে না। নিজেদের মনের দারিদ্র্য এত বেশি যে, ধন দিয়েই ওরা তা পূর্ণ করতে চায়।”^৩ এই তীব্র অথচ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ-ই জ্যোতির্ময়ীর নারীদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সুপ্রিয়া তাঁর নারীসত্তাকে কিন্তু অস্বীকার করেনি। শেষাবধি দাদার বন্ধু বিভাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছিল। বিয়ে করেছিল সুপ্রিয়া বিভাসকেই। কিন্তু বিয়ের পরেও সে তার নিজস্ব চিন্তায় স্থির দাঁড়িয়েছিল। একদিকে বিবাহিত স্বামী বিভাসের দাবি আর অন্যদিকে নারীর নিজস্ব ভুবন গঠনের তীব্র জেদ এই দুয়ের সংকট তৈরি হয়েছিল। দূর প্রবাসে তার শিক্ষকতার চাকরি সে ছাড়তে রাজি নয়। কিন্তু স্বামী বিভাসের কাছে এ ছিল, সুপ্রিয়ার অনর্থক বিদেশ-বাস। বিভাসের মনে হয়েছিল, সংসারের কারণে সুপ্রিয়ার উপার্জিত অর্থের কোনও প্রয়োজন নেই ; তাই সুপ্রিয়ার কাছে তার দাবি হয়েছিল তীব্র। এতকিছুর পরেও সুপ্রিয়ার সিদ্ধান্ত বদলায়নি। সুপ্রিয়া ও বিভাসের সম্পর্কের মাঝে যে অস্পষ্টতা দানা বেঁধেছিল, তা পরিষ্কার হবে উপন্যাসের এই অংশটুকু তুলে ধরলে -

“সুপ্রিয়া আরও একটু আশ্চর্যভাবে বললে, ‘তার মানে তোমার দরকার আর তোমার মতই আমাকে মানতে হবে, এই তো ?

অদ্ভুত উত্তরে বিভাসও আশ্চর্য হয়ে গেলেন, বললেন, না তা নয়। যাক আমি তর্ক করব না।’

দুজনেই চুপ করে রইল। খানিক পরে বিভাস বললেন, ‘শোবে?’

ও বললে, ‘শোব’খন, এখন পড়ব।’

বিভাসের মনে হল এই লেখাপড়ার ফল। নিরর্থক স্বাতন্ত্র্যবাদ ! সুপ্রিয়ার মনে হল, এই বিয়ের অর্থ ! এই মেনে চলা ! ওর প্রয়োজন ওর মত কিছু নয়, বিভাসের সব !”^৪

শেষপর্যন্ত ভালোবাসার দাবি নিয়ে বিভাস সুপ্রিয়াকে আদরের ঢঙে আবারও আক্রান্ত করতে চায়। হয়তো সুপ্রিয়া খানিকটা গলেছিল, যখন সে বিভাসকে বলতে শুনেছিল – বিশ্বের লোক দেখবে শুধু মেয়েরাই স্বামীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকে না, পতিপ্রাণ হয় না, ছেলেরাও হতে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিভাসের উক্তি এটা স্পষ্ট করেছিল যে, পুরুষ যখন আপন শক্তিতে নারীকে বশে আনতে পারে না, তখন সে আশ্রয় নেয় ছলনার। চাকরিতে জবাব দেওয়ার চিঠি সুপ্রিয়া যাতে জমা দেয়, তার জন্য বিভাস মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতে রাখে – “সত্যি বলছিলাম। বিশ্বাস করবে না ? আচ্ছা, তাহলে ওসব থাক। কিন্তু কাল চলো দুজনে তোমার ওখানে গিয়ে একটা ইন্তফার চিঠি দিয়ে তারপর মার কাছে যাবো। যাবে ?”^৫ বিভাসের এই কাতর আবেদন সুপ্রিয়া মেনে নিলে, তা হত নারীভাবনার আরেক দিক। বিভাসের এই প্রত্যাশী আবেদন সুপ্রিয়া অস্বীকার করলে – তা নিশ্চিতভাবে নারীভাবনার পৃথক অভিমুখকে চিহ্নিত করতে পারত – কিন্তু এর কোনোটিই হল না। আবেদনের ঢঙে এক প্রশ্ন দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়ে গেল। আর লেখিকা পরিশেষে অংশে বিভাস সুপ্রিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে বললেন – “অখন্ড সুরভিত অন্ধকার, স্নিগ্ধ শ্রাবণ ওদের বেষ্টন করে আছে।”^৬ লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী এখানে থামলেন। এক মুক্ত পরিসরের মুখোমুখি করলেন পাঠককে। পুনশ্চ, এককথায় বলতে হয়, নারী – পুরুষের সম্পর্কের সহজতা প্রাপ্তির পথ তখনও বহুদূর। ‘যেন স্নিগ্ধ শ্রাবণের পাশে’ সুরভিত অন্ধকারের এক শূন্য সম্পর্কের নাম ‘স্বামী-স্ত্রী’। এই সম্পর্কে সামাজিকতার নিরিখে, পারিবারিকতার নিরিখে প্রশ্নহীনভাবে মেনে না নেওয়ার মধ্যেই নারীর নিজস্বতা। ততক্ষণ এ লড়াই, অবিশ্বাস, পুরুষের প্রতি জারি থাকবে, যতক্ষণ না এ সম্পর্ক হয়ে উঠছে ‘জলবৎ তরলং’।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’ (১৩৫৫ বঃ) ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বকে প্রেক্ষাপটে রেখে লেখা হয়েছে। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস কীভাবে ভারতবর্ষের মূল স্রোতের ইতিহাসের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, তাই লেখিকা জ্যোতির্ময়ী এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে দুটি ঘটনা – এক, একান্নবতী পরিবারে অবহেলায় নীতিশের বড়ো হয়ে ওঠা। দুই, অপর একটি পরিবারে ঘটনাক্রমে সেটি আবার ব্রাহ্মণ পরিবার কালো মেয়ে বীণার অস্বীকারে, উপেক্ষায় বড় হয়ে ওঠা। প্রথম কাহিনিটিতে, নীতিশের প্রতি পরিবারের অবহেলার অন্যতম প্রধান কারণ তার মা-বাবা না থাকা। যার ফলে সে শৈশবেই হারিয়েছিল সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার মানসিক জোর। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। যদিও উচ্চবিত্ত পরিবারে তার জন্ম, তবুও মেধাবী নীতিশের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণ সম্ভব হয়নি। উল্টোদিকে ঐ একই পরিবারে তার জ্যাঠাভূতো ভাই অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন হয়েও বিলাত যাত্রার সুযোগ পেয়েছে। নীতিশকে হারাতে হয়েছে তার বাগদত্তাকে বিবাহের অধিকারও। কন্যার পিতা মেধাবী নীতিশের পরিবর্তে মেধাহীন বিলেত ফেরত তার ভাইকেই সুপাত্র হিসেবে ভরসা করেছে বেশি। কাহিনির মোড় এ জাতীয় নাও হতে পারত, যদি নীতিশের মা বেঁচে থাকতেন। মায়ের কাছে যে আশ্রয়ের নিশ্চিন্তকরণ থাকে, মা – যাকে ভরসা করা যায়, মা – যিনি আগলে রাখতে জানেন – সেই মায়ের অভাবই নীতিশকে এই পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। লেখিকা ইঙ্গিতে মধ্যবিত্ত

পরিবারের ‘সামন্ত’ মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন। সম্পত্তি বিবর্জিত নীতিশের মূল্য এখানে শূন্য।

দ্বিতীয় কাহিনিতে ব্রাহ্মণ পরিবারের বীণা, তার নিজের পরিবারেই নির্যাতিতা। গায়ের রং কালো হওয়াটা যে অপরাধ, বীণাকে তা ভাবতে বাধ্য করেছে তার পরিবার। স্ব-উপার্জনের রাস্তায় বীণা আজ অধ্যাপক। একদিকে মেধাহীন পুরুষের জয়-জয়কার আর অন্যদিকে মেধাবী বীণার প্রতি পুরুষতন্ত্রের সংগঠিত প্রবঞ্চনার ইতিহাস উপন্যাসে পাশাপাশি প্রবাহিত হতে দেখি। অধ্যাপিকা বীণার মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাই আমরা। “একটা কালো কুৎসিত মেয়ে যদি প্রফেসর হয়, তার দাম কিন্তু বিয়ের বাজারে কম হয় না। দামটা কিসের ? টাকার তাহলে কি নয় ? একটা ছেলে প্রফেসরের টাকা আর মেয়ে প্রফেসরের টাকার দামের তফাতটা কি?”^৭ যদিও উপন্যাসে বীণা ও নীতিশের একই পরিণতি হয়েছিল। দু’জনে যোগ দিয়েছিল মাহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি অভিযানে। যারা ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতার হননকে নিদারুণ ভাবে প্রত্যক্ষ করেছে, তারা কী করে ভাব কল্পনার সুরমূর্ছনায় গা ভাসিয়ে দিতে পারে ? দেশের স্বাধীনতার লড়াই-এ তাদের এই অংশীদারিত্ব নিজের নিজের অস্তিত্বকে যেন জিতিয়ে দিতে চায়। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তির এই স্বাধীনতা স্পৃহা একসূত্রে গেঁথে দেন লেখিকা। কিংবা তাত্ত্বিক অবস্থানের দিক থেকে বলা যেতে পারে ‘ব্ল্যাক-ফেমিনিস্ট’দের অনেক আগেই ‘কৃষ্ণকলি’ দের এই দেশে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে এও এক মানবিক তত্ত্ব।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’য় (১৩৭৪ বঃ) আবার দেখি, নারীর এক অন্য পরিসরকে। আসলে তাঁর সৃষ্ট মেয়েরা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান এবং চৈতন্য দিয়েই বারবার এই সমাজ ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী। দেশভাগের বিষম্বতায় যখন আক্রান্ত হয়েছে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই, তখনই এই উপন্যাসের নায়িকা বালিকা সুতারাকে দেখি ঘর ছাড়া হতে। দাঙ্গা মিটেছিল, দেশভাগ হয়েছিল, দেশ স্বাধীনও হয়েছিল কিন্তু সুতারা ঘরে ফিরলেও ঘর তাকে আর মেনে নেয়নি। একলা সুতারা লড়াই সংগ্রাম করে, দীর্ঘদিন একা পথ চলে, অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখন সে ইতিহাসের অধ্যাপক। আসলে দেশভাগ শুধু দেশের ভূগোলকেই ভাগ করেনি। শিশু ও নারীর উপর তার চূড়ান্ত নেতিবাচক বলা ভালো, ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। আলোচ্য উপন্যাসে দেশভাগ-তাড়িত পাঞ্জাবের নির্যাতিতাদের কাহিনি উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। সুতারা ঘরে ফিরতে চেয়েও ফিরতে পারেনি। এক জীবনে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে, পুরুষের একরোখা অপশাসনকে। যে সমাজ, যে পুরুষ তাকে দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই সমাজ, সেই পুরুষ ধর্ম রক্ষা করতে না পারার দায়ে তাকে সমাজ-পরিবার বিমুক্ত করতে বাধ্য করে। তার অপরাধ ‘শয়তানে’র হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এক মুসলমান পরিবারে আশ্রয় নেওয়া। হিন্দু সমাজপতিরা একেই ‘মুসলমান-ছোওয়া’ আখ্যা দেয়। বাবা-মা-দিদিকে এক রাতে চোখের সামনে খুন হতে দেখা মেয়েটি যখন দাঙ্গা পরবর্তীতে কলকাতায় দাদার শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় নেয়, তখনও সেই বাড়ি থেকে সে একরাশ ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পায়নি।

সুতারা যে ঘরে ফিরতে চেয়েছিল, সেই ঘর আর তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ছোট সুতারা যে ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় দাদাদের কাছে ফিরেছিল, সেখানে এসে সে প্রতি পদে পদে বুঝতে পারে এই ঝুঁকি তাকে সারা জীবন নিতে হবে। ছোট সুতারা জীবনের এই অংশকালীন অভিজ্ঞতায় দ্রুতই বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার একক লড়াই আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এই ভাবে দেশ কাল রাজনীতির সঙ্গে নারীর অস্তিত্ব রক্ষার

লড়াইকে একসূত্রে বিশ্লেষণ করেন লেখিকা। মেয়েদের এই দৈন্য অবস্থার পিছনে ইতিহাসের এই নিরিথকে অস্বীকার করলে বড়ো ভুল হবে। দেশ তো ভাগ হল। পরস্পর দু-পক্ষই নিজেদের প্রাপ্য ভূগোল পেল, কিন্তু সেই ভূগোল কি মেয়েদের নিজস্ব ভুবনকে গড়ে তুলতে দিতে চায়? বোধ হয় না। সেখান থেকেই শুরু হয় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। সেখানেই সুতারাদের অবদান। যে দেশ-কাল-সমাজে এক সময়ে মেয়েরা পুনর্জন্মে মেয়ে হয়ে জন্মাতে চাইত না, সমকালীন সময়ের ইতিবাচক উত্তরণে লেখকের সৃষ্ট মেয়েরা নিজের একক অস্তিত্বে বলীয়ান হয়ে উঠতে চায়, অন্তত লড়াইয়ের মানসিকতা থেকে বোধা যায়, সে যুগে নিতে চায় নিজের অধিকার।

তথ্যসূত্র:

- ১। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদনা), ২০১৪, *কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক*, কলকাতা, আশাদীপ, পৃঃ ২৩
- ২। তদেব, পৃঃ ২৪
- ৩। ঘোষ, গৌরকিশোর (সম্পাদনা), ১৯৯১, *জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ৩*, কলকাতা, দে'জ, পৃঃ ৫৮
- ৪। তদেব, পৃঃ ৭৩
- ৫। তদেব, পৃঃ ৭৮
- ৬। তদেব, পৃঃ ৭৮
- ৭। তদেব, পৃঃ ৬০।

রাসেলীয় দৃষ্টিতে ‘শব্দ’ : একটি অনুধান

মৃন্ময় ঢালী

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, হাওড়া, বেলুড় মঠ

সারসংক্ষেপ: বার্ট্রান্ড রাসেলের (১৮৭২ - ১৯৭০) দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ‘শব্দ’র ধারণার দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। ভাষার ভিত্তি হিসেবে শব্দ কেবল ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং তা সত্য-মিথ্যার নিরূপণ ও অধিবিদ্যাগত সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত একটি মৌলিক উপাদান। প্রবন্ধটিতে শব্দের চারটি প্রকার—উচ্চারিত, শ্রুত, লিখিত ও পঠিত—উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে, কীভাবে শব্দকে একটি ‘সার্বজনীন শ্রেণি’ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। রাসেল ভাষার গঠনগত জটিলতাকে উপলব্ধি করে যুক্তি দেন যে, দার্শনিক সমস্যাগুলোর শিকড় ভাষাগত বিভ্রান্তিতে নিহিত, এবং শব্দের যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা সমাধান সম্ভব। ভাষার মৌলিক শব্দসমূহ—যেমন বস্তুশব্দ—দ্বারা অর্থের নির্মাণ ও অনুরণন কীভাবে ঘটে, তা এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়াও, শব্দের ব্যবহারিক দিক—যেমন নির্দেশমূলক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তাঁর বিশ্লেষণে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। ফলে, এই প্রবন্ধটি মূলত শব্দের দার্শনিক ভিত্তি, তার গঠন ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করে ভাষা ও দর্শনের আন্তঃসম্পর্ককে নবরূপে সুসজ্জিত করতে সহায়তা করে।

সূচক শব্দ: শব্দ, উচ্চারিত শব্দ, শ্রুত শব্দ, লিখিত শব্দ, পঠিত শব্দ, নির্দেশমূলক শব্দ।

মূল আলোচনা:

‘শব্দ’ কী? এই প্রশ্ন দর্শন থেকে পদার্থবিদ্যা সর্বত্রই ঘুরপাক খায়। তবে দর্শনশাস্ত্রে ‘শব্দ’ বলতে বোঝায় ‘Word’ -কে। আর পদার্থবিদ্যায় শব্দ বলতে বোঝায় ‘Sound’ -কে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা দর্শনশাস্ত্রের ‘শব্দ’ -কে নিয়েই আলোচনা করবো। ছোটবেলা থেকেই আমরা শব্দের মাধ্যমে আমাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করি আমাদের বিশ্বকে। এই বিশ্ব একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিশ্ব। যেই বিশ্বে আফালন শুধুমাত্র আমার একার। ছোটবেলায় যখন কোন শিশু কিছু ইঙ্গিত করে তখন সেই ইঙ্গিতের অর্থ সেই কেবল বোঝে। সেখানে থাকে তার মনের অনাবিল আনন্দ ও বেদনা। আবার যখন আমরা কথা বলতে শিখি তখন শব্দের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাবকে বুঝিয়ে থাকি। সুতরাং এ কথা আমরা বলতেই পারি যে আমাদের ভাব প্রকাশের প্রথম একক হল ‘শব্দ’। শব্দ নিয়ে বৈয়াকরনিকদের আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল যেখানে বৈয়াকরনিকরা শব্দ নিয়ে এত আলোচনা করেছেন বা করে চলেছেন, সেখানে দর্শনশাস্ত্রের শব্দ নিয়ে আলোচনা করতে হবে কেন? সত্যি কথা বলতে কি এই কথাটা দর্শনশাস্ত্রের বিশেষত পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের প্রাচীন এবং আধুনিক কোন আলোচনাতেই বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু ঊনবিংশ বিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক দর্শন এবং বিশ্লেষণী দর্শনের মধ্যে শব্দের আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল। এই পর্বের দার্শনিকরা মনে করতেন যে দার্শনিক যত সমস্যা রয়েছে তার প্রধান কারণ হল ভাষাগত সমস্যা। ভাষাকে যদি আমরা একটা উপযুক্ত দার্শনিক প্রেক্ষিতে সংযোগ ঘটাতে পারি তবেই দার্শনিক সমস্যাগুলোর সমাধান হবে। ভাষা গড়ে ওঠে শব্দের মাধ্যমে। তাই ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হলে

শব্দের ব্যবহার উপযুক্ত হতে হবে। শব্দের যদি উপযুক্ত ব্যবহার হয় তাহলে গড়ে উঠবে প্রকৃত ভাষা। আর ভাষায় দ্বারাই প্রকাশ পাবে ‘অর্থবোধকতা’। এই অর্থবোধকতাই প্রকাশ করবে সত্যতাকে। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের কোন একটিকে বাদ দিলে বৃত্তি সম্পন্ন হবে না। এই বৃত্তির সম্পূর্ণতার কথা যারা অনুভব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ভাষা দার্শনিক বার্টেন্ড রাসেল (১৮৭২ - ১৯৭০)। তিনি তার “An Inquiry into Meaning and Truth” গ্রন্থে শব্দ কি তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব শব্দ কীভাবে সত্যতা বা মিথ্যাত্বের পর্যায়ে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে যা দিয়ে আমরা সমাধান করতে পারি দার্শনিক সমস্যাগুলোকে। এই সমস্যাগুলো মূলত জগত অতিরিক্ত কোন সত্তার অস্তিত্বমূলক সমস্যা ইত্যাদি। সহজ করে বলা যায় অধিবিদ্যাক সমস্যা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে অধিবিদ্যা বলতে কি বোঝায়? প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বিশেষত অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয় হিসেবে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনাকেই নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে চার্চের প্রভাবে অধিবিদ্যার আলোচনা ক্রমশ বৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকে সড়ে এসে তা পর্যবসিত হয়েছিল ঈশ্বর, আত্মা এবং অমরত্বের ধারণায়। পশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে স্মরণীয় দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট অধিবিদ্যা সম্পর্কিত এই প্রচলিত ধারণাকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিকরা জগত অতিরিক্ত কোন সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেননি। অর্থাৎ পরমসত্তার অস্তিত্বকে নস্যাৎ করেছেন। রাসেল আমাদের এইরকম রহস্যময় জগত থেকে আমাদের মুক্ত করতে চেয়েছেন। কেননা এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে ভাষাগত জটিলতার কারণেই। তাই তিনি এই ধরনের বিষয় স্বীকৃতি করণ সমস্যাগুলোরই সমাধান করতে চেয়েছেন। বলা যায় শব্দের দ্বারা তিনি ভাষার মধ্যে থাকা জট কে খুলতে চেয়েছেন। যদি জট না খুলতে পারি তাহলে সেগুলি বোতলে বন্দি করা মাছির মতো হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে দর্শন হয়ে যাবে অতি জাগতিক দূর্বোধ্য কোন বিষয়। ভিটগেনস্টাইনের ভাষায়, “What is your aim in philosophy?—To shew the fly the way out of the fly-bottle”.^১

প্রাচীনকাল থেকে যেসকল ঐতিহাসিক নথি আমাদের কাছে রয়েছে, তার ভিত্তিতে শব্দ হল কুসংস্কারপূর্ণ ভয়ের বস্তু। কোন ব্যক্তি যদি তার শত্রুর নাম জানত, সে শব্দের মাধ্যমে তার উপর জাদুকরী ক্ষমতা অর্জন করতে পারত। আমরা এখনও নাম ব্যবহারের নিয়মের মতো বাক্যাংশ ব্যবহার করি। কেননা সৃষ্টির আদি থেকে শব্দ ছিল, এই বক্তব্য মেনে নেওয়া সহজ। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ B.C.E.) ও কারনাপের (১৮৯১-১৯৭০) দর্শন এবং তাদের মধ্যবর্তী বেশিরভাগ অধিবিদ্যারই ভিত্তি গঠন করে। ভাষাকে বোঝার আগে, আমাদের এর রহস্যময়তা ও ভীতিপ্রদ গুণাবলী গুলি থেকে মুক্ত করতে হবে। এই প্রবন্ধে মূলত আমরা এটি আলোচনা করবো।

শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করার আগে, প্রথমে শব্দগুলোকে সংবেদ্য জগতের (sensible world) ঘটনাস্বরূপ বিবেচনা করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ চার ধরনের হতে পারে: উচ্চারিত শব্দ (spoken word), শ্রুত শব্দ (heard word), লিখিত শব্দ (written word) এবং পঠিত শব্দ (read word)। বস্তুগত দিক থেকে সাধারণ ধারণা গ্রহণ করা ক্ষতিকর নয় বলে মনে করেন রাসেল, কারণ আমরা সহজবোধ্য ভাষায় বলা বিষয়গুলোকে যে কোনো দার্শনিক ভাষায় রূপান্তর করতে পারি। সুতরাং, লিখিত এবং পাঠিত শব্দগুলিকে একত্রিত করা সম্ভব, এবং প্রতিটির জন্য একটি বস্তুগত উপাদান গঠন করা সম্ভব। রাসেল

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বাখ্যা করেছেন। যেমন- অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক অটো নিউরাথ বলেছেন, একটি কালির স্তূপ (a mound of ink) এই বাক্যটিকে এই ভাবে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে লিখিত বা মুদ্রিত শব্দ হিসেবে গণ্য হয়। লেখার এবং পড়ার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এ সম্পর্কে প্রায় সবকিছুই বলা যেতে পারে বক্তৃতা ও শ্রবণের পার্থক্যের আলোচনার মাধ্যমে।

যেমন একটি শব্দ নেওয়া যেতে পারে, যেমন- ‘গবয়’। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ‘গবয়’ শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে, শুনতে পারে, লিখতে পারে বা পড়তেও পারে। অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তি কোনো শব্দ উচ্চারণ করে, রাসেল তাকে বলবেন মৌখিক উচ্চারণ। যখন কেউ কোনো শব্দ শোনে, রাসেল তাকে বলবেন মৌখিক শব্দ এবং একটি শব্দ যখন লেখা বা মুদ্রিত হয়, সেই বস্তুগত রূপটিকে তিনি বলবেন মৌখিক আকৃতি। এটা অবশ্য সুস্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে, মৌখিক উচ্চারণ, মৌখিক শব্দ এবং আকৃতিগুলি অন্যান্য উচ্চারণ, শব্দ এবং আকৃতির থেকে মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পৃথক করা সম্ভব। তবে তিনি এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেননি বরং তিনি সংবেদ্য জগতে অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আমরা যে ‘গবয়’ শব্দটি উচ্চারণ করছি তা কোনো একক সত্তা নয়; এটি জিহ্বা, গলা এবং স্বরযন্ত্রের অনুরূপ সংযোগের একটি শ্রেণি। ঠিক যেমন ভাবে বাঁপ দেওয়া এক ধরনের শারীরিক ক্রিয়া, হাঁটা আর এক ধরনের শারীরিক ক্রিয়া, তেমনি উচ্চারিত শব্দ ‘গবয়’ তৃতীয় আর এক ধরনের শারীরিক ক্রিয়া, যা আগের দুটি থেকে আলাদা। এখানে ‘গবয়’ শব্দটি একটি সার্বজনীন ধারণা, কেননা গবয় নিজেও একটি সার্বজনীন শ্রেণি। আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে, একই শব্দ ‘গবয়’ দু-বার ভিন্ন পরিস্থিতিতে উচ্চারণ করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা একই শ্রেণির দুটি পৃথক উদাহরণ উচ্চারণ করি, ঠিক যেমন আমরা যখন দুটি আলাদা গবয় দেখি, তখন একই শ্রেণির দুটি পৃথক উদাহরণ দেখি। সুতরাং, যুক্তিগত অবস্থানের দিক থেকে গবয় এবং শব্দ ‘গবয়’ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; উভয়ই সাধারণ ধারণা এবং উভয়ই কেবল নির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিদ্যমান। ‘গবয়’ শব্দটি এক ধরনের মৌখিক উচ্চারণের শ্রেণি, যেমন গবয় এক ধরনের চতুষ্পদ প্রাণীর শ্রেণি। ঠিক একই ধরনের ব্যাখ্যা শ্রবণযোগ্য শব্দ এবং লিখিত শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রাসেল বলেন, “it may be thought that I have unduly emphasized a very obvious fact in insisting that a word is a universal.”^২ অর্থাৎ, এমন হতে পারে যে আমরা শব্দকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি সেটি একটি অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণার ফলে সেটি সার্বজনীন ধারণায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটি অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা রয়েছে, অর্থাৎ আমরা অসতর্ক ভাবে একটি শব্দকে একক বস্তু হিসেবে কল্পনা করি এবং যুক্তি দেই। যদিও অনেক গবয় রয়েছে, কিন্তু একটি মাত্র শব্দ ‘গবয়’ তাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। এখান থেকেই আমরা ভাবতে শুরু করি যে সমস্ত গবয়ের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা ‘গবয়ত্ব’ রয়েছে, যা আসলে ‘গবয়’ শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং এখান থেকেই আমরা প্লেটোর ছায়ার জগতে বিশ্রামরত গবয়র ধারণায় পৌঁছে যাই। অর্থাৎ বাস্তবে যা রয়েছে তা হলো কয়েকটি কমবেশি অনুরূপ শব্দ, যা কয়েকটি কমবেশি অনুরূপ চতুষ্পদ প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যখন আমরা উচ্চারিত শব্দ গবয়কে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করি, তখন দেখি যে, আমরা তা ইচ্ছার বিবেচনা ছাড়া করতে পারি না। কিছু মানুষ ডগ (Dog) এর পরিবর্তে ডগ্ (Dowg) উচ্চারণ করে, তবু

আমরা বুঝতে পারি যে তারা কুকুরকে (Dog) বোঝাতে চেয়েছে। একজন জার্মান হয়তো ‘Dok’ উচ্চারণ করবেন; তবে আমরা বুঝতে পারি যে তিনি ‘Dog’ শব্দটির একটি রূপ উচ্চারণ করেছেন, যদিও একজন ইংরেজ যদি একই শব্দ করতেন, তবে তা dock বা জাহাজঘাট শব্দের উদাহরণ হতো। ঠিক যেমন দেশভেদে উচ্চারণ আলাদা হয় ফলে তার অর্থও আলাদা হয়, আবার একই রকম ভাবে লিখিত শব্দের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিষয় প্রযোজ্য, বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তির হাতের লেখা খুব খারাপ হয়। সুতরাং, একটি শব্দের একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণ বা আকৃতির সাথে মিল থাকা অপরিহার্য, তবে এটি যথেষ্ট নয়, কেননা উচ্চারণ বা আকৃতির সাথে সাদৃশ্যের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। শব্দ, প্রকৃতপক্ষে, একটি পরিবার, যেমন গবয় একটি পরিবার, এবং যেমন বিবর্তনের পথে গবয় ও গরুর মধ্যে কিছু অস্পষ্ট মধ্যবর্তী স্তর ছিল, তেমনই শব্দগুলির ক্ষেত্রেও কিছু অনির্দিষ্ট মধ্যবর্তী স্তর আছে।

এই দিক থেকে মুদ্রণ খুবই সুবিধাজনক। যদি ছাপার কালি অস্পষ্ট না হয়, তাহলে সাধারণ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন ব্যক্তির পক্ষে নির্ধারণ করা কঠিন নয় যে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ‘গবয়’ শব্দটি মুদ্রিত হয়েছে কি না। প্রকৃতপক্ষে, মুদ্রণ এমন একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যা এই শ্রেণীবিভাগের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতাকে সহজ সরল করতে তৈরি করা হয়েছে। ধরাযাক ‘A’ অক্ষর অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, এবং প্রতিটি ‘B’ অক্ষর থেকে ‘A’ অক্ষরটি অনেকটাই ভিন্ন। কালো কালি দিয়ে সাদা কাগজে ছাপানোর ফলে প্রতিটি অক্ষর তার পটভূমি থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে একটি মুদ্রিত পৃষ্ঠায় পৃথক ও সহজে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় প্রতিটি অক্ষরকে।

উচ্চারিত শব্দ, শ্রুত শব্দ বা লিখিত শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ক্রিয়া তা শব্দ বা আকৃতির থেকে ভিন্ন, কারণ এদের প্রতিটির অর্থ থাকে। এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে অর্থবোধক হয়—যেমন ‘অথবা’, ‘তবে’, ‘যাই হোক’—এই ধরনের শব্দগুলি একাকী অবস্থান করতে পারে না, কারণ তারা একক অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। কেননা এগুলো কোন বাক্যের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে বাক্যগুলোকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। অর্থাৎ আমরা অর্থের ব্যাখ্যা এই শব্দগুলোর মাধ্যমে শুরু করতে পারি না, কারণ এগুলো অন্য শব্দগুলোর উপর নির্ভর করে। তবে এমন কিছু শব্দ আছে—যেগুলো সাধারণত শিশু প্রথম শেখে—যেগুলো স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা যায়: নির্দিষ্ট নাম, পরিচিত প্রাণীদের শ্রেণীবাচক শব্দ, রঙের নাম ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দকে আমরা বস্তুশব্দ বলি, এবং এই সকল শব্দ মিলে গঠন করে বস্তু-ভাষা। এই শব্দগুলোর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, এই শব্দগুলোর অর্থ বস্তুগুলোর সম্মুখ করণের মাধ্যমে শেখা যায় (বা শেখানো যায়), অর্থাৎ যে বস্তু বা শ্রেণিকে তারা বোঝায়, তার সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, এই শব্দগুলোর অন্য কোন পূর্বস্বীকৃতি শব্দগুলোর উপর নির্ভর করে না। তৃতীয়ত, এই শব্দগুলোর এক একটি সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে; যেমন কেউ ‘আগুন’ বলে চিৎকার করতে পারে, কিন্তু এই চিৎকার করা অর্থহীন হবে। শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার যে কোনো প্রচেষ্টা অবশ্যই এই ধরনের শব্দ থেকেই শুরু করতে হবে, কেননা শব্দের অর্থ যেমন সত্য ও মিথ্যা হতে পারে, আবার এই সত্য মিথ্যার ক্রম আছে, ঠিক তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমের কথা আছে।

শব্দ বহু ভাবে ব্যবহৃত হয়: গল্প বলার জন্য, অনুরোধ করার জন্য, আদেশ দেওয়ার জন্য, কল্পকাহিনীতে ইত্যাদি। তবে বস্তুযুক্ত শব্দের সবচেয়ে মৌলিক ব্যবহার হলো প্রদর্শনমূলক (demonstrative) ব্যবহার, যেমন— চোখের সামনে একটি শেয়াল দেখলে শেয়াল বলে চিৎকার

করা। এটা স্পষ্ট যে, ভাষা জানার অর্থ হলো শব্দগুলোর যথাযথ ব্যবহার করা এবং সেগুলো শোনার পর সঠিক প্রতিক্রিয়া দেখানো। একটি শব্দের অর্থ বলতে পারা যতটা জরুরি। ঠিক তেমনি একজন ক্রিকেটারের জন্য বলের গতিবিদ্যা সম্পর্কে গাণিতিক সূত্র জানা ততটাই জরুরি। প্রকৃতপক্ষে, অনেক বস্তুযুক্ত শব্দের অর্থ স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করাই কঠিন, কারণ ভাষা এদের মাধ্যমেই শুরু হয়। আমরা ‘লাল’ শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব কেবল তখনই, যখন আমরা কোন লাল রঙের বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করি। একটি শিশু ‘লাল’ শব্দটি বুঝতে পারবে, যখন শব্দটি শোনার সাথে সাথে সেই রঙের বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে; এবং সেই লাল শব্দটি যখন সে আয়ত্ত করেছে তখনই। যখন সে কোন লাল রঙের বস্তু দেখতে পায় এবং লাল বলতে পারে এবং তা বলার প্রবণতা অনুভব করে।

বস্তুশব্দ সম্পর্ক শেখার মূল প্রক্রিয়া এক বিষয়; আর ভাষার ব্যবহার, যখন তা পুরোপুরি আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন আরেক বিষয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনে, সমস্ত ভাষা—নামের উচ্চারণের মতো তা প্রকাশ্যভাবে না হলেও, ইচ্ছার দিক থেকে তা হয় আদেশসূচক হয়। যখন কোনো বাক্যকে নিছক একটি বিবৃতি বলে মনে হয়, তখন সেটির আগে ‘জেনে রাখো যে’ শব্দগুচ্ছ যোগ করা উচিত। আমরা অনেক কিছু জানি, কিন্তু শুধু কিছু বিষয়ই প্রকাশ করি; যেগুলো আমরা প্রকাশ করি, সেগুলোই আমরা শ্রোতাকে জানাতে চাই। যখন আমরা আকাশ থেকে একটি তারা খসা পড়তে দেখি তখন শুধুমাত্র ‘দেখো’ বলি, তখন আমরা আশা করি যে এই একটিমাত্র শব্দ পাশের ব্যক্তিকে সেটি দেখার সুযোগ দেবে। রাসেল বলেন, ধরাযাক যদি আমাদের কাছে একজন অবাস্তব অতিথি আসে, তাহলে তাকে লাথি মেরে সিঁড়ি থেকে নামিয়ে দিতে পারেন, অথবা আপনি বলতে পারেন চলে যাও। যেহেতু দ্বিতীয়টি কম পরিশ্রমসাধ্য, এবং যদি এটি সমান কার্যকর হবে, তাহলে সেটিই শ্রেয়।

সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে যখন আমরা কোনো শব্দ ব্যবহার করি, তখন সাধারণত তা শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে শব্দটি কোনো সংবেদী বা কল্পনাশক্তির দ্বারা উপস্থিত বস্তুকে নির্দেশ করে, বরং আমরা চাই যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষটি সেটি নিয়ে কিছু করুক। এটি একজন শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যখন সে ভাষা শিখছে, এবং এটি সবসময় প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও সত্য নয়, কারণ বিশেষ পরিস্থিতিতে শব্দ ব্যবহারের অভ্যাস স্বয়ংক্রিয় হয়ে যায়। রাসেল বলেছেন, যদি আপনি হঠাৎ এমন এক বস্তুকে দেখতে পান যাকে আপনি ভুলবশত মৃত ভেবেছিলেন, তাহলে হয়তো আপনি তার নাম উচ্চারণ করবেন, যদি সেই ব্যক্তি না হয় তাহলে অন্য কেউ তা শুনবে। তবে এমন পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ একটি বাক্যের অর্থের মধ্যে তিনটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান থাকে: প্রথমত, এটি উচ্চারণ করার পরিবেশগত কারণ, দ্বিতীয়ত, এটি শোনার ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, তৃতীয়ত, (উচ্চারণের কারণগুলোর অংশ হিসেবে) বক্তা আশা করে যে এটি শ্রোতার উপর প্রভাব ফেলবে।

সাধারণভাবে বলা যায়, ভাষা মূলত মানুষের দ্বারা তৈরি শব্দসমূহের সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য সকল ব্যক্তি মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে উৎসাহিত করা। তবে এটি ভাষার নির্দেশমূলক, তথ্যবহুল ও ঘোষণামূলক মৌলিক ক্ষমতাকে প্রমাণ করে, এই কারণেই যখন আমরা কোনো বক্তব্য শুনি, তখন তা আমাদের এমন কিছু করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে যা বক্তা অনুভব করতে পারে, কিন্তু শ্রোতা অনুভব করতে পারে না, অথবা যা বক্তা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে স্মরণ করছে। এক্ষেত্রে রাসেলের উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য, ধরাযাক যদি রাতে কোনো অতিথিকে আমরা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সময় বলি, এখানে দুটি ধাপ নিচে

নেমে যান, তবে এটি তাকে এমনভাবে চলতে সাহায্য করবে যেন সে ধাপদুটি দেখতে পাচ্ছে। তবে এটি বোঝায় যে অতিথির প্রতি আপনার কিছু সদীক্ষা রয়েছে। বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য সব সময় তথ্য প্রদান করা নয়; তবে নঞর্থক অর্থে এটি প্রতারণার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ ভাষাকে যেন আমাদের চিন্তাগুলোর আড়ালের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাই যখন আমরা ভাষাকে তথ্য প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি, তখন আমরা নিঃশব্দে ধরে নিই যে বক্তার কিছু নির্দিষ্ট ইচ্ছা রয়েছে। তবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভাষা তথ্য প্রদান করতে পারে—এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ যে ভাষা মিথ্যা ভাষণ ও পরিবেশন বলতে পারে। যখন ভাষা সত্য বা মিথ্যা পরিবেশন করে, তখন এর উদ্দেশ্য শ্রোতার মধ্যে কিছু ক্রিয়া সৃষ্টি করা, যদি শ্রোতা একজন দাস, শিশু, বা কুকুর হয়, তাহলে সরাসরি আদেশসূচক বাক্য ব্যবহার করাই সহজতর হবে বলে মনে করেন রাসেল। তবে সত্য ও মিথ্যার কার্যকারিতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে: মিথ্যা কেবল তখনই কার্যকর হয়, যখন সত্যের প্রত্যাশা করা হয়। আসলে, কেউই কিছু শিখতে পারত না যদি সত্য বলা সাধারণ নিয়ম না হত। ধরাযাক মানব শিশু একটি কুকুরকে দেখলে, এবার এলোমেলোভাবে তাকে ‘বিড়াল’, ‘ঘোড়া’ বা ‘কুমির’ বলতে শেখানো হলে, তাহলে কেউই ‘কুকুর’ বলে তাকে প্রভাবিত করতে পারবেননা। তাই মিথ্যা বলা একটি গৌণ কার্যকলাপ, যা সত্য বলাকে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ধরে নেয়।

রাসেল আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, যদিও অধিকাংশ বাক্য আদেশসূচক হয়, তবে বক্তা শ্রোতাকে কর্মে উৎসাহিত করতে পারে কেবল তখনই, যখন বস্তুতে শব্দের ঘোষণামূলক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমি বললাম দৌড়াও, এবং কোন ব্যক্তি যদি সত্যিই দৌড়াতে শুরু করে; তাহলে এটি কেবল তখনই সম্ভব হয়, যদি এবং কেবল যদি ‘দৌড়ানো’ শব্দটি একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়াকে নির্দেশ করে। সামরিক প্রশিক্ষণে এটি সবচেয়ে সহজ রূপে দেখা যায় যেখানে শর্তযুক্ত প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলা হয়, যাতে নির্দিষ্ট একটি শব্দ command বা আদেশ সূচক শারীরিক আন্দোলন সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, যে সকল শব্দের বিষয়ে যেমন প্রশ্ন ওঠে ঠিক একই রকম ভাবে সকল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেও একই প্রশ্ন উঠবে। তবে যেসব শব্দ শারীরিক গতিবিধির নাম নয়, সেগুলোর সাথে কর্ম-প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সংযোগ কম।

রাসেল বলেছেন, “It thus appears that, while most sentences are primarily imperative, they cannot fulfil their function of causing action in the hearer except in virtue of the indicative character of object-words. Suppose I say "run!" and the person addressed consequently runs; this happens only because the word "run" indicates a certain type of action. This situation is seen in its simplest form in military drill: a conditioned reflex is established, so that a certain kind of noise (the word of command) produces a certain kind of bodily movement. We may say, in this case, that the kind of noise in question is the name of the kind of movement in question. But words which are not names of bodily movements have a less direct connection with action.”^৩

কেবল কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চারিত শব্দের অর্থ শ্রোতার উপর প্রত্যাশিত প্রভাবের সাথে একীভূত হতে পারে। আদেশসূচক শব্দ বা ‘দেখো’ এর মতো শব্দ এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যদি আমি বলি ‘দেখো, ওখানে একটা শিয়াল আছে’, তাহলে আমি কেবল শ্রোতাকে একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়ায় প্রভাবিত করতে চাই না, বরং আমি পরিবেশের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেও তাকে সেই ক্রিয়া করার একটি সুযোগ দিচ্ছি। আবার গল্প বলার ক্ষেত্রে, অর্থ ও উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত

প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র বাক্যেরই নির্দিষ্ট একটি লক্ষণ থাকে, কিন্তু অর্থ কেবল বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা বস্তুশব্দের (object-words) একটি স্বতন্ত্র অর্থ থাকে, যা বাক্যের মধ্যে তাদের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না। ভাষার সর্বনিম্ন স্তরে, বাক্য এবং একক শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এই স্তরে, একক শব্দ ব্যবহার করা হয় যেসব বস্তুকে সেই সকল বস্তু নির্দেশ করে সেগুলোর সংবেদনযোগ্য উপস্থিতি বোঝাতে। এই ধরনের ভাষার মাধ্যমেই বস্তুশব্দ তাদের অর্থ অর্জন করে, এবং এই স্তরের ভাষায় প্রতিটি শব্দই এক একটি বিবৃতি (assertion)।

রাসেল বলেন, “Anything going beyond assertions as to what is sensibly present, and even some assertions which do not do so, can only be effected by means of sentences; but if sentences contain object-words, what they assert depends upon the meaning of the object-words.”^৪

সুতরাং, যদি বাক্যের মধ্যে বস্তুশব্দ থাকে তাহলে সে বাক্য যা প্রকাশ করে তা নির্ভর করে বস্তুশব্দগুলোর অর্থের উপর।

আবার অন্যদিকে কিছু বাক্য থাকে, যেগুলোর মধ্যে কোনো বস্তুশব্দ থাকে না। এগুলো যুক্তিবিদ্যা এবং গণিতের বাক্য। রাসেল বলেন এক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত অভিজ্ঞতামূলক বাক্য বস্তুশব্দ যুক্ত, অথবা এমন অভিধানগত শব্দ প্রয়োগ করা যায়, যেগুলো বস্তুশব্দের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ফলে, অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুশব্দের অর্থ অত্যন্ত মৌলিক, কারণ এদের মাধ্যমেই ভাষা অ-ভাষিক ঘটনাসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যা ভাষাকে অভিজ্ঞতামূলক সত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করে।

সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে রাসেল তাঁর শব্দ সম্পর্কিত মৌলিক ভাবনার মধ্যে দিয়ে ভাষা দর্শনের ইতিহাসে এক বিপ্লব ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমেই তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন ভাষা দর্শনের বা বিশেষত বিশ্লেষণী ভাষা দর্শনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে। রাসেল শব্দের ধারণাকে কেবল ভাষাগত একক হিসেবে দেখেননি, বরং একটি দার্শনিক পরিকাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যেখানে শব্দের ব্যবহার, তার প্রেক্ষিত ও তাৎপর্য গভীর অর্থ বহন করে। শব্দ কেবল ভাব প্রকাশের উপায় নয়; বরং তা মানুষের জ্ঞানের কাঠামো, উপলব্ধি এবং সমাজিক যোগাযোগের একটি মৌলিক ভিত্তি। এই আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, শব্দের সাহায্যে আমরা কেবল বাস্তবতাকে উপলব্ধিই করি না, বরং তা নির্মাণ করি, ব্যাখ্যা করি এবং প্রয়োজন হলে তা পরিবর্তনও করি। রাসেলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দের এই গভীর, যুক্তিনিষ্ঠ এবং কার্যনিষ্ঠর ব্যাখ্যা আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভাবনার জগতে নতুন দিশা দেখায়। পরিশেষে বলা যায় কালিক বিচারে তা হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এক কালোত্তীর্ণ ভাষ্যতে।

তথ্যসূত্র:

- ১। Wittgenstein, Ludwig, trans. by Anscombe G.E.M., 1986, *Philosophical Investigations*, Great Britain, Basil Blackwell, পৃষ্ঠা ১০৩।
- ২। Russell, Bertrand, 1995, *An Inquiry into Meaning and Truth*, London, Routledge, পৃষ্ঠা ২৪।
- ৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২৮।
- ৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।

অপারেশন বর্গার প্রেক্ষাপটে অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ : লোকসংস্কার থেকে জনচেতনার উত্তরণ

সুতপা পাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)

সারসংক্ষেপ: অভিজিৎ সেন বাংলা কথাসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারার লেখক। লেখক জীবনের প্রথম থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মহাশ্বেতা দেবীর কাছে। সত্তর দশক থেকে তিনি লিখতে শুরু করলেও, সত্তর পরবর্তী সময়েই তাঁর কলম পূর্ণ গতি পেল ভাঙতে থাকা সমাজ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরতে। ব্যক্তিগত জীবনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরি করার সূত্রে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে তিনি বসবাস করতেন। ফলে সেখানকার গ্রামাঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্প-আখ্যানে উঠে এসেছে সেই সমস্ত নিম্নবর্গীয় ভূমিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সংকটের বাস্তব ছবি। তাঁর ‘দেবাংশী’ গল্পেও এক বিশেষ গোষ্ঠীর ভূমিজীবী মানুষের জীবনের বিশ্বাস, সংস্কার ও সংকটের ছবি ধরা পড়েছে। প্রবন্ধে লোকসংস্কার নির্ভর এই মানুষগুলির ভূমি সমস্যাকে কেন্দ্র করে সম্মিলিত প্রতিরোধ তথা প্রতিবাদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার চেষ্টা রয়েছে।

সূচক শব্দ: অপারেশন বর্গা, লোকসংস্কার, ভূমিজীবী, জোতদার, আদিয়ার, প্রতিবাদ, জনচেতনা।

মূল আলোচনা:

ভূমিজীবী মানুষ এবং নিপীড়িত ব্রাত্যজনের দুঃখ ক্লিষ্ট জীবনের কথাকার অভিজিৎ সেন। সত্তরের সময় থেকেই তাঁর বাংলা সাহিত্যে আগমন। যৌবনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে। নকশাল বিপ্লবীদের জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে তা বণ্টন করার প্রয়াসকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। তবে সত্তর দশকেই তিনি রাজনীতি ছেড়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগ দেন। এরপর সাতের দশকের শেষ পর্বে প্রশাসনিক হাতবদল ঘটে। সে সময় সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই দ্রুত বদল ঘটছে, তখন থেকে তিনি আরও জোরালোভাবে কলম ধরেন। সময়-সমাজ-রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে তিনি সাহিত্যে বুনতে শুরু করেন সমস্যা জর্জরিত মানব জীবনকে। তবে তাঁর বেশিরভাগ গল্পের কাহিনি নির্মিত জমিকেন্দ্রিক সমস্যাকে ঘিরে। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে জমির মালিক ও জোতদারদের শোষণ অত্যাচারের ছবিকেই তিনি তাঁর লেখনীতে বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাইলেন। আলোচনার আয়োজনে আনতে চাইলেন নিম্নবিত্ত ব্রাত্যজীবনকে, তাঁদের বিশ্বাস, সংস্কারকে। পেশাগত জীবনে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে চাকরির সুবাদে আটের দশক থেকে ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, বেনামি জমি উদ্ধার ও বণ্টন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিশেষত, গ্রামীণ অর্থনীতির বদল কেমন করে গ্রামের ভূমিজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনকে বদলে দিচ্ছিল তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী। সেইসঙ্গে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন গ্রামে গ্রামে প্রচলিত ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা এবং কর্মের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাঁর গল্পগুলিতে জমিকেন্দ্রিক সমস্যাকে ঘিরে ভূমিজীবী মানুষদের প্রতিবাদের এক অন্য রূপও ধরা পড়েছে। প্রবন্ধে এই জমি কেন্দ্রিক সমস্যাকে সামনে রেখে

তাঁর ‘দেবাংশী’ গল্পে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব নিম্নবর্ণীত লোকজীবনের বিশ্বাস-সংস্কারের ছবিটি কেমন? জানব কেমন করে লোকসংস্কার নির্ভর এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবাদী চেতনার সঞ্চার ঘটেছে।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার লোকজ সমাজের এক প্রাচীন বোধ-যা মানব সমাজে আবহমান কাল ধরে বয়ে চলেছে। মানুষ যখনই কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখনই মানুষের মনে বাসা বাঁধে ভয়, আর ভয় থেকেই তৈরি হয় নানান বিশ্বাস ও সংস্কার। মধ্যযুগে মানুষ জীবনের শুভাশুভের পিছনে কল্পনা করত দেবতার অনুগ্রহ কিংবা আত্মার ক্ষতিকর ক্রিয়া। এটা তারা কল্পনা করত সেই ভয়, বিশ্বাস বা কল্পনাপ্রসূত এক ধরনের যাদুবিশ্বাস থেকেই। আধুনিক সভ্য সমাজেও তার রেশ রয়েছে। আজও মানুষ দৈনন্দিন নানা কর্মে শুভাশুভ বিশ্বাস ও আচার-সংস্কার মেনে চলে। দেশ বা সমাজ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও সংস্কার আজও মানব সমাজের যেন সাধারণ সম্পত্তি। এসব লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার এমন এক বিষয়, যা যুক্তিতর্কের পরোয়া না করে আজগুবি ঘটনা ও কার্যকারণবিহীন বক্তব্যের মাধ্যমে লোকসমাজের অন্ধ আনুগত্যে বংশ পরম্পরায় টিকে রয়েছে। লোকসংস্কার ও বিশ্বাসকে গ্রামের মানুষেরা আসলে নিজেদের সংস্কৃতি বানিয়ে ফেলেছে। ফলে বিপদে-আপদে, অমঙ্গল দূরীকরণে মানুষজন সাধু-সন্তের দ্বারস্থ যেমন হয়, তেমনই দেবদেবীর কাছে মানত করে সংকট সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে মানসিক শান্তিও পায়। বন্যা, খরা কিংবা শিলাবৃষ্টি থেকে ফসল রক্ষা, বহু নারীর সন্তান কামনা, স্বামীকে বশে আনা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক চলাফেরায় নানা সমস্যার সমাধান লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস অনুযায়ীই গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় মানুষজন করে থাকে। মূলত লোকবিশ্বাস হলো মানসিক বিষয়। যতক্ষণ তা মানুষের কাজ-কর্মে প্রতিফলিত না হয়, ততক্ষণ তা বিশ্বাসের পর্যায়ে থাকে। কিন্তু মানুষের কাজে, কর্মে, অভিযুক্তিতে বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটলে তা হয়ে যায় লোকাচার-লোকসংস্কার। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কোনো না কোনোভাবে মানুষের জীবনকে শাসন করে এই লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার। লোকবিশ্বাস বেশির ভাগই হয়ে থাকে ধর্মানুভূতি নির্ভর। আর মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রধানত প্রকাশ পায় পূজো, আচার-অনুষ্ঠানে, লোকজ সংস্কারে। লোকাচার লোকজীবনের আজন্ম প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অঙ্গ – অভ্যাসগত বিধি-বিধান, আচার- আচরণ, রীতিনীতি, যা অবচেতন মনে লুকিয়ে থেকে মানুষের প্রত্যাহিক কর্মকে প্রভাবিত করে। মানুষের দেবাংশী হওয়া বা মানুষের শরীরে দেবতার ভর হওয়া এমনই এক লোকবিশ্বাস, যা গ্রামীণ মানুষের সমস্যাবহুল জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এবং ধীরে ধীরে এই সংস্কার মানুষের অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত হয়।

এই ‘দেবাংশী’ শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বরের অংশ। লোকায়ত সংস্কার অনুযায়ী দেব শক্তি যার উপরে ভর করে বা যার শরীরকে আশ্রয় করে সাধারণ মানুষকে সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় বলতে দেববাণী হয়, সেই-ই দেবাংশী। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে মানব শরীরে দেব-দেবী বা আত্মার ভর হওয়ার ধারণা বহু যুগ থেকেই প্রচলিত। ব্যক্তির শরীরে এই ‘ভর’ হলে তার আচরণ ভাষা বা মনের অবস্থার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে এই ‘দেবতার ভর’ বিষয়টির কোনো ভিত্তি নেই। বিজ্ঞানের ভাষায় ‘ভর’ বলতে কোনো বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাপকে বোঝায়, যা বস্তুর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর অন্যান্য বস্তুর প্রতি তার মহাকর্ষীয় আকর্ষণের শক্তিকে নির্ধারণ করে। যুক্তিবাদীরা তাই ব্যক্তির শরীরে দেবতার ভর বিষয়টিকে তার মানসিক ব্যাধি বলেই মনে করেন। সচরাচর

পরিবারে বা সমাজে গুরুত্ব না পাওয়া মানুষরাই এই মনোরোগে ভোগেন। অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ গল্পে লোকসংস্কার নির্ভর গোষ্ঠী সমাজে এই ‘দেবতার ভর’ বিষয়ক ছবিটি স্পষ্ট। লোহারা গ্রামের সারবান লোহার সাধারণ মানুষ থেকে দেবাংশী হয়ে ওঠার কাহিনি দিয়ে শুরু হয়েছে এই গল্প। গ্রামের গুনমানদের বিচারে সারবান লোহার মন সহনশীল, গভীর ও তার আত্মা সৎ। তাই তার মতো মানুষের উপরেই দেবতার ভর হয়। ভর হলে সারবানের মুখে দৈববাণী হয়। আর “কালী কিংবা মনসা থানের এক চিমটা মাটি তখন অসাধ্য সাধন করতে পারে দৈবী মহিমায়। যক্ষা, হাঁপানি, কুষ্ঠর মতো রোগও সেই মাটি ধোয়া জল খেলে সেরে যায়। বক্ষ্যা রমণী সন্তানবতী হবে, পঙ্গু নিজের পায়ে হাঁটবে, অন্ধ এই পৃথিবীর আলো বৃক্ষলতা সব দেখবে।”^১ পঞ্চাশ বছর আগে সারবানের বয়স যখন দশ, তখন গ্রামের বিরাম গুনমান পাঁচিশ টাকায় সারবানকে কিনেছিল রঘুনাথ মন্ডলের কাছ থেকে তার এই গুণের জন্যই। তখন ‘খেরা খেলা’র প্রচলন ছিল। দশ বছর বয়সেই এই ‘খেরা খেলা’য় ধনুকের শব্দে পেটের মধ্যে এবং ঘাড়ের পিছনে সারবানের একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি হয়, যা দেখে সবাই চিৎকার করে বলে ওঠে—“এই চ্যাণ্ডা হবে পাতা।”^২ সেই থেকেই দেবাংশী হয়ে সারবান লোহারা গ্রামের মানুষজনের হিতাহিত নির্ধারণের নিয়ামক। তার নিদান বেশিরভাগটাই বিফল হলেও, যেগুলো সফল হতো তাতেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একসময় সারবান নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করে সে দেবাংশী। এবং দেব অংশ সেজে সে অর্থ উপার্জনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

কিন্তু পাঁচ বছর আগে গ্রামের সেতু বর্মনের আরজি শুনে সারবান অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে শুরু করে। কারণ তার কাছে এতদিন ধরে কেবল সংসার, রোগ মুক্তি, সন্তান কামনা ইত্যাদি নিদান চাইতেই মানুষজন আসতো। সেতু বর্মনের মতো নিদান তার কাছে এতদিন কেউ চায়নি। গ্রামের দৈত্যারির সঙ্গে ‘কোবলা’ নিয়ে সেতু বর্মনের বিবাদ। তাই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সেতু বর্মন সারবানের শরণাপন্ন হয়। একরকম অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েই সারবান সেতু বর্মনের উদ্দেশ্যে দৈববাণী শোনায় – “জমিনের দখল ছাড়বু নাই সেতু। মন্ডল উচ্ছেদ করবা চালে, মাও বিষহরির নামেৎ বাঁধা দিবু।”^৩ কিন্তু পরবর্তীকালে এই নিদানের জন্য সারবানকে দৈত্যারির কাছে অপমানিত হতে হয়। অভিজিৎ সেন সেতু বর্মনের প্রসঙ্গে বর্গাকেন্দ্রিক বিষয়টিকে সামনে রেখে জোতদার-আধিয়ার সংঘর্ষের ছবিটিকে তুলে ধরেছেন। সত্তর দশকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায নিম্নবর্গীয়দের শোষণের ছবি দেখা গেছে। দেখা গেছে কীভাবে জমিদাররা একজন চাষি, আধিয়ারকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করত। এরপর আসে অপারেশন বর্গা। আধিয়াররা জমিতে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অবগত হয়। বিশেষ করে নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে কৃষক-শ্রমিক তথা খেটে খাওয়া মানুষজন নিজেদের অধিকারের দাবি জানাতে শেখে। সত্তরের শেষ পর্বে কংগ্রেস শাসনের অবসানে বাম সরকার ক্ষমতায় আসলে তারা অপারেশন বর্গা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করে। এর আগে ১৯৭২-৭৭ সালে ভূমিসংস্কার নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস যে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তার মধ্যে প্রধানতম হল জমি বন্টন। এই সময়ে যুক্তফ্রন্টের আমলে যারা জমি দখল করেছিল, তাদের অনেককে উৎখাত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু দখলকারী গরিব কৃষকেরা সংগঠিত হওয়ায় জোতদাররা তাদের উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালে সরকারের জমি ন্যস্ত এবং ন্যস্ত জমির দখল দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মনের অন্দরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। ১৯৭২-৭৭ এই সময়ে সরকারি স্তরে কিছু নীতি থাকলেও বাস্তবে তার রূপায়ণ মোটেই সহজ ছিল না। কংগ্রেস শাসনতন্ত্র ভূমিসংস্কারের বিষয়টিকে অত্যন্ত যান্ত্রিকভাবে দেখায়,

সেই সুযোগ নিয়ে জোতদারের দল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি হলে কিছু আইন প্রণয়ন ও কর্মসূচি রূপায়ণের চেষ্টা চলে। কিন্তু ভূমিহীন এবং দরিদ্র কৃষকদের জমি বন্টনে পাট্টার মাধ্যমে নিয়মিতকরণ না করে একদল নতুন লোককে পাট্টা দেওয়া হয়। ফলে অনেক যোগ্য কৃষককে বঞ্চিত হতে হয়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলে বন্টিত হয়নি এমন জমির অনুসন্ধান করে এবং ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি জমি বন্টনের কাজ শুরু করে। ১৯৭৮ সালের ৫ই জুলাই অপারেশন বর্গার কর্মসূচিতে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় ভূমিসংস্কার আইনের ৫০ (ই) ধারায় বর্গা নথিভুক্তির জন্য রাজস্ব ও আধিকারিকদের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কিন্তু জমি দখলে বেশি সুবিধা পায় তথাকথিত জোতদার তথা পাট্টির কর্মীরাই। আর এই জমির অধিকার সূত্রে আশির দশক থেকে গ্রামে গ্রামে শুরু হয় হানাহানি। বর্গাকেন্দ্রিক এই সমস্যার দিকগুলোই অভিজিৎ সেন তাঁর গল্পে বেশ কিছুটা তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানান –“আটের দশক পড়বার আগেই থেকেই বামফ্রন্ট অপারেশন বর্গা কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ চেষ্টা করতে থাকে। খুব কাছের থেকে দেখে এবং ব্যাংকের কর্মচারী হিসেবে এর সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে সমস্যাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হই।... অনেকেই জানে যে, দিনাজপুর জেলার খাঁপুর গ্রামে তেভাগা আন্দোলনের সময়ই বেশ বড়সড় লড়াই হয়। আমি এই খাঁপুর এবং তার আশপাশের চার-পাঁচটি থানার অসংখ্য গ্রামে অপারেশন বর্গা চলাকালীন সময়ে অনুসন্ধান করেছি এবং আগ্রহ নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি যাবতীয় তাৎপর্য। এই সব অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার দলিল আমার দেবাংশীর গল্প গুলো।”^{৪৮}

অপারেশন বর্গা কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে জমির অধিকার দেওয়া। কিন্তু প্রশাসনিক আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে সুবিধা পেল সেই জোতদাররাই। ‘দেবাংশী’ গল্পে অভিজিৎ সেন বর্গা সমস্যার জটিল রূপটি আরও স্পষ্ট করলেন জোতদার রোহিণী বর্গা রেকর্ডের সময় আধিয়ার জাফরকে উচ্ছেদ করতে চাকর সনাতন দ্বারা জাফরের নামে মামলা দায়ের করার ঘটনায়। ফলে সেতু বর্মনের মতো জাফরও মরিয়া হয়ে ছুটে আসে দেবাংশী সারবানের কাছে নিদানের আশায়। গল্পের কাহিনি এগোলে দেখা যায়, সারবান ভরগ্রস্ত অবস্থায় জাফরকে দিয়ে রোহিণীকে ডেকে পাঠিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে। এর পূর্বে দৈত্যারির সঙ্গে ঝামেলার পর সাপের কামড়ে তার অলৌকিক মৃত্যু ঘটে। সেই ঘটনা এবং জাফরের কাছে রোহিণীর সহজেই ভুল স্বীকার এই দুই ঘটনায় সারবান অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। কারণ সে নিজে জানে যে তার শক্তি আর মনসার শক্তি এক নয়। ফলে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সারবান এবার মুক্তি চায়। চায় সাধারণ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে। গভীর রাতে নিজের স্ত্রীর কাছে সে স্বীকার করে সে দেবাংশী নয়। গল্পে অভিজিৎ সেন অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে সমাজ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বটিকে তুলে ধরেছেন। ড. শ্রাবণী পাল বলেন –“এ উপন্যাসে লোহার সারবান লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত একাধিক চরিত্রের সমবায় গড়া। লোকটি এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানুষের দেবতা হয়ে ওঠার আখ্যান। লেখক তাকে সহজ বিশ্বাসে গড়ে তুলেছেন, কোথাও অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন তোলেননি, আবার এক সময় দেখিয়েছেন নিজের চারপাশে গড়ে ওঠা ভক্তি আর বিশ্বাসের প্রাসাদ-কারাগার থেকে নিজেই মুক্তি চাইছে, সে নিজেই।”^{৪৯} সুতরাং সারবানের লোকাচারে বিশ্বাসী দেবাংশী সত্তার সঙ্গে শ্রেণিসংগ্রামের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিপ্লবী মনের দ্বন্দ্বকে অভিজিৎ সেন চমৎকারভাবে তুলে ধরে গল্পে ব্যক্তিক ট্রাজেডিকে পরিবেশন করেছেন।

এরপর গল্পে ঘটনার মোড় ঘুরে যায় মৃত দৈত্যারির ছোটো ছেলে বিনোদের আগমনে। এতকাল গ্রামের জোতদাররা গরীব কৃষকের জমি ছলে বলে দখল করে নিলেও, গ্রামীণ সংস্কারকে তারা কখনোই এড়াতে পারেনি। এতদিন সারবান সহজেই দেবাংশী সেজে গরিব কৃষকদের প্রতিরোধের শক্তি হতে পেরেছে। তাই দৈত্যারি বা রোহিনী জমি দখলের চেষ্টা করলেও দেবাংশীর বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। কিন্তু বিনোদ শহরে পড়াশোনা করা শিক্ষিত ছেলে। দেবাংশীর প্রতি তার কোনো ভয় বা বিশ্বাস নেই। সেইসঙ্গে তার আগ্রহও নেই জমি দখলের প্রতি। সে আগ্রহী কলকারখানার বিষয়ে। গল্পে লেখক বিনোদকে নব্য ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যে বিনোদ জমি অপেক্ষা টাকাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। সেতু বর্মনের কাছ থেকে সে টাকা ফেরত চায় সুদে আসলে। সেইসঙ্গে তাকে উন্মাদ করে তোলে সেতু বর্মনের সুন্দরী মেয়ে বারুণীবালাকে ভোগের বাসনা। এখানেই অভিজিৎ সেন চমৎকারভাবে জমি এবং যৌনতাকে, জমি এবং নারীকে এক করে দেখিয়েছেন। ভোগবাদী সমাজে জমি এবং নারী দুই-ই আসলে ভোগ্য বস্তু। ড. শ্রাবণী পালের মতে, “জমির সঙ্গে অবধারিত ভাবে জড়িয়ে থাকে যে যৌনতা স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেন অভিজিৎ।... কখনও কখনও নারী আর ভূমি একে অন্যের পরিপূরক হয়ে যায়, তখন গাড়া জমিতে জোর করে হাল নামানো যেন কৃষক রমণীকে ধর্ষণের সমার্থক হয়ে যায়।”^৬

‘দেবাংশী’ গল্পে সেতু বর্মন টাকা ফেরত দেওয়ায় অসমর্থ হলে শাস্তি স্বরূপ ঘটে যায় বিনোদ ও তার সঙ্গপাঙ্গের দ্বারা বারুণীকে ধর্ষণ। এবার আসে দেবাংশীর কাছে বারুণীর নষ্ট হওয়া নারীত্বের নিদান চাওয়ার পালা – “দেবাংশী ময় বিচার চাঁও, মোর ইজ্জৎ লুটের বিচার চাঁও ময়।”^৭ ফলে খেরা থানের শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলায় সানাই এর সুরে, ঢোলকের প্রবল শব্দেও সারবান স্থিরচিহ্নে উপলব্ধি করে—“মানুষের যে একজন দেবাংশীর বড় দরকার। কোথায় আর্তি জানাবে এই মার খাওয়া, অসহায় মানুষ?”^৮ আসলে সারবান চায় এই সমাজকে, সমাজের মানুষকেই মানুষের বিচারের দায় ভার দিতে। তাই বারুণীকে সে জানায় – “মানুষের কাছেই বিচার চাও মাও। এই যি এত জনা মানুষ আছে, তোমার বাপ ভাই আছে, তোমার সোয়ামি আছে, ইয়াদের কাছেই তোমার আর্জি জানাও।”^৯ সারবান আরও গভীর প্রত্যয় যুক্ত দায়িত্ববোধ থেকে বারুণীর হাত ধরে ভিড়ে লুকিয়ে থাকা ধর্ষণকারীদের চিহ্নিত করার সাহস যোগায়। এরপর বারুণী বিনোদ ও তার দলবলকে শনাক্ত করলে সে বিচারের ভার, নিদানের ভার দেয় জনগণের ওপর। দৃষ্ট কণ্ঠে সে ঘোষণা করে – “তুমরা যদি সর্কাই চান ই পাপ বন্দ হবে। ই দায় দেবাংশীর একার লয়।”^{১০} গল্পের শেষে অসহায় দরিদ্র এক জনগোষ্ঠীর একমাত্র অবলম্বন সারবান প্রকৃত অর্থেই যেন দেবাংশী হয়ে ওঠে। যে দেবাংশী নিপীড়িত, শোষিত মানুষদের অলৌকিক সংস্কারের বেড়া জাল ছিঁড়ে বের করে এনে পৌঁছে দেয় বিপ্লবের পথে। পৌঁছে দেয় সম্মান রক্ষা আর অধিকার আদায়ের চেতনায়। অভিজিৎ সেন গল্পে লোকসংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ছবিটিকেই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন।

অভিজিৎ সেনের গল্পবিশ্বের পটভূমি মূলত গ্রাম সমাজ। তিনি গ্রামাঞ্চলের মানুষজনের প্রতি মুহূর্তে টিকে থাকার লড়াইকেই তাঁর গল্পে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। তাই গ্রামীণ সংস্কার বিশ্বাস তথা লৌকিকতা-অলৌকিকতা তাঁর গল্প বুননের বিশেষ উপকরণ। এর মধ্য দিয়ে তিনি যেমন গ্রাম বাংলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন ক্রমশ পরিবর্তনশীল সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির পরিকাঠামোয় মানুষের অভিযোজনগত ক্রিয়া-

প্রতিক্রিয়াকে। তাই তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে সমকালের ভাষ্য। সমাজের পরিবর্তিত মূল্যবোধের চেতনার সঙ্গে জড়িত মানব জীবনের মনস্তাত্ত্বিক বয়ান তাঁর গল্পগুলি।

তথ্যসূত্র:

- ১। সেন অভিজিৎ, প্রকাশ সাল - ডিসেম্বর, ২০০৫, শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ - ২৮
- ২। ঐ, পৃঃ- ৩১
- ৩। ঐ, পৃঃ-৩৫
- ৪। সেন অভিজিৎ, প্রকাশ সাল - ১৯৯০, কি লিখি কেন লিখি, কোরক শারদীয়, পৃঃ - ৬০
- ৫। পাল শ্রাবণী, প্রকাশ সাল-ফেব্রুয়ারি, ২০২২, সত্তর উত্তর গ্রামসমাজ ও বাংলা ছোটগল্প, ১৫ শ্যামচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, একুশ শতক, পৃঃ - ৫২
- ৬। ঐ, পৃঃ - ৫১
- ৭। সেন অভিজিৎ, ডিসেম্বর, ২০০৫, শ্রেষ্ঠ গল্প, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ -৪৭
- ৮। ঐ, পৃঃ- ৪৭
- ৯। ঐ, পৃঃ - ৪৮
- ১০। ঐ, পৃঃ - ৪৯

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

- ১। অভিজিৎ সেন, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর, ২০০৫

সহায়ক গ্রন্থ:

- ১। অভিজিৎ সেন, কি লিখি কেন লিখি, কোরক শারদীয়, প্রকাশ-১৯৯০
- ২। তপোধীর ভট্টাচার্য, ছোটগল্পের অন্তর্ভূবন, মহাজাতি প্রকাশন, প্রকাশ-২০০০
- ৩। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রকাশ-১৯৯৩
- ৪। পরিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমি ও ভূমিসংস্কার সেকাল একাল, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ২০০৭
- ৫। শ্রাবণী পাল, সত্তর উত্তর গ্রাম সমাজ ও বাংলা ছোটগল্প, একুশ শতক, ১৫ শ্যামচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি ২০২২।

E-source:

<https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0>

গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ : মানবীবিদ্যা চর্চা ও বিষয়গত অভিনবত্ব

নূর-ই-নুসরাত

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় গোলাম মুরশিদ অগ্রগণ্য। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন। বিশেষত গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কোন গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। বিশেষত ১৮-২০ শতকে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানের ইতিহাসের বিবর্তনে ঠাকুর পরিবারের অবদান অনস্বীকার্য। এই বিষয়গুলোকে গোলাম মুরশিদ তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। সেখানে নারী মুক্তি তথা স্বাধীনতার পথে মূল অন্তরায়গুলো বিশ্লেষিত হয়েছে যা নারীদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব এবং নারীর নিজের প্রতি নিজের মনোভাবও তাঁর প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। তিনি আধুনিক নারীবাদীদের মতো পুরুষবিদ্বেষী মনোভাবকে নারী মুক্তির সঠিক পথ হিসেবে বিবেচনা করেননি বরং নারীকে নিজস্ব শক্তিতে আলোকিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। গোলাম মুরশিদের প্রবন্ধের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে নারীদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অনুধাবন করা যায়। এই প্রবন্ধে নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথের অবদানের স্বরূপ উন্মোচিত হবে।

সূচক শব্দ: গোলাম মুরশিদ, রবীন্দ্রনাথ, বিষয়ভাবনা, মানবীবিদ্যা, মননশীলতা, অভিনবত্ব।

১. ভূমিকা:

আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় গোলাম মুরশিদ (জ. ১৯৪০) অন্যতম ব্যক্তিত্ব। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে মানবীবিদ্যা চর্চা প্রধান। এসব প্রবন্ধে মানবীবিদ্যা চর্চার প্রকৃত ধারা পরিলক্ষিত হয়। তিনি নারী প্রগতির ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত উনিশ শতকের গোড়া থেকে নারীরা যে আত্মসচেতন হয়ে উঠছিলেন, তার প্রতিফলন প্রবন্ধগুলোতে লক্ষ্যনীয়ভাবে ফুটে ওঠে। ফলে তাঁর মানবীবিদ্যা চর্চা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মানবীবিদ্যার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে রবীন্দ্রমানস ও সৃষ্টিকর্মে পূর্ববঙ্গ (১৯৮১) এবং রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা (২০২২) গ্রন্থে। তবে আধুনিকতার অভিধাত্রে বঙ্গরমণী (১৯৮৪), রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর (১৯৯৩), গ্রন্থে নারীদের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। যা এই আলোচনার মূল উপকরণ।

২.

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে প্রথম নারী শিক্ষার বিস্তার লাভ করে। নারী শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা। সামাজিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম একটি ধারা মানবীবিদ্যা বা নারীর ইতিহাস চর্চা। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় এটি বর্তমানে সবচেয়ে আকর্ষণীয়

ও বিতর্কিত শাখা। সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা, অংশগ্রহণ, অবদানের দিকগুলো পর্যালোচনা করে ইতিহাসে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত মূল্যায়নের লক্ষ্যে যে ইতিহাস চর্চা করা হয়, সাধারণত তাকেই মানববিদ্যা চর্চা বলা হয়। আমাদের দীর্ঘ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসে নারীদের ইতিহাস ছিলো উপেক্ষিত। নারী ইতিহাস চর্চার প্রথম সূত্রপাত ঘটে ইউরোপে এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত নারী সংক্রান্ত সামগ্রিক বিদ্যাচর্চাকেই মানববিদ্যা বলা হয়। নারীদের শিক্ষা, প্রগতি, স্বাধীনতা, স্বাভাবিকতা, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চাই মানববিদ্যার অন্তর্গত। সভ্যতায় নারীদের ঐতিহাসিক অবদান, নারীর সম্পর্কে আর্থ-সামাজিক ও নৈতিকবোধ তৈরি, নারীদের অবমূল্যায়নকারী বিষয়ে সমালোচনা, ইতিহাস চর্চায় দীর্ঘ পুরুষতান্ত্রিক ধারা সংশোধন ও লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, নারীকেন্দ্রিক বিষয়গুলোকে ইতিহাস চর্চার আওতায় আনা, পুরুষতন্ত্র কীভাবে নারীর বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তা বিশ্লেষণ করা বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটিয়ে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নতুন উপাদানের মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও গুরুত্বের যথাযথ মূল্যায়নই মানববিদ্যার মূল লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য। মূলত উপেক্ষিত নারী সমাজের বিভিন্ন অবদানে দিকগুলো তুলে এনে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই নারীবিদ্যার চর্চার মূল উদ্দেশ্য।

নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা এবং সমাজে নারীদের অধঃস্তনতা মুছে ফেলতে নারীবাদী আন্দোলন দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে। নারীবাদী আলোচনার পদ্ধতি কী হতে পারে তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা নারী পুরুষ ও তাদের সামাজিক সম্পর্ক যেভাবে বিশ্লেষণ করেন তা অনেকক্ষেত্রেই সমস্যাজনক।^১

আদিমকালে খাদ্যসংগ্রহ ও পশুশিকার করে মানুষ যখন জীবন ধারণ করতো, তখন নারীর বিচরণক্ষেত্র ও অধিকার আজকের মতো সীমিত ছিলো না। বরং প্রজনন ক্ষমতার জন্য তার বিশেষ সমাদর ও মর্যাদা ছিল সমাজে। কৃষি ও পশুপালনের মাধ্যমে সভ্যতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নারী গৃহবন্দী হল। ... ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবারের উদ্ভব নারীকে ততদিনে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করে গৃহকোণে বেঁধে দিয়েছে। সেইসঙ্গে অর্থনৈতিক ও সমাজ শাসনের চাবিটি চলে গিয়েছে পুরুষের হাতে।^২ পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য ছিলো মূলত ভাবাদর্শগত, সমাজতান্ত্রিক, জৈবিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত, বলপ্রয়োগ, নৃতাত্ত্বিক, ধর্ম ও পুরাণ এবং মনস্তাত্ত্বিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ মুখ্য নারী গৌণ। এটি একটি কাঠামো যা নারীকে নয়, বরং লিঙ্গের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়। পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র শুধু নারীকে নয়, একটা পুরুষকেও পুরুষ হয়ে ওঠার প্রেরণা দেয়।^৩

বাংলা অঞ্চলে প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী যেমন: অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও অ্যালপাইনদের সমাজ ছিলো মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃসূত্রীয়।^৪ প্রাচীন সমাজে নারীদের প্রাধান্য ও স্বাধীনতা ছিলো তার প্রমাণ আমরা চর্চাপদে নারীদের জীবনাচারে অনুধাবন করতে পারি। বৈদিক সমাজ থেকে সমাজে নারীদের অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে বেড়িয়ে সভ্যতার যে ক্রমবিকাশ সেখানেই নারীদের গৃহবন্দী করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নারীশক্তি অর্থাৎ দেবীরা ছিলেন পূজনীয় এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কল্পনায় অধিকাংশই ছিলো নারী। কিন্তু কৃষিজীবী মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে বৈদিক সমাজের মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির

জন্ম হয় তা পুরুষ আধিপত্যের বিশ্বতাত্ত্বিক ভিত রচনা করে।^৭ তারপর ইতিহাসে নারীদের আলোচনা অনালোকিত হয়ে পড়ে।

আঠারো শতকের শেষার্ধ্বে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন পাশ্চাত্যের নারীমুক্তির আন্দোলনে সোচ্চার তখনও ভারত উপমহাদেশে নারীর আক্ষরিক অর্থে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারের দাবি সর্বোচ্চ উচ্চারিত হতে শুরু করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব এবং অবরোধ প্রথা সব মিলিয়ে নারী সামাজিক অবস্থা ছিলো অত্যন্ত সংকটাপন্ন। কিছু ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতায় বিশেষ করে মিশনারীদের উদ্যোগে ভারতে স্ত্রী শিক্ষার উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। তবে লজ্জা ও ভয়ের সংস্কৃতি নারী অগ্রসরের পথে প্রথমে বাঁধা সৃষ্টি করে:

সম্পর্কের এই অসমতা যা উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হয় বস্তুগত সম্পদে ওপর অধিকারের অসমতা থেকে, ভাবাদর্শগত কারণে এবং ভাবাদর্শিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বহাল রাখতে প্রয়োজন হয় বল প্রয়োগের, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির।... লিঙ্গ অসম সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রবল লিঙ্গ অধঃস্তনের ওপর তার কর্তৃত্ব জারি রাখে এই প্রক্রিয়ায়।^৮

রুশ বিপ্লবের পূর্বে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল তার বড় পরিবর্তন ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের পর। পুঁজিতাত্ত্বিক বিশ্বে তখন পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী শক্তি অপরদিকে উপনিবেশিত রাষ্ট্র। উপনিবেশগুলোতে শিল্পায়নের গতি ছিলো খুবই শ্লথ। পুরনো সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও নির্যাতনের প্রক্রিয়াতেই কিছু নগরায়ণে, শাসকদের ভাষা-শিক্ষা, যোগাযোগ স্থাপন হয়। ইউরোপে দর্শন-বিজ্ঞান রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছিলো তার প্রভাব ভারতবর্ষেও প্রতিফলিত হয়। ইউরোপের উনিশ শতকের অগ্রসর চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণা ও লেখালেখিতে তা স্পষ্ট। উনিশ শতকের শেষের দিকে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক বাঁধা, আপত্তি এবং কুৎসার মধ্যেও কিছু কিছু নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ও কর্তৃত্বের সামষ্টিক রূপ থেকে ব্যক্তির রূপ লাভ প্রক্রিয়ায় নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার ধারণাটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাঠামো উপস্থিত করে।^৯

উনিশ শতকে সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার বিরুদ্ধে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রয়োজন অত্যাাবশ্যকীয় ছিলো। রেনেসাঁর মানবকল্যাণমুখী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নারী জাগরণ। নারীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এতটাই অসহায়, দুর্বল, অধিকারহীন ও অক্ষম করে রাখা হয়েছিল যে, নিপীড়িত হয়েও নিজেদের মুক্তির কথা তারা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য যারা চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইতিহাস ইত্যাদির নতুন দিক নিয়ে চর্চা শুরু করেন তাঁরা রেনেসাঁর মানবিক আবেদন থেকে নারীসমাজের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য এগিয়ে আসেন ও প্রতিবাদ জানান। এই আন্দোলন সমাজ সংস্কারমূলক হলেও নবজাগরণের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সময়ে নারীদের বিষয়ে আধুনিক ও প্রগতিশীল মনোভাব পোষণ করেন: “পুরুষের সঙ্গে সবকিছু সমান ভাগ করে নেওয়ার দাবি। রবীন্দ্রনাথ যে সওয়া শো বছর আগে এ কথা ভাবতে পেরেছিলেন, তাই প্রমাণ করে তিনি কেবল কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা।”^{১০}

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা প্রসারে খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম সমাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে যেটুকু জাগরণ এসেছিল তার ফলে সেই সমাজের মেয়েদের সামাজিক নিপীড়ন বন্ধের জন্য একটা উদ্যোগ ও চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজের দুই মেরুতে বাস করছিলো হিন্দু ও মুসলিম জনগণ।^{১০} নারী জাগরণের আন্দোলনের সূচনা হয় অবিভক্ত ভারতবর্ষের উদারনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে। এ জাগরণের মূলে ছিলো ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব। নারী জাগরণের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের অধিকার, উন্নয়ন, প্রগতি ও দাবি উত্থাপনের প্রক্ষেপে সামাজিক আন্দোলন দানা বাঁধে মূলত দুটি ধারায়- সংস্কারমূলক ও উপনিবেশবিরোধী জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের ধারা। নারীমুক্তির আন্দোলনের পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর জাগরণ।^{১০}

আধুনিক যুগে নারীরা তাদের অবরোধ, অনধিকার ও অধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে নারীবিদ্যা চর্চার সূচনা হয়। তবে একটি ভয়ানক বিষয় হলো, নারীদের এই সচেতনতা পুরুষদের মাধ্যমে, পুরুষদের প্রয়োজনে সাধিত হয়েছিলো। সুতরাং এই সচেতনতা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। গোলাম মুরশিদ বলেন,

বাঙালি নারীদের ‘মুক্তির’ আন্দোলন শুরু করেন পুরুষরা। সুতরাং সত্যিকার অর্থে পুরুষদের শাসন থেকে নারীদের পুরোপুরি স্বাধীন করার আন্দোলন ছিলো না। বরং বলা যায়, পুরুষরা অংশ তাদের নিজেদের জীবন ও জগতকে আধুনিক করে তোলার জন্য এবং অংশত নারীদের প্রতি সহানুভূতিবশত এ আন্দোলন শুরু করেন।^{১১}

১৮-২০ শতক ছিলো ভারতবর্ষের রেনেসার যুগ। পুরোটা সময় জুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়। এই সময়েই নারীরা তাদের অবরোধ প্রথা ও পরাধীনতা নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে মানবীবিদ্যা চর্চার ইতিহাস এই কালপর্বে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের অবদান ইতিহাসে অনস্বীকার্য।

৩.

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পারিবারিক ও ধর্মীয় বেড়া জালে কতোটা অবরোধবাসিনী ছিলো তারই স্বরূপ তুলে ধরেছেন গোলাম মুরশিদ। কেবল তা-ই নয়, বরং নারীদের অবরোধ প্রথা ভেঙে শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারে অগ্রসর হওয়ার নেপথ্যের কারণ বিশ্লেষণপূর্বক পুরুষতন্ত্রের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার চিত্র তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব তাঁর প্রবন্ধে অনুধাবন করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তুলে এনেছেন তৎকালে নারীদের বন্দীদশার কথা। সেখান থেকে ঠাকুর পরিবারের নারীরা কিভাবে নারী মুক্তির পথকে সুগম করলো তা ফুটে উঠেছে। বিশেষত বাংলায় নারী শিক্ষা, বাংলা নাটক ও নারীদের মঞ্চ অভিনয়, নারীদের পোশাক, নারীদের বিদেশ গমন ও নারী স্বাধীনতার অনেকগুলো অনুযজ্ঞ সূচনা হয় ঠাকুর পরিবারের নারীদের মাধ্যমে। সমাজের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তারা নারী মুক্তির পথকে সুগম করেছেন। গোলাম মুরশিদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

তিনি দেশে ফেরার পরের মাসেই তাঁদের বাড়িতে একটি গীতিনাট্য অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে কাদম্বরী দেবী অংশ গ্রহণ করেন। এর আগে পর্যন্ত কোনো ভদ্র পরিবারের নারীরা মঞ্চ অভিনয় করেছেন বলে জানা যায় না।... তারপর মায়ার খেলার সবগুলো চরিত্রে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন ঠাকুরবাড়ির

মেয়েরা। মৃণালিনী দেবী এ সময়ে রীতিমতো সন্তানবতী। তাঁকে অভিনয়ে উৎসাহিত করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রগতিশীল পদক্ষেপ।^{১২}

রবীন্দ্রনাথ কেবল মেয়েদের দিয়ে অভিনয়ই করাননি বরং বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা নিয়ে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা গ্রন্থটিকে আপাতদৃষ্টিতে মানবীবিদ্যা চর্চা বিষয়ক রচনা মনে হলেও এই গ্রন্থে লেখক ভুলে এনেছেন বহুমুখী রবীন্দ্রনাথকে। নারী সম্পর্কিত বিষয় ছাড়াও এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পরিবার, সমাজচিন্তা, ধর্ম ও প্রেম। নাম-প্রবন্ধ ছাড়াও গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে “দ্বারকানাথ ঠাকুর: অবজ্ঞাত নায়ক”, পিতৃগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ”, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাজ, স্বরাজ, স্বাধীনতা”, রবীন্দ্রনাথের প্রেম” এবং “রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার পটভূমি” প্রবন্ধ। যেখানে রবীন্দ্রমানস গঠন ও বিবর্তনের ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হয়। লেখকের ভাষায় এ গ্রন্থে “আমরা এক বিবর্তনশীল রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই, দেখতে পাই ‘নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা’।”^{১৩} ফলে গ্রন্থটি গোলাম মুরশিদের রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রেও অনন্য সংযোজন। যেখানে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহ, তাঁর মানসগঠনের প্রেক্ষাপট, প্রেম ও নারী ভাবনা এবং ধর্মচিন্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

লেখক গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন ‘রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা’। কিন্তু প্রথম তিনটি প্রবন্ধে নারী ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। ফলে সাধারণ পাঠকের ধারণা হতে পারে প্রবন্ধগুলো গ্রন্থের মূল বক্তব্য থেকে বিচ্যুত। তবে চতুর্থ প্রবন্ধ অর্থাৎ “রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা” প্রবন্ধ পাঠের পর বোঝা যায় পূর্বের প্রবন্ধগুলোর প্রাসঙ্গিকতা। কারণ রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার ভিত্তিপ্তস্তর গঠিত হয়েছে পরিবার থেকেই। প্রেম ও নারী সম্পর্কে প্রথম ধারণা তিনি পরিবার থেকেই লাভ করেন। এমনকি সমাজ ও ধর্মচিন্তাও তাঁর পারিবারিক পরিবেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত। পরিবার ও পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিলো নিবিড়। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে এই মানস গঠনের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহ দুটি দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত তাঁর ধর্ম ও সমাজচিন্তার ভিত তৈরি হয় পিতা ও পরিবার থেকে। অন্যদিকে ঠাকুর পরিবারের মাধ্যমে বাঙালি নারী সমাজের অগ্রগতির ধারা সূচিত হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা বিষয়ক আলোচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে “দ্বারকানাথ ঠাকুর: অবজ্ঞাত নায়ক”, পিতৃগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ”, “রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাজ, স্বরাজ, স্বাধীনতা”, প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সবগুলো প্রবন্ধ পড়ার গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

গোলাম মুরশিদের ‘রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা’ গ্রন্থটির বিশেষত্ব দুদিক থেকে। প্রথমত, গ্রন্থের বিষয়বস্তুগত দিক। যেখানে রবীন্দ্রনাথকে নানা আলায়ে দেখা এবং সব আলো মিলিয়ে এক অখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, শিক্ষা গ্রহণ, ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রেক্ষাপট, প্রেম, নারী-ভাবনা এবং সাহিত্যে এই সকল কিছু প্রতিফলন। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থটির ভাষা শৈলী। যা পাঠককে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করে। ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে গিয়ে পাঠককে কোথাও বাধাগ্রস্ত হতে হয় না। অর্থাৎ ভাষার সাবলীলতা এই গ্রন্থের অন্যতম দিক। তবে আলোচনার সময়ে কিছু বিষয়ের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। যদিও ভূমিকা অংশেই লেখক এ বিষয়ে কৈফিয়ত দিয়েছেন: ‘এ গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদাভাবে লেখা। ফলে কোনো কোনো প্রসঙ্গে পুনরাবৃত্তি

লক্ষ করা যাবে। আশা করি পাঠকরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।^{১৪} গ্রন্থের শুরুতে লেখকের এই বক্তব্য তাঁর গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতার পরিচায়ক।

প্রথমেই বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যায়, লেখক বহুমুখী রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা করেছেন। সে অনুযায়ী তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করেন। এ গ্রন্থে তিনি অবতারণা করেছেন ঠাকুর পরিবারের তিন পুরুষের, অর্থাৎ দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য এবং আধুনিকতা সম্পর্কে তিনজনের মধ্যে তুলনাও দেখিয়েছেন। যেমন:

দ্বারকানাথ ছিলো ইহলোকের, বিষয়ী মানুষ: অপর পক্ষে, দেবেন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধিও কম ছিলো না। কিন্তু তাঁর প্যাশন ছিলো আধ্যাত্মিকতায়। পিতাপুত্রের অবস্থান ছিলো বিপরীত দুই মেরুতে। দ্বারকানাথ দরবারী, দেবেন্দ্রনাথ সংসারত্যাগী, নিভৃতচারী। পিতার প্রতি পুত্র শ্রদ্ধাহীন, ভালোবাসাহীন। সেই সূত্রেই দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা দ্বারকানাথের প্রতি একান্তভাবে শ্রদ্ধাহীন।^{১৫}

এই আলোচনায় লেখক অল্প কয়েকটি বাক্যে তিন পুরুষের সম্পর্কের যোগসূত্র তুলে ধরেন। ফলে দীর্ঘ আলোচনার পরেও বিষয়টি বুঝতে গিয়ে পাঠক খেঁই হারিয়ে ফেলে না। প্রথম প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সূক্ষ্ম নিষ্ঠিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে। একদিকে আছে ব্যক্তির অবদান অন্যদিকে একটা বিশেষ সময় এবং সমাজের মূল্যবোধ ও মনোভাব। ঠাকুর পরিবারের প্রভাব প্রতিপত্তিই শুধু নয়, তৎকালের আধুনিকতার নায়ক হিসেবে দ্বারকানাথকে উপস্থাপন করেছেন গোলাম মুরশিদ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, নিজের পরবর্তী প্রজন্মের কাছেই তিনি ছিলেন অবজ্ঞাত।

“পিতৃগ্রস্ত রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধটি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ সৃষ্টি করে ‘পিতৃগ্রস্ত’ শব্দটির ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পিতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রবীন্দ্রনাথ পিতার আদলেই গড়ে ওঠেন। ফলে তাঁদের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য অন্য কোনো শব্দ যুতসই হতো না। এই প্রবন্ধে লেখক পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। এই সম্পর্ক ও বিশ্বাসই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়। তবে তিনি পিতার মতো সংসারবিরাগী ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাজ, স্বরাজ, স্বাধীনতা” প্রবন্ধে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। আদি ব্রাহ্মসমাজের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সমাজচিন্তার প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় পূর্ববঙ্গ তথা শিলাইদহে বসবাসের সময় থেকে। কলকাতার নাগরিক সমাজ ও পারিবারিক নিঃসঙ্গ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে গ্রামীণ সমাজের পরিবেশ তাঁকে প্রভাবিত করে। এ সময়ে তিনি গ্রামীণ নারীদের জীবন সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেন। নিজের পরিবারে যেসব নারীদের তিনি দেখেছেন তাঁরা ছিলো গৃহবন্দী ও ধর্মীয় সংস্কারে আবদ্ধ। কিন্তু গ্রামীণ নারীদের জীবনযাত্রার ভিন্নতা তিনি লক্ষ করেন। তাঁর ছোটোগল্পে এর প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯০৫ সালের শেষে তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং এ সময় থেকে শুরু হয় তাঁর সমাজ-সচেতনতার তৃতীয় পর্ব। তিনি যে স্বদেশী সমাজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও ছিলো ব্যতিক্রমী। তাঁর মতে, স্বদেশী সমাজ হলো সব বিষয়ে স্বাবলম্বী এবং সংস্কারমূলক সমাজ।^{১৬} ফলে সমাজ, স্বদেশ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি নিজস্ব চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও নারী-ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা বিদ্যমান। কারণ তিনি সারাজীবনে বহু নারীর কাছাকাছি এসেছেন এবং নিজের কল্পনায় ও সাহিত্যে সৃষ্টি করেছেন বহু নারী চরিত্র। নারী ভাবনায় তিনি স্ববিরোধী, যা গোলাম মুরশিদ তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন। কারণ নিজের কন্যাসহ পরিবারের নারীদের স্বাধীনতা, বিয়ে, শিক্ষাসহ যাবতীয় বিষয়ে তিনি প্রথাবিরোধী হননি কখনো। অথচ সাহিত্যে নারী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজের এই সীমাবদ্ধতাকে তিনি অতিক্রম করেছেন। অন্যদিকে “তাঁর প্রেমের চরিত্র ছিলো অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন”^{১৭} গুলচবাইগ্রন্থে^{১৮} গোলাম মুরশিদ দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে নারীদের প্রভাব এবং ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করেছেন। যা পাঠকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনায় গোলাম মুরশিদ দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে এনেছেন রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীদের অবস্থান। তিনি বলেন, *গল্পগুচ্ছে*র পাতায় পাতায় নারীদের প্রতি এ রকম সহমর্মিতা লক্ষ করা যায়।^{১৯} তিনি বলেছেন *চোখের বাগ্লি* বিনোদিনীর কথা, সুচরিতা, বিমলা, *যোগাযোগের* কুমু, *শেষের কবিতা*র লাবণ্য, *দুই বোনের* উর্মিমালা, *চার অধ্যায়ের* এলা, *নষ্টনীড়ের* চারুলতা, *দেনাপাওনা*’র নিরুপমা, *শান্তি*’র চন্দ্রা, *জীর* পত্রের মৃণালের কথা। এসব নারী চরিত্রের মাধ্যমে নারীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ অবস্থান প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার পটভূমিতে লেখক শুরুতেই ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা এবং পারিবারিক আবহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ বেড়ে ওঠেন কটুরপঙ্খী ব্রাহ্ম পরিবারের আনুষ্ঠানিকতার পরিধিতে। পিতার ধর্মই হয়ে ওঠে তাঁর ধর্ম। যদিও পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে নিজের মতো করে বদলেছেন। ব্রাহ্ম ধর্মের আচার, উপনিষদের প্রভাব, বাউল দর্শনের প্রতি আগ্রহ এমনকি সুফীবাদ দ্বারাও তিনি প্রভাবিত ছিলেন। সবশেষে থিতু হয়েছেন মানবধর্মে। রবীন্দ্র সাহিত্য পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর ধর্মচিন্তার এই বিবর্তনকে গোলাম মুরশিদ তুলে এনেছেন তাঁর প্রবন্ধে।

গোলাম মুরশিদ প্রতিটি প্রবন্ধকে একটার পর একটা জুড়ে দিয়ে সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছেন এক অনন্য মাত্রায়। এই জুড়ে দেয়ার বিষয়টি কেবল প্রবন্ধ থেকে প্রবন্ধে নয়। অনুচ্ছেদ-অনুচ্ছেদে, বাক্য-বাক্যে, শব্দ-শব্দে। আবার প্রতিটি শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ এবং প্রবন্ধই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। ফলে সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে গোটা বিষয়টিই। বড়ো লেখকদের রচনায় ভাষিক বৈশিষ্ট্যই এমন যে, তা বোদ্ধা পাঠককে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। গোলাম মুরশিদও তার ব্যতিক্রম নন। বাংলা ভাষার একজন আভিধানিক হওয়ায় তাঁর শব্দজ্ঞান ও শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও পরিণীলিত। যেমন: মনের ভাব প্রকাশের জন্য তিনি ‘পিতৃগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে তাঁর নিজস্ব সংযোজন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বিষয়টি বোঝাতে কাব্যিক ভাষা থেকে বেছে নিয়েছেন ‘অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন’ কথাটি। তাঁর এই শব্দচয়ন ভাষার মধ্যে এক অন্যরকম আবেদন সৃষ্টি করে।

উপসংহার:

বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ গবেষণা ও বুদ্ধিচর্চার ধারায় গোলাম মুরশিদ অদ্বিতীয়। তাঁর নিরন্তর শ্রম ও সাধনার ফলে বাঙালি পাঠক পেয়েছে অসাধারণ কিছু গবেষণাগ্রন্থ। তিনি একাধারে বাঙালির সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, সাহিত্যিকদের জীবনী ও মানবীবিদ্যার চর্চা করেছেন। বিশেষত মানবীবিদ্যার চর্চা তাঁর রচনায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। কারণ তথাকথিত নারীবাদী না হয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন নারী জাগরণ ও বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনা এই ধারায় এক বিশেষ সংযোজন। কারণ বঙ্গীয় নারী সমাজের উত্তরণে ঠাকুর পরিবার

এবং রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য। গোলাম মুরশিদের অনেক লেখায় নারী এবং নারীর ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। তিনি নারীদের যথার্থ মুক্তির পথ ও প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করেছেন নির্মোহভাবে। নারী প্রগতির ধারায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের অবদান প্রবন্ধগুলোতে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তবে ব্যক্তিজীবন ও প্রবন্ধ সাহিত্যে রক্ষণশীলতার ছাপ রাখলেও সৃজনশীল সাহিত্যে প্রগতিশীলতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সমর্থনকে তিনি রবীন্দ্রমানসের সুস্পষ্ট স্ববিরোধ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নারী মুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও মানসিকতার জন্য তিনি তাঁকে কেবল কবি নন, উল্লেখ করেছেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবে।

তথ্যসূত্র:

১. পারভিন, শাহীনা, নারীর স্বর উন্মোচনে নারীবাদী পদ্ধতিমালা ও ক্রমনোগ্রাফী রচনার গুরুত্ব, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৮, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১১
২. বসু, পূর্ববী, ২০০০, *নারীর ভাবনা*, ঢাকা, অবসর প্রকাশনী, পৃ. ১০৪
৩. মাহফুজ সরকার ও শাহরিয়ার জিম সম্পা., ২০২১, ধর্মের তত্ত্ব তালাশ: পুরুষতন্ত্র বনাম নারীবাদ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ১১১
৪. রায়হান রাইন, প্রাচীন বাংলার কৃষিজীবী ও ব্রাহ্মণ সমাজে নারী", নাসিম আখতার হোসাইন ও পারভীন জলি সম্পা., ২০১৯, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারী, ঢাকা, উত্তরণ, পৃ. ৪৯
৫. তদেব, পৃ. ৫২
৬. রীয়াজ, আলী সম্পা., ১৯৯৫, *বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা, চারদিক প্রকাশন, পৃ. ৮৪
৭. মুহাম্মদ, আনু, ২০১২, *নারী পুরুষ ও সমাজ*, ঢাকা, সংহতি, পৃ. ৩২
৮. মুরশিদ, গোলাম, ২০২০, *রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা*, ঢাকা: অবসর, পৃ. ১১৭
৯. বেগম, মালেকা, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ২০০২, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ. ৩৭
১০. দাশ, পুরাকায়স্থ, নিবেদিতা, ১৯৯৯, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, ঢাকা, পিপিস্ট্রিস্ট, পৃ. ১৪
১১. মুরশিদ, গোলাম, ২০১৯, *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, পৃ. ১৮০
১২. মুরশিদ, গোলাম, ২০২০, *রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা*, ঢাকা: অবসর, পৃ. ৮৭
১৩. তদেব, পৃ. ১৬
১৪. মুরশিদ, গোলাম, *রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা*, পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ
১৫. তদেব, পৃ. ৩৫
১৬. তদেব, পৃ. ৬১
১৭. তদেব, পৃ. ১৫
১৮. তদেব, পৃ. ১০৯।

সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ স্বপ্নময়

চক্রবর্তী হলে গোলাপ

অরিজিৎ ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মানকর কলেজ, মানকর, পূর্ব বর্ধমান

সারসংক্ষেপ (Abstract): পরিবার, সমাজ, আইন, রাষ্ট্রের হাতের পুতুল হতে থাকা যৌনপ্রান্তিক মানুষদের স্বপ্ন আর স্বপ্নপূরণের পথ ও সেই পথের বাঁধা নিয়ে লেখা স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস ‘হলে গোলাপ’ (২০১৫)। লিঙ্গ পরিচয়ের সংকটকে কেন্দ্র করে লেখা এই মানবিক আখ্যানটি স্নাত হয়েছ ভালোবাসার অলৌকিক জলে। কাহিনি বয়ানে মানুষের লিঙ্গ পরিচয়ের সমস্যা তুলে আনতে গিয়ে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী অক্লান্ত পরিশ্রমে খুঁড়েছেন ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শারীরবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, জিনেটিক্স, মিথ-পুরাণ। কাহিনির পরতে পরতে মিশে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি। এই উপন্যাসটিতে আসলে এক সঙ্কট-সঙ্কুল মানুষের অনুভূতিগুলি চিত্রিত হয়েছে আশ্চর্য মায়াময় দক্ষতায়। রূপান্তরকামী পরিমল, হিজড়ে দুলালীদের নিয়ে লেখা এই আখ্যানে মানবজীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য বিষয় যৌনতার নানামাত্রা যথাসম্ভব সুবিস্তারে বর্ণিত। এই উপন্যাসে যৌনতার প্রচলিত, অপ্রচলিত ছবিগুলির মধ্যে মানুষের নানা রুচি ধরা পড়ে। আর সে ছবি শুধু শিল্পের জন্য শিল্প নয়, সেখানে রক্তমাংসের মানুষ এতটাই সুস্পষ্ট যে সত্য আর সাহিত্যের পার্থক্য সেখানে দুর্লভ। এককথায় ভিন্নতর যৌনপ্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার নিখুঁত বিবরণ এই উপন্যাস।

সূচক শব্দ (Keywords): সমাজ, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, শরীর, লিঙ্গ, যৌনতা, আইন, প্রভৃতি।

মূল আলোচনা:

শরীর এবং সমাজ—এই দুটি ধারণা প্রাথমিকভাবে পৃথক মনে হলেও আধুনিক সমাজতত্ত্বে এই দুটি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। শরীর শুধুই একটি জৈবিক কাঠামো নয়, বরং তা একটি সামাজিক নির্মাণ, যা সমাজের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের মাধ্যমে নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সমাজের কাঠামোতেও শরীরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যেখানে মানুষের দেহ, তার সক্ষমতা, রূপ, যৌনতা, রোগ বা স্বাস্থ্য—সব কিছুই সামাজিক ব্যাখ্যা ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজতত্ত্বের একটি বিশেষ শাখা—‘শরীরের সমাজতত্ত্ব’ গড়ে উঠেছে, যা সমাজে শরীরের ভূমিকা ও তা নিয়ে সামাজিক ভাবনা বিশ্লেষণ করে।

শরীরের সমাজতত্ত্ব এই ধারণার বিপরীতে দাঁড়ায় যে, শরীর নিছক একটি প্রাকৃতিক বা জৈবিক বিষয়। বরং, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—যেমন পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, ধর্ম, আইন—প্রতিনিয়ত শরীরকে এক নির্দিষ্ট ফ্রেমে স্থাপন করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, সমাজ নির্ধারণ করে কিভাবে একটি ‘আদর্শ’ নারী বা পুরুষের শরীর দেখতে হবে, কী ধরনের পোশাক পরিধান করা উপযুক্ত, অথবা শরীরের কোন অংশ কতটা প্রকাশযোগ্য। আবার, ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে শরীরের সম্পর্কও গভীর। ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো দেখিয়েছেন, আধুনিক সমাজে ক্ষমতা সরাসরি শরীরের উপর প্রয়োগ করা হয়—

কারাগার, হাসপাতাল, বিদ্যালয় কিংবা সামরিক প্রতিষ্ঠান—সবখানেই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

নারীর শরীর ও তার উপস্থাপন সমাজে এক বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্র। নারীর দেহ বহু সময় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে মূল্যায়িত হয়। নারীর সৌন্দর্য, যৌনতা, মাতৃত্ব, এমনকি স্বাস্থ্যসেবাও সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা নির্ধারিত। যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের আলোচনায়ও শরীর একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। হিজড়া, রূপান্তরিত লিঙ্গ বা অ-দ্বৈত লিঙ্গের মানুষদের শরীর সমাজ কতটা স্বীকৃতি দেয়, কিংবা তাদের প্রতি কেমন আচরণ করে, সেটি সমাজের মূল্যবোধ, আইন এবং সংস্কৃতি দিয়ে নির্ধারিত হয়।

অন্যদিকে, স্বাস্থ্য এবং রোগের ধারণাও নিছক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো সমাজের ভেতরে ক্ষমতা ও বৈষম্যের প্রতিচ্ছবি। ধনী ও দরিদ্র মানুষের শরীরের উপর রোগের প্রভাব, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, কিংবা দেহকে শ্রমের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার বৈষম্য—সবই শরীরের সমাজতত্ত্বের আলোচনার অংশ।

আধুনিক গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শরীরের উপস্থাপনা ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সেলিব্রিটি সংস্কৃতি, ‘ফিটনেস’ ও ‘বিউটি’ আদর্শের প্রচার, কিংবা ‘বডি পজিটিভিটি’ আন্দোলন—সব কিছুই আমাদের শরীর সম্পর্কে সামাজিক চেতনা গঠনে প্রভাব ফেলে। মানুষ কেমন শরীর চায়, কীভাবে শরীর গঠন করে, কী খায়, কীভাবে ব্যায়াম করে—এসব সবই এখন সামাজিকভাবে নির্দেশিত, কখনো কখনো চাপসৃষ্টিকারীও বটে।

সমাজ ও শরীরের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বহুমাত্রিক। সমাজ যেমন শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি শরীরও সমাজের কাঠামো ও চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ কিংবা সংস্কার—সবক্ষেত্রেই শরীর একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, শরীরকে রাজনৈতিক বার্তা প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়—হোক তা মিছিল, অনশন, নগ্ন প্রতিবাদ কিংবা শরীরে স্লোগান লেখা।

সার্বিকভাবে, সমাজের শরীর এবং শরীরের সমাজতত্ত্ব এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে মানুষের অস্তিত্ব, পরিচয়, স্বাস্থ্য, ন্যায় ও অবিচার, সৌন্দর্য এবং ক্ষমতা—সব কিছু একে অপরের সঙ্গে জড়িত। এই বিশ্লেষণ সমাজকে বুঝতে সাহায্য করে যে, শরীর শুধুই একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়, বরং একটি সামাজিক সত্তা, যা সমাজের ভিতরেই গড়ে ওঠে, পরিচালিত হয়, আবার কখনো কখনো সমাজকে চ্যালেঞ্জ দেয়।

সমাজ ও শরীরের সম্পর্ক এক চিরন্তন ও জটিল অধ্যায়। শরীর শুধু জীববৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব নয়, বরং এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর উপন্যাস ‘হলদে গোলাপ’ (২০১৫) সমকামিতা, তৃতীয় লিঙ্গ, লিঙ্গ পরিবর্তনকামীতা ও শরীরের সামাজিক নির্মাণের প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম হিসেবে চিহ্নিত। শরীরের সামাজিক নির্মাণের ধারণা প্রথমে পশ্চিমা নারীবাদী তত্ত্ববিদদের মাধ্যমে আলোচিত হয়। জুডিথ বাটলারের ‘Gender Trouble’ (১৯৯০) গ্রন্থে তিনি লিঙ্গ ও যৌনতার সামাজিক নির্মাণের ধারণা তুলে ধরেন। বাটলারের মতে, লিঙ্গ কোনো প্রাকৃতিক বা জৈবিক বাস্তবতা নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে বাঙালি সাহিত্যে, শরীর ও লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণের প্রশ্ন দীর্ঘকাল ধরে আলোচিত

হয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘সমাজধর্ম ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে যৌন অবদমন ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরোধিতা করেন।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর *হলদে গোলাপ* উপন্যাসটি ১৯৯৫ সালের একটি রেডিও প্রোগ্রাম ‘সন্ধিক্ষণ’-এর মাধ্যমে শুরু হয়, যেখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যৌনতা সম্পর্কিত গোপন বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়। এই উপন্যাসে তৃতীয় লিঙ্গ, লিঙ্গপরিবর্তনকামীতা ও সমকামীতা ইত্যাদি বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিকেত, যিনি রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে সমাজের লিঙ্গ ও যৌনতা সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি সমাজের প্রচলিত লিঙ্গবিভাজনকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং শরীরের সামাজিক নির্মাণের প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। *হলদে গোলাপ* উপন্যাসে লিঙ্গ ও যৌনতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে হার্মাফ্রোডাইটিজম, সিউডোহার্মাফ্রোডাইটিজম, টার্নার সিনড্রোম, ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মাধ্যমে লিঙ্গের বৈচিত্র্য ও সামাজিক নির্মাণের প্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ শরীরের সামাজিক নির্মাণের ধারণাকে সমর্থন করে। এটি দেখায় যে, শরীরের লিঙ্গ ও যৌনতা শুধুমাত্র জৈবিক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবিত।

‘হলদে গোলাপ’-এর মূল উপজীব্যই হলো শরীরের সেই বহুমাত্রিক পরিচয়, যা কেবলমাত্র জৈবিক নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে নির্মিত। উপন্যাসে শরীরের বিবিধ রূপ—পুরুষ, নারী, উভলিঙ্গ, লিঙ্গান্তরিত ব্যক্তি—সমাজের চোখে বিচিত্র ও ‘অস্বাভাবিক’ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু লেখক প্রশ্ন তোলেন: অস্বাভাবিকতা কে নির্ধারণ করছে? উদাহরণস্বরূপ, একজন ইন্টারসেক্স শিশুর জন্ম হলে সমাজ তার শরীরকে একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গে ‘রূপান্তর’ করতে চায়, অথচ প্রকৃতি তাকে দ্বৈততা দিয়ে জন্ম দিয়েছে। এই দ্বন্দ্বই প্রকাশ পায় সমাজের শরীরনির্ভর ক্ষমতাকাঠামো।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী এই উপন্যাসে এক অসামান্য কাজ করেছেন—তিনি বিজ্ঞানের ভাষা ও তত্ত্বকে সাহিত্যের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, উপন্যাসে আমরা পাই, টার্নার সিনড্রোম, ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম, সিউডোহার্মাফ্রোডাইটিজম ইত্যাদি বায়োলজিক্যাল কন্ডিশনের উল্লেখ। এগুলি আসলে বুঝিয়ে দেয়, প্রকৃতিতে শরীরের দ্বৈততা নেই—শরীরই বিভিন্ন, বৈচিত্র্যময়। কিন্তু সমাজ এদের গ্রহণ করে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সমাজ কি প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়? সমাজ কি নির্ধারণ করে দেয় কে নারী, কে পুরুষ, কে ‘নন-নরমাল’? এখানে শরীর হয়ে ওঠে ক্ষমতার একটি ক্ষেত্র—যেখানে শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণীবিভাজন প্রয়োগ করা হয়।

‘হলদে গোলাপ’-এর একটি অনন্য দিক হলো, এটি সমাজে প্রান্তিককৃত শরীরের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের মূল স্রোতে নিয়ে আসে। তৃতীয় লিঙ্গ, হিজড়া, বা সমকামী মানুষদের শরীরের ওপর সমাজ যে নিষেধাজ্ঞা চাপায়, যে লজ্জা আর ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে—এই উপন্যাসে তা অনুপমভাবে ধরা পড়ে। একটি দৃশ্য উল্লেখযোগ্য, যেখানে হিজড়া চরিত্রটি বলে:

“তুমি মানুষ, আমি হিজড়া। তোমার শরীরেই যদি মানুষত্ব, তবে আমার শরীরটাই কী?”’

এই সংলাপে শরীর-মানবত্বের সম্পর্কটিকেই লেখক প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। সমাজ যে শরীরের ভিত্তিতে পরিচয় নির্ধারণ করে, সেই কাঠামোকেই তিনি ভেঙে ফেলেন।

উপন্যাসে একদিকে রয়েছে চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীর ভাষা—যা নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে শরীরকে ‘ব্যাখ্যা’ করে। অন্যদিকে রয়েছে চরিত্রদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, লজ্জা, কাম,

বেদনা ও জিজ্ঞাসা—যা শরীরকে অনুভব করে। এই দ্বৈততা থেকেই স্পষ্ট হয়, শরীর একটি ভাষা, কিন্তু সেই ভাষা কে বলবে? পিতৃতন্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, না শরীর নিজেই? লেখক এখানে ভিকটিম শরীরকে ভাষা দেন—তাকে কেবল বস্তুরূপে নয়, বলার অধিকারসম্পন্ন এক সত্তা হিসেবে তুলে ধরেন।

সমাজ যেসব শরীরকে স্বাভাবিকতার বাইরে রাখে, তাদেরকে ‘অন্য’ (othered) করে তোলে। এই ‘অন্যতা’ জন্ম দেয় নিগ্রহ, হেনস্থা, অবমাননার। কিন্তু উপন্যাসে দেখা যায়, সেই শরীরগুলো নিজেরা নিজেদের ভাষায়, অভিজ্ঞতায়, ভালোবাসায় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, লেখক কখনও ‘করুণা’ দেখান না, বরং তিনি প্রান্তিক শরীরকে কেন্দ্রীয় করে তোলেন। এতে করে উপন্যাসটি শুধুমাত্র ‘সিমপ্যাথেটিক’ না থেকে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক। তিনি কেবল একটি হিজড়ার দুঃখ লিখছেন না, লিখছেন সমাজের শরীরগত দমননীতির বিরুদ্ধে এক সংহতির আখ্যান।

এই উপন্যাসে শরীর মানেই নিছক আঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, বরং তার গভীরে রয়েছে কামনা, আকাঙ্ক্ষা, ভীতি ও গোপনতা। সমাজ যেভাবে যৌনতাকে গোপনীয় ও নিষিদ্ধ করে তোলে, তা ‘হলদে গোলাপ’-এ একাধিক চরিত্রের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। যেমন, একজন সমকামী পুরুষের কামনা সমাজের চোখে বিকৃত; একজন লিঙ্গান্তরকারী নারীর যৌনতা ‘ভয়ঙ্কর’; একজন হিজড়ার আকাঙ্ক্ষা ‘উপহাসযোগ্য’। লেখক এই মানসিক ও সামাজিক শৃঙ্খলগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেন।

এই উপন্যাসে রেডিও ‘সন্ধিক্ষণ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উঠে আসে। এখানে যৌনতা, শরীর ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা হয়, যা অনেক চরিত্রকে তাদের দমবন্ধ অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেয়। এটা বোঝায়, শরীর বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনার অভাবই সমাজে বিকৃতি, আতঙ্ক ও অজ্ঞতার জন্ম দেয়।

সমাজ ও শরীরের সম্পর্ক আধুনিক তত্ত্ববিদদের মাধ্যমে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। মিশেল ফুকো তাঁর ‘*The History of Sexuality*’ গ্রন্থে যৌনতার ইতিহাস ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। জুডিথ বাটলার তাঁর ‘*Undoing Gender*’ গ্রন্থে লিঙ্গ ও যৌনতার সামাজিক নির্মাণের প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বগুলির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজ ও শরীরের সম্পর্ক একটি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া, যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবিত।

শেষ পর্যন্ত, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’ শুধু একটি উপন্যাস নয়; এটি এক বিশ্লেষণাত্মক সমাজতত্ত্ব, যা শরীরকে পাঠ করার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। উপন্যাসটি স্পষ্ট করে যে:

- শরীর নিছক বায়োলজিক্যাল নয়;
- সমাজ নির্ধারণ করে শরীরের মানে;
- ‘অন্য’ শরীরগুলো সমাজের জন্য আয়নার কাজ করে;
- আর, এসব শরীরও নিজেরাই সমাজ গড়তে পারে।

‘হলদে গোলাপ’ আমাদের শেখায়—শরীর এক অভিজ্ঞতার জগৎ, তাকে ‘পাঠ’ করতে হলে আমাদের চাই মুক্ত, দমনহীন এক দৃষ্টি। এটি লিঙ্গ ও যৌনতার বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক নির্মাণের প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, শরীর শুধুমাত্র একটি জৈবিক অস্তিত্ব নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ, যা সমাজের বিভিন্ন প্রভাবিত। এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমাজ ও শরীরের সম্পর্কের একটি

গভীর ও বিস্তৃত ধারণা লাভ করতে পারি, যা আমাদের সমাজের লিঙ্গ ও যৌনতার বৈচিত্র্য ও সামাজিক নির্মাণের প্রক্ষেপে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

তথ্যসূত্র:

১) চক্রবর্তী স্বপ্নময় : জানুয়ারি ২০১৫, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৬৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

- সানন্দা সেন ও সায়েনী ব্যানার্জী : ২০২৪, জেডার স্টাডিজ : সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।
- Judith Butler : 2004, Undoing Gender, Routledge, New York & London.
- Judith Butler : 2007, Gender Trouble, Routledge, New York & London.
- Tr. Robert Hurley : 1988, The History of Sexuality, Vintage Books, United States.

একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিকের চোখে প্রথা ও সংস্কারের প্রতিফলন : বাণী বসুর খারাপ ছেলে

সায়নী কুণ্ডু

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ২০০২ সালে প্রকাশিত বাণী বসুর ‘খারাপ ছেলে’ উপন্যাসটি খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির আবহ, নিয়ম, সংস্কার, বিশ্বাসের কাহিনি নিয়ে সূচনা হলেও উপন্যাসের ক্রম-অগ্রসরতায় প্রকাশ পায় এই সমাজেরই চাপা পড়ে থাকা ও অন্ধকারে থাকতে বাধ্য হওয়া কিছু মানুষের কথা। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের কাছে যারা পতিতা, যাদের সংস্পর্শকে ঘৃণ্য মনে করা হয়, বলা বাহুল্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর চরমতম অপমানের দৃষ্টান্ত মেলে বারাদনা পল্লীগুলিতে, নারী পতিতা হতে বাধ্য হয় যাদের লোভ-লালসার কারণে সেই পুরুষগুলির সভ্য সমাজে সম্মান লাভ এবং পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা করায় কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অবস্থার বিপাকে পড়ে মেয়েগুলি জীবনভর অন্ধকার গলির বাসিন্দা হয়ে যায়। তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন, শিক্ষা, সম্মানজনক পেশা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসাকে সমাজ সমর্থন করে না, বরং এদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় মনে করে। ঔপন্যাসিক সমাজের এই এক চোখা বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, উপন্যাসের চরিত্রগুলির কার্যক্রমও সেই অনুযায়ী, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষও ঘৃণ্য কাজে দোষী সাব্যস্ত হয় ও শাস্তি পায়।

সূচক শব্দ: মধ্যবিত্ত মানসিকতা, দারিদ্র, লোভ, পতিতা পল্লী, খারাপ মেয়ে, খারাপ ছেলে, এক চক্ষু বিচার, সামাজিক সংস্কার।

মূল আলোচনা:

বাণী বসুর ‘খারাপ ছেলে’ উপন্যাসটি সমাজের বাস্তব সমস্যার কাহিনিরূপ। উপন্যাসের নামটি আমাদের দ্বিতীয় বার ভাবতে বাধ্য করে বৈকি, যে সমাজে আমরা বাস করি সেখানে ছেলেদের খারাপ বলা সমাজ পরিবার কোথাও অনুমোদিত নয় বরং মেয়েদের খারাপ খুব সহজেই অনুমান করে দাগিয়ে দেওয়া যায়। আসলে সম্ভানের জন্মদান, পালন এগুলি যা একমাত্র নারীর দ্বারাই সম্ভব এই সত্যটুকুর উপরে ভর করেই বহু নারীকে সমাজ ‘খারাপ মেয়ের’ তকমা দিয়ে দিতে পারে। চারিত্রিক স্বল্পনের দায় পুরুষ খুব সহজেই এড়িয়ে যেতে পারলেও নারী শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তা থেকে পালাতে পারেনা, তাই খারাপ মেয়ে হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। তাদের জন্য আলাদা পাড়া করে সমাজের থেকে আলাদা করে তাদেরকে রাখতে হয়। আবার এই ভদ্র সভ্য সমাজেরই কিছু পুরুষ কামতৃপ্তি ঘটাতে রাতের অন্ধকারকে হাতিয়ার করে সেখানেই উপস্থিত হয়। উপন্যাসটিতে লেখিকা সমাজের নারী-পুরুষ অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের নিরিখে একচক্ষু নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

শুধু তাই নয় উপন্যাসে উপস্থিত কিছু ঘটনা এই একবিংশ শতকের সাধারণ নারীদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র জিনার এক দিদির বিবাহ প্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দেখা যায় মেয়েটির লেখাপড়ার কারণে পাওয়া স্কলারশিপ তার বিদেশ যাত্রা ছাড়পত্র হিসাবে যথেষ্ট নয় বরং বিদেশে

চাকুরীরত কারও স্ত্রী হিসেবে “সিঁদুর টিদুর পড়ে একেবারে যাক।”^১ এই প্রস্তাব ও আদেশ বেশি গ্রহণীয়।

মল্লিকা চরিত্রটি যে এখন একটি পরিবারের দায়িত্বশীল বড় বউ তার বিবাহ প্রসঙ্গেও সমাজ পরিবারের গুরুজনসুলভ হস্তক্ষেপ দেখি, খুব সহজেই একটি মেয়ের মানসিক দ্বন্দ্ব বা ইচ্ছার খোঁজ না নিয়ে বিয়ে ঠিক করে মনে করা যায় “একটা হিল্লো হয়ে গেল...”^২

এখনো বহু পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর অবস্থান প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাগ করা থাকে। দৈনন্দিন অশান্তির ভয়ে অনেক স্ত্রী মুখ বুজে অনেক কিছু মেনেও নেয় কিন্তু লেখিকার প্রতিবাদ এখানেই, অনেক নারী নিজেরাই নিজেদের বুদ্ধি, চিন্তা, ইচ্ছার খর্বতা নিয়ে সংকোচে গুটিয়ে থাকে, আবার কিছু নারী সুযোগ পেলেই মুক্ত আকাশে বিহঙ্গের মতো তার প্রতিভাগুলির বিকাশ ঘটাতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত হয় না। নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা গার্হস্থ্য নৈপুণ্যের বাইরে কোন গুণের বিকাশ এখনো সমাজ বক্র দৃষ্টিতে দেখে ও চেষ্টা করে অবদমিত করতে। জিনাকে তার স্বামী তাই সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। পোশাক, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশা এমনকি ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কেও হস্তক্ষেপ করে। “নিখিলের বহু নির্দেশ সে পালন করে চলে।”^৩ তার এই “আপসপ্রিয়তা, শান্তিপ্রিয়তা”^৪ আসলে সাংসারিক শান্তি বজায় রাখার কারণেই। বেশিরভাগ মেয়েই একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে মুখ খোলে না। জিনার বড় জা মল্লিকা তাই জিনাকে বলে “তোরই বা ধৈর্য কি কম? আমি তো বুঝি তুই কতটা সহিছিস! সবই তো শান্তির জন্য?”^৫

তবে জিনার মত কিছু মেয়ে নিজেদের মুক্তির আকাশ নিজেরাই খুঁজে নেয় সব ক্ষেত্রে হয়তো সোচ্চারে করতে পারে না তবে নিজেদের ইচ্ছার দাম দিতে তারা পথ ঠিক করে নেয়। একজন বন্ধুর সাহায্যে জিনাও খুঁজে নেয় নিজের জন্যই একটু মুক্তির নিঃশ্বাসের রাস্তা, সেই সূত্র ধরেই লেখিকা উন্মুক্ত করেন সেই সব মেয়েদের জীবন কথা যাদের আমরা এড়িয়ে চলি ও তথাকথিত ভদ্রসমাজ ‘খারাপ মেয়ে’ বলি।

যারা সমাজের চোখে ঘৃণ্যবৃত্তি অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য হয় কিন্তু আমাদের মনে লেখিকা প্রশ্ন জাগান কোন মেয়ে কি জন্ম থেকেই গণিকা হওয়ার মনোবৃত্তি পোষণ করে, দারিদ্র, অশিক্ষা আর মানুষের চরমতম লোভ-শঠতা শত শত নারীর এই পেশা গ্রহণের কারণ। মুকুট তাই বলে-“দেখবি এখানে সেখানে বাচ্চা মেয়ে বড় মেয়ে পাচার হচ্ছিল। ধরা পড়েছে, গ্রামে, মফস্বলে। এগুলোর মধ্যে কিছু চুরি, কিছু জোচ্চুরি, আবার কিছু জেনে বুঝে নিজের লোকেরাই বিক্রি করে দিয়েছে।”^৬

সংবাদপত্রের এই খবরগুলো সত্যতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারেনা। প্রতিদিন অজস্র নারী দেশে-বিদেশে কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষের লোভ-লালসার বলি হিসাবে অন্ধকার গলিগুলির বাসিন্দা হতে বাধ্য হয়।

মুকুট জিনাকে সত্য ও বাস্তব কথা বলে, “শুনে রাখ জিনা দারিদ্র আর অশিক্ষার প্রথম শিকার মেয়েরা। দরিদ্র ঘরের যেই একটা মেয়ে জন্মাল অমনি তাকে নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার জন্মে যায় তার পুরুষ অভিভাবকদের। তার মা ঠাকুমার যারা কত্ৰীপদে আছে তারাও সেই মতো আচরণ করে। সবচেয়ে কম খাবার তার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি কাজ। কোন সময় ভারবাহী পশুর চেয়ে বেশি তাকে মনে করা হয় না। উপরন্তু এই পশু যেটুকু যত্ন পায়, এরা তাও পায় না। কিন্তু মেয়েরা দুগ্ধবতী গাভীর মতই লাভজনক। যৌবনোদগম

হলেই সে যৌন পণ্য। তাকে নানা রকম দামে বিক্রি করা যায়।”^৭ কথাগুলো খুব রুঢ় ও কড়া হলেও লেখিকা সমাজের সত্য বাস্তব অন্ধকার দিকটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

এই মেয়েগুলিকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল জিনা, যদিও তা প্রথমে ছিল গোপনে কিন্তু পরে অন্যদের আংশিক সমর্থন পেলেও স্বামীর বিপুল রোষের মুখে পড়ে সে। অবশ্য তারও যে কারণ ছিল তা উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে স্পষ্ট হয়। বলাবাহুল্য যৌন পণ্য হতে বাধ্য হওয়া মেয়েগুলি শিক্ষিত হয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চাইলেও সমাজ তাদের প্রতি বক্রদৃষ্টিই নিষ্ক্ষেপ করে। এই “খারাপ মেয়েদের”^৮ পড়াতে গিয়ে জিনা “খারাপ ছেলেদের”^৯ উদ্দেশ্যেই ঘৃণা ছুড়ে দেয়। সমাজের চোখে দিনের আলোয় “তারা কি কারোর বাবা! কাকা! জ্যাঠা! স্বামী! দাদা! ভাই!”^{১০}

“কারা সেই ধিনিকেষ্ট যাদের মজার জন্য পাড়া ভর্তি করে করে মেয়ে পুষে রাখতে হয়,”^{১১} এদের এই অভ্যাসটি গোপনে রেখে তারা দিব্যি সভ্য সমাজের চরিত্রগুলিতে সফলভাবে অভিনয় করে যায়। কিন্তু নারীকে সন্তান জন্মের দায়ভার নিতে হয় বলে তারি কপালে জোটে কেবল বিড়ম্বনা।

উনিশ শতকে নব্য বাবুগণের বারান্দা গৃহে গমন এক রকম স্বাভাবিক অভ্যাসের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রগতিশীল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের হস্তক্ষেপে এই নির্লজ্জতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ লুপ্ত হয়ে যায়, তবে তা যে একেবারে সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা তো নয় তা নাহলে বারান্দা গৃহগুলি আজও সমাজের দৃশ্যমান হত না এবং এমন একটি বিষয় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় আলোচনা হতে পারত না।

একথা বলাই যায় সমাজ ও পরিবার যুগ যুগ ধরে পুরুষের বারান্দা গৃহ গমনের পশ্চাতে স্ত্রীর ক্রটিকেই দায়ী করেছে, একসময় অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল নারী আশ্রয় ও সম্মান হারাবার ভয়ে কেবল ভাগ্যের দোষ দিয়ে ও চোখের জল ফেলে সারা জীবন ধরে স্বামী ব্যভিচারী জেনেও তাকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা করে গেছে। আসলে একটা সময় বিবাহ করাই হতো পুত্র সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে বংশরক্ষার তাগিদে। অর্ধাঙ্গিনী, সহধর্মিণী এগুলি পুস্তকের কথা, বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম ও আইনের দ্বারা সিদ্ধ ভোগ্য পণ্য বা গার্হস্থ্যের দাসী যাকে সমস্ত প্রকার মানুষের শারীরিক অত্যাচার করার অধিকার সমাজ সমর্থন করে, সেই সাপেক্ষে পুত্রহীন বা সন্তানহীন নারীর ক্ষেত্রে তা আরও ভয়ঙ্কর। বর্তমানে নারীগণ শিক্ষিত হওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হয়েছে তবে আজও মেয়েরা গৃহশান্তি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করে যায়। তবে উপন্যাসে যে ব্যভিচারে অভিযুক্ত অবস্থায় জিনা তার স্বামী নিখিলকে আবিষ্কার করে তারপরে একবিংশ শতকের নারী হিসেবে তার পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক। “যুগের পর যুগ অসহায় নারীকে বহুভোগ্যা করেছে বহু লোভী কামুক। ভোগ করে উচ্ছিষ্ট ভাঁড়ের মতো ফেলে দিয়েছে। সমাজ বেঠনীর ভেতরের স্ত্রী, বাইরে গণিকা। কাউকেই প্রাপ্য দেয়নি অথচ নিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত সুখ। সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ শান্তি-জৌলুস, আবার স্বৈরাচারের নিষ্ঠুর মজা। সন্তান উৎপাদন করেছে গণিকালয়ে, তারপর নামহীন, পরিচয়হীন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে পৃথিবীর আস্তাকুড়ে। এর জন্য অনেক করুণার অশ্রু বর্ষিত হয়েছে, আহা উছতে ভরে গেছে পৃথিবী। কিন্তু বিচারের কথা কেউ কখনো ভাবেনি। ব্যভিচারী নারীকে অক্রেপে শাস্তি দিয়ে গেছে সমাজ। ব্যভিচারী পুরুষের জন্য ক্ষমা, ভয়, প্রশ্রয়, বড়জোর একটু ঘৃণা। পুরুষরা তো বহুচারী হয়ে থাকে। আহা! প্রকৃতিই এমন করে তৈরি করেছে এই বোচারা শক্তিমানদের। ...

প্রথম যুগগুলোতে সকলেই তো ছিল স্বৈচ্ছাগামী,”^{১২} নারীদের ক্ষেত্রে “পরিবারের প্রয়োজনে, সন্তান পালন, গৃহ ও সমাজকে ধারণ করবার জন্য একদিক থেকে চলল নীতিশিক্ষা বর্ষণ-পরপুরুষ গমন পাপ, না জেনেও তা করে অহল্যা পাষণ হয়েছিলেন, এক পুরুষের প্রতি অনুগত থাকাই পুণ্য, তাতে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, এইভাবে চলতে চলতে একদিন মৃত পুরুষের চিতায় তাদের তুলে দিয়ে নিশ্চিত হলো সমাজ।... সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি যদি হয় পরিবার, যদি সে পরিবার প্রথাকে মান্য করতে হয় তাহলে তো সবাইকেই তা করতে হবে! মেয়েদের মধ্যে যদি নিষ্ঠা দীর্ঘদিনের ট্রেনিংয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বা তা হবে না কেন?”^{১৩}

উপন্যাসের সমাপ্তিতে উপন্যাসিক একজন ‘খারাপ ছেলের’ জন্য শাস্তিও বিধান করেন যে শাস্তি আসলে এতদিন ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিপীড়িত নারীগুলির পক্ষ থেকেও এবং শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকেও।

“আমাদের দেশে পতিতা বৃত্তি কার্যত বেআইনি। সাপ্রেশন অভ ইমমরাল ট্রাফিক ইন উইমেন এন্ড গার্লস অ্যাক্ট ১৯৫৬, অনুসারে...বেশ্যাকে পুলিশ হাজত বাস করাতে পারে। ...কিন্তু যৌনকর্মরত পুরুষটির কি হবে তাকে কি হাজতে নেওয়া হবে? পুলিশ তা করবে না, কারণ পুরুষের ওটা দরকার। নিষিদ্ধ করবে গণ্ডির বাইরে বেশ্যাবৃত্তি। অর্থাৎ বারবধূকেও মানতে হবে লক্ষণরেখা, নাহলে ঘরগৃহস্থালি ছারখার হবে খন্দেরবাবুর। এই বৃত্তের সঙ্গে রুটি রুজি জড়িত ওই বেশ্যারও সন্তান পালন করতে হয়, তাকে শাস্তি দিলে তার সন্তান না খেয়ে থাকবে হয়তো একবেলা। তার চেয়ে হয় বন্ধ করুন বেশ্যাবৃত্তি নয়তো পূর্ণ আইনি স্বীকৃতি দিয়ে যৌনকর্মীদের বাঁচান দালাল মাস্তান পুলিশ চক্র থেকে যদি সদিচ্ছা থাকে।

লেখিকা প্রশ্ন তোলেন অপরাধী কে? বেশ্যা! না তার খন্দের! না রাষ্ট্র, যে এই বৃত্তিকে লালন করে?”^{১৪} এই প্রশ্ন আমাদের সমাজের প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের।

উপন্যাসটি আসলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক চক্ষু বিচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ। বারাজনা বলে পরিচিত পতিতাবৃত্তি করে অর্থ উপার্জনকারী নারীদের সংস্পর্শ গৃহস্থ বাড়িগুলির ক্ষেত্রে আতঙ্কের কিন্তু রাতের অন্ধকারে যাদের কারণে তাদের এই পরিণতি তাদেরকে সমাজ এক ঘরে করেনা, সমাজ নিন্দিত হলেও অপরাধযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

উপন্যাসে এক স্থানে দেখি বারাজনা গৃহে যাবার অপরাধে ধরা পড়ার পরও নিখিলের রূঢ় মনোভাবের বদল হয় না, বাড়িতে আগের মত যত্নের অভাবে যে স্ত্রীকে দোষারোপ করার স্পর্ধা তখনও সে রেখেছে, তাই বাবাকে স্ত্রীর কাজের উদ্দেশ্যে বলতে পেরেছে,- “আপনিও সমানে আশকারা দিয়ে যাচ্ছেন, নইলে বাড়ির বউয়ের এত সাহস হয়? ভদ্র বাড়ির মেয়ে ভদ্র বাড়ির বউ হয়ে খারাপ পাড়ায় যেতে লজ্জা করেনি ওর? কে বলতে পারে সেখান থেকে নষ্ট হয়ে এসেছে কিনা! ওসব এন জি ও ফি-ও অনেক দেখা আছে আমার।”^{১৫} তার বাবা অর্থাৎ কল্যাণ বাবু এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এই স্পর্ধা ও নির্লজ্জতায় যে কথার মাঝখানে বাধা দিতেও পারেননি। “এখন শুধু বলতে পারলেন তোমার স্পর্ধা তো কম নয়!- বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে আপনার। কার বাবা আপনি? আমার না ওর? দিনের পর দিন যে মেয়ে সোনাগাছি যায়... তার আর...

-তুমি অনাচার করতে যেতে পার আর অন্যের সেবার জন্যে গেলে গালি দিচ্ছ?”^{১৬} কল্যাণ বাবু ও নিখিলের এই কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হয় ব্যভিচারী হলেও সামাজিক সমর্থনে

পুরুষের স্পর্ধা বজায় থাকে, নারী অবস্থার বিপাকে পড়ে ব্যভিচারী নিয়ে জীবন বেছে নিলে ঘৃণিত ও পতিত হয়ে পড়ে, পুরুষ স্বেচ্ছায় সেই আনন্দ ভোগ করতে গিয়েও স্বাভাবিক জীবন ভোগ করার অধিকার পায়। সমাজ এই পতিতা নারীগণের স্বাভাবিক জীবনে ফেরাকে সমর্থন করে না, নরক যন্ত্রণাই তাদের আজীবন সঙ্গী। ঔপন্যাসিক জিনার স্বামী নিখিলকে এই ‘খারাপ ছেলে’দের প্রতিনিধি হিসাবে স্ত্রী-পিতা, পরিবার, সমাজের সকলের কাছে ঘৃণার পাত্র করে তুলেছেন আসলে সমাজের এক চক্ষু বিচারকেই লেখিকা উপন্যাসের সমাপ্তিতে প্রশ্টিচহুরূপে রেখে গিয়েছেন।

সমাজ সচেতন মানুষ রূপে উপন্যাসটির পরিকল্পনা আসলে ঔপন্যাসিকের সমাজের লৈঙ্গিক বৈষম্যের ভিত্তিতে করা এক পক্ষীয় বিচারের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ। বিনা তর্কে বয়ে আসা অযৌক্তিক নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্টিচহু।

তথ্যসূত্র:

- ১। বসু, বাণী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০, খারাপ ছেলে, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ২৮।
- ২। তদেব, পৃ. ১৪।
- ৩। তদেব, পৃ. ৪৪।
- ৪। তদেব, পৃ. ৪৪।
- ৫। তদেব, পৃ. ৪৮।
- ৬। তদেব, পৃ. ৫৪।
- ৭। তদেব, পৃ. ৫৪।
- ৮। তদেব, পৃ. ৬৯।
- ৯। তদেব, পৃ. ৬৯।
- ১০। তদেব পৃ. ৬৮।
- ১১। তদেব পৃ. ৬৯।
- ১২। তদেব, পৃ. ১১৫।
- ১৩। তদেব, পৃ. ১১৬।
- ১৪। সেনগুপ্ত, মল্লিকা, ২০২০, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১২২।
- ১৫। বসু, বাণী, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০, খারাপ ছেলে, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১১৭।
- ১৬। তদেব, পৃ. ১১৭।

চড়ক উৎসব : বাংলার লোকজ সংস্কৃতির এক বর্ণিল উৎসব

অরিন্দম গায়েন

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
নেতাজি সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলার লোকজ সংস্কৃতির পরিসরে যে উৎসবগুলোর একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও তাৎপর্য আছে, তার মধ্যে ‘চড়ক’ বা ‘Hook- Swing’ অন্যতম। প্রচলিত প্রবাদ ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’ বাঙালির যে উৎসবপ্রবণ মনোভঙ্গির পরিচয় দেয়, চড়ক সেই ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এই উৎসবের অবস্থান বাংলার গ্রামীণ সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত হলেও, এর তাৎপর্য শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং, চড়ক উৎসব বাঙালি সমাজে এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। চৈত্র মাসের শেষ দিনে—চৈত্র সংক্রান্তিতে আয়োজিত এই উৎসব মূলত শিবের পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, এর বহুমাত্রিক রূপ ও কার্যকারণ একে কেবলমাত্র ধর্মীয় পরিসর থেকে সরিয়ে এনে একটি লোকজ মেলায় পরিণত করেছে। শিবের গাজন, নীলপূজা, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন, মেলা, গান, নৃত্য—সব মিলিয়ে এটি হয়ে উঠেছে এক বহুমাত্রিক লোকআয়োজন। এ উৎসবে ধর্ম যেমন আছে, তেমনি আছে দেহতত্ত্ব, সামাজিক মিলন, ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ। এই ধর্ম ধর্মযন্ত্র নয়, এই ধর্ম ভক্তির প্রকাশ; যেখানে পুরোহিতের নিয়ম যতটা না মুখ্য, তার থেকেও বেশি মুখ্য হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ।

সূচক শব্দ: ইতিহাস ও উৎসবের উদ্ভব, প্রধান আচার অনুষ্ঠান, লোকনৃত্য ও লোকসংগীত, আধুনিককালে চড়ক উৎসব, উপসংহার।

মূল আলোচনা:

চড়ক উৎসবের উৎপত্তি নিয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন, এই উৎসবের শিকড় প্রাগ-আর্য সময়ে প্রাচীন অ্যানিমিজম বা প্রকৃতি পূজার মধ্যে নিহিত। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি দক্ষিণ ভারতের কোনও কষ্টসাধ্য উপাসনার ধারার প্রভাব। তবে বাংলায় এই উৎসবের প্রবর্তক হিসেবে অনেকেই ধর্মীয় সংস্কারক ধর্মঠাকুরের নাম উল্লেখ করেন। তাঁর প্রচারিত শিবপূজার একটি ধারা হিসেবে এই উৎসব বিস্তৃত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। চড়ক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘চক্র’ থেকে। চক্র>চরক>চড়ক।^১ অনেক পণ্ডিতের মতে, এই উৎসব বাংলার আঞ্চলিক কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। গ্রীষ্মের শেষে এবং বর্ষার আগমনের প্রাক্কালে যখন প্রকৃতির মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়, তখন এই ধরনের উৎসব মানুষের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটায় এবং কৃষিকাজের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মানসিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

চড়ক উৎসবের প্রস্তুতি পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার হচ্ছে “অধিবাস”। এটি মূলত সেই সময়কাল ও আচার-অনুষ্ঠানের সম্মিলন, যার মাধ্যমে ভক্ত বা সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রত এবং শিব-উপাসনার জীবন শুরু করেন। এই অধিবাস চৈত্র মাসের শুরুতেই হয় এবং এটি চড়ক পূজার জন্য আত্মশুদ্ধি, শারীরিক সংযম ও মানসিক প্রস্তুতির সূচনা হিসেবে বিবেচিত। অধিবাস শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে “অধি+বাস” অর্থাৎ কোথাও অবস্থান গ্রহণ করা বা বসবাস শুরু

করা। চড়ক উৎসবের প্রেক্ষিতে এটি বোঝায়—ভক্তেরা একটি নির্দিষ্ট স্থান যেমন শিবমন্দির, আখড়া বা নির্জন স্থানকে পবিত্র করে সেখানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (সাধারণত চৈত্র মাসব্যাপী) সাধনার উদ্দেশ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই সময় তারা মাংস, মদ, স্ত্রীসঙ্গ, ঘুম ও দৈনন্দিন সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে কঠোর ব্রত পালন করেন। অনেক সময় মাটির বিছানায় শুয়ে, নিরামিষ খেয়ে এবং নীরবতা পালনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের চর্চা করেন। অধিবাসে অংশগ্রহণকারী এই সন্ন্যাসীরা গ্রামে ‘চড়ক সন্ন্যাসী’ হিসেবে পরিচিত হন। এই অধিবাস কেবল শরীর বা আচরণের পরিবর্তন নয় এটি এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি—যার মাধ্যমে ভক্ত নিজেকে দেবতা শিবের আরাধনায় নিবেদিত করে তুলতে চায়। অধিবাস তাই চড়ক উৎসবের একটি অভ্যন্তরীণ সাধনার পর্ব যেখানে আত্মত্যাগ, শুদ্ধতা ও একাগ্রতার চর্চা মুখ্য হয়ে ওঠে। এই আচার উৎসবের গভীরতা ও পবিত্রতাকে আরও তীব্র করে তোলে।

চড়ক উৎসবে সন্ন্যাস ব্রত হলো এমন একটি কঠোর আত্মনিবেদিত আচার, যেখানে ভক্ত ব্যক্তি (পুরুষ বা নারী) নিজেকে শিবের সেবায় উৎসর্গ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংসারজীবন ও দৈনন্দিন ভোগবিলাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকেন। এই ব্রত মূলত চৈত্র মাসব্যাপী পালন করা হয় এবং চড়ক পূজার দিন তা পূর্ণতা লাভ করে। “সন্ন্যাস” শব্দটি এসেছে “সংন্যাস” থেকে যার অর্থ ত্যাগ। এই ব্রতের মূল ভাবনা হলো আত্মত্যাগ ও শিবভক্তির মাধ্যমে দেহ ও মনের শুদ্ধি সাধন। যারা এই ব্রত গ্রহণ করেন তারা পরিচিত হন ‘চড়ক সন্ন্যাসী’ নামে। তারা সাধারণত গেরুয়া বা সাদা পোশাক পরিধান করেন, খালি পায়ে চলেন এবং ব্রতকালীন সময়টুকু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কাটান। সন্ন্যাস ব্রতের নিয়মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- উপবাস ও নিরামিষ আহার
- মাটি বা ছাউনিতে রাত্রি যাপন
- ব্রহ্মচর্য পালন
- মদ-মাংস, ধূমপান প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা
- দেহকে কষ্ট দিয়ে ধ্যান ও শিবচর্চা করা (যেমন—পিঠে বড়শি গাঁথা, গড়াগড়ি দেওয়া)
- সেবার কাজ, দান ও শিবসংকীর্তনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

এই ব্রত কেবল ভক্তির প্রকাশ নয়, এটি একটি তপস্যাও। শিবভক্তরা মনে করেন, এই ব্রতের মাধ্যমে শিবের কৃপা লাভ সম্ভব এবং সকল পাপ মোচন হয়। সন্ন্যাস ব্রত তাই চড়ক উৎসবের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে, যা এই লোকোৎসবকে ধর্মীয় সাধনার একটি মহৎ রূপ দেয়।

চড়ক উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ একটি আচার হল পাটদান। “পাট” শব্দের অর্থ এখানে হচ্ছে ব্রতের প্রতিশ্রুতি বা মানত এবং “দান” মানে উৎসর্গ বা নিবেদন। অর্থাৎ পাটদান বলতে বোঝানো হয় কোনও ব্যক্তির মানসিক বা পার্থিব ইচ্ছাপূরণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর—বিশেষ করে শিবের—কাছে প্রতিজ্ঞা করা এবং সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ হলে একটি নির্দিষ্ট ব্রত বা কষ্টসাধ্য আচার পালনের অঙ্গীকার নেওয়া। অনেক সময় মানুষ রোগমুক্তি, সন্তান লাভ, অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা কোনও সংকট থেকে মুক্তির জন্য শিবের কাছে মানত করে—যদি ইচ্ছাপূরণ হয় তবে চড়ক উৎসবে পাট দেবে। পাটদানের অর্থ সে ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবারের কেউ চড়ক ব্রতের সন্ন্যাসী হবে বা বড়শি গাঁথা, দণ্ড কাটা, গড়াগড়ি দেওয়া ইত্যাদি কষ্টকর আচার পালন করবে। পাটদান মূলত শিবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক প্রতীকী মাধ্যম। এটি লোকবিশ্বাসের গভীর

দিক তুলে ধরে যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে যে, শিবকে তুষ্ট করলে সব দুঃখ দূর হয়। গ্রামবাংলায় আজও এই পাটদানের রেওয়াজ প্রচলিত আছে যা চড়ক উৎসবকে আরও ব্যক্তিগত ও আবেগময় করে তোলে।

চড়ক উৎসবে পাটনাচানি একটি লোকবিশ্বাসভিত্তিক আচার যা পাটদান সংক্রান্ত এক বিশেষ রীতিকে বোঝায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, যে ব্যক্তি কোনো মানত (পাট) পূরণের জন্য নিজের শরীরকে শারীরিক কষ্ট দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি প্রকাশ করে তাকে পাটনাচানি বলা হয়। ‘নাচানি’ শব্দটির মূল অর্থ হলো নৃত্য বা নাচ করা। তবে চড়ক উৎসবে এটি কেবল নাচ নয়—এটি একধরনের ধর্মীয় পরিবেশে সংগঠিত দেহনৃত্য ও কষ্টসাধ্য আচার। পাটনাচানিরা সাধারণত পাটদানকারী ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে চড়কসন্ম্যাসী বা দণ্ডী হয় এবং সেই মানতের পাট পালন করে। তারা দণ্ড নেয়, বড়শি গাঁথে, আগুনের উপর দিয়ে হাঁটে বা গড়াগড়ি দেয়। সেই সময় অনেকেই শিবের নাম জপ করতে করতে “নাচে” বা উদ্ভাদনার ভঙ্গিতে শরীর দুলিয়ে এই আচার সম্পন্ন করে। এই আচারে ‘নাচা’ মানে হচ্ছে শরীরের ভেতরের ঈশ্বরপ্রেম বা ভক্তির ভাবপ্রকাশ। কখনো কখনো এই পাটনাচানিরা এক ধরনের উন্মত্ত অবস্থায় পৌঁছায়, যা লোকবিশ্বাসে ঈশ্বর-আবিষ্ট হওয়া বলে ধরা হয়।

চড়ক উৎসবের অন্যতম চমকপ্রদ এবং দর্শনীয় আচার হলো উড়োভোগ। এটি এক ধরনের কষ্টসাধ্য ভক্তিপূর্ণ আচার, যেখানে শিবের উদ্দেশ্যে নিজের শরীরকে উৎসর্গ করে এক বিশেষভাবে ভক্তরা শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেন। উড়োভোগ শব্দটি এসেছে “উড়ে ভোগ দেওয়া” থেকে। এই আচারে একজন চড়ক সন্ম্যাসী বা পাটনাচানির পিঠে লোহার বড়শি গেঁথে তাঁকে চড়ক গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘোরানো হয়। এই ঘূর্ণন চক্রাকারে হয়, এবং সন্ম্যাসী বাতাসে শূন্যে “উড়তে” থাকেন—এইজন্য এই আচারকে উড়োভোগ বলা হয়। এটি শিবকে ‘ভোগ’ বা নিবেদন করার একটি প্রতীকী উপায়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই দুঃসহ শারীরিক কষ্ট সহ্য করে যে ভক্ত উড়োভোগ দেন, তার পাপ মোচন হয় এবং শিবের আশীর্বাদ লাভ হয়। অনেক সময় এটি কোনো মানত পূরণের অংশ হিসেবেও করা হয়। উড়োভোগ আচারটি শুধু ভক্তির নিদর্শন নয়, এটি একজন ভক্তের ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনের চূড়ান্ত রূপ। যদিও আধুনিক কালে এই প্রথা অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ বা সীমিত করা হয়েছে তবুও কিছু অঞ্চলে এখনো এই প্রথা প্রচলিত আছে বিশেষ করে গোপনে বা প্রতীকীভাবে। উড়োভোগ চড়ক উৎসবের এক গভীর ধর্মীয় ও শারীরিক সাধনার রূপ যা বাংলার লোকবিশ্বাস ও চেতনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

চড়ক উৎসবে সন্ম্যাস ব্রতের অংশ হিসেবে ভক্তরা নানা ধরনের দেহকষ্টমূলক আচার পালন করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইটি হলো—কাঁটা সন্ম্যাসী এবং আগুন সন্ম্যাসী। এরা উভয়েই শিবভক্ত সন্ম্যাসী, যারা নিজেদের দেহ ও মনকে শিবের পূজায় উৎসর্গ করে নানা কষ্টসাধ্য আচার সম্পন্ন করেন। “কাঁটা” শব্দটি এখানে বোঝায় শরীরে লোহার বড়শি বা কাঁটা গেঁথে নেওয়া। কাঁটা সন্ম্যাসীরা পিঠে, কাঁধে বা হাতের চামড়ায় লোহার বড়শি গেঁথে তাতে দড়ি বেঁধে চড়ক গাছে ঝুলে বা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় শূন্যে ভেসে থাকেন। এই আচারে বিশ্বাস করা হয়—ভক্ত যদি শারীরিক যন্ত্রণাকে জয় করে ভক্তিভাবে এই কাঁটা সয়ে নেয় তবে শিবের কৃপা লাভ হয় এবং সকল পাপ ধুয়ে যায়। অনেক সময় এটি কোনো মানতের প্রতিফলন হিসেবেও করা হয়। আগুন সন্ম্যাসীরা চড়ক উৎসবের দিন আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যান, কখনো বা জ্বলন্ত কয়লার উপর গড়াগড়ি দেন, আবার কখনো আগুনে দাঁড়িয়ে শিবের নাম জপ করেন।

আগুন তাদের জন্য শুধু উপাদান নয়, এটি একপ্রকার আত্মশুদ্ধির প্রতীক। আগুনের মধ্য দিয়ে চলা মানে শিবের শক্তিকে অন্তরে গ্রহণ করা, ভয়ের উপর জয় লাভ এবং আত্মার বিশুদ্ধতা অর্জন করা।

চড়ক উৎসবের অন্যতম জনপ্রিয় এবং রঙিন উপাদান হলো দশাবতার নৃত্য। এটি একটি লোকনাট্যধর্মী নৃত্য-আচারের রূপ, যেখানে দশজন চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন সাজে দেবতা বিষ্ণুর দশটি অবতারের রূপে আবির্ভূত হন এবং লোকগাথা বা পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে সেই অবতারদের কর্ম ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। “দশাবতার” শব্দটি এসেছে “দশ” (অর্থাৎ দশটি) এবং “অবতার” (অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতার) থেকে। এই দশ অবতার হলেন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ (কখনও কখনও কঙ্কি অবতারও অন্তর্ভুক্ত হয়)। এইসব অবতারদের অভিনীত রূপে সাজা অভিনেতার গান, বাদ্যযন্ত্র ও সংলাপের মাধ্যমে মঞ্চে বা গ্রাম্যমাঠে অভিনয় করেন। দশাবতার নৃত্য শুধু ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ নয়, এটি এক ধরনের লোকনাট্য—যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পৌরাণিক কাহিনি ও নৈতিক শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়। এই নৃত্য প্রায়শই ঢোল, কাঁসর, করতাল ইত্যাদি লোকবাদ্যের তালে পরিবেশিত হয় এবং আনন্দ, ভক্তি ও উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

চড়ক উৎসব কেবল ধর্মীয় ভক্তি নয়, এটি এক বিশাল লোকসংস্কৃতি ও গণরঙের উৎসব। এর নানা অঙ্গের মধ্যে চাষা নৃত্য ও মুখা নৃত্য দুটি উল্লেখযোগ্য, যা উৎসবের আনন্দঘন পরিবেশে সামাজিক বার্তা ও বিনোদনের সংমিশ্রণ ঘটায়। “চাষা” শব্দটি এসেছে “চাষা-মেহেতার” অর্থাৎ কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ থেকে। চাষা নৃত্য হলো একপ্রকার লোকনাট্যধর্মী নৃত্য, যেখানে চাষাভুষো পোশাকে সাজা শিল্পীরা কৌতুক ও সংলাপের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট ও সামাজিক বাস্তবতা উপস্থাপন করেন। এরা সাধারণত মুখে কড়া মেকআপ, হাস্যরসাত্মক ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে দর্শকদের আনন্দ দেন এবং একপ্রকার বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতির প্রতি ইঙ্গিত করেন। এই নৃত্যে অনেক সময় ‘চাষানী’ অর্থাৎ নারী চরিত্রও অংশ নেয়, যা পুরো পরিবেশকে আরও রঙিন করে তোলে। “মুখা” শব্দের অর্থ মুখোশ। মুখা নৃত্য হলো এমন এক লোকনৃত্য, যেখানে শিল্পীরা বিভিন্ন পশু, দেবতা বা পৌরাণিক চরিত্রের মুখোশ পরে তালে তালে নাচেন। এই নৃত্য অনেকটা ধ্রুপদী উপস্থাপনার মতো হলেও এতে রয়েছে গ্রামীণ আবেগ ও শক্তিশালী ভঙ্গিমা। মুখা নৃত্য সাধারণত পৌরাণিক কাহিনি বা রাক্ষস-দানবের প্রতীকী রূপে পরিবেশিত হয়।

চড়ক উৎসবে খেঁজুর ভাঙ্গা একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার এবং প্রতীকী আচার, যা সাধারণত উৎসবের শেষ দিন বা চড়কপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি শুধুমাত্র একটি উপকরণভিত্তিক ক্রিয়া নয় বরং তাতে নিহিত রয়েছে গভীর ধর্মীয়, প্রতীকী ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। খেঁজুর ভাঙ্গা বলতে বোঝানো হয় একটি প্রতীকী খেঁজুর গাছ বা কাঠামো ভেঙে ফেলা যা সাধারণত খড়, কাপড়, বাঁশ ও রঙিন কাগজ দিয়ে তৈরি হয়। এই খেঁজুর গাছ সন্ধ্যাস, তপস্যা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ভক্তির প্রতীক। সন্ধ্যাসীরা উৎসবকালীন কঠিন ব্রত পালন শেষে এই প্রতীকী খেঁজুর গাছ ভেঙে একটি আচার সম্পন্ন করেন। এই ভাঙা বোঝায়—তাঁরা তাঁদের সন্ধ্যাস ব্রতের সমাপ্তি টানলেন এবং শিবের প্রতি তাঁদের অর্ঘ্য পূর্ণ হলো। এই ভাঙনকে অনেকেই দেখেন পাপ, দুঃখ, ক্রোধ ও অহংকারের সমাপ্তি হিসেবে। লোকবিশ্বাসে, খেঁজুর ভাঙলে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে এবং শিবের কৃপা লাভ হয়। অনেক ক্ষেত্রে এটি মানত পূরণেরও প্রতীক। এছাড়া খেঁজুর ভাঙ্গা অনুষ্ঠানটি একাধারে একটি দর্শনীয় জনসমাগম ও আনন্দঘন সামাজিক

উৎসব হয়ে ওঠে। মানুষ ভিড় করে এই আচার প্রত্যক্ষ করতে এবং এটি চড়ক উৎসবের এক নাটকীয় ও চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বিবেচিত হয়।



চিত্র : সেকাল একাল চড়ক: উৎসবের পথে সময়ের ছাপ

চড়ক উৎসবে “বাণফোঁড়া” হলো একটি প্রাচীন ও তীব্র ভক্তিবিশিষ্ট আচার, যেখানে সন্ন্যাসীরা নিজেদের দেহে লোহার বাণ বা কাঁটা বিদ্ধ করে দেবতা শিবের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা, তাগ ও আত্মসমর্পণ প্রকাশ করেন। এই রীতিটি চড়ক উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ এবং ধর্মীয় তপস্যার এক উগ্র ও দেহজ প্রকাশ। “বাণফোঁড়া” শব্দটি এসেছে ‘বাণ’ অর্থাৎ ধনুকের তীর এবং ‘ফোঁড়া’ অর্থাৎ বিদ্ধ করা বা ঢুকিয়ে দেওয়া—এই দুইটি শব্দ থেকে। মূলত একটি লম্বা ও সরু লোহার কাঁটা বা তীর সন্ন্যাসীর পিঠের চামড়ার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এই বাণের দুই প্রান্তে দড়ি বেঁধে তাঁকে চড়কগাছে ঘোরানো হয়, যাকে বলে চড়ক ঘূর্ণি। এই আচার সাধারণত শুধুমাত্র সেইসব সন্ন্যাসীরা পালন করেন যারা ব্রত সঙ্গতভাবে পালন করে বছর ধরে কঠোর সাধনায় নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, এই যন্ত্রণার মাধ্যমে শরীর থেকে পাপ বের হয়ে যায়, ঈশ্বর প্রসন্ন হন এবং সমাজের কল্যাণ ঘটে। ‘১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রাণহারী প্রথা চিরতরে রদ করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হয় এবং বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে ক্রমশ এটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট বিডন সাহেব ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সাথে পরামর্শ করে চড়কের সময় বাণফোঁড়া বেআইনি কাজ বলে ঘোষণা করেন। বাণফোঁড়া বেআইনি ঘোষিত হবার পর এটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু হুগলি জেলার উক্ত বৎসরে তিনজন সন্ন্যাসী বাণফোঁড়ার জন্য গ্রেপ্তার হন’।^২

চড়ক উৎসবের নাম শুনলেই যে দৃশ্যটি সবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হলো—চড়ক ঘূর্ণি। এটি উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয়, বিস্ময়কর এবং কষ্টসাধ্য আচারগুলোর মধ্যে একটি যা বছ বছর ধরে বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। “চড়ক ঘূর্ণি” বলতে বোঝানো হয় একটি উঁচু লম্বা দণ্ড বা খুঁটির মাথায় বাঁধা থাকে একটি ঘূর্ণায়মান চাকা বা কাঠামো যেটিকে বলা হয় চড়ক গাছ। এই কাঠামোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একজন বা একাধিক সন্ন্যাসীকে—যাদের শরীরের পিঠে লোহার বড়শি গোঁথে দেওয়া হয়। এরপর সেই কাঠামোকে ঘোরানো হয় ফলে সন্ন্যাসীরা শূন্যে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় থাকে, যেন আকাশে উড়ছেন। এই আচার অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক কিন্তু ভক্ত সন্ন্যাসীরা এই যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন—শিবকে তুষ্ট করার জন্য, মানত পূরণের জন্য বা পাপ মোচনের জন্য।

এটি শুধুমাত্র দেহসাধনার বহিঃপ্রকাশ নয় বরং একধরনের আত্মিক সাধনা ও ঈশ্বরের প্রতি চূড়ান্ত আত্মনিবেদনের প্রতীক। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই কষ্টসাধ্য আচার পালনের ফলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যায়, দুর্দশা দূর হয় এবং শারীরিক যন্ত্রণা পবিত্রতার রূপ নেয়। চড়ক ঘূর্ণি শিবের প্রতি ভক্তি প্রকাশের এক অসাধারণ রূপ যা শারীরিক সাহস, আত্মত্যাগ এবং ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়। এই দৃশ্য দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে। গ্রামীণ সমাজে এটি একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগের প্রতিফলন তেমনিই অন্যদিকে এক ধরনের লোকরঞ্জনমূলক আয়োজন। উৎসবের আবহ, ঢাক-ঢোলের শব্দ, মানুষের উল্লাস—সব মিলিয়ে এটি এক ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্যের রূপ ধারণ করে। চড়ক ঘূর্ণি শুধু একটি শারীরিক কৌশল নয়, এটি ভক্তির চরম প্রকাশ। এই আচার শারীরিক কষ্টের ভেতর দিয়ে আত্মার শুদ্ধি এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতীকায়িত করে। চড়ক উৎসবের এই অংশটি তাই বাংলার লোকজ ধর্মীয় সংস্কৃতির এক জীবন্ত নিদর্শন।

চড়ক উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীন ধর্মীয় আচার হলো নীল পূজো। এটি মূলত শিবের একটি লোকাবাসী রূপ—নীলকণ্ঠ শিব—এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত পূজা যা চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ চড়ক উৎসবের মূল দিনেই অনুষ্ঠিত হয়। লোকবিশ্বাস অনুসারে, এই দিনে শিব তাঁর কণ্ঠে বিষ ধারণ করে সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন—এই কারণে তাঁকে বলা হয় “নীলকণ্ঠ”। সেই ত্যাগ, কষ্ট এবং সৃষ্টির প্রতি শিবের ভালোবাসার স্মরণেই এই পূজো অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ বাংলায় এই নীল পূজো বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভক্তরা এই পূজায় অংশগ্রহণ করেন। নীল পূজায় সাধারণত শিবলিঙ্গ বা শিবমূর্তিকে গঙ্গাজল, দুধ, বেলপাতা, ধূপ, প্রদীপ, সিন্ধি ও নানা উপাচারে পূজা করা হয়। অনেক ভক্ত উপোস থেকে পূজো করেন এবং সন্তান লাভ, মানত পূরণ, রোগমুক্তি বা মঙ্গল কামনায় শিবের কাছে প্রার্থনা করেন। অনেক ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীরাও এই পূজোর মাধ্যমে তাঁদের ব্রতের সূচনা বা সমাপ্তি করেন। এই পূজো চড়ক উৎসবের মধ্যে একটি শান্ত, ভক্তিময় ও আন্তরিক আচার যা ভক্তের আত্মনিবেদন, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরপ্রেমকে প্রতিফলিত করে।

চড়ক উৎসবে অষ্টক গান এক বিশেষ ধরনের ভক্তিমূলক লোকগান যা সন্ন্যাসীরা তাঁদের ব্রত পালনের সময় গেয়ে থাকেন। এই গানে সাধারণত শিবের গুণকীর্তন, তপস্যার মহাত্ম্য, ভক্তের কষ্ট সহ্য করার কথা এবং লোকজ ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ পায়। অষ্টক শব্দের অর্থ ‘আট’—এই গানের প্রতিটি স্তবকে আটটি চরণ বা পংক্তি থাকে, সেই থেকেই এ নাম। এই গানগুলো চড়ক ব্রত পালনের সময় বিশেষ করে রাত্রিকালীন ভ্রমণ, সন্ন্যাসীদের ঘোরাণা, পাটদান বা তপস্যার মুহূর্তে গাওয়া হয়। গানের সুরে থাকে একধরনের ধ্যানী ভাব, ধীর লয় ও আবেগময়তা, যা উৎসবের আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও গাঢ় করে তোলে। অষ্টক গান সাধারণত গাওয়া হয় ঢাক, কাঁসর, ঢোল কিংবা করতালের তালে। অনেক সময় সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধভাবে গানটি গেয়ে থাকেন এবং গ্রামের মানুষ তাঁদের চারপাশে জড়ো হয়ে সেই গান শুনে অংশগ্রহণ করেন। এতে তৈরি হয় এক ধরনের ভক্তিমূলক সম্মিলিত অভিজ্ঞতা। এই গানগুলো শুধুই সঙ্গীত নয়, বরং লোকজ ধর্মচর্চা ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এগুলো মৌখিক ঐতিহ্যের অংশ, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রচলিত রয়েছে।

আধুনিককালে চড়ক উৎসব বলতে বোঝানো হয় সেই উৎসবের এক পরিবর্তিত রূপ যেখানে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও লোকজ উপাদানগুলিকে বর্তমান সমাজ ও সময়ের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উপস্থাপন করা হয়। আগেকার দিনে চড়ক উৎসব ছিল মূলত গ্রামীণ সমাজভিত্তিক,

ধর্মানুশীলনের এক নিখাদ রূপ; যেখানে সন্ন্যাসীরা শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে ভগবানের কৃপা লাভের আশায় তপস্যায় মগ্ন হতেন। কিন্তু আধুনিক যুগে এই উৎসবের কিছু আচার যেমন চড়ক ঘূর্ণি, কাঁটা গাঁথা, দেহবিদারণমূলক রীতিনীতির উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা এসেছে; পাশাপাশি অনেক এলাকায় নৈতিক ও চিকিৎসাবিদদের সমালোচনার মুখে পড়েছে। ফলে বর্তমানে এই রীতিগুলো প্রতীকীভাবে বা নাটকীয়ভাবে পালন করা হচ্ছে। আধুনিক চড়ক উৎসব এখন শুধুমাত্র ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি লোকসংস্কৃতির প্রদর্শনী, সামাজিক মিলনমেলা ও পর্যটনোৎসবে রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসবকে ঘিরে মেলা বসে, স্থানীয় শিল্পীরা নাচ-গান পরিবেশন করেন, এবং নানা রকম লোকশিল্পের প্রদর্শনী হয়। এতে স্থানীয় অর্থনীতিরও চাপা ভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পরিবর্তনের মধ্যেও উৎসবের মূল চরিত্র—ভক্তি, ত্যাগ ও একতার বার্তা—আটকে রয়েছে। অনেক শিক্ষিত ও শহরবাসী মানুষও এখন চড়কের আয়োজন ও চর্চায় অংশ নিচ্ছেন, যার ফলে এটি একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে। সার্বিকভাবে, আধুনিককালে চড়ক উৎসব মানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এক নতুন লোকজ সাংস্কৃতিক বাস্তবতা যা অতীতকে সম্মান জানিয়ে বর্তমানকে জড়িয়ে রাখে।

উপসংহারে বলা যায় যে উৎসবের শেষ দিনে নানা আচার যেমন—চড়ক ঘূর্ণি, পাটনাচানি, খেঁজুর ভাঙ্গা, নীল পূজা ও অষ্টক গান—সবকিছুর সমাপ্তির মধ্য দিয়ে চড়ক উৎসব শেষ হয়। সন্ন্যাসীরা দীর্ঘ তপস্যা ও কষ্টসাধনের পর নিজেদের ব্রত ত্যাগ করেন এবং পুনরায় সাধারণ জীবনে ফিরে যান। এই সময় তাদের ভোগ খাওয়ানো হয়, স্নান করানো হয় এবং আশীর্বাদ নেওয়া হয়। এই পর্বে অনেক সময় শিবের উদ্দেশ্যে বিশেষ পূজা ও আরতি অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামের মানুষ ভিড় করে শিবের কৃপা প্রার্থনায় অংশ নেয়। উপসংহারে একদিকে যেমন থাকে ধর্মীয় ভাবগম্ভীরতা, তেমনি থাকে সামাজিক উৎসবের আনন্দ—যেখানে গান, বাজনা, মেলা এবং মানুষের মিলনমেলা ঘটে। চড়ক উৎসবের উপসংহার হলো একটি পূর্ণতার প্রতীক। এটি বোঝায় যে ভক্তি, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে। পাশাপাশি এটি একটি লোকজ সংস্কৃতির সমাপ্তি নয় বরং নতুন বছরে শুদ্ধ চেতনায় প্রবেশের প্রতীক।

তথ্যসূত্র:

- ১। চৌধুরী, দুলাল, বাংলার লোক উৎসব, পুস্তক বিপণী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৭৯।
- ২। মিত্র, সুধীরকুমার, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, প্রথম খন্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা -২৫৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

- ১। ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৯।
- ২। চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসংস্কৃতি তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি, জুলাই ১৯৮৫।
- ৩। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯, কলকাতা ৭০০০৭৩।
- ৪। করণ, সুধীর কুমার, সীমান্ত বাংলার লোকায়ান, আশাদীপ, জানুয়ারি ২০১৩।

তথ্যদাতা:

- ১। রামচন্দ্র কোলে (চড়ক কমিটির সভাপতি), গ্রাম + পোস্ট - আটিসাড়া, ব্লক - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯।
- ২। সুবল পাত্র (স্থানীয় মানুষ), গ্রাম + পোস্ট - আটিসাড়া, ব্লক - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯।
- ৩। রাম পাত্র (স্থানীয় মানুষ), গ্রাম + পোস্ট - আটিসাড়া, ব্লক - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৯।

বঙ্কিম প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদ

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রানাঘাট কলেজ, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাঙালির জাতিগত গৌরব ও স্বাভিমানের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি, বরং সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোয় ভারতের অতীত গৌরব, ধর্মীয় ঐক্য, সংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত, তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র* এবং *লোকরহস্য* জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে। তিনি জাতির অতীত ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন জাতি নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখবে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের একেত্র মাধ্যমে জাতীয় শক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন।

তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত ধর্মবোধের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, ধর্মকে যদি সঠিকভাবে বোঝা যায়, তবে তা সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য সহায়ক হতে পারে। এ কারণে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দেন এবং ভারতীয় সমাজে সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরিচয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে ওঠে। তাঁর *বন্দে মাতরম* গান ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশপ্রেম আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ আজও ভারতকে তার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হয়।

সব মিলিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও জাতীয়তাবাদী দর্শন শুধুমাত্র তাঁর সময়ের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছিল। তাঁর চিন্তাধারা, সাহিত্য ও আদর্শ আজও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। একজন জাতীয় পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সূচক শব্দ: বঙ্কিমচন্দ্র, বাংলা সাহিত্য, জাতীয়তাবাদ, প্রবন্ধ সাহিত্য।

মূল আলোচনা:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক। যিনি শুধু উপন্যাস রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। প্রবন্ধের মাধ্যমেও সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বাঙালির জাতিগত গৌরব ও স্বাভিমানের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখেননি, বরং সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোয় ভারতের অতীত গৌরব, ধর্মীয় ঐক্য, সংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত, তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র* এবং *লোকরহস্য* জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে। তিনি জাতির অতীত ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন জাতি নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখবে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। তিনি ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয় শক্তির বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেন।

১৮৩৮ সালের ২৭ জুন চব্বিশ পরগনা জেলার কাঁঠাল পাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিকে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা, পড়ে হুগলির ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ব্যাচে যে দুজন ছাত্র বিএ পাস করেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিম্ন নির্বাহী চাকরিতে যোগ দেন (সাব-অর্ডিনেট এক্সিকিউটিভ সার্ভিস) এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদের দীর্ঘদিন চাকরি করেন।^১

‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির বিষয় ছিল সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্মকথা, দর্শন, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি। Bengali Literature (১৮৭১) প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। ‘The Calcutta Review’ পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও লঘু কৌতুক এবং স্বদেশ চিন্তাবিষয়ক ছিল লোকরহস্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইসের (১৭৮৫-১৮৫৯) ‘Confessions of an English Opium Eater’-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে প্রবন্ধ সাহিত্যে চিন্তাপ্রধান এবং রসপ্রধান উভয় ধারার বিশেষ উন্নতি ঘটে। বঙ্কিমের সৌন্দর্যপ্রধান প্রবন্ধ লোকরহস্য ব্যঙ্গরসে এবং কমলাকান্ত কখনও রোমান্টিক উপলব্ধিতে সার্থক। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃতানুগ ধারাটি অস্বীকার করে ইংরেজি রোমান্টিক সমালোচনার ধারাটি নিয়ে এলেন। ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক প্রবন্ধে তিনি উদারমুক্ত মনোভাব এবং বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি তথা গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। অর্থনৈতিক প্রবন্ধে সাম্যবাদের পক্ষে মত আর নিকাম কর্মের আদর্শ প্রচার তাঁর শেষের দিকের প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনার শুরুতেই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত জাতি বিষয়ক ধারণা। তিনি যে জাতির কথা বলেছেন সেটির কৌমগত, ভৌগোলিক ও সামাজিক উপাদানের ব্যাপারে ধোঁয়াশা আছে। তিনি ‘ভারতীয়’ শব্দটি যে অর্থে আমরা শব্দটি বর্তমানে ব্যবহার করি, সেই অর্থে ব্যবহার করেননি। তাঁর বিচারে ‘ভারতীয়’র পরিধিতে কেবল ‘বাঙালি’ ও ‘হিন্দু’ও কখনও কখনও ঢুকে পড়েছে।

সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর ‘দ্য আনহ্যাপি কনশাসনেস’ গ্রন্থে (প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) লিখেছেন, এটাই হল কল্পনাপ্রসূত ইতিহাস (imaginary history) লেখার সুবিধা। ধ্যানধারণাগত অনির্ণেয়তা (Conceptual indeterminacy)-র বালাই সেখানে নেই। সুদীপ্ত কবিরাজ লিখেছেন, “Such writers use fuzziness of the community to give their audience a community which had not existed before, by gradually conceiving a community called the nation.”^২

এমন নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় মুসলমান শাসন (তুর্কি শাসন বা মুঘল শাসন)-কে বিদেশি শাসন বলে গণ্য করেননি। তবে, বঙ্কিমের জাতি সংক্রান্ত ভাবনায় মুসলমানকে জায়গা দেওয়া নিয়ে সংশয় ও জটিলতা ছিল। তপন রায়চৌধুরীর ‘ইউরোপ রিকনসিডার্ড’ (প্রকাশক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)-এ এই ধারণা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে।^৩ বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে কোনও ব্যতিক্রম নন, এবং সম্ভবত ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না।

ঐতিহাসিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল জাতীয়তাবোধ জাগরণের অন্যতম উপায় হল কল্পিত ঐতিহাসিক। অতীতের স্বর্ণযুগের সঙ্গে (যেটা বহুলাংশে কল্পিত কিংবা ঐতিহাসিক নথি কর্তৃক সমর্থিত নয়) বর্তমানের হতশ্রী দশার তুলনা। পরম্পরা ও ঐতিহ্যের প্রতি জনগণের একটা আস্থাঘাচক আকর্ষণ তৈরি হবে, যেটা জাতীয়তাবাদের বিকাশে কাজে লাগবে।

বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, হিন্দুরা কখনও অতীত নিয়ে, ইতিহাস নিয়ে, স্মৃতিকে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে মাথা ঘামায়নি। ফলে হিন্দুর কোনও ইতিহাস সার্থকভাবে গড়ে ওঠেনি। সেই ইতিহাস নির্মাণের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বঙ্কিম। তিনি বললেন, “বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।”^৪ তিনিই জানালেন, “সাহেবেরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।”^৫ বঙ্কিম বুঝেছিলেন সঠিক ইতিহাস-জ্ঞান একটি জাতির উত্থানের জন্য আবশ্যিক। আর মিথ্যা, বিকৃত ইতিহাস যে একটি জাতিকে ভিতর থেকে ফাঁপা করে দিতে পারে তাও তিনি বুঝেছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র” প্রবন্ধে ইউরোপে যখন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার শৈশবাবস্থা এবং বঙ্গে যখন ইতিহাসচর্চা প্রায় শুরুই হয়নি বলা যায়, সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনা ও ইতিহাস-লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিম মিনহাজ উস সিরাজের তবকৎ-ই-নাসিরী-তে প্রাপ্ত বখতিয়ার খলজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনিতে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, “সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।”^৬ তিনি এই ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে করেন এবং বখতিয়ার যে বঙ্গের খুব কম অংশকেই দখল করতে পেরেছিলেন, তাও উল্লেখ করেন।

পার্থ চ্যাটার্জি তাঁর ‘ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল ওয়াল্ড: আ ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স’ (প্রকাশক জেড বুকস, লন্ডন) বইতে দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয়দের পরাধীনত্বের কারণ হিসেবে দুটি বিষয়কে শনাক্ত করেছিলেন। এক, ভারতীয়রা স্বভাবগতভাবে স্বাধীনতাকামী নয়। শাসক যদি অনুকূলে থাকে, শাসকের আচরণে নির্যাতন, অত্যাচার ও প্রতারণার বহিঃপ্রকাশ তীব্র ভাবে না-ঘটে, তবে, বঙ্কিমের মনে হয়েছিল, ভারতীয়রা স্বাধীন না পরাধীন তা নিয়ে বেশি একটা মাথা ঘামায় না।

দুই, ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব। ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখার প্রবণতাও স্বাধীনতার পথে সমস্যা বলে অনুভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

১৮৬৪ সালে রাশিয়ায় শিক্ষিত যুবকরা বিপ্লবী ভাবধারায় আকৃষ্ট হতে শুরু করল। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জেলা ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনকে স্বীকৃতি দান করলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে ফেললেন ‘বীরবাহু’। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র বদলি হয়ে এলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমায়। হাতে এল ‘বীরবাহু’। উগু হল স্বদেশপ্রেমের বীজ। ১৮৬৫ তে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ খেমে গেল।

১৮৬৬-তে বিসমার্কের উদ্যোগে জার্মানির একীভবনের প্রয়াস দেখা গেল। অস্ট্রিয়া আর এশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। রাশিয়াতে জার আলেকজান্ডারকে প্রাণে মারার চেষ্টা করল বিপ্লবীরা। দেশে তখন দেখা দিল ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ওড়িশায়। সেখানে সেবা ও ত্রাণকার্যের জন্য এগিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ। স্বদেশ ও বিদেশের এসব ঘটনা বঙ্কিমচন্দ্রের নজর এড়ায়নি।

১৮৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত হল চৈত্র মেলা বা হিন্দুমেলা। প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্র। ১৮৬৮-তে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা শুরু করলেন নগর সংকীর্তন। যশোহর থেকে শিশিরকুমার ঘোষ প্রকাশ করতে শুরু করলেন অমৃতবাজার পত্রিকা। আর ইউরোপে জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘Subjection of Women’ নারী স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে দিল। এই ঘটনাগুলোও ছাপ পড়েছিল বঙ্কিম-মানসে। অনেকে বলেন, ‘Subjection of Women’-এর ছায়া পড়েছিল ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের শান্তিচরিত্রে।

১৮৭০-এ ফ্রান্সের সঙ্গে এশিয়ার যুদ্ধ বেধে গেল। ওদিকে জাতীয়তাবাদের স্কুরণে আয়ারল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হল হোমরুল লিগ। ইতালি গর্জে উঠল পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ শুরু হল সেদেশে। স্বদেশের সাঁওতাল পরগনায় তখন কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। এরই মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখে ফেললেন ‘ভারত সঙ্গীত’। বঙ্কিমচন্দ্র ততদিনে এসে গিয়েছেন বহরমপুরে।

এইসময়ে তিনি লিখলেন ধর্মতত্ত্ব। ‘ধর্মতত্ত্বে’ই বঙ্কিম তুলে ধরলেন অনুশীলন বিষয়ক ধারণা। অনুশীলনের মূলে আছে ভক্তি। জ্ঞান ও কর্তব্য, এই দুই ধারায় এটি বিভক্ত। বঙ্কিম বললেন, পশ্চিমে গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জ্ঞান পেতে হলে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র অনুশীলনকারী হলে সেসবের আবশ্যকতা হয় না। ‘ধর্মতত্ত্ব’ ও ‘কৃষ্ণচরিত্রের’ সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্র করলেন সেই জাতি মূলত পুরুষ, আরও স্পষ্ট করে বললে, উচ্চবর্ণের পুরুষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। তনিকা সরকার তাঁর ‘হিন্দু ওয়াইফ, হিন্দু নেশন: কমিউনিটি, রিলিজিয়ন অ্যান্ড কালচারাল ন্যাশনালিজম’ (প্রকাশক পার্মানেন্ট ব্ল্যাক) গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

‘লোকরহস্য’ এবং ‘কমলাকান্তর দগুণ’-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করেছেন। এই সকল প্রবন্ধেই তিনি ধর্ম ও রাজনীতির পুরোদস্তুর বিচ্ছেদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। বলেছেন, ইউরোপে ধর্ম শান্তিপ্রিয়, নম্র, ক্ষমশীল কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহের সূত্রে তা হিংস্রতার জন্মদাতা। এমনটা ভারতের ক্ষেত্রে হতে বাধ্য যদি ভারতও ইউরোপ অনুসারী হয়। কৃষ্ণচরিত্রে তিনি সেটাকেই তুলে ধরেছেন। নৈতিকতার প্রশ্নে বঙ্কিমের কোনও আপসকামিতা ছিল না। তাই তিনি ত্যাগ,

আত্মোৎসর্গ এবং আত্ম বিসর্জনকে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বৈরাগীরাই জাতীয়তাবাদী বন্ধিমের দৃষ্টিতে প্রকৃত রাজনীতিক, আসল যোদ্ধা।

কার্ল মার্ক্স বিরচিত Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie অর্থাৎ “মূলধন, অর্থনীতির রাজনৈতিক আলোচনা” অথবা শুধুই ‘ডাস কাপিটাল’ যা কিনা সারা বিশ্বে সাম্যবাদের ইজারা নিয়ে রেখেছে, সেই পুস্তকটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। প্রথম ইংরাজি অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে। বন্ধিমচন্দ্র সাম্যের পশ্চিমী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি নিজে লিখেছে, “সাম্যনীতি নতুন তত্ত্ব নহে। কিন্তু ইউরোপীয়রা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি – সেইরূপ লিখিয়াছি। আরও, স্বদেশীয় জনসাধারণকে এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছি। সুশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য কিছু না পান, আমি দুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অঙ্কুরিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব।” ১৮৭৩ সালে পাবনা-সিরাজগঞ্জে প্রজা বিদ্রোহ হয়। তার কিয়দকাল পূর্বেই বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল এবং বন্ধিম সেখানে “বঙ্গদেশের কৃষক” নামক একটি ধারাবাহিক আলোচনা লেখেন। এই আলোচনায় বন্ধিম উক্ত বিদ্রোহের কারণ যে কৃষক মহলে যে অসন্তোষ তার বিশ্লেষণ করেন। কার্ল মার্ক্সের কতিপয় ঐতিহাসিক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী উক্তি মध्ये অন্যতম হল, The history of all previous societies has been the history of class struggles। “বঙ্গদেশের কৃষক” প্রবন্ধে বন্ধিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, “বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী।”^৭

“বঙ্গদেশের কৃষক”এর আলোচনা তিনি যেখানে শেষ করেছিলেন “সাম্য” শুরু হয়েছিল সেই বিন্দু থেকে। সাম্যতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের অবতারণা করেছিলেন। যথা, “শ্রমোপজীবীদের যে পরিমাণে দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহাদিগের সহিত সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের তারতম্য অধিক হইতে লাগল। প্রথমে ধনের তারতম্য – তৎফলে অধিকারের তারতম্য।” বারবার মার্ক্সের উক্তি দ্বারা এই নিবন্ধ ভারাক্রান্ত না করেই বলতে পারি যে মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সাথে বন্ধিমের এই বিশ্লেষণের খুব একটা তারতম্য নেই। বন্ধিম সরাসরি কারণ দর্শিয়েছেন, “..... শ্রমের বেতন অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্র। ইহা বৈষম্যবর্দ্ধক।”

স্বভাবতই ভগবান বলে স্বীকৃত কোন অতিপুরুষের জীবনী লিখতে বসলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাই উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন তুলসীদাসকৃত ‘রামচরিতমানস’। কিন্তু কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠাতা কানাইলাল মনেকলাল মুঙ্গী তাঁর বিখ্যাত সাত খণ্ডে সমাপ্ত কৃষ্ণ জীবনী “কৃষ্ণাবতার” এর ভূমিকাতে বলেছেন, Wise and valorous, he was, loving and loved, far seeing and yet living for the moment, gifted with sage-like detachment and yet intensely human; the diplomat the sage and the man of action with a personality as luminous as that of a divinity। আমার এই ধারণা জন্মেছে যে এই প্রবন্ধে বন্ধিম আশ্রয় প্রয়াস পেয়েছেন কৃষ্ণকে এক জন মানুষ, অপিচ এক মহামানব রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি তাঁর কৃষ্ণচরিত্র শুরু করেছেন কৃষ্ণের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের কথা বলে। ‘প্রথম পরিচ্ছেদ – গ্রন্থের উদ্দেশ্য’এ বন্ধিম লিখেছেন, “বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণ-

উৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণায়াত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীত, সকল মুখে কৃষ্ণনাম ভিখারী 'জয় রাধেকৃষ্ণ' না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘণার কথা শুনিলে 'রাধেকৃষ্ণ' বলিয়া আমরা ঘণা প্রকাশ করি। বনের পাখি পুষিলে তাকে 'রাধেকৃষ্ণ' নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।”^৮

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক বাঙালির যখন ‘আত্ম’বোধ তৈরি হচ্ছে, তখন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ দানা বাঁধছে এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটছে। শিক্ষিত আধুনিক বাঙালিকে অনেকখানিই নির্মাণ করেছে ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি। ফলে, যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা ইংরেজ ঔপনিবেশিকতা বাঙালিকে নির্মাণ করলো; তারই বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করলো। অথচ, তাকে অস্বীকার করতে পারছে না আধুনিক বাঙালি। ফলে এই দ্বৈততা আধুনিক বাঙালির একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল।

উনিশ শতকের শেষদিকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধে বঙ্কিম জানিয়েছেন যে, দেশের মঙ্গল অর্থে হাতে গোনা মানুষের মঙ্গল হয়েছে। কৃষক সম্প্রদায় যারা ভারতের জনসংখ্যার সিংহভাগ — তাদের কোনো মঙ্গল নেই। ‘কমলাকান্তের দণ্ডুর’-এর ‘বিড়াল’ নিবন্ধে বিড়াল সেই সিংহভাগ বাঙালির হয়ে বলেছে — “সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?... আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?”^৯ অন্যদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত ‘শিক্ষিত’ ‘ভদ্রলোক’ বাঙালি এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পেছনে ইংরেজের উদ্দেশ্য হল কোম্পানির কাজের জন্য কেরানি তৈরি করা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার মানেই বাজার দখল করা। বাঙালি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে যত গ্রহণ করেছে, দেশীয় হস্তশিল্প, কুটিরশিল্পের ততই দ্রুত অবক্ষয় হয়ে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। ফলে শিক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে আঘাত হানার বাসনা লালন করলেও, তারা নিজেরাই ছিল ইংরেজ শাসকের কর্মচারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৫৮ সালে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে এই জাতীয়তাবাদের প্রভাব রয়েছে।

কৃষ্ণচরিত্র’-এর প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে বলেছেন — “অনুশীলন ধর্ম্মে যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ।”^{১০} এই গ্রন্থে মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে বলেছেন — “কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানব চরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।”^{১১} তিনি কৃষ্ণকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক চরিত্ররূপে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে স্বাধীন যুক্তির দ্বারা তিনি কৃষ্ণচরিত্রের অলৌকিক অংশ পরিবর্তন করে চরিত্রটিকে আপন আদর্শের প্রতিভূরূপে মহত্তর মানুষরূপে চিহ্নিত করেছেন। ‘ধর্ম্মতত্ত্ব’ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য — মানুষের শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, ক্ষুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্বলাভ সম্ভব হয়। এই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম। ‘মনুষ্যত্ব কি?’ প্রবন্ধে বলেছেন — “বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।”^{১২}

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম তুলনামূলক সমালোচনার সূত্রপাত করেন। পাশ্চাত্যের চরিত্রের সলো প্রাচ্যের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তেমনি প্রাচীন মধ্যযুগের কবিদের তুলনামূলক আলোচনা করে পরস্পরের সম্পর্ক যেমন নির্ণয় করেন, তেমনি

দুজনের মিল-অমিল দেখিয়ে দেন। যেমন ‘জয়দেব বিদ্যাপতি’ প্রবন্ধে লিখেছেন- “জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ, বিদ্যাপতির গীত, রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাজ্ঞা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।”^{১৩} ‘ভারতকলঙ্ক’, ‘বঙ্গদেশের কৃষক’, ‘বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার’, ‘বাঙালির উৎপত্তি’ প্রবন্ধে তিনি দেশ ও জাতির অতীত সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। হাসিম শেখ, রমা কৈবর্তদের দুর্দশার চিত্র তিনিই প্রথম তুলে ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য গ্রন্থ ‘কমলাকান্তের দপ্তর’। আফিমখোর কমলাকান্তের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-জাতিসং অনেক দর্শনের কথা শুনিয়েছেন। আফিমখোর কমলাকান্তের মনে হয়েছিল- ‘অপরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন স্থায়ী সুখের উৎস নাই।’

‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে মানবতার প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। ‘ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে তত্ত্বদর্শনে পৌঁছে যান। জগতে সুখ কী, দুঃখ কী, দুঃখ থেকে পরিব্রাজনের পন্থা কী, আবার তেমনি অনুশীলন ধর্মের প্রসঙ্গও নিয়ে আসেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি উদাহরন তাঁর বিশাল সাহিত্য এবং আবেগপূর্ণ বক্তৃতাগুলি। এর এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে। তাঁর তত্ত্বগুলিকে রূপান্তর এবং পুনর্ব্যাখ্যা করে, বোঝা যায় জাতীয়তাবাদ এবং দেশ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি। তাঁর কাজের অংশ কীভাবে স্বদেশী আন্দোলন এবং আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা স্পষ্ট। তাঁর রচনায়, তিনি জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর সময়কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। তবুও বিদ্রোহীদের প্রেরণার এক শক্তিশালী উৎস ছিল তাঁর লেখা। তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের গভীরে প্রোথিত ছিল তার দৃঢ় দেশপ্রেম, যা হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রতি তার অটল বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারত বিভিন্ন দিক থেকে পশ্চিমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যা তিনি ভারতীয় হতে গর্বিত হওয়ার বৈধ কারণ হিসেবে দেখেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল তার সহ-নাগরিকদের মধ্যে তাদের নিজস্ব দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আত্ম-মূল্যের পুনরুজ্জীবিত অনুভূতি জাগানো।

কাজেই আমরা বলতে পারি বঙ্কিমের ঋষিচেতনার জাগরণ একান্তভাবেই বাঙালির প্রাণের চিরন্তন মাতৃভাবনার পথেই ঘটেছিল। তিনি যখন দেশমাতৃকার মানসপ্রতিমা অন্তরে দর্শন করে বলেন: কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! তখন স্পষ্টতই তাঁর কমলাকান্ত চরিত্রটি হয়ে ওঠে মাতৃকাপরায়ণ বাঙালির হৃদয়ের প্রতিভূ।

বঙ্কিমের যুক্তিনিষ্ঠ আচরণ তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমকে একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল, যে সাগরপাড়ি দেওয়া সম্পর্কে শাস্ত্র-নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তিনি কি ভাবছেন। বঙ্কিম বলেছিলেন, “শাস্ত্র দেখার দরকার নেই। যদি মনে কর তাতে ভালো হবে, তো শাস্ত্র দেখো না।” এই বৈপ্লবিক মতাদর্শ একান্তভাবেই বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাযান থেকে বজ্রযান, বজ্রযান থেকে সহজযান তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের মতো একের পর এক ধর্মবিপ্লব ঘটেছে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী ভাবনার বীজ নিহিত ছিল তাঁর ভাবনায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সাহিত্য এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বাংলা সাহিত্যে ও ভারতীয় সমাজে এক অমূল্য অবদান রেখেছে। তিনি শুধু একজন কথাসাহিত্যিক নন, বরং একজন সমাজচিন্তক, ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক দার্শনিকও ছিলেন। তাঁর রচনায় বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা ও দেশপ্রেমের গভীর বোধ প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক পুনর্জাগরণের একটি আন্দোলন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি জাতির প্রকৃত শক্তি তার শিক্ষা, নৈতিকতা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মধ্যে নিহিত। তাঁর লেখনীতে তিনি একদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমনস্কতা ও উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলো জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে তিনি বাঙালি সমাজের সমস্যা, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সামাজিক সংস্কার ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, সত্যিকারের জাতীয়তাবাদ মানে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়; বরং তা সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর *কৃষ্ণচরিত্র* প্রবন্ধ গ্রন্থে, যেখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এক আদর্শ জাতীয় নেতা ও নীতিনিষ্ঠ শাসকের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, কৃষ্ণের নীতি ও কর্মপদ্ধতি ভারতীয়দের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে। এইভাবে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাণকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, যা তাঁর সময়ের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত ধর্মবোধের ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, ধর্মকে যদি সঠিকভাবে বোঝা যায়, তবে তা সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় ঐক্যের জন্য সহায়ক হতে পারে। এ কারণে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দেন এবং ভারতীয় সমাজে সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী জাতীয় পরিচয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা হয়ে ওঠে। তাঁর *বন্দেমাতরম* গান ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশপ্রেম আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ আজও ভারতকে তার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হয়।

সব মিলিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও জাতীয়তাবাদী দর্শন শুধুমাত্র তাঁর সময়ের জন্য নয়, বরং ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছিল। তাঁর চিন্তাধারা, সাহিত্য ও আদর্শ আজও আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। একজন জাতীয় পথপ্রদর্শক হিসেবে তিনি বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৯
- ২। সুদীপ্ত কবিরাজ, 'দ্য আনহ্যাপি কনসেসসাস: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড দ্য ফরমেশন অফ ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্স ইন ইন্ডিয়া (সোয়াস স্টাডি অন সাউথ এশিয়া), ওইউপি, নয়াদিল্লি, ১৯৯৫, পৃ.১১৩।
- ৩। তপন রায়চৌধুরী, 'ইউরোপ রিকনসিডার্ড', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড, ২০০২, পৃ.১৮৩।
- ৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিবিধ প্রবন্ধ', সম্পা: দাস, সজনীকান্ত ও চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ:৩০৭।
- ৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, সপ্তদশ মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ২৮৫।

- ৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিবিধ প্রবন্ধ', সম্পা: দাস, সজনীকান্ত ও চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ:৩৩২।
- ৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদেশের কৃষক', সম্পা: সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ ২৫৭।
- ৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র, কলকাতা, ১৮৮৬। পৃ:১-৩
- ৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্তের দণ্ডর, *বিড়াল*, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ:৬৩-৬৬।
- ১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ: আগস্ট ২০১৫, পৃ: ৯৬০।
- ১১। তদেব, পৃ: ৯৬১।
- ১২। তদেব, পৃ: ৩২৩।
- ১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিবিধ প্রবন্ধ', সম্পা: সজনীকান্ত দাস, ও ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ:৫৩।

বাণী বসুর ‘ক্ষত্রবধূ’ উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্ক

অর্ণব মল্লিক

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
কান্দরা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে বিবাহ নামক সামাজিক প্রথাকে মানদণ্ড করে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি— একটি বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক ও অন্যটি বিবাহ পরবর্তী সম্পর্ক। বিবাহ পরবর্তী নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলত দাম্পত্য সম্পর্কই প্রধান। বর্তমান সময়ে সামাজিক ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। সমকালীন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক বাণী বসু তাঁর ‘ক্ষত্রবধূ’ উপন্যাসে মহাভারতের কাহিনির প্রেক্ষাপটে দেখান দাম্পত্য-সম্পর্কের জটিলতা চিরকালীন। উক্ত উপন্যাসে তিনি গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী এই তিনজন রাজকন্যার দাম্পত্য সম্পর্ককে একালের চোখ দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এটাও দেখান যে এই তিন রাজকন্যার পোষাকী নাম চাপা পড়ে গিয়েছে দেশনাম বা পিতার নামের আড়ালে। গান্ধারীর ক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে উঠেছে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষার হাতিয়ার। রুচির অমিল সত্ত্বেও তাই ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। গান্ধারী তাঁর স্বপ্নের রাজকুমারকে পায় না। ফলে তাঁদের দাম্পত্য সফল হয় না। পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তী ও মাদ্রীর বিবাহ গান্ধারীর অনুরূপ নয়। পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তী ও মাদ্রীর প্রণয় ছিল। তবুও তা সফল হয়নি। উপন্যাসিক দেখান, এর জন্য পাণ্ডুর পৌরুষের অক্ষমতাজনিত কারণ যতটা দায়ী তার থেকেও পুত্র সন্তান লাভের বাসনায় তাঁর জীবিত অবস্থাতেই নিয়োগ প্রথায় কুন্তী ও মাদ্রীকে প্রকারান্তরে সন্তান উৎপাদনে বাধ্য করা আরো বেশি দায়ী।

সূচক শব্দ: ভূমিকা, গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের দাম্পত্য, কুন্তী ও মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর দাম্পত্য, উপসংহার।

মূল আলোচনা:

নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে বিবাহ নামক সামাজিক প্রথাকে মানদণ্ড করে দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি— একটি বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক ও অন্যটি বিবাহ পরবর্তী সম্পর্ক। বিবাহ পরবর্তী নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলত দাম্পত্য সম্পর্কই প্রধান। বর্তমান সময়ে সামাজিক ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। সমকালীন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম সাহিত্যিক বাণী বসু তাঁর ‘ক্ষত্রবধূ’ উপন্যাসে মহাভারতের কাহিনির প্রেক্ষাপটে দেখান দাম্পত্য-সম্পর্কের জটিলতা চিরকালীন। উক্ত উপন্যাসে তিনি গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী এই তিনজন রাজকন্যার দাম্পত্য সম্পর্ককে একালের চোখ দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি, গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর কথা। আর সে কথা বলতে গিয়ে উপন্যাসিক এই গান্ধারী নাম নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন কোথাও

কুরুকুলের জ্যেষ্ঠ বধুর নাম নেই। এরপরই তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গান্ধারী, কুন্তী, মাদ্রী কোনোটিই ব্যক্তি নাম নয়। কুন্তী কুন্তীভোজের কন্যা, মাদ্রীও মদ্রতনয়া আর গান্ধারী তো গান্ধার রাজকুমারী। আসলে নারী তো চিরকালই পণ্য। তাই তাদের কোনো নাম থাকতে নেই। থাকে শুধু জাতি নাম। সে না হয়, নাম না থাক। কিন্তু তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব বা বক্তব্য থাকতে পারে কি? এই জিজ্ঞাসা স্বয়ং ঔপন্যাসিকের। অবশ্য এই জিজ্ঞাসার উত্তর ঔপন্যাসিক নিজেই দিয়ে দেন। তিনি বলেন তাদের বক্তব্য থাকলেও শুনছে কে! কবির ভাষায়, *হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ*।

কুরুকুলের এই ক্ষত্রবধূদের দাম্পত্য যাপনের কথাই ঔপন্যাসিক আমাদের শুনিয়েছেন। প্রথমেই আসা যাক, গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ প্রসঙ্গে। এই বিবাহের মধ্যে ছিল না কোনো প্রণয় কিংবা পূর্বরাগ। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ব জেনেও গান্ধারী যে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন তা মূলত স্বদেশকে বাঁচাতে। গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যদি এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহলে ভীষ্মের সঙ্গে আগত নির্বাচিত বীরযোদ্ধা পুরুষেরা তাঁর স্বদেশ গান্ধার রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আর সেই যুদ্ধে গান্ধার রাজ্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে আমরা দেখি, গান্ধারী স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তাঁর কাজল কালো সুন্দর চোখ দুখানি দৃঢ় শ্বেত পট্টিতে বেঁধে ফেললেন। যদিও তিনি বললেন অন্ধ স্বামীকে অতিক্রম করবেন না বলে তিনি চোখে পট্টি বেঁধেছেন কিন্তু বুদ্ধিমতী রাজমাতা সত্যবতী ও ভীষ্ম বুঝলেন আসলে তা নয়। তাঁদের মনে হল, *জবরদস্তি দিয়ে কোনও শুভ কাজ হয় না*।

বস্তুতপক্ষে গান্ধারীর চোখের পট্টা বস্ত্রখণ্ডের ছিল না, তা ছিল জমাট অভিমানের। দাসীর বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে। দাসী কুন্তীকে চুপি চুপি বলে, *মা, আমার মনে হয় চোখ বেঁধেছে রাগে, ঘেম্মায়। তবে সে-কথা তো মুখে কোনও দিন বলবে না।...* চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া! এই চক্ষু বন্ধন স্বামীর প্রতি প্রণয়জাত নয় বলেই স্নানের সময় যখন গান্ধারী চক্ষু বন্ধন খুলে ফেলেন তখন স্নান ঘরের জানলা দিয়ে হস্তিনাপুরের যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই তিনি দুচোখ মেলে দেখেন। ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ জেনেও গান্ধারী তাঁকে বিবাহ করছেন শুনে সত্যবতী যখন গান্ধারীর কাছে জানতে চান তাঁর ধৃতরাষ্ট্রকে পছন্দ কিনা, তখন গান্ধারী বলেন, *কোন হিসাবে দেবী? আমি তো তাঁকে চাক্ষুষ দেখিনি*। আবার তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সত্যবতী যখন বলেন, *আমি ধরে নিতে পারি তোমার পাত্র পছন্দ হয়নি* তখন গান্ধারী উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন, *কখন বললাম, পছন্দ হয়নি! চাক্ষুষ করিনি এটুকুই বলেছি। কিন্তু শুনেছি তো তিনি মহাবীর, বিশালকায়, সুদর্শন। এসব তো শুনেছি*।

গান্ধারী নিজেকে ধৃতরাষ্ট্রের ‘সহধর্মিণী’ ‘সহমর্মিণী’ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সত্যবতী বুঝতে পারেন, *এই মেয়ে নিশ্চিতভাবে কুরুকুলের ওপর তার অপছন্দের পাত্র চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে*। গান্ধারীর কুরুকুলের প্রতি যে রাগ, সেই রাগ যাতে বোঝা না যায় প্রথম প্রিয়সম্মিলনের রাতে তা গোপন করার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেছেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর যে বিরাগ সেই বিরাগ গোপন থাকেনি। তাঁর শরীর এই মিলনে উন্মুখ হয়ে ওঠেনি। তাই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হাত দিয়ে গান্ধারীর আপাদমস্তক স্পর্শ করে মনে হয়েছে, গান্ধারী ‘তুষারশৈলের মতো সুন্দর’ হলেও তাঁর শরীরে উষ্ণতা নেই। যদিও গান্ধারী কথার জাল বিস্তার করে ধৃতরাষ্ট্রের এই ভাবনা দূর করে দিতে চেয়েছেন। গান্ধারী বিষয়টিকে সহজ করতে চেয়েছেন এই বলে, *আমার কুমারী সংস্কার আমাকে সুদূর করেছে। যত দিন যাবে, আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। তখন আর আপনার এরকম মনে হবে না*।

দিন যত এগিয়েছে গান্ধারী বুঝতে পেরেছেন ধৃতরাষ্ট্র একজন ভীত, লোভী, অসহায় মানুষ। ফলে কখনো ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর অনুকম্পা, কখনো বিরাগ জেগেছে। যদিও ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মনের কথাগুলি গান্ধারীকে বলেছিলেন কিন্তু গান্ধারী কখনো সেভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াতে পারেননি, সহধর্মিণী রূপে স্বামীর মনে আস্থা জোগাতে পারেননি, তাঁর ভরসার স্থল হতে পারেননি। ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে দুঃখ, যে ভয়, যে আশঙ্কা ছিল তা দূর করার জন্য গান্ধারী বলতে পারেননি, *আমি তো আছি আপনার পাশে, ভয় কী?* বরং এর ঠিক উল্টোটাই করেছেন গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্রের এই ভয় এই আশঙ্কা শুনে শুধু মনে মনে ছিছিঙ্কার করেননি, মুখেও সেকথা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন। ফলে গান্ধারী কোনো দিনই ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারেননি। কাজেই তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্ক সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি।

ছোটো থেকেই গান্ধারীর স্বপ্নের পুরুষ ছিল বিশাল এবং মহানুভব বিরাট হৃদয় হবে এমন মানুষ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হলো না। গান্ধারী একদিন অন্যান্য দিনের মতো প্রত্যুষে স্নানের সময় যখন তাঁর চোখের পট্টি খুলেছিলেন সেইসময় দাসীর কথায় তিনি বাতায়নের ফাঁক দিয়ে প্রথম যখন ধৃতরাষ্ট্রকে দেখলেন তখন, *চেহারার সঙ্গে কর্ণ, মন, সব মিলে যে মূর্তি দাঁড়াল, তাতে মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল তাঁর। ধৃতরাষ্ট্র অসুন্দর নন, কিন্তু তাঁর চেহারার মধ্যে ভয়ানক একটা মিথ্যা কিছু আছে।*^{১০} তিনি যেন দুর্বল অসহায়ের ছদ্মবেশ পরে থাকলেও আসলে তিনি ভীষণ আগ্রাসী ভোগী একজন মানুষ। তাঁর এই রূপ গান্ধারী বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি বেদনার্ত হয়েছিলেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। ঘটনাচক্রে ঐদিনই তিনি বিদুরকে দেখেছিলেন। বিদুরকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যেন সত্যতার প্রতিমূর্তি। অথচ সরল বা নির্বোধ নন। ফলে তাঁর পছন্দের মানুষ হয়ে ওঠেন বিদুর।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের অদ্ভুত সম্পর্ক কুরুকুলের মেজবধু পাণ্ডুপত্নী কুন্তীও অনুভব করেছেন। তাঁরও মনে হয়েছে গান্ধারীর স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব আত্মমর্যাদাজ্ঞান, স্বাভাবিক এসবকে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। হয়তো তাঁর মনের ভেতর কোনো অপরাধবোধ, হীনম্মন্যতা কাজ করে। আর তাই গান্ধারীকে তিনি যেন মাথার উপরে দেবী বলে বসিয়ে রেখেছেন। ফলে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে একধরনের দূরত্ব রয়েছে গিয়েছে। এই দূরত্বের কারণেই জীবন চেয়ে দাসীদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের বেশি ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতার কারণেই এক দাসীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত একটি শিশু ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছিল। বিদুর ও ব্যাসদেবের কথোপকথন থেকে আমরা শুধু তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হয়ে যাওয়ার খবর জানতে পারি। ফলে যখন ঘটনাচক্রে দেখা গেল গান্ধারী মা হতে পারবেন না তখন গান্ধারীর ব্যাসদেবের আশীর্বাদ অনুসারে শতপুত্র লাভের ইচ্ছাকে পূর্ণতা দেবার জন্য ব্যাসদেব পরামর্শ দিলেন যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র সন্তান উৎপাদনে সক্ষম তাই তাঁর সঙ্গ করার জন্য একশত ক্ষত্রিয় কন্যা নিযুক্ত হোক। কারণ নিয়োগ মতে যেহেতু জীবন গর্ভে জাত ভিন্ন পুরুষের ঔরসপুত্র নিয়োগকারীর সন্তান বলে গণ্য হয় স্বামীর ক্ষেত্রেও তাঁর ঔরসজাত ভিন্ন নারীর গর্ভজ পুত্রকেও তেমন তাঁর জীবন পুত্র বলে গণ্য করা উচিত। ব্যাসদেব একথাও বলেন, গান্ধারীর গর্ভ থেকে বেরোনো মাংসপিণ্ড থেকেই শতপুত্রের জন্ম হয়েছে সকলকে এমনটাই জানানো হবে। সত্য কথা গোপন থাকবে। কেউ জানতে পারবে না যে ওই একশত পুত্রের গর্ভধারিণী গান্ধারী নন। লক্ষ করার বিষয় ধৃতরাষ্ট্র খুব সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। তাঁর এই সম্মত হওয়ার পিছনে রয়েছে তাঁর পরনারী সঙ্গ লাভের বাসনা। কিন্তু গান্ধারী কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হতে পারছিলেন না। তাঁর সমস্ত দেহ-মন বিদ্রোহ করে উঠেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, সতীন পুত্র হলে ভালো লাগতো না, কিন্তু মনে নিতে হতো, মনে

নিতে পারতেন। কিন্তু এই যে শত অবিবাহিত রমণীর সঙ্গে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য তাদের সঙ্গে বিহার করবেন, এটা একটা ব্যভিচার। যদিও সত্যবতী ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন গান্ধারীর অনিচ্ছাকে সম্মান দিতে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সেই সম্মান দেননি। আমরা দেখতে পাই, ধৃতরাষ্ট্র সারাক্ষণ গান্ধারীকে বলে গিয়েছেন এই প্রস্তাবে সম্মত হতে। একসময় গান্ধারী বাধ্য হয়ে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। কাজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার সময় গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাস গোপন করার কথা ঔপন্যাসিক বাণী বসু উল্লেখ করলেও এই গোপন করা থেকেই গান্ধারীর মনবেদনা আর গোপন থাকে না।

গান্ধারীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ ও দাসীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার গভীরতা থেকে আমরা গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের দাম্পত্য-সম্পর্কের সত্য উন্মোচন করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, তাঁদের এই দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক ও সুস্থ ছিল না। সেই সময় পর্বে রাজাদের একাধিক মহিষী বা রক্ষিতা থাকতো। কিন্তু সেটা তাঁদের মহিষীরা জানতেন। পুরুষের এই বহুগামিতা অবশ্যই সমর্থন যোগ্য নয়। কিন্তু এই নিয়ে অন্তত তাঁদের কোনো গোপনীয়তা ছিল না। বস্তুতপক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্কে কোনো গোপনীয়তা থাকে না। ধৃতরাষ্ট্র পরনারীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা গান্ধারীর কাছে গোপন করেই ক্ষান্ত হননি, এই ঘনিষ্ঠতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য শতনারী সঙ্গে যে প্রস্তাব ব্যাসদেব দিয়েছেন তা খুব সহজেই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া শত ক্ষত্রিয় নারীর সঙ্গে বিহার করে সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ধর্মপত্নী গান্ধারীর ইচ্ছাকে সম্মান তো দেননি এমনকি এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার সময় গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাসও তিনি বুঝতে পারেননি।

এইভাবে নিবিড় পাঠ করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র কেউই একে অপরের সাহচর্যে তৃপ্ত ছিলেন না। তাঁদের রুচিবোধের তারতম্য ছিল। এই তারতম্যের কারণে স্বামীর সঙ্গে গান্ধারীর কোনোদিনই মানসিক মেল বন্ধন হয়নি। ধৃতরাষ্ট্রও গান্ধারীর মনের নাগাল পাননি। এই মানসিক দূরত্বের কারণে শেষপর্যন্ত তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

গান্ধারীর মতো জোরজবরদস্তির বিয়ে নয়, কুন্তীভোজের কন্যা পৃথা ও মহারাজ পাণ্ডুর। কুন্তী নিজেই স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুর গলায় বরমাল্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখি দাম্পত্য-সম্পর্ক যথাযথ হয়ে ওঠে না। পাণ্ডু তাঁর নববধূ কুন্তীর সঙ্গে প্রণয়লাপ করলেও তাঁকে চুম্বন করলেও তাঁদের মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। স্বাভাবিকভাবেই তাই কুন্তীর মনে হয়, *তোমার হাত-পা নেই স্বামী! তোমার কামনা নেই? নবযৌবনমতী প্রেমময়ী স্ত্রীকে একান্ত কাছে পেয়েও স্নাতকের মতো খালি বাক্য! বাক্যের পর সাজানো বাক্য কেবল?*^১ মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর শারীরিক মিলনের আগেই পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহ হল মদ্র রাজকন্যা মাদ্রীর সঙ্গে। এই বিবাহে পাণ্ডু তাঁর অনিচ্ছার কথা তাঁর অসহায়তার কথা কুন্তীকে বললেও আমার তা মনে হয় না। কারণ পরবর্তীকালে আমরা দেখব সকলের বাধা অগ্রাহ্য করে পাণ্ডু বনবাসে যাত্রা করেছেন। কাজেই পাণ্ডুর এই বিবাহে সামান্য হলেও যে ইচ্ছা ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ‘সামান্য’ বললাম এই কারণে যে পাণ্ডু তাঁর অক্ষম পৌরুষত্বের কথা জানতেন। বিদুরকে তিনি সেকথা নিজে বলেছিলেন একথা আলোচ্য উপন্যাসে উল্লেখ আছে। পাণ্ডু হয়তো আশা করেছিলেন রাজবৈদ্যের ওষুধে তাঁর এই অক্ষমতা দূর হয়ে যাবে। আর সেকারণেই তিনি ভীষ্মের প্রস্তাব অনুসারে দ্বিতীয় বিবাহে অনাগ্রহ প্রকাশ করে এই বিবাহ করতে অস্বীকার করেননি। অথচ তিনি কুন্তীর সামনে এমন ভান করেছেন যে যাতে তাঁর অনিচ্ছা, অসহায়তা

প্রকাশ পেয়েছে। সেকালের রাজপুরুষদের মতো তিনিও একাধিক নারীসঙ্গ পেতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ মাদ্রীর সঙ্গে বিবাহের পর কুন্তীর কাছে আসা দূরে থাক, মাদ্রীর মহল থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন তেরো-চৌদ্দ দিন পরে। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের থেকে ভীষ্মের আগ্রহ বেশি ছিল এবং তিনি নিজে থেকে দ্বিতীয় বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ করেননি এটা অস্বীকার করা হলে অবিচার করা হবে। কাজেই আমার মতে, পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের মতো অন্তত নারী-শরীর লোলুপ ছিলেন না। তিনি কুন্তীকে ভালোবাসতেন। তাই কুন্তীর সঙ্গে কথা কথা বলতে বলতেই তাঁর রাত কেটে যায়। শুধু তাই নয়, মৃগয়া করে ফেরার পরে তিনি প্রথমে কুন্তীর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলেন।

মাদ্রীর সঙ্গে বিবাহের কারণে প্রায় একপক্ষকাল পাণ্ডুর সঙ্গে অসাক্ষাতের কারণে কুন্তী বিরহ ব্যথায় জর্জরিত হয়েছিলেন। আর এই বেদনা থেকেই তাঁর বিদুরের কাছে যাওয়া। এই প্রসঙ্গেই আমরা জানতে পারি, বিদুরের সঙ্গে কুন্তীর প্রথম আলাপের সময়ই দুজনের চোখাচোখি হয়েছিল। কুন্তী তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, *বিদুরের তাকে খুবই পছন্দ হয়েছে, তার চোখে রীতিমতো মুগ্ধতা ছিল, যেন ছিল খানিকটা নীরব মন-জানাজানি। বিদুর যেন দুচোখ দিয়ে বলেছিলেন— আমি আপনার সত্যিকারের বন্ধু, বরাবর আপনার পাশে থাকব।*^{১২} আর এই মন জানাজানির সূত্র ধরে কুন্তী তাঁর হৃদয়ের যে বেদনা তা ভাগ করে নিতে চেয়েছেন বিদুরের সঙ্গে। এই সাক্ষাতেই তিনি বিদুরের কাছে রাজনীতি বা বৃত্তিশাস্ত্র, ধর্ম বা লোকাচার সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য বিদুরের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। বিদুর তা করবেন বলেও জানিয়েছেন। কুন্তীর এই সাহায্য প্রার্থনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি তাঁর বিরহ দিনে সময় যাপন করার জন্য এই শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছেন। আর এটা তো খুব সত্য কথা, সময় যাপনের জন্য ভালো সঙ্গীর প্রয়োজন। বিদুর কুন্তীর সেই সঙ্গী হতে পেরেছেন।

পাণ্ডু যৌনমিলনে অক্ষম ছিলেন। তাঁর এই অক্ষমতা কথা তিনি বিদুরকে বলেছিলেন একথাও আমরা আগে উল্লেখ করেছি। কুন্তী পাণ্ডুর এই অক্ষমতার কথা বুঝতে পারেননি না বলে বরং বলা ভালো পাণ্ডু সুকৌশলে কুন্তীকে সেটা বুঝতে দিতে চাননি বা দেননি। কিন্তু তাঁর এই অক্ষমতার কথা কুন্তীর কাছে বেশি দিন তিনি গোপন রাখতে পারেননি। পাণ্ডুর দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় কুন্তীর মনে পাণ্ডুর যৌন মিলনের সক্ষমতা বিষয়ে মনে সংশয় দেখা দেয়। মাদ্রী স্পষ্ট ভাষায় কুন্তীকে বলেছেন, *দিদি আমার অভিজ্ঞতা ভালো নয়। রাজা আমাকে নানাভাবে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেসবই হলনা। আমার সঙ্গে তাঁর মিলন সম্পূর্ণ হয়নি।*^{১৩} পাণ্ডু তাঁর এই অক্ষমতার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মৃগয়া থেকে ফেরার পরে কিমিন্দম মুনির দেওয়া অভিশাপের কথা প্রচার করেছেন। কিমিন্দম মুনির অভিশাপ অনুসারে পত্নীর সঙ্গে মৈথুনের সময় পাণ্ডুর মৃত্যু হবে জেনেও তাঁর দুই স্ত্রীই তাঁর সঙ্গে বনবাসে যেতে চেয়েছেন। বনবাসে খাওয়া পরার কষ্ট হবে জেনেও কুন্তী ও মাদ্রী পাণ্ডুর সঙ্গে বনবাসে যান। এমনকি এই বনবাস যাপনে তাঁরা মানসিক দিক থেকে প্রফুল্ল ছিলেন। আর এ থেকে মনে হয় পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর দুই স্ত্রীর মানসিক মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল। এই মানসিক বন্ধন সত্ত্বেও পাণ্ডুর মনে শান্তি ছিল না। পৌরুষহীনতার যন্ত্রণা তাঁকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। তার ছায়া পড়েছে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে। অবশেষেব তাই ব্যাসদেব নিয়োগ প্রথায় পাণ্ডুর পুত্র হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি নিয়োগের জন্য বিদুরের কথা বলেন। আর এই বিদুর তো কুন্তীর স্বপ্ন পুরুষ। বিদুরকেই কুন্তী একদিন তাঁর বন্ধ ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন স্বপ্নে। তাই পাণ্ডুর কাছে যখন তিনি শুনলেন বিদুরের ঔরসে তাঁকে পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে

হবে, তাঁর স্বপ্নপুরুষ বিদুরই হবেন তাঁর প্রথম প্রেমিক, কৌমারহর তখন তিনি রোমাঞ্চিত হলেও তা প্রকাশ করলেন না। মন যা বলল, মুখ বলল তার অন্য কথা। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কথা ভাবুন মহারাজ। কী করে এ সম্ভব হবে! ছি-ছি, কী লজ্জা!^৪ কিন্তু পাণ্ডুর কাছে যেহেতু ব্যাসদেবের আদেশ শিরোধার্য তাই বিদুর এলেন, অন্ধকারে ছায়ার মতো কুন্তীর গৃহে প্রবেশ করলেন। মিলনের আগে বিদুর কুন্তীর সম্মতি আছে কিনা জানতে চাইলেন কেননা কুন্তী তাঁর কাছে সম্মানীয়া, বরণীয়া। আসলে বিদুর বলতে চেয়েছিলেন অন্য কথা। সেই অন্য কথাটি ঔপন্যাসিক তাঁর একালের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের ধরিয়ে দেন। বিদুরের হৃদয়ের কথাটি এই, আপনাকে বরণ করব এ আমার আশার অতীত সৌভাগ্য। যেদিন প্রথম আপনাকে দেখি সেদিনই চিত্ত হারাই। ... আজকে আমার যে নিরুচ্চার প্রেম পূর্ণতা পেতে চলেছে, তা সব বঞ্চনার ক্ষতি পূর্ণ করে দিয়েছে। আপনি প্রস্তুত তো?^৫ বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে কুন্তী নিজেকে সংহত করে বলেছিলেন, আপনি তো জানেন পতির মতই পত্নীর মত।^৬ আসলে বিদুরের মতো তিনিও বলতে চাইছিলেন, আমার এই অনায়াসে যৌবন পুষ্পাঞ্জলির মতো সমর্পণে দিলাম তোমাকে।^৭

স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে মিলনের সময় কুন্তী তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে প্রাণপণে অমানুষিক যত্নে গোপন করে গেলেন। পাণ্ডুর সম্মতিতে তিনি বিহার করলেন তাঁর স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে। পুত্র কামনায় অন্য পুরুষের সঙ্গে বিহার করতে দিলেন পাণ্ডু। অবশ্য নিয়োগ প্রথায় একে অপরের প্রতি নিরাসক্ত থাকার শর্ত মেনে মিলনের সময় তাঁরা দুজনেই একে অপরের প্রতি আসক্তি গোপন করে গেলেন। পাণ্ডুও তাঁদের পারস্পরিক আসক্তির কথা জানতে পারলেন না। তাই তিনি পুনরায় বিদুরকে নিয়োগ করতে চেয়েছেন কুন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য। কুন্তী তা চাননি। কারণ তিনি অসম্মত হলে তাঁর সম্মান থাকবে না বলতে গিয়ে দুঃখে কুন্তীর চোখ দিয়ে তাই জল বেরিয়ে আসে। এমনকি তাঁর অসম্মত হওয়ার পরে পাণ্ডু মাদ্রীর সঙ্গে বিদুরের বিহারের কথা বললে তাতেও কুন্তী তাঁর অসম্মতি জানান। এর কারণ স্বরূপ তিনি যাই বলুন না কেন আসলে তিনি তাঁর স্বপ্নের পুরুষকে অন্য কোনো রমণীর সঙ্গে বিশেষত তাঁরই সতীনের সঙ্গে বিহার করতে দিতে চাননি। বিদুরের সঙ্গে বিহারে কুন্তী অসম্মত হলে পাণ্ডু শতশৃঙ্গের কোনো মুনি ঋষিকে চেয়েছেন কুন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করতে। সে কথা শুনেই কুন্তীর মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে পুরুষের লোলচর্ম মুনি ঋষিদের চিত্র। স্বাভাবিকভাবেই কুন্তীর সারা শরীর মন কুঁকড়ে ওঠে। কুন্তীর যেমন করুণা হয় পাণ্ডুর প্রতি রাগও কম হয় না। আসলে পাণ্ডু তো তাঁর পত্নীদের জন্য প্রেমিক খোঁজেননি। বরং এই নিযুক্ত পাত্রের যত কম আকর্ষণ থাকে ততো ভালো। তাতে এই সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক হয়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে স্ত্রীদের তিনি হারাতে চাননি, আবার পুত্র সন্তান তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে কুন্তীর দেবতাদের আকর্ষণ করার মন্ত্র জানা আছে শুনে পাণ্ডু প্রবল উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কেননা দেবতাদের গুণসে জাত সন্তান মানবশ্রেষ্ঠ হবে, আর দেবতাদের সঙ্গে মানুষের প্রেম অসম্ভব। ফলে তাঁরা এই ভূমণ্ডলে নিশ্চয় থাকবেন না— মিলনের পর স্বর্গে ফিরে যাবেন। ফলে কুন্তী একে একে জন্ম দেন পবনপুত্র ভীম, ইন্দ্রপুত্র অর্জুন। এরপরেও পাণ্ডু কুন্তীর কাছে আরোও পুত্র চাইলে কুন্তী কিছুতেই তাতে মত দেন না। ফলে পাণ্ডু ঐ একইভাবে মাদ্রীর গর্ভেও সন্তান চান। দুর্বাসা প্রদত্ত অভিকর্ষণ মন্ত্র মাদ্রীকে শিখিয়ে দিতে বলেন। পাণ্ডুর এইভাবে পুত্রকামনায় একাধিকবার স্ত্রীদের পরপুরুষের শয্যাসঙ্গী হতে বাধ্য করেছেন। এই

থেকে মনে হয় জ্বীদের প্রতি প্রেম আসলে ঠিক প্রেম নয়, দামী রত্নের প্রতি মানুষের যেমন একটা তীব্র তৃষ্ণা থাকে, অকাঙ্ক্ষা থাকে এও ঠিক তাই।

কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই গান্ধারীর মতোই স্বামী সহচর্যে অতৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁদের মানসিক মেলবন্ধন যে ঘটেছিল তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। বনবাসে দিনযাপন যে সর্বতোভাবে কষ্টের হবে তা জেনেই তাঁরা বনবাসে গিয়েছিলেন। রামায়ণে সীতাও স্বামীর সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ছিলেন দেবর লক্ষ্মণ। স্বামী ও দেবর মিলে তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন। স্বামীর পৌরুষের অক্ষমতার দুঃখও তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। অন্যদিকে পাণ্ডু পৌরুষের অক্ষমতার কারণে নিরন্তর মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে যে জ্বীদের কোনোপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা সম্ভব ছিল না তা তো বোঝাই যায়।

সেকাল হোক বা একাল, ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা’ এই মানসিকতার পরিবর্তন আজও হয়নি। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি যেন সন্তান উৎপাদনের স্বীকৃতি স্বরূপ, যে স্বীকৃতি না থাকার কারণে কুন্তীকে সদ্যোজাত কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিবাহ তো আসলে তা নয়। বিবাহ শব্দের অর্থই হলো বিশেষ রূপে বন্ধন। মন ও শরীর এই দুইয়ের মেলবন্ধন যদি পরস্পরের মধ্যে গড়ে না ওঠে তাহলে বিবাহ সার্থক হয়না। আমরা দেখেছি গান্ধারীর সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের সেই বন্ধন গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রীর মানসিক বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তাই তাঁরা পাণ্ডুর পৌরুষের অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে বিলাসব্যাসন ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন। খাওয়া পরার কষ্ট স্বীকার করলেন। কুন্তী ও মাদ্রী পাণ্ডুর মনের খবর রাখলেও কুন্তী ও মাদ্রীর মনের খবর পাণ্ডু রাখতে পারেননি। তাই সেই অর্থে তাঁদের কোনো বন্ধন গড়ে ওঠেনি। যদিও পাণ্ডু তাঁর জ্বীদের ভালোবাসতেন ঠিকই কিন্তু সেই ভালোবাসা যথার্থ ছিল না। সেই ভালোবাসার মধ্যে তাঁর সর্বগুণাশ্রিত জ্বীদের প্রতি একধরনের মুগ্ধতাবোধ কাজ করেছিল। আর তাই তিনি তাঁর জ্বীদের বিশেষ করে কুন্তীর মনের খবর রাখেননি। বলতে গেলে একপ্রকার জোর করেই তিনি বারবার অন্য পুরুষের অন্ধশায়িনী হতে কুন্তীকে বাধ্য করেছেন। মহাভারতকার যতই গান্ধারী, কুন্তী বা মাদ্রীকে সতী রমণী বা মহীয়সী নারী রূপে চিত্রিত করুন না কেন, একালের ঔপন্যাসিক সেই মহান স্বরূপের গোপন কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যেহেতু তাঁরা ক্ষত্রকন্যা, তাই তাঁরা তাঁদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে গোপন করে কীভাবে নষ্ট দাম্পত্যকে গ্রহণ করে তা বহন করেছেন। এই বহন করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার ছিল না। কুরুবংশের চেয়ে তাঁদের পিতৃরাজ্যের সামরিক ক্ষমতা বেশি হলে এই গ্রহণ করার দায় তাঁদের থাকত না বলেই মনে হয়।

পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁরাও যে সুখী হতে পারেননি এই দাম্পত্য সম্পর্কে সেটাও ঔপন্যাসিক দেখিয়ে দিয়েছেন। পাণ্ডু তাই কৃচ্ছসাধনের পথ বেছে নেন। কিন্তু এই সাধনা তো আসলে মুনি ঋষিদের কাছ থেকে পৌরুষের অক্ষমতা দূর করে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হওয়ার এক প্রচেষ্টা। তাই তিনি মুনি-ঋষিদের মতো জীবন-যাপন করলেও পুত্র লাভের বাসনা তাঁর মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। ঔপন্যাসিক তাই লেখেন, শেষ পর্যন্ত যখন নিয়োগমতে তাঁদের ক্ষেত্রজ সন্তানও হল, পাণ্ডু কি খুব সুখী হতে পেরেছিলেন? মনে হয় না। এতগুলি দেবনন্দন, তার উপরে তাঁর নিজের অনূর্বরত্ব মিলিয়ে তাঁর মানসিক অবস্থা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়।^{১৮} পাণ্ডু তাই যুধিষ্ঠিরকে আদর করার সময় বলেন, কী, পিতা বললি, বৎস! বললি না? না কি তাত?^{১৯} যুধিষ্ঠির যে বিদুরের ঔরসজাত সেকথা হয়তো তাঁর মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়।

অন্যদিকে ধৃতরাষ্ট্র অন্য নারীর শরীরের মধ্যে সুখ খুঁজে ফেরেন। একটা কথা না বললেই নয়, সেটা হল ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ের মানসিকতার ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের এক জায়গায় মিল ছিল। সেই মিল হল তাঁদের কাছে বিবাহ মানে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে কুরুকুলের সিংহাসনে নিজের বংশের অধিকার স্থাপন করা। এই বিশেষ উদ্দেশ্যকে সফল করতে গিয়েই তাঁদের উভয়েরই দাম্পত্য সম্পর্ক মলিন হয়ে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৬ চৈত্র, গীতবিতান, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা নং ৬৬৯।
- ২। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ২৫।
- ৩। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১০৫।
- ৪। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ২৭।
- ৫। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ২৭।
- ৬। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ২৭।
- ৭। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ২৮।
- ৮। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ৩৩।
- ৯। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ৩৬।
- ১০। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ৯১।
- ১১। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ৫০।
- ১২। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ৬৭।
- ১৩। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ৭৮।
- ১৪। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১১৬।
- ১৫। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১১৭।
- ১৬। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১১৮।
- ১৭। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১১৮।
- ১৮। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১৫৪।
- ১৯। বসু, বাণী, জানুয়ারি ২০১৭, মাঘ ১৪২৩, ক্ষত্রবধু, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং ১২১।

মন্দাক্রান্তা সেনের একবিংশ শতকের কবিতায় নারীর জীবনকথা

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইন্ডিনিং কলেজ

সারসংক্ষেপ: একবিংশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতার জগতে মন্দাক্রান্তা সেন একজন বিশেষ কবি ব্যক্তিত্ব। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার টালিগঞ্জের তাঁর জন্ম। শিক্ষাজীবন যথেষ্ট উজ্জ্বল হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চাতেই নিজেকে সর্বাংশে নিয়োজিত করেন। বিংশ শতকে তাঁর লেখা শুরু এবং একবিংশ শতকের প্রথম পর্বেই তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। বর্তমানেও তাঁর সাহিত্যচর্চা সমানভাবে বহমান।

অপরূপ মহিলা কবিদের মতো মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতাতেও মহিলাদের জীবনকথা বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে। সমাজের সব স্তরের নারীদের কথা তাঁর কবিতায় ভাষা পেয়েছে। এসেছে গৃহবধূ, যুবতি, তরুণী, বিধবা, বেশ্যা, ধর্মিতা প্রকৃতি নানা শ্রেণির নারীর কথা। সমাজের সব স্তরের নারীদের জীবনের যন্ত্রণাকে কবি ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নারী হৃদয়ে ভালোবাসার প্রতিরূপ কেমন, পুরুষকে নারী কতটা ভালোবাসে আবার কতটা ঘৃণা করে, পুরুষের উপরে নারীর আস্থা কতটা, সেই আস্থা ধ্বংস হলে তারা কতটা কষ্ট পায় এই সব নানা প্রশ্নের উত্তর তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন কবিতায় পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন মহিলাদের আত্মার সাধনা, ভালবাসা, ভালবাসার অপমৃত্যু, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণার কথা। একবিংশ শতকে লেখা তাঁর বিখ্যাত কিছু কাব্য হল ‘বলো অন্যভাবে’ ‘এ সবই রাতের চিহ্ন’ ‘হৃদয়পুরাণ’ ‘জন্মসূত্র’ ‘হত্যাসূত্র’ ইত্যাদি।

কবিতার মধ্যে দিয়ে নারী জীবনের সংকট ও সম্ভাবনাকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবি। খুব সরল সাধারণ ভাষা ও ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। কবিতার ছন্দ নিয়ে তাঁর চর্চা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে লেখা মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যভুবনে নারী জীবনের প্রতিচ্ছবি কতটা আছে তা দেখার চেষ্টা করব। একই সঙ্গে দেখব এই কাজে তিনি কতটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সূচক শব্দ: নারীর প্রেম, নারী শোষণ, নারীর অসহায়তা, নারীর মাতৃত্ব, নারীর স্বপ্ন সাধনা।

মূল আলোচনা:

একবিংশ শতকের প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে মন্দাক্রান্তা সেন অন্যতম। আধুনিক বাংলা কবিতা যাদের হাতে বিশেষ নির্মিতি পেয়েছে তিনি তাঁদের একজন। ১৯৭২ সালে কলকাতার টালিগঞ্জে তাঁর জন্ম। শিক্ষাজীবন শুরু হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে। এই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর লেডি ব্রেরবোর্ণ কলেজ থেকে ব্যাচেলার ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর পড়াশুনার পথ পাল্টে নেন কবি। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে এম.বি.বি.এস. পড়তে শুরু করেন। যদিও এই পড়াশোনা তিনি শেষ করতে পারেননি। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে মন্দাক্রান্তা সরাসরি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর সাহিত্য চর্চাই হয় তাঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। সাহিত্য জীবনে লিখেছেন অসংখ্য

কবিতা, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প। এখনও চলছে তাঁর সাহিত্য সাধনা। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমী গোল্ডেন জুবিলী অ্যাওয়ার্ড, কৃতিবাস পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার। একবিংশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর বিখ্যাত কিছু কাব্যগ্রন্থ হল ‘বলো অন্যভাবে’, ‘হৃদপুরাণ’, ‘এ সবই রাতের চিহ্ন’, ‘বর্ষাফলকে গাঁথা হাড়’, ‘জন্মসূত্র হত্যাসূত্র’, ‘আত্মহত্যা রেখেছি মূলভূমি’, ‘বাকিটুকু বাক্যে বলা মানা’, ‘এমন নিশংস আয়োজন’ প্রভৃতি। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষ হিসেবেও মন্দাক্রান্তা সেনের মধ্যে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাওয়ার কিছু বছর পর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। উত্তর প্রদেশের দাদরি মবলিঞ্চিং ঘটনার প্রতিবাদে তিনি এই পুরস্কার ফেরত দিয়েছিলেন। পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে তাঁর সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রকট হয়। এমনিতে কবি শিল্পীদের সবচেয়ে বেশি পরিচয় হৃদয়ের মধ্যে। শিল্পী-সাহিত্যিকরা সবসময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এই সাধারণ সত্য মন্দাক্রান্তা নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন। যদিও বর্তমানের সব শিল্পীরা সামাজিক ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না, বা করছেন না। তবে মন্দাক্রান্তা সেন এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ভুল করেননি। একদিকে কবি অন্যদিকে সামাজিক জীব এই উভয় পরিচয় তিনি সমানভাবে বজায় রেখেছেন।

মন্দাক্রান্তা বিশ শতকের নব্বুই এর দশকের পর থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। তবে কাব্যজগতে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা একবিংশ শতকে। কবিতার বিষয়ভাবনা, আঙ্গিক, ভাষা ব্যবহার, ছন্দ নির্মাণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে তিনি নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি হিসেবে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন খুব সাদা চোখে। সমাজ ও মানুষের হৃদয়ের গভীরে যেখানেই অসংগতি উপলব্ধি করেছেন, সেখানেই তাঁর কবিতার তীর আছড়ে পড়েছে। জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন কবিতাকেও সেই ভাবে সাজিয়েছেন। জীবনমুখী কবিতা মন্দাক্রান্তার কবি স্বভাবের অন্যতম দিক। এই সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বলেছেন--
“কবির কবিতায় অব্যবহৃত হয়ে উঠেছে জীবনের স্পন্দন। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করেছেন এবং তাকেই একেবারে সাদামাটা ভাবে অথচ সাবলীলভাবে পরিবেশন করেছেন।”

বাংলা সাহিত্যে নারীদের জীবনকথা অত্যন্ত পরিচিত একটি বিষয়। সাহিত্যের প্রায় সূচনালগ্ন থেকে মহিলারাও সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছেন সমানভাবে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্য মানেই তা মানুষের জীবনের ইতিহাস। মানুষের প্রাত্যহিকতা, তাদের স্বপ্নসাধনা, জীবনযাত্রণা জীবনযুদ্ধের কথাই সাহিত্যে বেশি করে জায়গা পায়। ফলত সাহিত্যে মহিলাদের জীবনের প্রক্ষেপ ঘটা খুবই স্বাভাবিক আর তেমনটা হয়েছেও। বাংলা সাহিত্যের একেবারে প্রথম পর্বে লেখা চর্যাপদেও আমরা দেখেছি নারী জীবনের কথা। সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষরা নিম্ন শ্রেণির মহিলাদের দেহ উপভোগ করছে। গ্রামের বাইরে ডোমদের বসবাস, তাদের গ্রামে প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু উচ্চশ্রেণির পুরুষরা এইসব নারীদের শরীর উপভোগ করতে দ্বিধা করেনি। বিষয়টাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন ডোম নারীর শরীরে কোনো দোষ নেই, যত দোষ তার জন্মতে। চর্যাপদে নারী জীবনের এই যে পক্ষেপ তার ধারা প্রাচীন যুগের সীমা অতিক্রম করে মধ্যযুগের সাহিত্যেও সমানভাবে বহমান থেকেছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী জীবনের প্রক্ষেপ ঘটেছে মূলত পুরুষ কবিদের মাধ্যমে। এই পর্বে নারী কবিদের সেইভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। বা তাঁরা সাহিত্যচর্চা করেননি, করলেও আজ পর্যন্ত তা আবিষ্কৃত হয়নি। এর অনেক রকম সামাজিক কারণ রয়েছে।

এখানে আমরা সেদিক নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব না। আমরা দেখার চেষ্টা করব মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীজীবনের ছবি কোথায় কীভাবে এসেছে। প্রথমেই ধরা যাক মনসামঙ্গল কাব্যের কথা। এখানে বেহুলার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বেহুলাকে তার স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্য দেবতাদের সামনে উচ্ছল নৃত্য প্রদর্শন করতে হয়েছে। নারীত্বের এই অপমান সেদিনের প্রেক্ষিতে তো বটেই আজকের প্রেক্ষিতেও সর্বাংশে লজ্জাজনক। সেদিনের পুরুষ কবিরা নারীদের সম্মানের আসনেই বসিয়েছিলেন। তাই ঘটে যাওয়ার ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপ তাকে কাব্য কাহিনিতে স্থান দিয়েছেন নিরাবরণ ভাবে, কোনোরকম বিবৃত না করে। একইভাবে মহিলাদের জীবন যন্ত্রণার কথা এসেছে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারোমাস্যার মধ্যে দিয়ে সমকালীন গৃহবধূদের জীবনযন্ত্রণা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। আবার লহনা-খুলনার সংসারে সতীন যন্ত্রণার ছবি যেভাবে এঁকেছেন তা চিরকালীন হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী জীবনের কথা নানা জায়গায় পাওয়া গেলেও বিশেষভাবে বলতে হয় ধর্মমঙ্গল কাব্যের কানাড়া ও কলিঙ্গার কথা। সমগ্র মধ্যযুগে এইরকম বীরত্বপূর্ণ নারী চরিত্র বিশেষ একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা আগেই বলেছি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মহিলা কবি বিশেষ নেই। বিস্তৃত এই কালপর্বে মাত্র একজন মহিলা কবিকে আমরা পাই। ইনি হলেন চন্দ্রাবতী। মধ্যযুগের শেষ পর্বে চন্দ্রাবতী লিখেছিলেন রামায়ণ কাব্য। তাঁর কাব্য চন্দ্রাবতী রামায়ণ নামেই পরিচিত। কাব্যটি সমকালীন সময়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং এখনও মহিলা কবিদের লেখা রামায়ণ হিসেবে এই কাব্যের সুনাম রয়েছে।

ঊনবিংশ শতকে রেনেসাঁসের পর বাংলা কাব্য কবিতার জগতে প্রভূত পরিবর্তন সূচিত হয়। মধ্যযুগের পর্ব শেষ হলে বাংলা কাব্যজগত টপ্পা, তরজা, ঝুমুর ইত্যাদি অঙ্গীল গানের ঘোলাজলে আবদ্ধ থেকেছে বেশ কিছু বছর। সেখান থেকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যকে মুক্ত করেন এবং বাংলা আধুনিক কবিতার সূচনা হয়। এই সময় থেকে বাঙালি মেয়েরাও কাব্যভুবনে তাঁদের ত্রিাশলতার ছাপ রাখতে শুরু করেন। একের পর এক মহিলা কবির আবির্ভাব হয়। এই পর্বের বিখ্যাত কবি হলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁর ‘পদ্মরাগ’ কাব্য মেয়েদের জীবনকথার বর্ণনায় সমৃদ্ধ। নিজে ছিলেন সুশিক্ষিতা ও আধুনিক মনস্কা নারী। মেয়েদের অবরুদ্ধ জীবনযাপনের বিরুদ্ধে ও তাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে রোকেয়া চিরকাল সংগ্রাম করে গেছেন। রোকেয়ার পর ঊনবিংশ শতকে একের পর এক মহিলা কবির আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা সাহিত্যের পাতায় মেয়েদের জীবনযন্ত্রণার কথা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এই পর্বের বিখ্যাত মহিলা কবি হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্যগুলি হল ‘বসন্ত উৎসব’ ও ‘গাথা’। বাংলার শান্ত ও নিবিড় প্রকৃতি বর্ণনার মাঝে মাঝে কবিতার মধ্যে মেয়েদের জীবনকথার প্রকাশ আছে। আবার গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্যে অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর একটি সহজ সখ্যতা লক্ষ করা যায়। বিধবা সমস্যা এইসব কবিদের কাব্যে বিশেষভাবে ছায়া ফেলেছে। ব্যক্তিগত জীবনে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে কাব্যগুলোতে। বিখ্যাত কাব্য হল ‘অশ্রুকাণা’, ‘আভাস’, ‘অর্ঘ্য’। ঊনিশ শতকে মহিলা কবিদের মধ্যে আর একজন বিশেষ ব্যক্তি হলেন মানকুমারী বসু। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে ইনি বিধবা হয়েছিলেন। বিধবাদের জীবনযন্ত্রণা তাঁর কাব্যেও বিশেষভাবে ভাষা পেয়েছে। ‘কাব্যকুসুমাজলি’ ও ‘প্রিয়প্রসঙ্গ’ কাব্য দুটি তাঁর কবি প্রতিভার

অন্যতম প্রকাশ। সমকালীন সমাজে নারীদের জীবনের বাস্তব ছবি তাঁর কাব্যে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ের আর একজন কবি কামিনী রায়। তাঁর কবিতায় গীতিকবিতার ছাপ আছে। তবে সমকালীন অন্যান্য গীতিকবি বিহারীলাল বা অক্ষয় কুমার দত্তের মতো আবেগপ্রবণ না হলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে তিনি যে কবিতাগুলো লিখে গিয়েছেন তা কৃতিত্বের দাবি রাখে। তাঁর বিখ্যাত কাব্য হল ‘আলো ও ছায়া’, ‘মালা ও নির্মালা’, ‘পৌরনিকি’, ‘গুঞ্জন’, ‘দ্বীপ ও ধূপ’, ‘অশোক সংগীত’ ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতকের এইসব মহিলা কবিদের কাব্যে নারীদের জীবনকথাসহ সমকালীন আরো নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও নারী জীবনের কথা এক্ষেত্রে অবশ্যই বেশি করে জায়গা পেয়েছে। সব মিলিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিরা তাঁদের কথাকে ব্যক্ত করেছেন নিজস্ব ঢঙে।

বিংশ শতকের শেষ পর্বে ও একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত মহিলা কবিরা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সময়ে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য কবি রাজলক্ষ্মী দেবী। ‘মহাসাধক’ কাব্য প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর আবির্ভাব। এই সময়ের আর একজন বিখ্যাত কবি কবিতা সিংহ। দেশ, কৃত্তিবাস প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশ পেত। বিখ্যাত কাব্যগুলি হল ‘সহজ সুন্দরী’, ‘কবিতা পরমেশ্বরী’, ‘মোমের তাজমহল’ প্রভৃতি। মেয়েদের জীবনযন্ত্রণা ও মেয়েদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচার নিয়ে কবিতা সিংহের হৃদয়ে ছিল গভীর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে তাঁর কবিতার মধ্যে। সমকালীন আর একজন বিখ্যাত কবি হলেন তাসলিমা নাসরিন। তাসলিমা বিদ্রোহী নারী কবি রূপে বিশেষভাবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে আমরা সব সময় দেখছি প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করতে এবং সে বিরোধিতার ভাব ও ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে অন্যদের থেকে আলাদা।

বিংশ শতকের শেষ পর্বে ও একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাব্যগুলি হল ‘আমার প্রভুর জন্য’, ‘যদি শর্তহীন’, ‘ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম’, ‘উড়ন্ত নামাবলি’, ‘ওই যে সৌধের চূড়া’, ‘ভাষায়, যেটুকু বলা যায়’। বিংশ শতকের শেষ পর্বে ও একবিংশ শতকের প্রথম দিকে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত। যুক্তিবাদী ও কঠোর বক্তব্যের জন্য কবিতার জগতে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতাতেও নারী জীবনের যন্ত্রণা ও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা আছে। সাম্প্রতিককালে কৃষ্ণা বসুর মতো তিনিও সরাসরি নারী বিপ্লব ও বিদ্রোহের কথা কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁকে নারীবাদী কবি হিসেবেও অভিহিত করা যায়। তাঁর কাব্যগুলি হল ‘কথামানবী’, ‘আমরা লাস্য আমরা লড়াই’, ‘দেওয়ালির রাত’, ‘পুরুষকে লেখা চিঠি’, ইত্যাদি। মন্দাক্রান্তা সেনের আবির্ভাব বিংশ শতকের শেষ পর্বে। এখনও মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যচর্চা বহুমান। বর্তমান নিবন্ধে আমরা মন্দাক্রান্তা সেনের কাব্যে নারী জীবনের পক্ষেপ বিষয়ে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা অগ্রসর হবে একবিংশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর কিছু কবিতাকে কেন্দ্র করে।

মন্দাক্রান্তা সেন একজন নারী। মেয়েদের জীবনের নানা বিচিত্র প্রসঙ্গ তার কবিতায় বিশেষভাবে জায়গা পাবে, এটাই স্বাভাবিক। ‘বলো অন্যভাবে’ কাব্যের ‘মন্দ’ কবিতায় কবি সমাজের একটি অন্ধকারময় দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের সমাজের কিছু নারী দেহব্যবসা করে জীবিকা উপার্জন করে। খুব সহজ ভাষায় এদেরকে আমরা দেহব্যবসায়ী বলে জানি। একজন নারী কেন দেহব্যবসা করে তার পূর্বাপর বৃত্তান্ত অনুসন্ধান ছাড়াই সেসব

নারীদের গায়ে নষ্ট নারীর তকমা লাগিয়ে দেয় আমাদের সমাজ। ধারণাটা এমন থাকে যেন এইসব নারীদের হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই। এরা শরীরের সুখ ও টাকার মোহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চেনে না। কিন্তু বাস্তবটা কি তেমনটাই অন্ধকারে মোড়া? সেখানে কি আলোর বিন্দুমাত্রেরখা নেই? এইসব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন কবি আলোচ্য কবিতায়। এই কবিতার সেই নষ্ট মেয়ে বলছে—

“ভিতরে ভিতরে শুধু তোর কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

এত পুরুষের কাঁধে হাত রাখি, কেউ তবু

তোর মতো নয়।”

বোঝাই যাচ্ছে এই নষ্ট মেয়েটি কোনো একটা পুরুষকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তাদের সে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি। বর্তমানে যে কারণেই হোক তাকে বহু পুরুষের কাছে শরীর বেচতে হয়, বহু পুরুষের কাঁধে হাত রাখতে হয়। তবুও হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসার যে সূক্ষ্ম বিন্দুটি রয়েছে তাকে সে মরতে দেয়নি। হাজার শরীরের স্পর্শেও ভালোবাসার মানুষের বুকে ভেসে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে। বোঝাই যাচ্ছে দেহব্যবসায়ী হলেও সে শুধুই দেহের ব্যবসাদার নয়। তার হৃদয়েও ভালবাসা আছে, সেও কাউকে ভালবাসে।

কবিতা শেষ পর্বে কবি আরো একটি প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। যারা সুস্থ দৈনন্দিন জীবনযাপনে বিশ্বাস করে, তারা কি কখনও কোনো দেহব্যবসায়ীকে ভালবাসতে পারবে? দেহব্যবসায়ীকে নিজের প্রেমিকা বলে সম্মান জানাতে পারবে? সত্যি বলতে কী এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এই কবিতায় যে পুরুষের উল্লেখ করেছেন কবি, সেই পুরুষটি দেহব্যবসায়ীকেই ভালোবেসেছে। সেও জানে যে তার প্রেমিকা সতী নয়। তারপরেও সে তাকে ভালোবাসে। ভালবাসার এই মর্মর প্রাসাদ নষ্ট মেয়ের মুখ থেকেই আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় –

“ভিতরে ভিতরে শুধু তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে

যাকে আমি ভালোবাসি।

সে আমাকে মন্দ বলে জানে।”

একজন নারী হয়ে মন্দাক্রান্তা সেন এই কবিতায় পুরুষকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সাধারণভাবে দেখা যায় নারী কবিরা পুরুষ সমাজকে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবেই বিবেচনা করেন। পারস্পারিক সম্মানবোধ অনেক সময়ই রক্ষিত হয় না। পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আক্রোশের সেই করাল রূপ মন্দাক্রান্তা সেনের মধ্যে দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে মন্দাক্রান্তা কিছুটা যেন অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন।

নারী ভাবনার আরো একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ‘ছদ্মপুরাণ’ কাব্যের ‘ভাসান’ কবিতায়। এই কবিতায় এমন একটি গৃহবধূর ছবি আঁকা হয়েছে, যে তার সংসার জীবনে চরমভাবে নির্যাতিত। দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে একসময় সে ভাবতে শুরু করে—

“যুবতীটি ভেবেছিল রোজ রাতে বিকোবার চেয়ে

একদিন অন্ধকার বেয়ে

চলে যাবে এই অন্ধকূপ থেকে দূরবর্তী ঘাটে।

এ তার প্রথম ঘাট, নারীজন্ম ভেসে ভেসে কাটে...”

সংসার বা গৃহকোনের মধ্যে হয়তো অনেক জটিলতা, অনেক নিষ্পেষণ আছে, তবুও সংসারের বাইরের পরিবেশ তার চেয়েও ভয়ংকর। কবিতার শেষ পর্বে আমরা দেখি সেই মেয়েটি আরো

কিছু মানুষের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে। এই কবিতায় পাশাপাশি দুটো ছবি আঁকা হয়েছে। একটা ঘর গৃহস্থালির মাঝে যুবতি নারীর ছবি, অন্যদিকে সংসার পরিবেশের বাইরের পৃথিবী। নারীর জন্য কোনো পৃথিবীই যথেষ্ট নিরাপদ নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারীকে শেষ পরিণতির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভোগ করা হয়। কিন্তু এখানেই নারীর শোষণ শেষ হচ্ছে না। গৃহতাগী এই মহিলাটি ঘর ছাড়ার আগে ফেলে গিয়েছিল তার ব্যবহার করা শাড়ি। দেখা যায় সেই সংসারে সেই ঘরে আবার একটি নতুন নারী এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তারই ব্যবহার করা শাড়ি পরিধান করেছে—

“সে ঘরে নতুন মেয়ে, সঙ্গে সেই ছেড়ে যাওয়া শাড়ি...”

কি ভয়াবহ নারীর শেষ পরিণাম। পৃথিবীর তীব্র লালসা তার নিঃশ্বাসের শেষ বিন্দুটি হরণ করেছে নিমেষে, মৃত্যুর আগের মুহূর্তে দিয়েছে চরম শারীরিক অত্যাচার। মৃত্যুর পরেও তার লাঞ্ছনার শেষ নেই। যে ঘর সে ছেড়ে এসেছিল আজ সেই ঘরে জায়গা নিয়েছে আরও একটি মেয়ে। হয়তো এমনটাই ঘটতে থাকবে দিনের পর দিন, হয়তো নতুন মেয়েটি আবার আগের মেয়েটির মতোই অত্যাচারিত হবে। এইসব অত্যাচারের বিচার করবে কে? কে এই পারিবারিক ও সামাজিক অত্যাচারের প্রতিবিধান করবে? এসব প্রশ্ন সকল সহৃদয় নাগরিকের মনেই উপস্থিত হবে, কিন্তু উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। এটাই বাস্তব যে সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকতে হবে সকল নারী সমাজকে।

‘ছদ্মপুরাণ’ কাব্যের **‘লজ্জাবস্ত্র’** কবিতাটিতে বর্তমান সমাজে নারীদের সামাজিক অপমানের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বর্তমান দিনে আমাদের ঘরের মেয়ে মা-বোনেরা রাস্তায় বেরিয়ে কেউ নিরাপদ নয়। যৌবনপ্রাপ্ত সব পুরুষই নারীদেহ উপভোগ করতে চায়। উপভোগের লালসা এতটাই নগ্ন যে কোনো মেয়ে রাস্তায় বার হলে তার সমস্ত শরীরটা যেন চোখ দিয়ে ছিঁড়ে খেতে চায় পুরুষরা। যুবতি মেয়ে বা গৃহবধূদের প্রতি টিপ্পনি কাটার অভ্যাস আমাদের সমাজ আজও পরিত্যাগ করতে পারেনি। বর্তমান অতিসভ্য সভ্যতার এই চরম লজ্জাজনক সত্য এই কবিতায় ব্যক্ত করেছেন কবি—

“রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর খসে পড়ছে আমার পোশাক

নগ্ন হয়ে যাচ্ছি, মাগো, কুঁজো হয়ে বসে পড়ছি শেষে

দু’হাতে জড়িয়ে নিচ্ছি দুই হাঁটু, ঢেকে নিচ্ছি মুখ বুক পেট

অরক্ষিত পিঠে এসে তীর বিঁধছে গোছাগোছা

মাগো দৃষ্টি গিঁথে যাচ্ছে যকৃতেও,...হৃৎপিণ্ডে...ফুসফুসে...”

বর্তমান দিনে রাস্তা, অফিস, আদালত, বাস, ট্রেন কোথাও নারীরা সুরক্ষিত নয়। কখনও তাদের সরাসরি আঘাত করা হয়, কখনও রেপ করা হয়। যখন সেসবের সুযোগ থাকে না তখন যেন দৃষ্টি দিয়ে তার সর্বস্ব হরণ করা হয়। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি যেন চোখের চাহনি দিয়েই সর্বাংশে ভোগ করে নেয় নারীকে। সময়ের নেপথ্যে এই কথাগুলো যে কতদূর সত্য তা বর্তমান সভ্যতা ও সমাজের দিকে তাকালে খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

নারীর হৃদয়ে পুরুষের অস্তিত্ব কতটা, পুরুষকে নারী কতটা ভালোবাসে, কতটা তার উপরে ভরসা করে? এইসব প্রশ্নের খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছেন **‘বিশ্ব কবিতাশুচ্ছ’** কাব্যের **‘আবাহন’** কবিতায়। মানুষের সমাজ টিকে আছে নারী পুরুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, প্রেম ও প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে। এইসব প্রেমের পরিণতি কতটা সুখকর হয় বা কতটা দুঃখের হয় তা বিচার করা বা যাচাই করার সুযোগ সবসময় থাকে না। সেই পরিসংখ্যান নেওয়াও একপ্রকার

দুঃসাপ্য। তবুও এই সত্য উপেক্ষা করার উপায় নেই। নারীর হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব, নারীর প্রেমময় হৃদয়ে পুরুষের অবয়ব কেমন তা বুঝে নিতে পারে একমাত্র নারীরাই। হৃদয়ের গোপন কথাকে হৃদয়ের মাঝে বুঝে নিয়ে সেটাকে প্রকাশ করতে পারে একজন নারী। যেমনটা প্রকাশ করেছে এই কবিতার নায়িকা—

**“তুমি না থাকলে চারিদিকে শুধু শূন্যতা
কত মুহূর্ত কত শতাব্দী শুনব তারা”**

সত্যিই নারীর হৃদয়ে পুরুষের অস্তিত্ব এমনই। নারী পুরুষকে হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার পর, নিজে নিজেই উপলব্ধি করে এই সম্পর্কের ভিতরে তার একান্ত আবেগ থাকলেও নিশ্চয়তা সর্বাংশের নেই। তবুও নিজের সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও শেষ পর্যন্ত নারী পুরুষকেই তার শেষ আশ্রয়স্থল বলে মনে করে। অনুভূতি তীব্রতা এক্ষেত্রে এতটাই গভীর থাকে যে, নিশ্চিত সর্বনাশের মধ্যেও নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে অন্য এক ধরনের আনন্দ তারা খুঁজে পায়। তারপর হৃদয়ের সব আগল উন্মুক্ত করে সাক্ষাতের আবেদন জানায়—

**“তুমি না থাকলে সব জনহীন, সব উজাড়
এস, থেকে যাও আমার সঙ্গে দিন দু’চার”**

প্রত্যেক নারীরাই তাদের ভালোবাসার মানুষকে জীবনের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলে মনে করে ও নিজেদের সমস্ত কিছু উজাড় করে দেয় সেই পুরুষের কাছে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে কতটা সুবিচার পায় তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মানবসভ্যতার মূল ভিত্তি নরনারীর পারস্পরিক সংসার বন্ধন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে একটা পুরুষ ও একটা নারী পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ নামক সামাজিক এই প্রতিষ্ঠান আসলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ বৈবাহিক সম্পর্কে ভালোবাসা দায়িত্ববোধ বা পারস্পরিক সম্মানবোধের অস্তিত্ব থাকে না। পুরুষের ইচ্ছার কাছে মেয়েদের জীবনের সব সখ বলি দিতে হয়। বলি দিতে দিতে মেয়েদের জীবন দিনে দিনে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারপরেও তারা মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে। অথচ পুরুষসমাজ মেয়েদের এই আত্মত্যাগের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। সংসার জীবনে মেয়েদের এইরকম আত্মত্যাগের একটি সুন্দর ছবি কবি উপস্থাপন করেছেন ‘এমন নৃশংস আয়োজন’ কাব্যের ‘করোটির ঢাকনা খুলে’ কবিতায়। এখানে একটি সংসারের ছবি আঁকা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে গৃহবধূটি স্বামীর ভালোলাগা মন্দলাগার মূল্য দেওয়ার জন্য জীবনের সব সত্যকে, ভালোবাসার সব অনুভূতিকে স্বামীর পায়ের তেলে দিয়েছে—

**“মাথা থেকে ভূত নামিয়ে দাও
বলতে বলতে**

মাথাই নামিয়ে রাখছি তোমার পায়ের”

বউটা মাথা নামিয়ে রাখল স্বামীর পায়ের, কিন্তু তাতে কি ভালোবাসা পেল? নাকি স্বামী নামক সেই পুরুষটি বধূটির সর্বাংশ ভোগ করতে করতে হিংস্র পশুতে পরিণত হয়েছে? কবিতার শেষে কবি এইসব প্রশ্নের খুব কাব্যিক উত্তর দিয়েছেন—

“ভৃগু করে খাচ্ছ তুমি

আমার পঁজে ওঠা ঘিলু...”

স্ত্রী'কে ভোগ করতে করতে পুরুষ কখন যে হিংস্র পশুতে পরিণত হয় তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। যে স্ত্রী'কে সে ভোগ করেছে, অন্তরে অন্তরে রক্তক্ষরণ হতে হতে সেই স্ত্রী শেষ পর্যন্ত জীবিত থেকেও মরে যায়, পচে যায় তার আত্মা। অথচ সেই জীবন্ত মৃতদেহ ভোগ করতেও পুরুষের কোনো দ্বিধা থাকে না। এই ক্ষেত্রে ‘গোঁজে ওঠা’ শব্দটি ব্যবহার করে কবি পুরুষদের হিংস্রতা ও নারীদের অসহায়তাকে বাণীরূপ দিয়েছেন। এই সত্য সভ্যতার ইতিহাসে অতি বাস্তব। বর্তমান দিনেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখনও সংসার পরিবেশে স্ত্রী'রা প্রতিদিন শোষিত হচ্ছে, আর নির্মমভাবে তাকে শোষণ করে চলেছে পুরুষ। আমরা জানি না কবে আমাদের এই নোংরা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে? তবে আমরা আশাবাদী। নিশ্চয়ই সেই শুভ দিনের উদয় হবে, যেদিন নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

গৃহবধূ, যুবতি, সাধারণ শ্রমিক, দেহব্যবসায়ী ইত্যাদি নানা পরিচয় নারীর থাকলেও, সবচেয়ে বড় পরিচয় তাদের মাতৃত্বে। মাতৃত্বের অনুভূতি ও দায়িত্ববোধ সামাজিক পরিবেশে একটা নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ‘শাণিত শহরের মেয়ে’ কাব্যের ‘পুজো’ কবিতায় এমনই একটি মাতৃত্বের গল্প কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। পুজোর আগে মা এবং মেয়ের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন চলছে। মেয়েকে নতুন জামা দিতে পারেনি বলে মায়ের মন খারাপ, আর মায়ের নতুন শাড়ি হয়নি বলে মেয়ের মন খারাপ হয়ে আছে। মনখারাপের এই দোলাচলতার মাঝে একটু একটু করে পুজো কেটে যায়। বিসর্জনের দিন প্রতিবারই পুরনো পোশাক পরে কেটে যায় মা ও মেয়ের—

“বিসর্জনের দিন

আমরা দু'জনে প্রতিবারই পরি

পুরনো একটা পাটভাল্লা বিষাদ

ইন্ডিরি করে হৃদয়ে তুলে রাখা”

পুজোর আনন্দের সময়ে মেয়েকে নতুন জামা দিতে পারেনি বলে মায়ের হৃদয় কেঁদে ওঠে, আবার মায়ের নতুন শাড়ি হয়নি বলে মেয়ের হৃদয়ও কেঁদে ওঠে। পারস্পরিক এই যে হৃদয়ের কান্না তা একমাত্র নারী হৃদয়েই সম্ভব। এই অনুভূতির তল পাওয়া পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। নারীর মাতৃত্ব সন্তানের আনন্দে পূর্ণতা পায়। সন্তানকে হাসিমুখে দেখতে মায়েরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু ছোট মেয়েটি সে তো এখনো মা হয়ে ওঠেনি, তাহলে সে কেন মায়ের নতুন শাড়ি হয়নি বলে মন খারাপ করে রয়েছে? আসলে এটাই নারীত্বের অন্যতম অহংকার। ছোট মেয়েটি মা হয়ে না উঠলেও তার জিনের মধ্যে মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি লুকিয়ে রয়েছে। যে কারণে মা'কে পুরনো শাড়ি পরে যেতে হবে ভেবে তারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ সমাজ জীবনের হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে মা ও মেয়ের এই মন ভার করার পালাক্রম অনন্ত সময় ধরেই চলতে থাকে। তবে এ কথাও সত্য মাতৃত্বের এই রোশনাই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে, মাতৃত্বের অহংকার নারীকে অহংকারী করে তুলেছে। তাদের অহংকার বজায় থাকুক, মাতৃত্বের ছোঁয়ায় পৃথিবী আরো রঙিন হয়ে উঠুক এই আমাদের প্রত্যাশা।

কোনো সন্দেহ নেই মন্দাক্রান্তা সেন একবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি। তাঁর কাব্যজগৎ বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ। তবুও একজন মহিলা কবি হিসেবে তাঁর কাব্যে মেয়েদের কথা থাকবে বেশি অংশে এটা খুবই স্বাভাবিক। আর ঘটেছেও ঠিক সেটাই। মন্দাক্রান্তা জীবনের অন্ধকার সত্যগুলোকে খুব সহজভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আধুনিক জীবনযন্ত্রণাকে ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গা থেকে অনুভব করেছিলেন। বিভিন্ন কবিতায় তাঁর সেই ভাবনার প্রকাশ আছে।

একবিংশ শতক অত্যাধুনিক জীবন সভ্যতার শতক। অন্তর্জালসহ অত্যাধুনিক জীবনভাবনা, বিশ্বায়ন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে এখনকার জীবন পরিচালিত হচ্ছে। একথা স্বীকার করতাই হয় অত্যাধুনিক জীবনভাবনার অনেক সুফল আমরা উপভোগ করছি। তবে প্রদীপের পিছনে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনই অত্যাধুনিক জীবনদর্শনের মধ্যেও অনেক জটিলতা লুকিয়ে আছে। ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের গভীরে এখন বেশি করে দানা বেঁধেছে একাকিত্বের যন্ত্রণা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই যন্ত্রণায় আহত হচ্ছে প্রতিটি মানবাত্মা। তবে বলতেই হয় একাকিত্বের যন্ত্রণাসহ জীবন জীবিকার অন্যান্য আরো সমস্যা পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে বেশি অংশে লক্ষ করা যায়। এই সত্য খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কবি মন্দাক্রান্তা সেন। কবিতার মধ্যে তাঁর সেই উপলব্ধির প্রকাশও আছে বহুল পরিমাণে।

সভ্যতার একেবারে আদি লগ্নে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো ভেদরেখা ছিল না। সেদিনের বন্য পরিবেশে পুরুষ ও নারীরা কাঁধে কাঁধ রেখে জীবনযুদ্ধে অংশ নিত। কিন্তু সভ্যতার যত অগ্রগতি ঘটেছে ততই নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমা বাড়তে শুরু করেছে। একটা সময়ের পর নারী তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে পুরুষকে। কারণ নারীদের জীবনের যাবতীয় লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার মূল কারিগর পুরুষরাই। এরপর শুরু হয় নারী-পুরুষের মধ্যে একটি ঠান্ডা লড়াই। এই আবহাওয়ায় আস্তে আস্তে পিছু হটতে থাকে নারীরা। দিনে দিনে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত হতে হতে একসময় তারাও রুখে দাঁড়ায়। প্রতিবাদ জানাতে থাকে জীবনের নানা অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে। সাহিত্য সেই অধ্যায় গুলোর একটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকেই মহিলা কবিরা তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও এই ধারা চলতে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে পেয়েছি আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীদের মতো মহান শিল্পীদের। যাঁরা বিভিন্ন উপন্যাসের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিজেদের মতো করে। তাই বলতে হয় বাংলা সাহিত্যে নারীভাবনা ও নারীজীবনের প্রচারকথা আমরা পেয়েছি বহু আগেই। একবিংশ শতাব্দীতে সেই ধারার বিন্দুমাত্র ছেদ ঘটেনি। মন্দাক্রান্তা সেন এই সময়ের কবি হিসেবে সময়ের ভাবনাকে কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। তবে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা তাসলিমা নাসরিনসহ অন্যান্য আরও অনেক মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের মতো নয়। মন্দাক্রান্তা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন সমস্যা গুলোকে। হৃদয়ের গভীরে কীভাবে নারীরা প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হয় সেই ক্ষয়ের ছবি অঙ্কন করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের মহিলা কবিদের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়ালেও মন্দাক্রান্তা কোথাও যেন তাদের থেকে পৃথক কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আচার্য দেবেশ কুমার, ২০১০, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, ১৯৫০-২০০০), কলকাতা, ইউনাইটেড বুক এজেন্সী, পৃ. ৫১৭।

আকর গ্রন্থ:

সেন মন্দাক্রান্তা, ২০২০, মন্দাক্রান্তা সেন শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

ক্লাসিক্যাল জীবনানন্দ ও পপুলার নজরুল : একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যবেক্ষণ

কালিপদ বর্মণ

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: কাজী নজরুল ইসলাম এমন একজন প্রখর ও শক্তিশালী কবি, যিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাঁর কবিতায় দেশপ্রেম, সাম্য, মানবতা এবং বিদ্রোহের সুর বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো শুধু বাংলা ভাষার সম্পদ নয়, এটি বাঙালির আবেগ ও অনুভূতিরও একটি অংশ। অপরদিকে জীবনানন্দ দাশকে বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি বাংলা কাব্য জগতে এনে দিয়েছেন সম্পূর্ণ এক নতুন সুর যা একান্তভাবেই স্বপ্নিল ও স্পর্শ-রূপ-গন্ধময়। সামগ্রিক এক নিজস্ব কবিসত্ত্বা নিয়েই তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এক কবিতা বিশ্বের অধীশ্বর। নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ একই সালে জন্মগ্রহণ করেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে কী অবিশ্বাস্যভাবে একজন আর একজনের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন ভাবলে আশ্চর্য লাগে! মুশকিল হয়, আমরা সাধারণত বিপরীত অবস্থান বলতে বুঝি, একজন নেতিবাচক ও একজন ইতিবাচক। দুজনেই ইতিবাচক হয়েও যে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, সে কথা আমরা সাধারণভাবে মাথায় আনতে পারিনা! যা জীবনানন্দ ও নজরুলের ক্ষেত্রে চরমভাবে ঘটেছে, আর এই বিষয়টিই এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

সূচক শব্দ: কন্ডিশন, মতবাদ, অন্তর্জগত, বহির্জগত, বদল।

মূল আলোচনা:

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুজন মানুষ। আর দুজনই জন্মেছেন ১৮৯৯ সালে। জীবনানন্দ দাশ নজরুল ইসলামের থেকে মাত্র তিন মাসের বড় ছিলেন। এই দুজন মানুষের বদনামও কম নয়। নজরুল সম্পর্কে অনেককেই বলতে শোনা যায়, তাঁর কবিতাগুলো মোটা দাগের, স্রেফ গদ্যকে কবিতা বলে চালানো। আবার জীবনানন্দ সম্পর্কেও অনেকেই অনেক কথা বলে থাকেন মানে তাঁর নাকি কোনো সামাজিক দায় ছিল না, শুধুমাত্র নিজস্ব অনুভূতি নিয়ে পরপর কবিতা লিখে গেছেন প্রভৃতি। এরকম নানা কথা আমরা শুনতে পাই। এসবের বাইরে আবার অনেকেই দুজনের মধ্যে তুলনা টানেন যে কে বড়, কে ছোট। কিন্তু যাঁরা জীবনানন্দ ও নজরুলের লেখা ভালোভাবে পাঠ করেছেন তাঁদের যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ভাবায় তা হল, একই বছরে দুজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেও তাঁদের সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় এত বিপরীত কেন? কেনই বা তাঁরা কবিতার স্টাইলের ক্ষেত্রে, কবিতার বিষয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন? আর এই বিষয়টা নিয়েই আমাদের আলোচনা। আসলে পৃথিবীতে কোনো কিছুই তো এমনি এমনি ঘটে না তার পেছনে কারণ থাকে। সমস্ত কিছুর পেছনেই থাকে কন্ডিশন। এই ব্যাপারটা আলোচনার পূর্বে আমরা কিছুটা পেছনে গিয়ে দেখে নেব সে সময় বিশ্ব সাহিত্যে কী কী ঘটছিল অর্থাৎ সমাজ,

সাহিত্য, শিল্প ও আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন হচ্ছিল। এতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রথমত, পৃথিবীতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পরবর্তী অংশে এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যারা সারা পৃথিবীকে প্রায় এক হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা হলেন চার্লস ডারউইন, কার্ল মার্ক্স, সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও আলবার্ট আইনস্টাইন। চার্লস ডারউইন তাঁর 'অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস' গ্রন্থে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। ফলে মানুষের বিবর্তনবাদ অর্থাৎ বানর থেকে মানুষ কী করে হল এই যে রহস্য, তার পুরোটা আবিষ্কার করলেন। ফলে আমরা জেনে গেলাম আমাদের রুটটা কী। কার্ল মার্ক্স আবিষ্কার করলেন শোষণের বিজ্ঞান। তিনি তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল'-এ শোষিত শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলেন। কেননা তার আগে মানুষ মনে করতেন যে রাজা-মহারাজা ও সামন্ত প্রভুরা শোষণ করবে, অত্যাচার করবে, শ্রমের সঠিক মূল্য দেবে না-আর এই সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক। তারা এটাকে তাদের নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। মার্ক্স প্রথম মানুষকে বোঝালেন যে এটা নিয়তি নয়, এটা প্রতিবাদ করার বিষয়। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে তিনিই প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত করেন। ফলে মানুষের চিন্তা পাল্টে গেল। ফ্রয়েড কী করেছেন তা সকলেরই জানা, তবুও বলি তিনি মানুষের মনের ভেতরে অবচেতনের যে রহস্য তা আবিষ্কার করলেন। অর্থাৎ মন কীভাবে চলে, কীভাবে আমাদের পরিচালিত করে মানে এইসব জটিলতা নিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করলেন। আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন যে পৃথিবীতে সব কিছুই আপেক্ষিক। মানে সময় অনুযায়ী প্রত্যেক জিনিস দৃশ্যত বদলে যায়। আর এখান থেকেই যে পোস্ট মডার্ন কনসেপ্ট তৈরি হচ্ছে শুধু তাই নয়, মানুষের বস্তু সংক্রান্ত সমস্ত ধারণা পাল্টে যায়। এই চারজন মহান মানুষের চিন্তাভাবনার ফলে আমাদের সভ্যতা অন্ততপক্ষে এক হাজার বছর এগিয়ে যায়। আর এখান থেকেই জন্ম নেয় বাজার অর্থনীতি বা মার্কেট ইকোনমি।

দ্বিতীয়ত, সামন্ততান্ত্রিক যুগে সম্পত্তি মানে ছিল শুধুই জমি। কারণ সামন্তপ্রথা একটি ভূমি ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল, যেখানে জমির মালিকানা ছিল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু জমিতো প্রাকৃতিক সম্পদ, একে প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি করা বা বিক্রি করা যায় না। সরাসরি পুঁজি তৈরিও সম্ভব নয়। জমি বাড়তে গেলে আর একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিতে হবে। তখন কিছু মানুষ বিবেচনা করে আবিষ্কার করল যে এসেনশিয়াল কমোডিটি বাড়তে হবে। এসেনশিয়াল কমোডিটি হল এমন পণ্য যা সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ ছাতা, জুতো, জামা-কাপড়, ঘরের ভেতরে আসবাবপত্র মোটকথা যা বিক্রি করে মুনাফা হবে। এই করতে গিয়েই শিল্প বিপ্লব হল। Industrial revolution হলে প্রোডাক্ট বেচার পক্ষে উপযোগী দেশগুলোকে খুঁজে নেওয়া হল। যেখানে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষ বেশি আছে অথচ প্রচুর মানুষ - সেই দেশগুলোকে টার্গেট করা হয়। এভাবেই কিন্তু কলোনিয়াল কনসেপ্ট গড়ে ওঠে। কলোনি থেকে শিল্প-সাহিত্যের যে মারাত্মক জিনিস আবিষ্কার হয় সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট আর পপুলার কনসেপ্ট।

তৃতীয়ত, সংগীতের জগতে, কবিতায় কিংবা চিত্রশিল্পে সেই সময় কী কী ঘটেছিল সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। সংগীতের জগতে বিঠোফেন পরিচিত একজন মানুষ। তিনি ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক সংগীতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। তিনি নিজেকে পরিচিত করে তোলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুরকারদের একজন হিসেবে। তিনি ১৮১২ থেকে ১৮২৭ এই যে সময়কাল, এই সময় পর্বে মিউজিক্যাল ফর্মের দিক থেকে এমন কিছু আবিষ্কার করলেন যা

তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন মৌলিক সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে পরিচিতি দিলেন। মানে বহুদিন ধরে যা প্রচলিত যেমন মিউজিক শুধু কানের আরাম তাকে অতিক্রম করে তিনি তাঁর কম্পোজিশনের ভেতরে সামাজিক প্রসঙ্গ থেকে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয় তাকে যুক্ত করলেন। এর ফলে সংগীত ইন্দ্রিয়সুখ অতিক্রম করে মগজ অবধি পৌঁছে গেল। তা আর সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার আওতায় থাকল না, ফলে মিউজিকের পূর্ণ রস নিতে গেলে আলাদা করে প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ল, প্রয়োজন পড়ল আলাদা করে শিক্ষা গ্রহণের। এর আগে সংগীত ছিল মনোরঞ্জনকারী অর্থাৎ সামন্ত প্রভুদের জন্য, রাজার জন্য দরবারে বাজানো হত। যাতে মন ভালো হত অর্থাৎ কানের আরাম কিন্তু ভেতরে কোনো বার্তা থাকত না। কোনো ফিলোসফি থাকত না। পাশাপাশি কবিতাও আগে ছিল শুধুমাত্র বর্ণনামূলক। যাকে এপিক পোয়েট্রি বলা হত। তাতে কোনো বিশ্লেষণ ছিল না। রামায়ণ মহাভারতে যেমন আছে আরকি। ১৮৬১ তে বোদলেয়ার প্রথম কবিতার কনসেপ্ট, কবিতার ডিকশন সারা পৃথিবীতে সমস্ত দিক থেকে পাল্টে দেন। তিনি বোঝালেন কবিতা চিন্তার বিষয়। তিনি ক্লাসিক্যাল অ্যাটিটিউড কবিতার মধ্যে রাখলেন। ১৮৫৭ সালে 'ফ্লুর দ্য মাল' নামে তাঁর প্রথম কবিতার বই বের হয়। তিনি বললেন অনুভূতিই কবিতার নিউক্লিয়াস। ইন্দ্রিয় চক্ষু দিয়ে দেখা নয়, আত্মার দৃষ্টি হচ্ছে কবিতার আসল দৃষ্টি যা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। শুধুমাত্র রোমান্টিকতার চর্চিত চর্চন নয়, কবিতায় আসবে পৃথিবীর যে কোনো বিষয় তবে তা আসবে কবিতার মতো করেই। বোদলেয়ার-এর হাত ধরেই কবিতায় সিম্বলিজম-এর জন্ম হয়। ফলে কবিতা আর শুধুমাত্র বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকল না, সংগীতের মতোই তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে চলে গেল আর কবিতার পূর্ণ রস নিতে গেলে আলাদা করে প্রস্তুতির প্রয়োজন হল। শিক্ষার প্রয়োজন হল।

আর চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ১৮৭৪ সালে Impressionism অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়াবাদের জন্ম হয়। ইম্প্রেশনিষ্টরা বললেন পৃথিবীতে ঘটা যে কোন ঘটনাই ছবির বিষয় হতে পারে। সে বড় ঘটনা বা তুচ্ছ ঘটনা, যাই হোক না কেনো কারণ আমরা ছবিতে যেমন সময়ের ইম্প্রেশন রাখতে চাই তেমনি ছবির ভেতরে কিছু না কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতিকেও রাখতে চাই। যা সাধারণভাবে বা সহজে অনুভব করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজনে আলাদা প্রস্তুতি নিতে হবে। আগে ছবি আঁকার মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র দক্ষতা প্রদর্শন। মানে প্রকৃতিকে কতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্যানভাসে ধরতে পারা যায়। আবার কখনো বিষয় ছিল নির্দিষ্ট, যেমন- মা ও শিশু, বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ছবি এরকম। এগুলো বদলে গেল ইম্প্রেশনিষ্টদের কারণে। আসলে এতদিন যে ছবি আঁকা হত তাতে চোখের আরাম হত, মগজে পৌঁছত না। ছব্ব কোনো কিছুর ছবি আঁকা কিন্তু তাতে বার্তা কই? এই ইন্দ্রিয়ের আরামই হচ্ছে পপুলার কনসেপ্ট-এর মূল কথা। এই যে ক্ষণে ক্ষণে আলো পাল্টাচ্ছে, রহস্য তৈরি হচ্ছে -- আলো দিয়ে এগুলোকে তো ধরতে হবে। ইম্প্রেশনিষ্টরা পপুলার কনসেপ্টকে বদলানোর চেষ্টা করেন।

আবার ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকাটাও ক্রমশ বেশ জটিল হয়ে উঠছিল। তার কারণ শিল্প বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন। যা নিয়ে শুরুতেই একটু বলেছি। শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি পৃথিবীতে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল আর স্বাভাবিক নিয়মেই আধুনিকতার বিবর্তন ঘটছিল অনিবার্যভাবে। আর এই সমস্ত কিছুর প্রভাব এসে পড়ে শিল্প-সংস্কৃতিতে। ফলে শিল্প আর ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, তাকে অতিক্রম করে মগজ অবধি পৌঁছে গেল। আর যেহেতু শিল্পের মূল উপজীব্য হল অনুভূতি, তাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম হল শিল্পে অনুভূতির প্রয়োগ। ফলে সেই শিল্পকে অনুভব করতে হলে ও তার

পূর্ণ রস নিতে গেলে আলাদা করে প্রস্তুতির প্রয়োজন হল, শিক্ষার প্রয়োজন হল, অনুশীলনের প্রয়োজন হল।

এবারে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাহলে সাধারণ মানুষ কী শিল্পের রস পাবেনা? এই প্রশ্নের মুখে পড়ে তখন একটা কনসেপ্ট তৈরি হয়ে গেল পপুলার আর ক্লাসিক্যাল-এর। যেমন- ছড়া ও কবিতা (ছড়া পপুলার, কবিতা ক্লাসিক), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ভীমসেন যোশী (হেমন্ত পপুলার, ভীমসেন ক্লাসিক), হরনাথ চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায় (হরনাথ পপুলার, সত্যজিৎ ক্লাসিক), কিংবা যাত্রা ও নাটক (যাত্রা পপুলার, নাটক ক্লাসিক। অর্থাৎ কাউকে যদি শিল্পের রস নিতে হয় তবে তাকে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ধীরে ধীরে কবিতার ভেতরেও দুটো ভাগ গড়ে ওঠে, একটা পপুলার কবিতা আর একটা ক্লাসিক্যাল কবিতা। এই দুটো মাধ্যমকে আলাদা আলাদা ভাবে বেছে নিলেন জীবনানন্দ ও নজরুল।

এবারে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কেনো দুজন দু'রকম পথ বেছে নিলেন? আসলেই নজরুল ও জীবনানন্দ যেসময় সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন সেসময় দুটো মেজর ঘটনা ঘটে। একদিকে দেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে নানা আন্দোলন গড়ে ওঠে, অপরদিকে বিশ্ব সাহিত্যকে পরিচয় করানো হয় বাংলায়। যেমন ১৯৩০-এ বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ারের কবিতা ও সাহিত্যিক চিন্তাভাবনা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে পরিচিত করান। বোদলেয়ারকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন এবং বোদলেয়ারের কবিতার ভাষা ও শব্দ ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত করে এবং কবিতায় চলে আসে 'সুররিয়াল ভাবনা' ও বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার।

জীবনানন্দ যেহেতু ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন, বিদেশি সাহিত্য বেশি পড়তে হয়েছে তাই তিনি কিন্তু এই ক্লাসিক্যাল কনসেপ্টে চলে গেলেন বিশ্ব সাহিত্যকে ধরার জন্য। তাঁর ভেতরে সুর রিয়ালিস্টিক ভাবনা চিন্তা কাজ করতে থাকে। তিনি জোর দেন অবচেতন মনের রহস্য আবিষ্কারে। আর নজরুল ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও জোরদার করে তুলতে মন দেন সেই উপযোগী গান ও কবিতা রচনায়। যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতা সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক। এমনকি এই কবিতা জাতিগত ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ। 'মুক্তি' কবিতাটি দেশপ্রেমের গান এবং স্বাধীনতার জন্য মানুষের লড়াইকে তুলে ধরে। 'ভাঙার গান'- এ পুরনো ভেঙে নতুন কিছু গড়ার কথা বলেন। পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানান। কবিতাটিও দেশপ্রেম এবং বিপ্লবের প্রতীক। নজরুল তাঁর লেখনী শক্তির মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে বিদ্রোহী সত্ত্বাকে জাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রায় সবকটি রচনাতেই বিদ্রোহের অগ্নিশিখা স্পষ্ট। তিনি পপুলার স্টাইলে লেখেন অথচ তাঁর লেখা পড়ে কিছুতেই চুপ করে বসে থাকা যায় না।

যেমন 'বিদ্রোহী' কবিতার একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি বর্ণ আমাদের শরীরের রক্তকে টগবগ করে ফুটিয়ে তোলে। যেন মাত্র কটি অক্ষরের সাহায্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ম্যাজিককে তিনি আমাদের দেখাচ্ছেন। এ অতি বিস্ময়কর। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই এরকম। তাঁর কবিতাগুলো ইংরেজ উপনিবেশের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষদেরকে, পড়ে থাকা জলে ভেজা ন্যাতানো সলতেকে যেন কেউটের ছোবলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ সেই বিস্ময়কর ম্যাজিকের মধ্যে তেমন কোনো হেঁয়ালী, সংকেত বা কোনো ইজম-এর প্রয়োগ ছিল না। শুধুমাত্র পপুলার অ্যাপ্রোচের সাহায্যেই তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি শুধু নয়; কারার ঐ লৌহ কপাট, কাভারী হুঁশিয়ার, আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে, আনন্দময়ীর আগমনে,

কামাল পাশা.... ইত্যাদি একটার পর একটা অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে গেছেন। লক্ষ করার বিষয় হল তাঁর কবিতায় কোনো হেঁয়ালী, সংকেত বা কোনো ইজমের প্রয়োগ নেই, শুধুমাত্র পপুলার অ্যাপ্রোচের সাহায্যেই সরাসরি বাস্তব থেকে নেওয়া শব্দ দিয়ে তিনি এই বিস্ফোরক বারুদের জন্ম দিয়েছেন-যা তুলনাহীন। আর জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি সকলেরই জানা।

জীবনানন্দ দাশের স্পেশালিটি হল তাঁর অন্তর্মুখীনতার কারণে। তাই তাঁর কবিতা ক্লাসিক্যাল। আসলেই গভীর মানসিক অনুভব কখনো ব্যাখ্যাযোগ্য হয় না। সেই অনুভব অন্যের মননে ট্রান্সফার করতে হলে সরাসরি বলে করা যায় না, একটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যে কৌশলটি পড়ার অভ্যাস বা অনুশীলন না থাকলে এমনি পড়েই বোধে নিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কাব্য কুহেলি কুহকে আচ্ছন্ন। তাঁর কাব্যে আছে সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়।

যেমন 'বনলতা সেন' কবিতাটি আমাদের সকলেরই জানা। কী আছে কবিতায়? যে একজন পুরুষ এক নারীর প্রেম পড়েছে। সেই প্রেম অত্যন্ত গভীর। কীরকম গভীর? আমরা যেভাবে কথা বলি, সেভাবে সরাসরি বলে বোঝানো সম্ভব নয়, তাই তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। যে একটি জাহাজডুবির পর ভাঙা হাল আঁকড়ে ভেসে থেকে এক নাবিক সমুদ্রের ভেতরে অনেকটা দূর চলে গেছে। কোথাও কোনো ডাঙার চিহ্ন সে দেখতে পাচ্ছে না। সে একেবারে দিশা হারিয়ে ফেলেছে। একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, যে তার মৃত্যু অনিবার্য। এমন সময় সে দেখতে পেল একটি ডাঙা বা দেশ। যেটি সবুজ ঘাসে ভরা। শুধু তাই নয়, অত দূর থেকেও সে দারুচিনির মিষ্টি গন্ধ টের পাচ্ছে। এই যে মৃত্যু হবে জেনেও সে যখন দেখতে পায় একটি দারুচিনি দ্বীপ, এখন তার মনে হয় সে বেঁচে যেতে পারে। আর সে বাঁচাটা হতে পারে সুমধুরভাবে। কেননা, সে দারুচিনির মিষ্টি গন্ধ টের পাচ্ছিল। এই একই রকম ব্যাখ্যাতীত মানসিক অবস্থা সেই পুরুষটির হল যখন সে বনলতা সেনকে দেখল। এই ব্যাখ্যাতীত অনুভূতিকে জীবনানন্দ বোঝাবার জন্য উদাহরণ হিসেবে একটি কাহিনিকে যে কৌশল প্রয়োগ করে, যেভাবে পেশ করলেন তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। এই প্রয়োগটিকে আমরা ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচ বলি। কারণ, অনুশীলন না থাকলে এই কৌশলটি সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই কবিতায় জীবনানন্দ পাখির নীড়ের সঙ্গে বনলতা সেন -এর চোখের উপমান-উপমেয় করেছেন। দুটিই দৃশ্য হলেও তিনি উপমান-উপমেয়টি দৃশ্যত হিসেবে করেননি। কারণ পাখির নীড় মানুষের চোখের মতো একেবারেই দেখতে নয় এবং মাপেও এক নয়! তিনি আসলে এই দুটি বস্তুর একটির ধারণার সঙ্গে আর একটির ধারণার উপমান-উপমেয় করেছেন। অর্থাৎ সাদৃশ্যের জায়গাটা হল একটির ধারণার সঙ্গে আর একটির ধারণার সাদৃশ্য। একটা পাখি শুধু খাবার সংগ্রহ করার জন্য সারাদিন ধরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। রাতে সে ফিরে আসে একমাত্র আশ্রয়স্থল তার নিজ বাসস্থানে। আর তার কোনো আশ্রয়স্থল নেই। এই 'একমাত্র আশ্রয়স্থল'- এর ধারণাটি বনলতা সেন-এর চোখের ধারণাটির সঙ্গে হুবহু এক অর্থাৎ ওই পুরুষটির কাছেও বনলতা সেন- এর চোখদুটি একমাত্র আশ্রয়স্থল অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশ এখানে পাখির নীড় এবং বনলতা সেন-এর চোখের দৃশ্যের উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে গিয়ে অন্তর্নিহিত ভাবে একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার উপমান-উপমেয় করেছেন। অর্থাৎ এটি দৃশ্যত নয়, ধারণাগত উপমান-উপমেয়। ফলে এই প্রয়োগ আর পপুলার থাকল না। ক্লাসিক্যাল অ্যাপ্রোচে স্থান করে নিল। মানুষের অন্তরলোকের গহীনে প্রেমের যে স্বর্গীয় উপস্থিতি, তাকে কি

সরাসরি বাস্তব দিয়ে ধরা যায়? ধরা কখনোই সম্ভব নয়। অথচ জীবনানন্দ পারলেন এই জটিল প্রয়োগের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

- ১) কাজী নজরুল ইসলাম, 'সঞ্চিতা', কলকাতা ডি.এম লাইব্রেরী, অক্টোবর ১৯২৮।
- ২) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, চতুর্দশ মুদ্রণ:শ্রাবণ ১৪২১, আগস্ট ২০১৪, কলকাতা-৭৩
- ৩) জীবনানন্দ দাশ- 'বনলতা সেন' সিগনেট প্রেস, কলকাতা, সপ্তবিংশ সংস্করণ, পৌষ- ১৪০৮।
- ৪) জীবনানন্দ দাশ- 'মহা পৃথিবী' সিগনেট প্রেস, কলকাতা, নবপর্যায় সিগনেট প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫।
- ৫) নিরোধ বরন হাজারা, এক নজরুল সহস্র সংশ্রয়, বুলবুল প্রকাশন, কলকাতা-১৯৯৯।
- ৬) সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'কবি জীবনানন্দ দাশ', ভারবি, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি- ২০১৪।

নবজাগরণের অগ্রগামী শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর

ছোট্ট দাস

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে জাগরণ ঘটে। অবিশ্বস্ত বঙ্গে মতুয়া আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নানারকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্ম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শ শতকে বাংলার নবজাগরণ ঘটেছিল শ্রী চৈতন্যদেবের মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে সংঘাত ও মিলনের মাধ্যমে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম, নিউ হিন্দু মুভমেন্ট, ইয়ং বেঙ্গলদের আন্দোলন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, বেথুন সাহেব, ডেভিড হেয়ারের অবদান অনস্বীকার্য। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। এই কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণ ছিল শহরকেন্দ্রিক, শহরের বাইরে পল্লী বাংলায় যেখানে দেশের নব্বই শতাংশ নিপীড়িত দলিত মানুষ বসবাস করেন সেখানে এর প্রভাব পড়েনি।^১ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণের নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই গ্রাম বাংলার অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সেই নবজাগরণের অগ্রদূত শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।

সূচক শব্দ: নবজাগরণ, শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ও গুরুচাঁদ ঠাকুর, শিক্ষা, সংস্কার, সাম্য।

মূল আলোচনা:

গীতায় বলা হয়েছে যে, যখনই দেশে অধর্মের বন্যা বয়ে যায়, তখনই একজন মহাপুরুষ এসে মানব সমাজকে সঠিক পথে চালিত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি অনাচারে বাঙালি সমাজ তথা ভারতীয় সমাজ জীবন নিপীড়িত হচ্ছিল তখনই আবির্ভূত (১৮১২-১৮৭৮) হয়ে ভারতকে নতুন পথে পরিচালিত করার সঠিক নির্দেশ দিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর তার দেখানো পথেই বাংলার অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া সামাজ্য নামে এক সম্প্রদায় তৈরি করেন এবং অনগ্রসর ও নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তাঁর মতাদর্শ দ্বাদশ আজ্ঞা নামে পরিচিত। এই আজ্ঞা গুলি হল- ১) সদা সত্য কথা বল। ২) পরস্পরকে মাতৃ জ্ঞান কর। ৩) মাতা পিতাকে ভক্তি কর। ৪) জগতকে প্রেম দান কর। ৫) চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ কর না। ৬) ষড়রিপুর নিকট সাবধান থাকিবে। ৭) কাহারও ধর্ম নিন্দা করিও না। ৮) বাহ্য অঙ্গ সাধুসাজ ত্যাগ কর। ৯) হাতে কাজ মুখে নাম কর। ১০) শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা কর। ১১) ঈশ্বরকে আত্মদান কর। ১২) দৈনিক প্রার্থনা কর। এই আজ্ঞা গুলি বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চশীল ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ এর অনুরূপ। এই দ্বাদশ আজ্ঞা ছাড়াও তাঁর অন্যতম আদর্শ হচ্ছে “জীবে দয়া

নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা”। জীবকে সেবা করলেই ভগবানকে সেবা করা হয়। এটা হচ্ছে তাঁর অন্যতম আদর্শ।

স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন “জীবের প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর”। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। এই জন্য তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অনগ্রসর মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া, সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করানো প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে জীবসেবার মহান আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছেন। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের সুদূরপ্রসারি ও বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধারা শুধু ভারতবর্ষের অনগ্রসর শ্রেনীকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে যে পথ দেখাতে সক্ষম তা তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। অতি সংক্ষেপে তাদের কর্মজীবনের কিছু অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

নারী শিক্ষা ও নারী - পুরুষের সাম্যের নীতি:

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মবাদী হিন্দু দর্শন নারীদের দেবীরূপে কল্পনা করেছে, মৃন্ময়ী মাতৃজ্ঞানে পুজো দিয়েছে। আবার সেই নারীকেই নরকের দ্বার বলেছে, সাধন ক্ষেত্রে নারী পরিত্যাজ্য বলে নারী বিহীন ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করেছে। সর্বোপরি নারীদের পশুর অধম বলে গালিও দিয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সংসার জীবনে নারীদের দাসী-বাদী করে রেখেছে, সন্তান জন্মদাত্রী যন্ত্র রূপে বন্দী করে রেখেছে। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মনে করেন ব্রহ্মচর্য কিংবা সন্ন্যাস ও সকল রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে গিয়ে যারা গৃহ ত্যাগ করে তারা জীবন চর্যাঁয় ভুল তো করেই উপরন্তু নারীর প্রতি চরম অবমাননার পরিচয় দেয়। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে এ সকল বর্ণাশ্রম প্রথা পালনের জন্য গৃহ, নারীসঙ্গ বা কায়িক শ্রম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। গৃহে থেকেই চতুরাশ্রম প্রথা অনুযায়ী জীবন চর্যাঁ করা যায় তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বলেনঃ

“করিবে গৃহস্থ ধর্ম লয়ে নিজে নারী

গৃহে থেকে ন্যাসী বানপস্থী ব্রহ্মচারী”।। (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃষ্ঠা ১১)

জগতের সমস্ত ধর্মই গৃহীকে এবং নারীকে ধর্ম সাধনার বাধা হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ধর্ম আন্দোলনে সেই গৃহ এবং নারীকেই সর্বোচ্চে রেখেছেন। এই বাস্তব মতুয়া ধর্ম আন্দোলনের যুগান্তকারী মতবাদ বা আদর্শই কেবল নয়, এ এক নতুনতর জীবন আদর্শ তথা বস্তুবাদ এর প্রতিষ্ঠা করেছে। তা সমাজ বিপ্লবের নতুন দিগন্ত কে চিহ্নিত করেছে।

গার্হস্থ্য ধর্ম তথা দাম্পত্য জীবনাচরণের এই আদর্শ, একে মানবতার চূড়ান্ত সার্থকতা বলেই হরিচাঁদ ঠাকুর উন্মোচন করেছিলেন। এই দাম্পত্য আচরণ বিধিকে আজ সারা পৃথিবী আইনে রূপান্তরিত করতে কতই না চেষ্টা করছে। তথাকথিত নারীবাদীরা বিশ্বজুড়ে আজ যে নারীবাদ বা মানবী চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বজুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন, হরিচাঁদ ঠাকুর প্রায় ২০০ বছর পূর্বে এই সর্বশ্রেষ্ঠ সমতার মানবিক আন্দোলনের আকারে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন এবং সেটা যে কত বড় বাস্তব সত্য তা মতুয়া মেলায় বর্ষ উৎসবে আগত মতুয়ারা দলে দলে নারীসহ যখন উপস্থিত হন তখন দেখা যায়। একজন নারী তার মানবী চেতনার মানবিক সমতায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি সুসংগঠিত মতুয়া দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, পরিচালনা করছেন। তার পেছনে রয়েছে অসংখ্য পুরুষ ও নারী। এই নারীকে মতুয়া ধর্ম আন্দোলন নারী হিসেবে চিহ্নিত করেনি, মানুষ হিসেবে, মতুয়া হিসেবে নবজাগরণের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

হরিচাঁদ ঠাকুর মনে করেন, নারীদের পুরুষের পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। "দশরথের প্রতি নায়েবের অত্যাচার ও কাছারি আখ্যানে নারী কাছারির উল্লেখ পাওয়া যায়। নারী কাছারির সে রায়ে অপরাধীর সাজা হয় ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায় তার ভক্তের জয় হয়"।^২ শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেন সমাজের অর্ধেক সংখ্যক নারীদের অচেতন রেখে সমাজ এগোতে পারে না, মানব সমাজের প্রকৃত উন্নতি হতে পারে না। অতএব নারীদেরও অবশ্যই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেছেনঃ

“খাও বা না খাও তাতে কোন দুঃখ নাই।

ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আমি চাই”।। (শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ১৪৪)

নারীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিলাম, কিন্তু ঘরে বন্দী করে রাখলাম, অন্যান্য মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখলাম- তা হবে না। তাদের পুরুষের সমান অধিকারও দিতে হবে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন:

“সমাজে পুরুষ পাবে যেই অধিকার।

নারীও পাইবে তাহা করিলে বিচার”।।

গুরুচাঁদ ঠাকুরও পিতাকে সমর্থন করেছেন-

“শুনেছি পিতার কাছে আমি বছবার।

নারী-পুরুষ পাবে সম অধিকার”।।

শুধুমাত্র এই বানী শুনিয়েই থেমে থাকেনি হরিচাঁদ ঠাকুর এবং গুরুচাঁদ ঠাকুর। এসব যাতে বাস্তবে, ধর্মে ও কর্মে প্রকৃত রূপ পায় তার ব্যবস্থা করেছেন। তালতলা গ্রামসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বহু বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। অসহায় দুর্বল নারীরা যাতে স্বয়ম্বর হতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর শতবর্ষ পূর্বে ওড়াকান্দিতে নারী ট্রেনিং স্কুল খুলেছিলেন। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সংগঠিত মতুয়া ধর্মের সমাজ সংস্কারের যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হলো নারী পুরুষের সাম্যের নীতি, নারীর শিক্ষা ও আত্ম উপলব্ধি।

শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন:

“শিক্ষিত হও সংগঠিত গঠিত হও ও আন্দোলন কর” (Education, Organise, Agitate) আমরা জানি এই স্লোগানটি বাবাসাহেব আম্বেদকরের। কিন্তু তার বহু পূর্বে এই একই স্লোগান দিয়েছিলেন শিক্ষার অগ্রদূত শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর।

“বিদ্যা হীন সমাজের কোন গতি নাই।

বিদ্যা শেখো বিদ্যা শেখো বলিলেন তাই।। (Education)

সভাকর সভাকর প্রভুজি হাঁকিল। (Organise)

ঘরে ঘরে আন্দোলন প্রয়োজন হল”।। (Agitate)

(শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ১১৩)

মহাকবি মহানন্দ হালদারের কাব্যের ছন্দের মধ্যে দেখতে পাই- শিক্ষা আন্দোলন, সংঘ বা সংগঠনের নির্মাণ, যেটা পূর্বেই হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া নাম দিয়ে সকলকে সংগঠিত করেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই সংগঠনের উপর দাঁড়িয়ে আন্দোলন করার জন্য তৈরি করেছিলেন নমঃশূদ্র, মতুয়া তথা পিছিয়ে রাখা শ্রেণীকে।

তিনি আরো বলেন

“নমঃশূদ্রকূলে জন্ম হয়েছে আমার,
তবু বলি আমি নহি নমঃর একার।
সবারে বলি আমি যদি মান মোরে,
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।
খাও বা না খাও তাতে দুঃখ নাই,
ছেলেপিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই”।

এই বার্তা গুরুচাঁদ ঠাকুর বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন। ডেকে ডেকে সবাইকে নিজ নিজ গ্রামে বিদ্যালয় তৈরি করতে বললেন। ঠাকুরের প্রেরণায় নমঃশূদ্রগণ বিভিন্ন জেলায় বিশেষত ফরিদপুর, খুলনা, যশোর এবং বরিশাল জেলায় বিদ্যালয় তৈরি হতে লাগলো। তিনি বললেন বিদ্যালয় তৈরি না হওয়া পর্যন্ত গোয়াল ঘরে পড়ার ব্যবস্থা করবে। ভোরে গোয়াল ঘর থেকে গরু বের করে দিয়ে সেই ঘর পরিষ্কার করে ছেলে-মেয়েদের পড়বার ব্যবস্থা করবে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী কুসংস্কারকে অবজ্ঞা করে গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃশূদ্র কূলে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে। মিড সাহেবের স্ত্রীও এই নারী শিক্ষার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ওড়াকান্দিতে তৈরি হয়েছিল নারী শিক্ষালয়। শ্রী গুরুচাঁদ চরিতের ৩৭১ পৃষ্ঠায় পায়:

নারী শিক্ষা দিতে প্রভু ব্যস্ত সর্বদায়,
ওড়াকান্দি তাতে হল নারী শিক্ষা লয়।

এছাড়াও তিনি মিড সাহেবের প্রচেষ্টায় সকলের জন্য অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমাজে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন:

হরিচাঁদ ঠাকুর যখন এসেছিলেন অবতার রূপে এই ধরাধামে তখন সমগ্র বিশ্ব বিশেষত ভারত বর্ষ ছিল পরাধীন এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এদেশ ছিল বিদেশি ধর্মাস্তকারীদের দাপটে, তাদের ধর্মীয় আচ্ছাদনে। মুসলিম ধর্মের আতিশয্য এবং খ্রিস্টান ধর্মের শাসনে। হিন্দুধর্ম ছিল সামাজিক অধিকারে একদম কোণঠাসা। হিন্দু ধর্মে ছিল প্রচুর শ্রেণীবিভাগ এবং জাতিগত বিভাজন। মুসলিম ধর্ম এবং খ্রিস্টান ধর্মের মানুষদের অত্যাচারে হিন্দুরা হয়েছিল শোষিত, হয়েছিল দুর্বল এবং নিঃস্ব। এই সুযোগে একশ্রেণীর হিন্দু যারা উচ্চবর্ণ হিসেবে গণ্য ছিল হিন্দু সমাজে তারা রাজ দরবারে তোষামোদ করে স্থান করে সসন্মানে জীবন যাপন করতেন। এরাই আবার দুর্বল হিন্দুদের দাসত্ববৃত্তি করতে কুষ্ঠিত হয়নি বরং এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের উপর এইসব উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার ও শোষণ ছিল মর্মান্তিক। এই নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নমঃশূদ্ররা। উচ্চ বর্ণের মানুষদের মধ্যে ছিলেন প্রথমে ব্রাহ্মণ, পরে কায়স্থ এবং বনিয়ারা। কায়স্থ এবং বনিয়ারা পরোক্ষভাবে শোষণ করতেন নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের। এ প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করতে পারি। তিনি মানুষকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন:

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান”।

জাতিভেদ প্রথা বিরোধী আন্দোলন:

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে যে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, বৈদিক বিধানকে অস্বীকার করেছিলেন “বেদ বিধি শৌচাচার নাই মানি” এর মধ্যে দিয়ে। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রণীত মতুয়া দর্শনের মূলনীতি হল:

“জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা,

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা” (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, পৃষ্ঠা ১১)

গুরুচাঁদ ঠাকুরও পিতার আঞ্জা ও আদেশ কে শিরোধার্য করে দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার মতে জাতিভেদ প্রথা হচ্ছে কোন সমাজ ও দেশের ক্ষেত্রে মারণ ব্যাধি স্বরূপ। তাই তো তিনি বলেছেন:

“মানুষে মানুষে বল ভিন্ন জাতি কোথা?

নরজাতি এক জাতি ভেদ করা বৃথা”। (শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ৩৬০)

গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজে জাতিভেদ প্রথার ওপর কুঠারঘাত করে বলেছেন:

“নমঃশূদ্র কূলে জন্ম হয়েছে আমার।

তবু বলি আমি নাহি নমঃর একার”। (শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ১৪৪)

এখানে গুরুচাঁদ ঠাকুরকে কেন এই কথা পরিস্কার করতে হচ্ছে- তিনি শুধু নমঃর নন? বৈদিকবাদিরা কখনোই চান না অন্য সমাজ থেকে কেউ উপরে উঠে আসুক। তাই হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুরের উপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র নমঃদের জন্য কাজ করছেন। তারা নমঃর ভগবান। এখানেও জাতিবাদের মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা হরি-গুরুচাঁদের জীবনদর্শন ও কর্মের যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো তাদের কর্মধারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ছিল, বিশেষ কোনো এক জাতির জন্য নয়। তার প্রমাণ আমরা পাই:

“নরাকারে ভূমন্ডলে যতজন আছে।

এক জাতি বলে মান্য পাবে মোর কাছে”।। (শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ২০১)

এই বিশ্বে যত মানুষ আছে তারা সকলে আমার কাছে এক জাতি অর্থাৎ মানব জাতি বলে মান্যতা পাবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই স্বীকারোক্তি বারবার কেন করতে হচ্ছে? কারণ, বৈদিকবাদী জাত ব্যবস্থা দেশ ও সমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করেছে যে, কারো পরিচয় জানার পূর্বে তার জাত (caste) সম্পর্কে জানা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরুচাঁদ ঠাকুর বৈদিকবাদীদের জাতিভেদ ব্যবস্থার উপর কুঠারঘাত করে জানিয়ে দিয়েছেন- বিশ্বের সকল মানুষ তার কাছে এক জাতি হিসেবেই মান্যতা পাবে।

“মতুয়া সকলে এক, জাতি-ভেদ নাই”।

বিশেষত: কন্যা হলে নাহিক বালাই”।। (শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ২০১)

তিনি সকলকে নির্দেশ দিতেন মতুয়ারা সকলে এক, তাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ যেন না থাকে। আর মতুয়া সমাজে কন্যা বা নারীর স্থান সবার উর্ধ্বে। কোন প্রকার নারী-পুরুষ বা জাতিগত বৈষম্য চলবে না।

রাজনৈতিক মতাদর্শের জাগরণ:

ধনহীন বিদ্যাহীন যারা এই ভবে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা শান্তি নাহি পাবে।।

আত্মমত্ত অগ্রভাগে প্রয়োজন তাই।

বিদ্যা চাই, ধন চাই, রাজকার্য চাই।। (শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত পৃষ্ঠা ৫৭৩)

এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর একটি সংকেত দিয়ে গেছেন যে, আপনাকে শুধু শিক্ষিত ও সম্পদশালী হলেই চলবে না, রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করতে হবে। কারণ, সেখানেই শাসন ব্যবস্থার ও দেশের প্রগতির সব ক্ষমতা গচ্ছিত আছে। বিচার পরিবর্তন সব

পরিবর্তনের মূল তেমনি সব রাজনীতি হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস। এই মৌলিক কথাকে কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই ক্ষমতার উৎসে পৌঁছানোর জন্য যেসব উপকরণ একান্ত প্রয়োজনীয় সেসব অর্জনের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। কারণ, সব বিদ্যাধন অর্জিত হলে আর্থিক ধনও এসে যাবে। তখন রাজনৈতিক অধিকারের জন্য সংগ্রামী লিগু হওয়া যাবে। তিনি এই বিদ্যাহীনদের জাগানোর জন্য আরো জানিয়েছেন যে, পৃথিবীর কোণে কোণে যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, যারা বিদ্যা ও অর্থ ধনে ধনী নয়, তারা কখনোই দেশের পরিচালনায় মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেনা। আর যদিও কোন প্রকারে ওই ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে তারা সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারবে না। তাই আত্মোন্নতির অগ্রভাগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো বিদ্যালাভ করা। এই বিদ্যা লাভ করতে পারলে ধনও আসবে আর দেশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতার অধিকারীও হওয়া যাবে। এক কথায় সব সমস্যার সমাধানের চাবি হচ্ছে শিক্ষিত হওয়া। সেই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনই নয়, সঙ্গে সামাজিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হতে হবে। তা না হলে কোন ক্ষেত্রে শান্তি আসবে না। তার মতে এই রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে সজ্জবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে। তাই তো তিনি বলেছেন,

“যে জাতির দল নাই, সে জাতির বল নাই।

যে জাতির নাই রাজা সে জাতি হয় না তাজা”।

মূল্যায়ন:

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, যে অর্থে শ্রীচৈতন্যদেব কে ষোড়শ শতকের নবজাগরণের নেতা বা রাজা রামমোহন রায় কে উনিশ শতকের নবজাগরণের নেতা বলে অভিহিত করা হয়, সেই অর্থে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ- গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বাংলার অবহেলিত লোকায়ত সমাজের নবজাগরণের যথার্থ অগ্রদূত বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে দাবি করা যায়।

শ্রী শ্রীহরিচাঁদ-গুরুচাঁদ নেতৃত্বাধীন মতুয়াধর্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের গতিশীল প্রবাহ বিশ্লেষণে এই তথ্য উদঘাটিত হয় যে কেবলমাত্র ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে হরি-গুরুচাঁদের প্রচেষ্টা ও উদ্যম নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, তা বর্তিত হয়েছে অনুন্নত জনগোষ্ঠীর আত্মজাগরণের ক্রমোন্নত প্রয়াসজনিত নব নব রূপান্তরের ধারায়। এই রূপান্তরের ধারা সূত্রাকারে নিম্নলিখিত রূপে বিন্যস্ত করা যায়-

- ১) জাত-পাত বিরোধী সংগ্রাম রূপ নেয় ব্রাহ্মণ্য পুরোহিত তন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে।
- ২) ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র বিরোধী আন্দোলন রূপান্তরিত হয় ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে।
- ৩) স্বতন্ত্র ধর্ম সংস্কার আন্দোলন রূপান্তরিত হয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে।
- ৪) সংস্কার আন্দোলন রূপান্তরিত হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়। পুনরুত্থাজীবনের
- ৫) অর্থনৈতিক উন্নয়ন আন্দোলন প্রসারিত হয় রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনে।
- ৬) মতুয়া আন্দোলন রূপ পরিগ্রহ করে নিপীড়িত সমাজের আত্মজাগরণের আন্দোলনে।^{১০}

তাই বলা যায় জাত-পাত বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে যার প্রাথমিক সূত্রপাত, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তা আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং সৃষ্টি করে অবহেলিত সমাজের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন। এইভাবে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ নেতৃত্বাধীন মতুয়া ধর্ম আন্দোলন মূলত নমঃশূদ্র সমাজকে অবলম্বন করে উদ্ভূত হলেও কালক্রমে তা সমাজ সংস্কার ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় জাগরণের সার্থক পরিণীতির দিকে অগ্রসর হয় এবং সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি করে অবহেলিত সমাজের নবজাগরণ।

তথ্যসূত্র:

- ১। শ্রী বরুণ কুমার ভক্ত, আলোর দিশারী শ্রীহরি-গুরুচাঁদঠাকুর, পৃষ্ঠা ৬
- ২। হরেন্দ্র নাথ মন্ডল, পাঁচ মহামানবের ধর্মীয় দর্শন, বলাকা সমবায় আবাসন, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২২, পৃষ্ঠা ৫২
- ৩। কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম আন্দোলন, নিখিল ভারত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা ৯৬

গ্রন্থপঞ্জি:

১. তারক চন্দ্র সরকার, শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, (নবম সংস্করণ) ঠাকুরনগর, ২০১০
২. আচার্য মহানন্দ হালদার, শ্রীশ্রী গুরুচাঁদ চরিত (পঞ্চম সংস্করণ) ঠাকুরনগর, ২০১০
৩. কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম আন্দোলন, নিখিল ভারত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
৪. জগদীশচন্দ্র রায়, গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার ও মুক্তির দিশা, হরিচাঁদ গুরুচাঁদ প্রকাশনী, মুম্বাই, ২০১৯
৫. হরেন্দ্র নাথ মন্ডল, পাঁচ মহামানবের ধর্মীয় দর্শন, বলাকা সমবায় আবাসন, উত্তর ২৪ পরগনা, ২০২২
৬. শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, মানব দরদী গুরুচাঁদ, সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তী, কলকাতা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৭. শ্রী বরুণ কুমার ভক্ত, আলোর দিশারী শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ ঠাকুর, ২০১৭
৮. রসময় বাইন, হরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আঙা ও হরি-গুরুচাঁদের অমীয় বাণী।
৯. অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র দাস, শ্রী হরিচাঁদ প্রসঙ্গে, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
১০. ড. কিরনচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮
১১. ড. জি. কে.পাহাড়ি, ভারতের ইতিহাসের রূপরেখা, শ্রীতারা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬
১২. গৌতম ভদ্র, নিম্নবর্ণের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কোলকাতা, ২০১২।

বাংলা কবি জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে জীবনানন্দ দাশ : প্রসঙ্গ আনিসুল হকের ‘এতদিন কোথায় ছিলেন’

দিব্যেন্দু দে

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকদের জীবনকে কেন্দ্র করে, বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন ধারা আমরা গড়ে উঠতে দেখি গত কুড়ি-তিরিশ বছরে। সেখানে মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক মানিক থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত একাধিক সাহিত্যিক, মনিষীদের জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে উপন্যাস। আমাদের আলোচ্য কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস।

বাংলা আধুনিক কবিতার এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী কবি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দকে দু’ভাবে আবিষ্কার করা হয়। এক হল — জীবন বিমুখ, রাজনীতিবিমুখ, সমকাল বিমুখ, নারী বিদ্বৈষী, অন্ধকার বিলাসী ইত্যাদি। আবার অন্যভাবে বলা যায় সমকাল বিমুখতা নয়, আসলে বণিক সভ্যতা বিমুখ, একজন মানব প্রেমিক, যিনি নির্জন আলোর সন্ধান করেছিলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্য গগনে দাঁড়িয়েও তিনি নিজের স্বতন্ত্রের রাজপথ নির্মাণ করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর যাবতীয় সাফল্য মৃত্যুর পরবর্তী কালে, জীবনে তাই কবি দেখে গেলেন— বেকারত্ব, অসহায়তা, অসুখী দাম্পত্যের এক দীর্ঘ অধ্যায়; আর ‘কবি’ পরিচয়ের জন্য লাঞ্ছনা, ঘরে এবং বাইরে। তাই শুধু কবি জীবনানন্দ নয়, শিক্ষক জীবনানন্দ, অসুখী দাম্পত্যকে বহনকারী জীবনানন্দ, বেকার জীবনানন্দকে বিভিন্ন মাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন একাধিক উপন্যাসিক। পূর্বের সাম্প্রতিক বছরগুলিতে (গত পনের-কুড়ি বছরে) প্রকাশিত এই উপন্যাস গুলি হল— ‘নীল হাওয়ার সমুদ্রে’, ‘সোনালী ডানার চিল’, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন’, ‘একজন কমলালেবু’, আর ‘কাঞ্চন ফুলের কবি’। বর্তমান পরিমিত পরিসরে সমস্ত উপন্যাসের নিবিড় আলোচনা সম্ভব নয়, তাই আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় রূপে আনিসুল হকের ‘এতদিন কোথায় ছিলেন’ উপন্যাসটির আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: জীবনীভিত্তিক উপন্যাস, জীবনানন্দ দাশ, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ব্যক্তিত্ব ও জীবন বোধ, অন্তর্মুখিনতা ও আত্মজিজ্ঞাসা, আনিসুল হক / উপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকদের জীবনকে কেন্দ্র করে, বাংলা কথাসাহিত্যে একটি নতুন ধারা আমরা গড়ে উঠতে দেখি গত কুড়ি-তিরিশ বছরে। সেখানে মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক মানিক থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত একাধিক সাহিত্যিক, মনিষীদের জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে উপন্যাস। আমাদের আলোচ্য কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস।

বাংলা আধুনিক কবিতার এক নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী কবি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্য গগনে দাঁড়িয়েও তিনি নিজের স্বতন্ত্রের রাজপথ নির্মাণ করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর যাবতীয় সাফল্য মৃত্যুর পরবর্তী কালে, জীবনে তাই কবি দেখে গেলেন— বেকারত্ব, অসহায়তা,

অসুখী দাম্পত্যের এক দীর্ঘ অধ্যায়; আর ‘কবি’ পরিচয়ের জন্য লাঞ্ছনা, ঘরে এবং বাইরে। তাই শুধু কবি জীবনানন্দ নয়, শিক্ষক জীবনানন্দ, অসুখী দাম্পত্যকে বহনকারী জীবনানন্দ, বেকার জীবনানন্দকে বিভিন্ন মায়ায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন একাধিক ঔপন্যাসিক। পূর্বের সাম্প্রতিক বছরগুলিতে (গত পনের-কুড়ি বছরে) প্রকাশিত এই উপন্যাস গুলি হল— ‘নীল হাওয়ার সমুদ্রে’, ‘সোনালী ডানার চিল’, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন’, ‘একজন কমলালেবু’, আর ‘কাঞ্চন ফুলের কবি’। বর্তমান পরিমিত পরিসরে সমস্ত উপন্যাসের নিবিড় আলোচনা সম্ভব নয়, তাই আমরা প্রতিনিধি স্থানীয় রূপে আনিসুল হকের ‘এতদিন কোথায় ছিলেন’ উপন্যাসটির আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টিকে প্রস্তুতিত করার চেষ্টা করবো।

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। কিন্তু ২০০৮ থেকে ‘প্রথম আলো’ ঈদ সংখ্যায় এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি ঔপন্যাসিক উৎসর্গ করেছেন ‘প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ, আপনাকে’। লেখক বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন, উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি প্রধানত কবির লেখা ইংরেজি দিনলিপি, বিভিন্ন আত্মীয়র স্মৃতিচারণামূলক বইকেই উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এই উপন্যাসে লেখক কবিকে এমনভাবে সম্বোধন করেছেন যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, লেখকের বলবার শৈলী বেশ অন্যরকম। শুরুতেই যেন স্বপ্নের দেশে চলে গেছেন। ভাষাও সেইরূপ স্বপ্নাতুর, কাব্যিক আলোকচ্ছটাও আছে। বইয়ের শুরুতেই অতি ছোটবেলায় ভাই বোনের জড়ো হয়ে ঠাকুমার কাছে রূপকথা শুনতেন সেইসব কল্পনা তাঁকে কবি হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এরকম ইঙ্গিত আছে এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসে আনিসুল হক বলেছেন যে উপন্যাস তিনি লিখতে যাচ্ছেন সেখানে কবি নায়ক এবং বনলতা সেন নায়িকা। লেখক কবির জন্য দুচোখে দুফোঁটা জল নিয়ে বসে আছেন। এক ফোঁটা জল তাঁর ব্যর্থ প্রেম বা বিষন্নতা, অপ্রেমের জন্য, অপর একটি ফোঁটা আজকের পৃথিবীতে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি, যা তিনি কখনো জানতে পারলেননা; তার জন্য।

অন্যান্য লেখকদের মত ঔপন্যাসিক জীবনানন্দকে এখানে ‘মুখচোরা’ বা ‘ইন্ট্রোভার্ট’ ইত্যাদি না বলে অসম্ভব সুন্দর রসবোধ সম্পন্ন একেবারে উল্টো মানুষ হিসেবে দেখেছেন এবং তা প্রমাণ করতে গিয়ে সাহিত্যিক বাণী রায়ের সঙ্গে কথোপকথন, মেলামেশা; সজনীকান্তর সমালোচনার উত্তর দেওয়া বা ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতি আত্ম সম্মানবোধের আঘাত হেতু প্রত্যাভার— সমস্তই তিনি উল্লেখ করেছেন। এমন ইঙ্গিত লেখক এর উপন্যাসে করেছেন।

একটি বিষয় এই উপন্যাসে উল্লেখ্য তা হলো কবি জীবনানন্দের শুধুমাত্র প্রশংসনীয় দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই উপন্যাসে। অন্যান্যদের লেখায় যেমন নানা নিন্দনীয় দিকও স্থান পেয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে তা নয়, শুধুমাত্র কবি জীবনের নানা প্রশংসা নিয়ে এই উপন্যাস। লেখক কবিকে ‘আপনি’ সম্বোধন করেছেন —

“কবিদের কবি আপনি, আধুনিক, অতি আধুনিক, অস্পষ্ট, নির্জনতম, দুর্বোধ, পরা বাস্তব- কত বিশেষণ, অথচ আপনার কবিতার একটি চরিত্রকে নিজের করে পেতে নাটোরবাসী কতই না উদগ্রীব, মানুষের কি ভালোবাসাই না আজ আপনার জন্য!”

ঔপন্যাসিক কবিকে শোনাচ্ছেন কবির জীবন কাহিনী— ছোটবেলার অসুস্থতা, কুসুমকুমারী দেবীর সন্তানের আরোগ্য লাভের জন্য যে পারিবারিক বাধা টপকে নানান জায়গায় ভ্রমণ, পিতা সত্যানন্দ’র জীবনের স্মৃতি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ খুব সহজ সুরে এই উপন্যাসে উঠে

এসেছে। কবির হাঁটার প্রসঙ্গ এসেছে এখানে। কবি খুব হাঁটতেন খুব ছোটবেলায় বরিশালে বাড়ির সংলগ্ন এলাকা আশপাশ কীর্তনখোলা নদীর ধার, লাশ কাটা ঘর, ও পারিপার্শ্বিক জুড়ে তিনি হাঁটতেন। সে হাঁটার অভ্যেস জীবনের শেষ কাল অবধি বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যুও ঘটে হাঁটতে গিয়ে ট্রামের ধাক্কায়। ছোটবেলায় মা তেমন দেখার সুযোগ পেতেন না সংসারের কাজের চাপে, তাই মতির মার রূপকথা শোনার আগ্রহ এই উপন্যাসে উঠে এসেছে; ‘শঙ্খমালা কাহিনী’ ইত্যাদি কবি শুনতেন।

ছোটবেলা থেকেই কবি অনুভূতি প্রবণ, ঘাস কাটা হলে বলছেন ঘাসের লাগবে। পরে কবি যে কবিতা রচনা করেছেন, যে অনুভবের কথা বলছেন কবিতায় তারই আগাম জন্ম তৈরি করেছেন ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে।

“কি হলো, খোকাবাবু? ফকির জিজ্ঞেস করেন। গাছগুলো কাটছো কেন? ওরা বুঝি ব্যথা পাচ্ছে না?”^২

বাংলাদেশের লৌকিক মিথ-পুরাণ, প্রকৃতি, সংস্কৃতি কিংবা মনসার ভাসান ছেলেবেলায় জীবনানন্দ দেখেছেন, তার সঙ্গে ছিল পড়াশোনার অভ্যাস, বাড়িতে বই ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ছিল। ছোট থেকেই কবিতা লিখতেন জীবনানন্দ। ছোটবেলায় তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন, ক্লাসে প্রথম হতেন। ছেলেবেলার খেলাধুলায় সামান্য মন থাকলেও তিনি সাহিত্যেই মেতে ছিলেন।

এই উপন্যাসে আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হল সেই ‘BY’। কবি তাঁর ডায়েরিতে প্রচুর সাংকেতিক ভাষায় অনেক কিছু লিখে গেছেন, সেখানেই জনৈক ‘BY’- এর কথা জানা যায়। তাঁর প্রতি কবির ভালোবাসার কথাও জানা যায়। অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা সাধারণত কেউ ভেবেছেন এই ‘BY’ আসলে ‘বেবি’- অর্থাৎ কাকাতো বোন; কেউ শোভনা কিংবা মনিয়া ইত্যাদি, কিন্তু এই উপন্যাসে লেখক বেশ অনারকম কথা বলছেন তিনি বলছেন এইসব নাম বা অক্ষর আসলে কল্পিত। কবি কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা পেতে এইসব নারীকে কল্পনা করেছিলেন। উল্লেখ্য এই দৃষ্টিকোণ অন্য কোন উপন্যাসে আসেনি —

“কারণ আপনি আসলে কোন নারীর প্রেমে পড়েছিলেন, কবিতা লেখবার জন্যেই আপনার অধিত বিদ্যা আর জন্মগতভাবে আপনার রক্তের ভেতর বয়ে চলা রোমান্টিকতার প্ররোচনা আপনাকে বলছিল একজন নারী দরকার, আপনি যার প্রেমে পড়বেন, যে আপনাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করবে বটে, বিনিময়ে আপনারই দ্বারা লিখিয়ে নেবে চমৎকার সব প্রেমের কবিতা, সেই নারীটি কে তা মুখ্য নয়, সে হবে আপনার সমস্ত রোমান্টিকতার উৎস।”^৩

এই উপন্যাসে লেখক কবির জীবনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে সামান্য হলেও ছুঁয়ে গেছেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মতো কবির শিক্ষা জীবন এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। মেট্রিক ও আই. এ. —ব্রজ মোহন কলেজ থেকে ফাস্ট ডিভিশন পেয়ে পাশ করেছেন, তারপরে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হন। অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে থাকতেন। ঠিক সেই সময় কুড়ি বছর বয়সেই ‘ব্রহ্মবাদী’ পত্রিকায় ‘বর্ষ আবাহন’ কবিতা প্রকাশ পায়। কবি আইন পড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে ছেড়ে দেন। আবার এম.এ. পরীক্ষা দেওয়ার আগে অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরে পিতার পরামর্শে পরীক্ষা দেন ও সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেন। লেখক বলছেন এই সময় চাকরির নানা সুযোগ থাকলেও সাহিত্য, প্রেম বা কবিতার প্রতি ভালো লাগার জন্য তা হয়নি। আসলে ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে কবিকে শুধুমাত্র প্রশংসার চোখেই দেখেছেন। তাঁর জীবনের গৌরবময় ইতিবাচক দিকটিই তিনি শুধু মাত্র ফুটিয়ে তুলতে

চেয়েছেন— তাই অন্যান্যদের লেখায় কিছু অঙ্কার দিক, কিছু অবরোধের দিক আসলেও এই উপন্যাসে তা আসেনি—

“আপনি যোগ দিলেন কলকাতার সিটি কলেজে, প্রথমে টিউটর হিসেবে”^৪

এই উপন্যাসে আমরা একটা অভিনব বিষয় দেখতে পাই, তা হল প্রিয়ার প্রতি বিরহ বা প্রথম কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গ হিসেবে ‘কল্যাণীয়াসু’ ইত্যাদি আসলে কবির কল্পনা। বাস্তবের কোন নারী নয়। লেখক এই ভাবেই বিষয়টিকে দেখতে চেয়েছেন।

“কিন্তু ওই যে তুরানি প্রিয়াকে হারানোর কথা বললেন, এটা চিঠিতে লিখলেনও অচিন্ত্যকুমারকে, সে কি কেবলই কাব্য করে? এই প্রিয়া কি কেবলই কাব্যের প্রিয়া? নিতান্ত বিরহের কবিতা বানিয়ে তোলায় আয়োজনে একজন প্রিয়ার কল্পনা?”^৫

এরপর শোভনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ এর উৎসর্গ পত্র কোন এক ‘কল্যাণীয়াসু’ এর প্রতি, এই কল্যাণীয়া আসলে বেবি বা শোভনা দাস, পরে মজুমদার। থাকতেন ডিব্রুগড়ে। কবি সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন, শোভনা ছিলেন তাঁর কবিতা শোনার সঙ্গি। পরবর্তীকালে তিনি ভূমেন্দ্র গুহকে সাক্ষাৎকারে জানান যখন তাঁর বয়স প্রায় নব্বই —

“মিলুদা ঝরা পালক আমাকে উৎসর্গ করেছিল”^৬

১৯৩২ এর আগস্ট ‘কলকাতা ছাড়ছি’ উপন্যাসে বনলতার কথা আছে। সে ডায়োসেশন কলেজে পড়ে তাদের মধ্যে পারস্পরিক চিঠি চালাচালি হয়, মাঝেমাঝে কবি গিয়ে দেখা করে আসেন হোস্টেলে কিন্তু অনেকদিন হলো আর কথা হয় না। কবি তাকে চিঠি লেখার কথা ভাবছেন উপন্যাসে এইসব গল্প আছে। আসলে সেই সময় ডায়োসেশন কলেজে পড়তেন শোভনাই সুতরাং বনলতা সেন আসলে শোভনা, বা বেবি এই সিদ্ধান্তে ঔপন্যাসিক এসেছেন—

“কাজেই আমরা আমাদের বনলতাকে পেয়ে গেলাম, জীবনানন্দ। শোভনা ওরফে বেবি। আপনার ওয়াইকেও পেলাম। বেবিই শোভনা, তিনিই বনলতা, তিনিই ওয়াই।”^৭

একটা বিষয় উল্লেখ্য এই উপন্যাসে ‘বনলতা সেন’ কবিতার বিভিন্ন লাইন শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি বিভিন্ন কবিতার একাধিক লাইনও শিরোনাম আকারে ব্যবহার করেছেন। আবার ‘নীল হওয়ার সমুদ্রে’ উপন্যাসে নানা লৌকিক ছড়া শিরোনাম আকারে ব্যবহৃত হয়েছে। এই উপন্যাসেও সিটি কলেজে চাকরি যাওয়া— অশ্লীল কবিতার জন্য নয় সেই সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করার কথাই বলা হয়েছে, চাকরি চলে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন বেকার থাকা, তারপরে দিল্লি রামযশ কলেজে কিছুদিন চাকরি করা ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে যথাযথভাবে এসেছে।

আরেকটি বিষয় দিল্লি স্টেশনে নেমে চারদিকে আলোর ঝলকানি, আর অচেনার মধ্যে সুধীর কুমার বলে এক পরিচিত ব্রাহ্ম তাঁকে নিতে আসেন, তাতে কবি আশ্চর্য হন। তখনই নাকি “পাখির নীড়ের মত চোখ” এর উপমা তাঁর মনে এসেছিল। পরে তিনি ‘বনলতা সেন’ কবিতায় ব্যবহার করেন কিন্তু এর উৎস সম্পর্কে লেখক কিছু বলেননি। ‘নীল হওয়ার সমুদ্রে’ও একই কথা আছে।

লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে কবির বিয়ে হয়ে যায়। পিতৃ-মাতৃহীন লাবণ্য দেবীর পরিবারের থেকে কোন পন দাবী করেননি কবি, অবশ্য এই উপন্যাসে লাবণ্য দেবীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে আরেক

জায়গায় পাত্রী দেখার প্রসঙ্গ আছে। কবির দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি একথা সর্বজন স্বীকৃত। আর সেজন্য প্রায় সবাই লাভণ্য দেবীকেই দোষারোপ করেছেন। কিন্তু এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক লাভণ্যদেবীর পক্ষে কিছু কথা বলেছেন— ঢাকায় পড়াশোনা লাভণ্যদেবীর, ঐরকম শহুরে সুন্দর জীবন কাটিয়েছেন। বরিশালে গোলপাতার ছাউনির মাটির ঘর, কাঁচা বাথরুম, তাঁর পক্ষে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বিয়ের পরও একান্ত ভাবে পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। পরে কলকাতার যে সংসার তা তিনি নিজের হাতে সামলে ছিলেন। কবি দীর্ঘ সময় বেকার ছিলেন কোন আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। কবি অর্থের জন্য স্ত্রীর উপার্জনের উপর নির্ভর করেছেন। আরেকটি বিষয় কবির মধ্যে নিজের চেহারা নিয়েও হীনমন্যতা ছিল। নিজের চুল উঠে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাঁকে বিরত করত, উল্টো দিকে লাভণ্যদেবী ছিলেন প্রকৃত সুন্দরী, তাছাড়া নানাভাবে জানা যায় কবি তাঁর সেই আগেকার শোভনাকে কখনো ভুলতে পারেননি।

“আপনার নিজের চেহারা নিয়ে আপনি কুণ্ঠিত ছিলেন। আপনার চাকরি ছিল না জীবনের বহুবছর, আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, একটা পয়সার জন্য আপনাকে কষ্ট করতে হয়েছে, এরকম দিন গেছে বহু, এসবও হয়তো দিনের পর দিন আপনার সঙ্গে লাভণ্যের দূরত্ব রচনা করে গেছে।”^৮

এমনকি কবি সুজয় নামে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে লাভণ্যদেবীকে সন্দেহ পর্যন্ত করতেন। এরপর উপন্যাসে এসেছে ভয়াবহ বেকারত্ব, অসুখী দাম্পত্য জীবন। পরবর্তীকালে বি.এম. কলেজে কবি চাকরি পান ও সে চাকরি স্থায়ী হয়। এবং পরিবারে শান্তি ফিরে আসে। এসব সত্ত্বেও জীবনানন্দের একমাত্র পরিচয় তিনি একজন কবি, তাই চাকরি পাওয়ার পর তিনি কবিতা রচনার অবসর খুঁজতে থাকেন। টাকার অভাবে আধুনিকতম প্রয়োজনীয় বই তিনি কিনতে পারেন না—

“আমাকে অবসর দাও, দাও টাকা আর প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক বই পত্র, আমি হব আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শীর্ষতম ব্যক্তিত্ব”^৯

ঔপন্যাসিক উপন্যাসের শুরুতে ‘বনলতা সেনকে খুঁজতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি তিনি কবির জীবনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ নানান ঘটনাকেও ছুঁয়ে গেছেন।

চিরকাল বরিশাল কবির প্রিয় জায়গা, কিন্তু ১৯৪৬ সালে ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁরা সপরিবারে কলকাতা চলে আসতে বাধ্য হন। বি.এম. কলেজের চাকরিতে কবি আর ফিরে যাননি। ‘স্বরাজ’ পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদকের পদে যোগ দিয়েছেন। বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসার দৃশ্য খুব সুন্দর ও বেদনাবিধুর। চিরকালের প্রিয় শিকড়ের টান যেখানে সব ছিন্ন করে কোন অনির্দেশের পথে পাড়ি জমানো, সেই পরিস্থিতির বর্ণনা এই উপন্যাসে খুব সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে। কিন্তু কলকাতা এসেও তিনি শান্তি পাননি। পত্রিকার কাজ নরকের মতো মনে হতে শুরু করে। সেখানে তাঁকে বলা হয় “সাংবাদিকতার আপনি কি বোঝেন!” বাড়িতে নানা আত্মীয়-স্বজন আসেন তাঁরা ভেবলু বা অশোকানন্দকে বেশি খোঁজেন, কবিকে সেভাবে খোঁজেই না কেউ, যেন কোন মূল্যহীন মানুষ। তিনি ব্যথিত হন, পরিবারও তাঁকে শান্তি দেয়নি; কবি তাঁর দিনলিপিতে আত্মহননের কথা ভাবছেন, ভাবছেন কোন সমুদ্রে সবাইকে নিয়ে ডুবে মরতে।

‘মাল্যবান’ কবির আত্মজৈবনিক উপন্যাস। কবির মৃত্যুর পর স্ত্রী লাভণ্য দেবী দীর্ঘদিন এই উপন্যাস ছাপার অনুমতি দেননি। কারণ মাল্যবান কখনোই শান্তি পায়নি। কিন্তু জীবনের শেষ কালে খানিকটা হলেও স্থিরতা এসেছিল কবির জীবনে। হাওড়া গার্লস কলেজের সম্মানের

চাকরি, ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তি, কলকাতা সেনেট হলে কবিতা পড়া, ধীরে ধীরে ভক্ত অনুরাগী পাঠক গড়ে ওঠা, ইত্যাদি তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ লগ্নে একই রকম ভাবে সেই উপভাড়াটিয়া (সাবলেট) মহিলার কথা এসেছে। কবি বিষয়টিকে নিয়ে ভীষণই বিব্রত ছিলেন, প্রত্যেকে একথা স্বীকার করেছেন। ১৯৫৪ সালের ২২ শে অক্টোবর রাত এগারোটার সময় কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সেদিন জড়ো হয়েছিলেন, তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে আজীবনের সমালোচক সজনীকান্ত দাস পর্যন্ত শোক জ্ঞাপন করেন। এরই সঙ্গে খুব ছোট্ট করে এক নার্সের আন্তরিক গুণ-মুগ্ধতা। দিনের পর দিন রাতের পর রাত তিনি অক্লান্তসেবা করে গেছেন কবির অসুস্থতার সময়ে।

যেন ঔপন্যাসিক বিনম্র শ্রদ্ধার্থ্য নিবেদন করেছেন পুরো উপন্যাস জুড়ে। কবি জীবনানন্দকে সামনে বসিয়ে তাঁরই জীবনের নানা উচ্চাচ ঘটনা, নানা সমালোচনা নানা খ্যাতি সকল বিষয়কেই তিনি ছুঁয়ে যেতে পেরেছেন। জানিয়েছেন তাঁর বিনম্র অশ্রু বিগলিত শ্রদ্ধা; এই উপন্যাসে খুব অনুপূঞ্জ বর্ণনা নেই কিন্তু খুব সুন্দর সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা বলে হৃদয়গ্রাহী, অন্যান্য কিছু ঔপন্যাসিকের মত অশ্লীলতা বা অপ্রয়োজনীয় নানা কথা এই উপন্যাসে স্থান পায়নি। এই উপন্যাসের ভাষা স্বপ্নের মতো মেদুর ও সুন্দর।

উপন্যাসে লেখক প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে ছুঁয়ে গেছেন, জানিয়েছেন তাঁর গুনমুগ্ধতার কথা, শ্রদ্ধার সঙ্গে উপন্যাসে সেসব তিনি বিবৃত করেছেন। এই উপন্যাসের স্টাইল—কবিকে সামনে বসিয়ে তাঁকে শুনিয়ে তাঁরই জীবনের নানা কথা বা ঘটনাকে ব্যক্ত করা, যেন পাঠকের সামনে কবি জীবনানন্দ, ব্যক্তি জীবনানন্দকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন কবি — এই শৈলী অভিনব তা স্বীকার করতে হবে। সর্বোপরি উপন্যাসের শেষে নার্স শান্তিকে কেন্দ্র করে যে সামান্য ভালোবাসার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন তা সৃজনমূলক এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা, অভিনব কখন ভঙ্গি, ভাষায় স্বপ্নের মেদুরতা, সারল্য এই উপন্যাসের বিশেষত্ব।

তথ্যসূত্র:

- ১। হক, আনিসুল, ২০০৯, এতদিন কোথায় ছিলেন, ঢাকা, সময় প্রকাশন, পৃঃ- ২১
- ২। তদেব, পৃঃ- ২২
- ৩। তদেব, পৃঃ- ৪২-৪৩
- ৪। তদেব, পৃঃ- ৪৫
- ৫। তদেব, পৃঃ- ৪৯
- ৬। তদেব, পৃঃ- ৫২
- ৭। তদেব, পৃঃ- ১০৭
- ৮। তদেব, পৃঃ- ৮৮
- ৯। তদেব, পৃঃ- ১০১।

শ্রী মা সারদাদেবী ও নারীপ্রগতি

নীলেন্দু দাস

সহকারী শিক্ষক, নার্সারী ও কে. জি. বিভাগ

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়

কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সারসংক্ষেপ: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের সমগ্র অংশ জুড়ে যে আধুনিক চেতনা সম্পন্ন নারী; তথা ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নবজাগরণের আনন্দমঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্ঘজননী ও প্রেরণা দাত্রী মা সারদাদেবী অবস্থান করছেন, তাঁর জীবনচর্য্য ও জীবন দর্শনে সুস্পষ্ট ভাবে ঊনবিংশ শতকে নারীজাগরণের চিত্র পরিস্ফুট হয়। যার সকল কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনায় স্থান পেয়েছে জনজাগরণ ও নারী সমাজের বন্ধনমুক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভগিনী নিবেদিতার (মিস মার্গারেট নোবেল) কথায় বলা যায়-তিনি ভারতীয় নারীর পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন আদর্শের অগ্রদূত।

সূচক শব্দ: ধর্মের ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রথা, স্ত্রী শিক্ষা, নারী প্রগতি, শুচিবায়ু, একাদশী-উপবাস, বাল্যবিবাহ।

মূল আলোচনা:

ভারত এমন একদেশ যেখানে নানা ভাষা নানা মত ও নানা ধর্মের মানুষের বসবাস, আর এই ধর্মে ধর্মে বিভেদের কারণে ভারতের অগ্রগতি অনেক পশ্চাদপদ তা শ্রীমা সারদা জানতেন, এই ধর্মের ভেদাভেদ দূর করে তিনি আমাদের কাছে, আমাদের নারী সমাজের কাছে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ বাড়ির বিধবা হলেও তাঁরকাছে ভিন্নধর্মের মানুষ আসতেন কৃপালাভের জন্য। দরিদ্র মুসলমান শ্রমিক আমজাদকে তিনি আপন গৃহমধ্যে খাবার পরিবেশন করে তার উচ্চিষ্ট স্বহস্তে পরিষ্কার করতে তাঁর সঙ্কোচ উপস্থিত হয়নি। এক আত্মীয় এই ব্যাপারে অনুযোগ করলে শ্রীমা সারদাদেবী তাকে ভৎসনা করে বলেনঃ ‘আমার শরণ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে; এই আমজাদ ও তেমন ছেলে’।^১ শ্রী মা সারদাদেবী বোম্বাইবাসী এক অপরিচিত পারসী যুবককে দীক্ষা প্রদান করেন।^২ জনৈকা অ-ভারতীয় খ্রীষ্টান মহিলার কন্যা মায়ের আশীর্বাদে রোগ মুক্তা হলে মহিলাটি মায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও বহুদিন তাঁর কাছে যাতায়াত করতে থাকেন।^৩ এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীমা এক ভারতীয় নারী কতৃক ধর্মের বিভেদের বেড়া জাল নির্মূল করার নজির সৃষ্টি করেন।

ঊনবিংশ শতক ছিল নবজাগরণ ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রী মা সারদাদেবী, যিনি জাতিবিচার কখনই না করার উপদেশ দিয়েছেন। স্বামী ঈশানানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, শ্রী মা সারদাদেবী জয়রাম বাটাতে তাঁর রক্ষনশীল আত্মীয় স্বজনদের দৃষ্টি এড়িয়ে এক অস্পৃশ্য বাগদি যুবককে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন।^৪ একবার গ্রামের বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার পর তিনি ভিন্ন ভিন্ন জাতের ভক্ত-সাধু-ব্রহ্মচারীকে একই পাত্র থেকে মুড়ি ও জিলিপি খেতে দিয়েছিলেন। মায়ের এই কার্য এটাই তুলে ধরে যে, সকল মনুষ্য আসলেই একই, এদের মধ্যে কোন সামাজিক ব্যবধান থাকতে পারে না।^৫ পিতৃব্যের পরলোক গমনের পর তাঁর শবদেহ

শাশানে বহন করে নিয়ে যাবার সময় তিনজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক শূদ্র ভক্ত ও ছিলেন। এই ব্যাপারে সঙ্গিনী গোলাপ মা অনুযোগ করলে শ্রী মা বলেছিলেন “শুদ্রকে গোলাপ? ভক্তের জাত আছে কী?”^৬ তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীদের বয়স্ক কায়স্থ ভক্তের পদধূলি নিতে বলেছিলেন বলে জানা যায়।^৭ সেই যুগে সমুদ্র যাত্রা (কালা পানি পার) করলে হিন্দুর জাতিনাশ হত এবং প্রায়শ্চিত্ত করে আবার জাতে উঠতে হত। তৎকালীন সময়ে এক জন নারী হয়ে ও মা সারদাদেবী স্বামীজীকে ধর্মপ্রচারের জন্য পাশ্চাত্য দেশে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন, একথা সকলের মনে রাখা দরকার।

স্ত্রী শিক্ষা ও নারী প্রগতি বিষয়ে শ্রী মা সারদাদেবীর সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও উদার ছিল। তিনি নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ পাননি, তাছাড়া তিনি ব্যক্তিগত আচরনে ছিলেন লজ্জাশীল, তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মহিলাদের মতো তাঁর ও চলাফেরার অবাধ স্বাধীনতা ছিল না, তা সত্ত্বেও স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি সচেতন আধুনিক চিন্তাভাবনার নজির স্থাপন করে গেছেন। ভগিনী নিবেদিতার স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। নিবেদিতার বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেনঃ ‘নিবেদিতার কর্মশক্তি তিনি প্রশংসা করিতেন এবং সুধীরা দেবী প্রভৃতি নিবেদিতার আদর্শে স্বাধীন ভাবে নারী শিক্ষায় ব্রতী রহিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এক স্ত্রী ভক্তের অবিবাহিত পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনিয়া শ্রী মা বলেছিলেন, “বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও-লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে”।^৮ উত্তর কলকাতার বোসপাড়া লেনে এই বালিকা বিদ্যালয়েই তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে ছাত্রীদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তিনি সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, রাধু বিবাহের পরে চোদ্দ বছর বয়সে ও মিশনারী বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতেন। সঙ্গিনী গোলাপ মা এই ব্যাপারে আপত্তি জানালে সারদাদেবী তাঁকে নিরস্ত করে বলেন যে, এতে দোষের কিছু নেই, বরং লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখার ফলে রাধুর শ্বশুরালয়ের মহিলাদের ও তাদের প্রতিবেশিনীদের ও উপকার হওয়া সম্ভব।^৯ কোয়ালপাড়া গ্রামে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে শ্রী মার আগ্রহ ছিল, জয়রামবাটী অঞ্চলে মেয়েরা লেখাপড়া, সূচী শিল্প ও ধাত্রী বিদ্যা শিখুক তা সারদাদেবী চাইতেন। মায়ের আগ্রহে গৌরীমার সারদেশ্বরী আশ্রমে একটি বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভা বালিকার ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা ও করা হয়েছিল।^{১০} আধুনিক সমাজে নেতৃত্ব করতে হলে ইংরাজী শেখা প্রয়োজন; মা সারদা একথা বুঝেছিলেন। শ্রী মা বুঝিয়েছিলেন মেয়েরা বিয়ের চিন্তা না করে স্বাধীন ভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশের সেবা করবে; বিয়েটা যে মেয়েদের জীবনের চরম পুরুষার্থ নয়- একথা শ্রী মা বার বার তুলে ধরেছেন সকলের কাছে; বিশেষত মেয়েদের কাছে।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম প্রধান বিদেশিনী আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাকে মা সারদা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা, যা যুগের পর যুগ ভারতীয় সমাজে বদ্ধমূল ছিল, অচ্ছুৎ বলে তিনি নিবেদিতাকে ত্যাগ করেননি। আধুনিক চেতনা সম্পন্না নারীর প্রতিনিধি স্বরূপা হয়ে তিনি নিজে তাঁকে গ্রহণ করেছেন এবং অন্যদের কাছে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি সম্পূর্ণ আপন জনের মতোই গ্রহণ করেছেন এবং কলকাতায় নিজের কাছে নং বোসপাড়া লেনে তাঁকে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। এক ইস্টার্ন দিবসে স্বয়ং নিবেদিতার মুখে ইংরাজীতে খ্রীস্টান ধর্ম সঙ্গীত শুনে তিনি সুগভীর ভাবান্বীততা প্রকাশ করেন। নিবেদিতার মুখে একদিন ইউরোপীয় বিবাহ পদ্ধতি

শুনে সারদাদেবী খুব ভালো উপভোগ করেন-নিবেদিতা লিখেছে ‘কিন্তু বিবাহ প্রতিজ্ঞাটি শুনে তাঁর মনে যে ভাবোদয় হল তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। “সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, শক্তিতে, অশক্তিতে যাবৎ মৃত্যু আমাদের বিচ্ছিন্ন না করে”।^{১১} কথাগুলি শোনামাত্র সকলেই ‘আহা’ করে উঠলেন আনন্দে, কিন্তু শ্রীমার পরিতৃপ্তিই সর্বাধিক। বার বার কথাগুলি তিনি শুনতে চাইলেন; বার বার বললেন কী অপূর্ব কথা। কী অপূর্ব কথা।

স্বামী বিবেকানন্দের অপর এক শিষ্যা ওলিবুলের অনুরোধে তিনি অত্যন্ত লজ্জাশীলা হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী ফটোগ্রাফারের সম্মুখে বসে নিঃসঙ্কোচে তাঁর আলোকচিত্র তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এক পত্রে জানা যায় (মার্চ ১৮৯৮) যে সারদাদেবী একদিন কলকাতায় স্বামীজীর কিছু ইউরোপীয় ও মার্কিন শিষ্যাদের সঙ্গে একত্রে আহার ও করেছিলেন।^{১২} সেকালের একজন অল্প শিক্ষিতা, গ্রাম্য পরিবেশে লালিতা, ব্রাহ্মণ-বিধবার পক্ষে-এ ধরনের আচরন ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয় ও ভারতীয় নারী জাগরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইংরেজ শাসন যে আমাদের দেশের মানুষদের জন্য দুর্গতির অন্যতম কারন একথা সারদাদেবীর অজানা ছিল না। ভক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার তাঁর সম্মুখে ইংরেজ শাসনে ভারতের উন্নতির কথা বলেন, তখন শ্রী মা সারদা মন্তব্য করেন- ‘কিন্তু বাবা, ঐ সব সুবিধা হলে ও আমাদের দেশের অল্প বস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অল্প কষ্ট ছিলোনি’^{১৩} সেই মাই স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১১) এর সময় জনৈক ব্রহ্মচারীকে ইংরেজ বিদ্বেষ ও বিলাতি দ্রব্য বর্জনের প্রবণতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিলাতের লোকেরা ও তাঁর সন্তান স্থানীয়, অর্থাৎ তাদের তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না, এ যেন ভারতীয় নারীর বিশ্ব মাতৃত্বের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরন বিশেষ।

ভারতীয় পশ্চাদ পদতার একটি অন্যতম দিক ছিল শুচিবায়ু। এই মানসিক অবস্থার জন্য ভারতীয় সমাজ তথা নারী সমাজ এক অলঙ্ঘনীয় অচলাবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। সে যুগে বহু মহিলাকে শুচিবায়ুগ্রস্তা করে তুলেছিল। এই শুচিবায়ুর সঙ্গে যে মানসিক পবিত্রতার কোন সম্পর্ক নেই এবং এই শুচিবায়ু যে মানসিক মালিন্যের বহিঃ প্রকাশ, একথা ও সারদাদেবী তাঁর গভীর অন্তদৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করেছিলেন।

একাদশী-উপবাস-কৃচ্ছসাধন ব্যাপারে আমাদের হিন্দু সমাজ নারী জাতির প্রতি সুবিচার করেনি, একথা শ্রীমা জানতেন। এ সম্পর্কে তিনি বাল বিধবা শবাসনা দেবীকে নিরশু উপবাসে দেখে বলেনঃ ‘আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি; তুই জল খা’। সুরবালা দেবী, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর হবিষ্যন্ন গ্রহন করে বাকি জীবন কাটাবার প্রস্তাব করলে তিনি বলেনঃ ‘আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হইয়। না দিলে অপরাধ হয়’। শ্রী মা বৈধব্যদশায় একাদশীর দিন সামান্য লুচি খেতেন। তাঁর সহচরী যোগীন মা, গোলাপ মা ও কখনও ঐ তিথিতে নির্জলা উপবাস করতেন না।^{১৪}

ভারতের প্রাচীন হিন্দুধর্ম শাস্ত্রে মেয়েদের বাল্য বিবাহের বিধান থাকা সত্ত্বেও শ্রী মা সারদাদেবীর উদার যুক্তিনিষ্ঠ মন সেই সামাজিক অনুশাসনকে সমর্থন করতে পারেনি। তৎকালীন সময়ে ভদ্রঘরের হিন্দু মেয়েদের আট-বারো বছর বয়সের মধ্যে বিবাহই ছিল সাধারণ নিয়ম। শ্রী মা সারদাদেবী ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। সে সময় দুজন মাদ্রাজী তরুণী কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে ও নিবেদিতার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। শ্রী মা তাদের কথা উল্লেখ করে বলে ছিলেন- ‘আহা তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, “পরগোত্র করে দাও; পরগোত্র করে দাও”। আহা! রাধুর

যদি বিয়ে না হত তাহলে কি এত দুঃখ দুর্দশা হত?’ এ থেকে শ্রীমা তাঁর বাল্য বিবাহের ঘোর বিরোধিতার মনোভাবই ব্যক্ত করেন ও নারী প্রগতির সমর্থনে অগ্রসর হওয়ার আহ্বায়ান জানান। অনর্থক দেশাচার, যুক্তিহীন জাতপাতের বন্ধন, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির উপরে উঠে প্রকৃত পক্ষে তিনি নারী মুক্তির স্বরূপটিই তাঁর সমগ্র জীবন চর্যার মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১) স্বামী গম্ভীরানন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৪, *শ্রী মা সারদাদেবী*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৪০০-০৪
- ২) তদেব, পৃঃ ৪৪৪-৪৫
- ৩) Sister Nivedita, Twelfth Edition 1977, *The Master as I saw Him*, Calcutta, Udbodhan Office, pp-124-25
- ৪) স্বামী ঈশানানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮১, *মাতৃসান্নিধ্যে*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৪৭-৪৮
- ৫) তদেব, পৃঃ ৩৮, ১৩৬
- ৬) স্বামী গম্ভীরানন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৪, *শ্রী মা সারদাদেবী*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২২৩
- ৭) অষ্টম সংস্করণ ১৩৮৫, *শ্রী শ্রী মায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৩৪৪-৪৫
- ৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৪, *শ্রী মা সারদাদেবী*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৫০৮
- ৯) তদেব, পৃঃ ৫০৮
- ১০) দুর্গাপুরী দেবী, ১৩৬৮, *সারদা-রামকৃষ্ণ*, কলিকাতা, শ্রী শ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম, পৃঃ ৩৪৬
- ১১) Sister Nivedita, Twelfth Edition 1977, *The Master as I saw Him*, Calcutta, Udbodhan Office, pp-124-25
- ১২) স্বামী গম্ভীরানন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৪, *শ্রী মা সারদাদেবী*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ২৮১-৮২
- ১৩) স্বামী ঈশানানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৮১, *মাতৃসান্নিধ্যে*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৬৮
- ১৪) স্বামী গম্ভীরানন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৪, *শ্রী মা সারদাদেবী*, কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৫০৭।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘গিরগিটি’ : সৌন্দর্যানুভূতি ও সূক্ষ্ম যৌনচেতনার আলোকে অভিনব শিল্পসৃষ্টি

পাণ্ডু ছাতাইত

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্প উপন্যাসে তুলে ধরেছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির পটভূমিতে নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের রসায়ন। আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বাস্তবের কথাকার হয়েও অন্তর্লৌক উন্মোচন করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর গল্পে আমরা দেখি মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি ও আদিম প্রবৃত্তির সহাবস্থান। মননধর্মিতায় কিম্বা গল্পে জীবনের জটিলতা রূপায়নে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি সৌন্দর্যচেতনাকে তাঁর গল্প উপন্যাসে আলাদা স্থান করে দিয়েছেন। নারী সত্তার সঙ্গে প্রকৃতি সত্তার মেলবন্ধন ঘটিয়ে তাদের এক করে দিয়েছেন - এমনি একটি গল্প হল ‘গিরগিটি’। যৌনবাসনা ও সৌন্দর্যচেতনাকে প্রকৃতির পটভূমিতে ক্রিয়াশীল করে তুলেছেন লেখক এই গল্পে। কুয়োর ঠাণ্ডা জলে নম্ন হয়ে মায়ার স্নান- ভুবনের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটি প্রকৃতির রূপমুগ্ধতার পরিপূর্ণ চিত্র। বৃদ্ধ ভুবন সরকারের দৃষ্টিতে মায়ার সৌন্দর্য যেন পূর্ণতা পেয়েছে। তাই মায়ার স্বামীর অভ্যস্ত যৌনজীবনে সাড়া না দিয়ে বৃদ্ধ ভুবন সরকারের পৌরুষদীপ্ত অনুভূতিতে নিজের সৌন্দর্যকে খুঁজে পেয়েছে। আর এভাবেই গল্পটি হয়ে উঠেছে লেখকের বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

সূচক শব্দ: সৌন্দর্যানুভূতি, যৌনতা, প্রকৃতি, গিরগিটি, মুগ্ধতা, অশ্লীলতা।

মূল আলোচনা:

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কথাকারদের রচনায় উঠে এসেছিল যুদ্ধ-মনস্তত্ত্ব-দাঙ্গা আর রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও দেশভাগের ফলে উদ্ভাস্ত সমস্যায় বিধ্বস্ত সমাজের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কালোবাজারী, সামাজিক অবক্ষয়, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, যৌনতা ছিল সে সময়ের কথাকারদের লেখনীর প্রধান বিষয়। বারুদের গন্ধ, ফ্যানের গন্ধ, মারী মড়কের মধ্য দিয়ে চলা অসহায় জীবনের রক্তের দাগ লেগে ছিল সমকালীন কথাসাহিত্যে। আর সেই সময়ে দাড়িয়েও সবদিক থেকে নিজেকে ভিন্ন ধাঁচের শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২)। একদিকে তিনি চিত্রিত করলেন চল্লিশের দশকের অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপ আবার অপর দিকে নিয়ে এলেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি ও যৌনতার এক অপরূপ মেলবন্ধন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই সূক্ষ্ম ফ্রেয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান তাঁর গল্পেও ধরা পড়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা তাঁর গল্পগুলিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

গতানুগতিক ধারা অবলম্বন করে সাহিত্য চর্চা করে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পগুলিতে প্রকৃতির প্রতি রূপ-মুগ্ধতা, নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন, সুপ্ত যৌনতার হাতছানি ও অন্তরের সৌন্দর্যচেতনার খোঁজে সময় ব্যয় করেছেন। যৌনতার সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক কিরূপ তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প পড়লে আমরা ধারণা করতে পারি। এই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকেই একসময় বাঙালি সমাজ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছে কারণ সৌন্দর্যের সীমানা ছাড়িয়ে না কি যৌনতার প্রবেশ ঘটেছিল তাঁর গল্প

উপন্যাসে। আসলে তৎকালীন সমাজ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মূল্যায়ন করতে পারেনি। সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে সৌন্দর্যের সীমানা ভেঙ্গে কতদূর গেলে যৌনতায় প্রবেশ করবে, তা সাধারণ পাঠকের জানা ছিল না। শুধু পাঠকই বা বলব কেন ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ বাবুও ‘গিরগিটি’ গল্পটি যৌনতার নিরিখে কলম চালিয়ে কিছুটা সেন্সার করে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেই বলেছেন,- ‘...‘গিরগিটি’ প্রথম লিখে দেশ পত্রিকায় দিই। সাগরবাবু পড়ে আমাকে বলেছিলেন পত্রিকার কথা চিন্তা করে কিছুটা সেন্সার করে এই গল্প ছাপতে হয় তবে এই গল্পটা ছাপা হলে আমি তোমাকে অরিজিনাল কপি ফেরৎ দেব যাতে করে বই হলে, পুরো গল্পটি, মানে যা প্রথম লিখেছো, তা দিতে পারো।’^১ সাগরবাবুর এই বক্তব্য তৎকালীন পাঠক সমাজের মনস্তত্ত্বকে পরিস্ফুট করেছে কারণ কিছুটা অংশ অশ্লীলতার দায় নিয়েই বাদ পড়েছে। আসলে তৎকালীন সময়ের থেকে অনেক বেশী আধুনিকমনস্ক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাই তিনি অশ্লীলতার বাঁধা ডিঙ্গিয়ে সৌন্দর্যের কুঠুরিতে পৌঁছাতে পেরেছিলেন যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর তাঁর এই রকম গল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল ‘গিরগিটি’ গল্পটি।

‘গিরগিটি’ গল্পটি আসলে সৌন্দর্যানুভূতি ও রূপমুগ্ধতার গল্প। বৃদ্ধের চোখ দিয়ে যুবতী রমণীর সূক্ষ্ম যৌনচেতনা ও অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনার আখ্যান। সমালোচকদের মতে,- ‘... ‘গিরগিটি’ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এমন একটি রচনা- যা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আর সব গল্প, উপন্যাস কোনো কারণে যদি হারিয়েও যায়, মুছে যায়, কি ধ্বংস হয়ে যায় শুধু যদি ‘গিরগিটি’ বেঁচে থাকে, কোনো পাঠকের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে সম্যক চিনে নিতে অসুবিধা হবে না।’^২ আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখনীর স্বরূপটি যেন নিহিত রয়েছে এই গল্পে। অন্য লেখকেরা যখন যুদ্ধ, দাঙ্গা, মনস্তত্ত্ব নিয়ে বাস্তবের মানুষকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে তখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতির রূপকে বা প্রকৃতিকে প্রতীকি চরিত্র করে বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকের সৌন্দর্যের উদঘাটন করতে চেয়েছেন। ‘গিরগিটি’ গল্পটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

আমরা গ্রীক পুরাণে নারসিসাস ও তাঁর রূপমুগ্ধতার কথা পেয়েছি। নারসিসাস নিজের রূপের প্রতি এতখানি মুগ্ধ ছিলেন যে তিনি অন্য কারোর প্রতি আসক্তি হওয়া তো দূরের কথা, অন্য কাউকে তিনি সৌন্দর্যানুভূতির দিক থেকে তুচ্ছ ত্যাগ করতেন এবং অযোগ্য মনে করতেন। তাই ভালোবাসা থাকলেও নিজের প্রতি মুগ্ধতাবশতঃ সে ইকোকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই রূপমুগ্ধতাকে কি আমরা এই গল্পে লক্ষ্য করতে পারি? আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কঙ্কাল’ গল্পের কথা আমরা বলতে পারি যেখানে দেখি বিবাহের দুমাস পরে বৈধব্য নেমে আসা ‘বিষকন্যা’ মেয়েটি দাদার কাছে এসে একাকিত্বের অবসরে কিভাবে নিজের রূপমুগ্ধতার কথা বলেছে। তাঁর একাকিত্ব ক্রমশ তাকে আত্মরতির দিকে নিয়ে গিয়ে নিজের রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত করে তুলেছে। এই মেয়ে কল্পনা করেছে সমস্ত পৃথিবী যেন তাকে ভালোবেসেছে তাকেই নিরীক্ষণ করছে, পৃথিবীর সমস্ত যুবাযুৱক তাঁর চরণবর্তী। আর আমরা দেখব জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘গিরগিটি’ গল্পে মায়ার সৌন্দর্যচেতনার বিকাশ নিজেকে নিজেই দেখা-এটা যেমন আত্মরতি আবার নিজের সৌন্দর্যকে অন্যের চোখ দিয়ে নিজের করে অনুভব করা এটিও আত্মরতি। মায়ার যেন নিজেকে দু-টুকরো করে নিয়ে দেখছে। এক টুকরো সে দেখছে নিজের ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো আরশিতে আর এক টুকরো দেখছে সে বৃদ্ধ ভুবনের কোটরাগত ঐ দুচোখ দিয়ে। তাই নিজেই নিজের সৌন্দর্যচেতনায় অবগাহনের মধ্য দিয়ে গল্পটির শুরু এবং ভুবনের চোখে নিজের অপরূপ সৌন্দর্যের রূপ দেখার মধ্য দিয়ে গল্পের পরিণতি।

গল্পের প্রথমেই আমরা দেখি, দেওয়ালে টাঙ্গানো এক বড় আরশির সামনে দাড়িয়ে তন্ময় হয়ে মায়া নিজেকে দেখছে। সে এমন করে দেখছে যেন সে নিজের সত্তা থেকে বেরিয়ে এসে ‘অন্য কেউ’ হয়ে দেখছে। তাই সে মোহিত হয়ে পড়েছে এতটাই যে আনন্দে একটা মৃদু শিশধ্বনি দেওয়ার মতো গানের সুর বেরিয়ে এসেছে হৃদয় থেকে ঠোঁটে। তাঁর গায়ের জামায় বোতাম নেই, বিশুদ্ধ আঁচল মাটিতে লুটিয়ে, বাঁধনখোলা খোপা থেকে ছাড়া পাওয়া একরাশ কালো চুল ঘাড়ে পিঠে কোমরে জড়িয়ে রয়েছে। মাঝারি গড়ন, রং ফর্সা নয়, মুখ সুন্দর, কপাল ভুরু নাক কিম্বা কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে কিম্বা বাদামি চকচকে মণি, কচি পেয়ারার মতো থুতনি এটা সে যেমন নিজে দেখে তেমনি তার স্বামী প্রণবও দেখে। সে নিজে এবং প্রণব কি দেখে? দুজনের দেখার মধ্যে এত পার্থক্য কেন? আসলে মায়া যুবতী। সারাদিন সে একাই থাকে। তার স্বামী অফিসে। আর তার চারপাশে মানুষ বলতে বৃদ্ধ ভুবন সরকার। ‘বিবাহের পর একমাত্র পুরুষ স্বামী প্রণবের বাড়াবাড়ি রকমের আদর রূপের প্রশংসায় মায়ার আগ্রহ নেই।’^৭ আসলে গতানুগতিক জীবন অভ্যাসে মায়ার যৌবন পাখি ছটফট করছে সে চাই মুক্ত প্রকৃতি, তাই সে প্রণবের থেকেও মুক্ত প্রকৃতিকে তার শরীরের প্রতি অঙ্গকে দেখিয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছে। আসলে প্রণব মায়ার কাছে স্বামীর আবদার নয়, অধিকার নিয়ে হাজির হয়েছে। তাই মায়ার রূপ তার কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও শারীরিক চাহিদা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই নানা অজুহাতে মায়ার শরীরকে দুচোখ দিয়ে গ্রাস করে নিজের যৌন ক্ষুধাকে পরিভূষ করতে চেয়েছে প্রণব, যা মায়ার ভালো লাগেনি। আর নিয়মমাফিক যৌন উপভোগ ভালো না লাগারই কথা। তাই প্রণবের আদর মায়ার কাছে একঘেয়ে রূপ নিয়েছে। চুমুর আবেগ উচ্ছ্বাস কোন কিছুর মধোই মায়া যেন আর দিশেহারা হতে পারছিল না। কতকাল ধরে চলে আসা এসব কুৎসিত অস্বাভাবিক জিনিস থেকে মায়া তাই বেরিয়ে আসতে চেয়েছে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে যেখানে কোন চাওয়া পাওয়া নেই, নিয়মমাফিক ভূষণও নেই। আসলে মায়াও যৌনতাকে উপভোগ করতে চেয়েছে। সে যৌনতার মধ্যে, যৌবনচেতনার মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতির স্পর্শ পেতে চেয়েছে—যা সে পেয়েছে প্রকৃতি ও বৃদ্ধ ভুবন সরকারের কাছ থেকে।

আমরা জানি গল্পের লেখক প্রকৃতিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। কখনো প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন পটভূমি আবার কখনো প্রকৃতি সংলগ্ন বা উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। ‘গিরগিটি’ গল্পটিতে প্রকৃতি সংলগ্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তাই ভাড়াটে বউ মায়ার জ্ঞানের দৃশ্য ভুবন ‘বুড়োর দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা একটি পরিপূর্ণ প্রকৃতি-সংলগ্ন ছবি নিরাবরণ যুবতীর একাকিত্ব ও তার রূপ, নির্জন কুয়োতলায় পরিপূর্ণতা।’^৮ যদি আমরা প্রকৃতি শব্দের কোন অর্থ খুঁজতে যায় তাহলে একটা অর্থ পাব নিসর্গ, আরেকটা পাব স্বভাব; আর আরেকটা অর্থ অবশ্যই নারী। এই তিনটি রূপকেই সার্থক করে তুলেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই গল্পে। বিভূতিভূষণের ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতি চেতনার একটা পার্থক্য আছে- বিভূতিভূষণের মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে একটা অপূর্ব মুগ্ধতা রয়েছে, যাকে বলা যায় শিশুর মতো মুগ্ধতা। আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতিতে মুগ্ধতা নেই বলব না কিন্তু সেই প্রকৃতির নানা ধরনের ‘ডাইমেনশন’, নানা ধরনের স্তর, নানান ধরনের বিভাজন। ‘গিরগিটি’ গল্পটি দেখলে যা ভালোভাবে বোঝা যায়। কলকাতার নাগরিক পরিবেশে প্রকৃতির অসামান্য স্পর্শ লক্ষ্য করা যায় এই গল্পে। মায়া এবং প্রকৃতি যেন এই গল্পে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না একে অপরকে। মায়া এমন এক নারী যে কলকাতার ইট কাঠ পাথরের মধ্যে থেকেও নির্জন কুয়োতলার নিমগাছটাকে সম্পদ বলে মনে করেছে। আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাছে প্রকৃতির গাছপালার মতই নারীও

সমগোত্রীয়। নারীর আছে শরীর যা সৌন্দর্যের আধার অর্থাৎ প্রকৃতির রূপের মতো আর চেতনা, যা সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়—তাই যেন এই গল্পের মূল। তাই সৌন্দর্যের রক্ত মাংস মায়ার সাথে প্রকৃতির নানান উপমা যোগ করে লেখক যেমন সূক্ষ্ম যৌনচেতনাকে প্রবল করে তুলেছেন ঠিক তেমনি সৌন্দর্যচেতনার নতুন সংজ্ঞা দান করেছেন বাংলা সাহিত্যে।

আসলে প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই গল্পে। প্রকৃতির সূত্র ধরেই মায়ার জীবনে ভুবনের আবির্ভাব। কারণ মায়া বৃদ্ধ ভুবনকে ভাঙ্গা পাঁচিল বা পৈঁপে জঙ্গলের নিষ্প্রাণ ক্ষতযুক্ত মাদার গাছটার মতো ভেবেছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিভূতিভূষণ বা রবীন্দ্রনাথের মত সহজ সরল নয়। তাঁর গল্পের মানুষ আমাদের চেনা জানা মধ্যবিত্ত জগতের মানুষ, যেমন মায়া। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মজাটা এখানেই তিনি লিখতে গিয়ে বাস্তব দৃশ্যের উপরেই থেমে যান না। তাঁর মূল স্বভাব তাকে ভেতরের দিকে আরো ভেতরের দিকে যাওয়ার; আর এই গভীরের দিকে যাওয়ার বাসনায় তাকে আলাদা করে দেয়। এই গল্পে তাই আমরা দেখি মায়ার মনের গভীরের কোনো হৃদিসই প্রণব পায়নি, পেয়েছে ভুবন। এই কারণে মায়ার জীবনে প্রণব হয়ে উঠেছে অভ্যাসের, একঘেয়েমির বস্তু। দুজন পুরুষের কথা আছে মায়ার জীবনে—একজন প্রণব, অন্যজন ভুবন। গল্পের নামের যে প্রাসঙ্গিকতা তা কিন্তু মায়া এবং ভুবনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটার মধ্যে দিয়েই ভালো করে লক্ষ করা যায়। মায়া ভুবনকে প্রকৃতির আরেক অংশ হিসাবে গল্পে উপস্থিত করেছে। দিনের পর দিন গেছে, মায়া তাই দাম্পত্যজীবনে ক্লান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে। একই ধরনের বাসনায়ুক্ত ক্লাস্তিকর আচরণ তাকে করে তুলেছে বিরক্ত। আর অন্যদিকে ভুবন বৃদ্ধ হলেও রূপ-সৌন্দর্যের তৃষ্ণা তার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। সে রূপের সমাদর করতে জানে। তাই বৃদ্ধ ভুবন মায়ার জীবনে ‘গিরগিটি’ হয়ে উঠেছে। প্রজাপতির দিকে যেন গিরগিটি এগিয়ে আসছে। ভুবন খুব সতর্কভাবে মায়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে। মায়ার কাছে সে বুড়ো মানুষ গাছ কিন্তু এই গাছ মায়ার কাছে কানে কানে সৌন্দর্যের কথা বলে। মায়ার কাছে ভুবন এমন এক আয়না যা মায়াকে তৃপ্ত করে; যা মায়ার সূক্ষ্ম অনুভব অর্থাৎ মনের যে প্রসাধিত রূপ তাকে নিরানন্দ থেকে আরেক ধরনের উল্লাসে আবিষ্ট করে। ডালিম গাছের প্রসঙ্গ, তারপর রাজহংসীর প্রসঙ্গ এসবের মধ্য দিয়ে ভুবন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে মায়ার দিকে এবং পরে সে বলেছে বাঘিনী শিকার করছে বনের মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতি জগৎ, ফুল-ফলের জগৎ পেরিয়ে প্রাণী জগতের মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছে। তাই যে গাছ এতক্ষণ ছিল, সেই গাছের অর্থাৎ ভুবনের মনের ভেতরে মাংসাশী প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরপর তিনটে বিয়ে করেছিল ভুবন। শুধু তাই নয় এই বয়সেও উন্টোডাঙার শশী মেয়ের সন্ধান দিয়েছে ভুবনকে। কিন্তু মায়া যখন ভুবনকে এসব থেকে বিরত থাকতে বলে তখনই হয়তো ভুবনের ভেতরের সরীসৃপ প্রবৃত্তি হিস্ হিস্ করে উঠে। কিন্তু ভুবন নামক এই অভিনব আয়নার চোখের দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা দেখলেও মায়া কিন্তু বৃদ্ধ ভুবনকে সরিয়ে দিতে পারে না, কেননা মায়া বুঝতে পারে শেষ পর্যন্ত গিরগিটি হয়ে ওঠার ক্ষমতা ভুবনের শারীরিকভাবে নেই। তাই মায়া মৃত মাদার গাছ ভেবেই তাকে জড়াতে চায়, তার কাছে ছুটে আসে নিজেকে দেখার জন্য-সর্বোপরি সৌন্দর্যানুভূতি উপভোগ করার জন্য, যা সে প্রণবের কাছে পায়নি।

যৌনতাকে লেখক এই গল্পে এমন সূক্ষ্মভাবে এনেছেন যা সৌন্দর্যচেতনাকে বিকশিত করে তুলেছে। কারণ লেখক প্রবৃত্তির মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজেছেন। ডালিম চারা, চেরা বেণী, কচি পেয়ারার মতো থুতনি, রাতের চুলে মানায় এমন সাদা দোপাটির মালায় বিভূষিতা নারী, জংলা

ছিটের শায়ী চিতা বাঘিনীর সৰু ছিমছাম মাজা ঘঁষা কোমরের ভাব—এমন অজস্র শব্দ লেখক ব্যবহার করেছেন যা যৌনতার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু লেখক যৌনতাকে ছাপিয়ে সৌন্দর্যচেতনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন তা আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই। আসলে লেখক ‘মায়া’ চরিত্রটিকে ছোটবেলায় দেখা পরমাসুন্দরী হালুইকরের স্ত্রীর আদলে গড়ে তুলেছেন। সেই বাস্তবতার সাথে লেখকের সৌন্দর্যপূজারী অনুভূতিশীল মনের মিশ্রণে গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পে নর-নারীকে তিনি প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ থেকে সংগ্রহ করেন এবং তাদের নিজস্ব শিল্পলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই লেখক এখানে অন্তর্লোকের সৌন্দর্যচেতনাকে উন্মোচন করার জন্য যৌনতার অনুভূতিকে প্রতিক্রিয়াশীল রেখে সৌন্দর্যের সামগ্রিকতার দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

মায়া যৌবনের সম্ভোগ চায় কিন্তু এব্যাপারে প্রণবের সঙ্গে প্রক্রিয়াগত পার্থক্যের জন্য এই রূপসী তার বিড়ম্বিত যৌবন নিয়ে যেন চরিতার্থতার বেদনায় আক্রান্ত হয়ে উঠেছেন। রূপসী মায়া তার ‘স্বামীর যৌন-কাতরতার আবেদনে সাড়া না দিয়ে এক বৃদ্ধকে তার চুলে দোপাটির মালা পরানোর অধিকার’^৫ নিজের অজান্তেই দান করেছে। আর বৃদ্ধ ভুবন সরকার নিজের মনের ‘ভেতরে রসের বাবু জেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে ক’রে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি।’^৬ তাই সে অবলীলাক্রমে মায়ার কাছে সরল ভঙ্গিতে স্বীকার করেছে— ‘কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।’^৭ আর মায়া তার অর্থহীন দাম্পত্যের বিপরীতে নিজেকে অন্য এক আলোয় দ্রষ্টা ও উপভোক্তা হিসেবে দেখতে চেয়েছে। যার জন্য ‘গিরগিটি’ গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১) গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, প্রাক-শারদীয় ১৪১৬, সাক্ষাৎকার : চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, অনুষ্ঠপ, পৃ. ২৪৬।
- ২) সামন্ত, অসীম, ২০০৭, প্রসঙ্গ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প, কলকাতা, অনুষ্ঠপ, পৃ. ৭৪।
- ৩) কর্মকার, অমরচন্দ্র সম্পাদিত, ২০১৭, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী: গল্পের অন্দর মহল, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৪১।
- ৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২০১৬, কালের পুস্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ’ বিশ বছর/ ১৮৯১-২০১০, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ৩৭৪।
- ৫) বসু, নিতাই সম্পাদিত, ২০১৭, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ১৮।
- ৬) তদেব, পৃ. ১৩৩।
- ৭) তদেব, পৃ. ১৩২।

আদিবাসী কবিদের কবিতায় আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সংকট

মকর মুন্সু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কান্দি রাজ কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: পৃথিবীর ইতিহাসে আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে আদিবাসীদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু একদিকে বিশ্বায়নের প্রভাব ও অন্যদিকে আদিবাসীদের অবহেলা অনাদরের কারণে আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিয়েছে। এমন কি প্রাদেশিক সমাজ সংস্কৃতির উন্নত ধারাগুলো আদিবাসীদের আকৃষ্টও করেছে। তাই তারা এক প্রকার মানিয়েও নিচ্ছে। ফলে বর্তমান সময়ে আদিবাসীরা এক মিশ্র সংস্কৃতিকে লালন পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিভিন্ন দিক থেকে যেমন- জীবনযাপন পদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ সর্বোপরি ভাষা সংস্কৃতিগত পরিবর্তন। তবে এই পরিবর্তিত সংস্কৃতি শহর থেকে গ্রামে বিস্তার লাভ করেছে। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সংকট তথা আত্মপরিচয়ের সংকট সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে ভাষাগত। আমাদের মূল আলোচনা আদিবাসী সাহিত্যিকদের রচিত কবিতা। এবং এইসব কবিতা বা গীতাঙ্ক কবিতাগুলো সবই সাঁওতালী ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সে কবিতাগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আমরা প্রধানত আদিবাসী কবিদের রচিত কবিতাকেই আলোচনার মধ্যে রাখব। অর্থাৎ আদিবাসী সাহিত্যিকদের রচনায় আদিবাসীদের সংকট কিভাবে ধরা পড়েছে সেটা অনুসন্ধান করার প্রয়াস থাকবে। এ বিষয়ে আদিবাসীদের সাহিত্যিকদের রচনায় প্রধানত আমোদ প্রমোদ, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, দারিদ্র ও নিজেদের অবহেলার দিকটাই প্রকট হয়েছে। বিশেষ করে ভাষাগত সংকটের কথা বারে বারে উল্লিখিত হয়েছে। এই অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আদিবাসী সমাজকে জেগে উঠতে বলেছে। সর্বোপরি সমগ্র সমাজকে একত্র হয়ে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছে। বর্তমান সময়ে একাডেমিক স্তরে আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব থাকলে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব কিনা সেটা অবশ্যই সময়ই বলবে।

সূচক শব্দ: আদিবাসী, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আত্মপরিচয়, সংকট, বিশ্বায়ন, প্রাদেশিক, আন্তরিকতা, প্রভাব।

মূল আলোচনা:

ভারতবর্ষে আদিবাসীদের প্রথম আগমন ঘটে সুদূর আফ্রিকা থেকে। সেটা আজ থেকে প্রায় পঁয়ষাট হাজার বছর পূর্বে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন মানবজাতি হিসেবে আদিবাসীদের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন-যাপন পদ্ধতি, ভাষা-সংস্কৃতি এসবই মহৎ ঐতিহ্যের স্মারক চিহ্ন হিসেবে আজও স্বীকৃত। কারণ আদিবাসী সমাজ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় ভাবে স্ব-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস করে চলেছে। বর্তমান সময়ে সেই ঐতিহ্য অনুস্মরণ বা ট্র্যাডিশান সমানভাবে বজায় রাখতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু আধুনিক কালের চটকদারি আধুনিকতা তথা বিশ্বায়ন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি

মানব প্রজাতিকে প্রভাবিত করেছে। এবং প্রভাবিত করে চলেছে, ভবিষ্যতেও করে যাবে। আদিবাসীরাও এর বাইরে থাকতে পারছে না। ফলত আধুনিকতা আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এবং সনাতনী আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে এক সংকট দেখা দিয়েছে। এই আত্মপরিচয়ের সংকট ভবিষ্যৎ আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

সর্বোপরি খুব সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, দ্রুত বিশ্বায়ন বিশ্বের অপরাপর জাতি মত আদিবাসীদেরও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়াও প্রাদেশিক সমাজ-সংস্কৃতির উন্নত ধারাগুলো খুব সহজেই আদিবাসীদের আকৃষ্ট করেছে। এবং তারা সেগুলো গ্রহণ করে পরিবর্তিত সমাজ-সংস্কৃতিতে মানিয়েও নিচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন তাদের জীবন-যাপনগত পরিবর্তন এসেছে, তেমনি এসেছে ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদগত পরিবর্তন। বলা যায় আদিবাসীরা এক প্রকার মিশ্র সংস্কৃতির বাহক হয়ে উঠছে। আর সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মোটেও সুভ বার্তা বহন করবে না। এটা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

প্রসঙ্গত আর একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, শহর বা শহরতলীর আদিবাসীদের মধ্যে বিশ্বায়নের প্রভাব সবচেয়ে দ্রুত এবং বেশি। তাই সেই সব আদিবাসীরা নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতিকে দ্রুত হারিয়ে যেতে বসছে। আর তাতেই আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কৃষ্টি-সাংস্কৃতিক সংকট। যা আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের সংকটের সমান। তবে এই সংকটের থাবা শুধুমাত্র শহরবাসী আদিবাসীদের নয়, বৃহত্তর আদিবাসীদের ওপরেও বসাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে সমগ্র আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি এই সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বর্তমানে যদিও কোথাও কোথাও একাডেমিক স্তরে আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আন্তরিক প্রয়াস ছাড়া এভাবে একটা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়?

আমাদের মূল আলোচনায় ‘আদিবাসী’ বলতে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে শুধুমাত্র ‘সাঁওতাল’ গোষ্ঠীকেই বোঝানো হবে। এবং এই আদিবাসী কবি সাহিত্যিকদের রচিত মূল কবিতাগুলো সাঁওতালী ভাষায় রচিত। এবং এইসব কবিতায় আদিবাসীদের সংকট কিভাবে ধরা পড়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে।

মূল আলোচনায় আদিবাসী কবিদের কবিতায় আদিবাসীদের স্ব-সংস্কৃতি চ্যুতি ও আত্মপরিচয়ের সংকটের দিকটাই আলোচ্য। আমরা সাধুরামচাঁদ মুরমু ‘সম্রমনাশ’, মার্শাল হেমব্রম ‘সিধুকানু’, ঈশ্বরচন্দ্র বাস্কো ‘জাগরণের গান’, সোনা হেমব্রম ‘জাতির অবলম্বন’, ঞ্জম হেমব্রম ‘অধিকার’, গোমস্তা প্রসাদ সরেনের ‘সাধুরামচাঁদ স্মরণে’ এবং ‘যা দেখা যাচ্ছে’ এবং নির্মলা টুডুর ‘সাঁওতাল সমাজ’ নলিনী রঞ্জন মুরমুর ‘কোথায় শব্দ উঠে’ ইত্যাদি কবিতাগুলো আলোচনা করা হবে। এই সব কবিতায় আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সংকটের কথা তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই আলোচনায় আদিবাসী বলতে কেবলমাত্র সাঁওতাল জাতি গোষ্ঠীকেই বোঝানো হয়েছে।

মূলত উপরে উল্লিখিত আদিবাসী কবিদের রচিত কবিতাই আলোচনা করা হবে। সে কবিতাগুলি সবই সাঁওতালী ভাষায় রচিত হয়েছিল। কবিতারগুলোর কোনটা প্রচলিত, যা গানের আকারে পরিবেশিত হয়। কোন কবিতা আবার পুরানো, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীর্ধে রচিত। আবার অনেক কবিতা অযত্নের কারণে নষ্টও হয়ে যেতে বসেছিল। বর্তমান কালের অনেক সাহিত্য অনুরাগী কবিতাগুলি সংগ্রহ করেছেন। এবং বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির যে দিকটায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা এখনও হয়ে চলেছে তা হল তাদের ভাষা, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, বলা যায় তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি।

সাঁওতালী সাহিত্যের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কবি সাধু রামচাঁদ মুরম। প্রথমেই সাধু রামচাঁদ মুরম রচিত ‘সম্রম নাশ’ কবিতাটি উল্লেখ্য করা যাক। কবিতাটির প্রথমেই আদিবাসী সংস্কৃতির চরম সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,-

“আমরা যত বোবা লোকে মত্ত হয়ে নাচের ঝোঁকে
দিবরাত্রী থাকি অন্ধকারে।

হাঁড়িয়া মদ পান করে পৌঁছই ইঁদ পরব টাঁড়ে
সমস্ত কাজ থাকলে পিছে পড়ে।”^১

এই যে আদিবাসীরা সমাজ সংস্কৃতি বহির্ভূত নেশাগ্রস্ত হয়ে পৌঁছে যায় ইঁদ-মেলায়। সেখানে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকে দিনরাত। এবং জীবনের মূল্যবান সময় ও অর্থ দুই এই ভাবেই তারা অপচয় করে চলেছে। এমনকি এই দুর্বলতার সুযোগে ‘দিকু’ বা অনাদিবাসী যুবকরা সরল সাধারণ আদিবাসী নারীদেরও অপমান লাঞ্ছিত করে থাকে। তাই সমাজের বাহিরে নয়, সমাজের মাঝেই ‘বাহা’ ‘করম’ এর অনুষ্ঠানে গৌরবের সঙ্গে নৃত্য-গীত করার কথা বলেছেন। আর তাতেই আদিবাসীর মান সম্মান কৃষ্টি সংস্কৃতি সব কিছু বজায় থাকবে বলেই কবির বিশ্বাস।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আর এক প্রতিভাবান সাঁওতালী কবি মার্শল হেমব্রম। তাঁর মন্ত্র সাঁওতাল সমাজকে অধিকার আদায়ে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁর ‘হেই সামালো’ (নির্বাচিত সাঁওতালি কবিতা) কাব্যগ্রন্থের ‘সিধু কানু’ কবিতাটিতে সিধু কানু বীর ভাতৃদ্বয়ের কথা স্মরণ করে আদিবাসীদের জাগরিত হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। নতুন দেশ, স্বাধীন দেশ ও ভালোবাসার দেশ গড়ার লক্ষ্যে আদিবাসীদের আগুয়ান হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন,

“জাতির অস্তিত্ব সংকটের যন্ত্রণা

সমাজ কলুষিত হবার যন্ত্রণা

সংস্কৃতি লাঞ্ছিত হবার যন্ত্রণা

ভাষা মুমূর্ষু হবার যন্ত্রণা”

সাহিত্য নিঃশেষ হবার যন্ত্রণা

দঙ্ক হই, দঙ্ক হই, সয়ে সয়ে দঙ্ক হই।”^২

অর্থাৎ তুমি আর কতদিন সহ্য করবে? আর যদি তুমি ঘুরে না দাঁড়াও, তাহলে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তোমার জাতিও অচিরেই হারিয়ে যাবে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘সাঁওতালি কবিতা’ গ্রন্থের তিন সংখ্যক কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে। যে কবিতাটি অনুবাদ করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কবিতায় আদিবাসী নৃত্য গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় আদিবাসী সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। করণ এই নৃত্য গীত আবার আদিবাসী সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ। তাই তিনি কবিতায় বলেছেন,-

“নাচবো না পরজাতির ইদঁতলায়।

নাচবো গো দঙ নাচবো করম আমাদেরই এই শালের ছায়ায়

নাচবো আমরা শুধু আমাদেরই গাঁ-য়

নাচবো সবাই এই আমাদেরই গাঁ-য়।”^৩

অর্থাৎ পরজাতির সাথে নয় স্বজাতির এই পিয়ালের শালের ছায়ায় নৃত্য গীত পরিবেশনেই আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির গৌরব বজায় থাকবে বলে কবির দৃঢ় বিশ্বাস।

আবার ২৪ সংখ্যক কবিতায় আধুনিক পণ্য দ্রব্যের ওপর আদিবাসীদের আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

“ঘোড়ায় চড়ে চাকরি নিয়ে রাঁচিশহর যাও
আমায় তুমি এনে দিও জবাকুশুম তেল
ঘরে তোমার রেখে গেলে বহিঃশিখা বউ
মনে থাকে যেন

কার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জুড়োব যন্ত্রণা।”^৪

আদিবাসী সমাজের নারীও যে আধুনিক সাজ সজ্জায় নিজেকে সাজাতে চায় সে কথা অকপটে ব্যক্ত করেছে।

আবার ১২৭ সংখ্যক কবিতায় আদিবাসীদের চরম দারিদ্রের কথা যেমন আছে। তেমনই আছে পেটের টানে ভিন দেশে পাড়ি দেওয়ার কথা। অথবা মান সম্মান ইজ্জত বিসর্জন দিলে মিলতে পারে দামি অলংকার বা শাড়ি। কবিতায় আছে,-

“দুজন মিলে যেতেও পারি নামাল জমির দেশে
বা কাছাড়ের চা বাগানের কাজে,
গয়নাগাঁটি পাবি রে তুই, দামি কাপড় তাতে,
কিন্তু পীরিত করতে হবে হিন্দু ছেলের সাথে।”^৫

ঈশ্বরচন্দ্র বাক্সে রচিত ‘জাগরণের গান’ কবিতায় লিখেছেন,

“এহো! খেরোয়াল জাতি
এক বার জেগে ওঠো সবে
জাতি-সমাজের দীপ রক্ষা কর।”^৬

কবি সমগ্র কবিতায় আদিবাসীদের বীর পরাক্রমে জাগ্রত হয়ে খেরোয়াল জাতির দ্বীপকে প্রজ্বলিত রাখার আর্তি জানিয়েছেন। কবি এও জানিয়েছেন যে আর ঘুমিয়ে থেকো না, জাগো, ওঠো। দেখ আর তোমার সোনার পারা জাতি ধর্ম ভেসে যাচ্ছে, তাকে রক্ষা কর। পালন কর। এবং জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত কর।

ঞুহুম হেমব্রম তার ‘অধিকার’ কবিতায় বলেছেন,

“ মানুষের মতো বাঁচতে আমি চাইছি শুধু

...

মানব বংশে জন্ম আমার

আছে মুখের ভাষা আর আছে নীতি সংস্কৃতি ও ধর্ম।

...

নয়তো আমি গর্জন করে বলব,

অধিকার নেব নিজেই।”^৭

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে আদিবাসীর নিজস্ব ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও মানুষের মতো করে বাঁচার অধিকার না দিলে সেই অধিকার ছিনিয়ে নেবার কথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন। কেন না আদিবাসী ভাষা সংস্কৃতির ওপর বার বার আঘাত আর বরদাস্ত করা হবে

না। এসব কথা উচ্চারণ করে খেরোয়াল সমাজকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি জানেন যে সম্মিলিত প্রয়াসই পারে এই আঘাতকে প্রতিরোধ করতে। তাই এই কবিতায় আদিবাসী সংস্কৃতিকে বাচাঁবার পক্ষে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

গোমস্তাপ্রসাদ সরেন রচিত ‘সাধু রামচাঁদ স্মরণে’ কবিতায় ভাষা সংকট প্রসঙ্গে বলেছেন,

“মাতৃভাষা পরিচয় দেয় আপন সত্তার। কিন্তু ভালবাসে
কয়জনা? বরং মনে করে অবহেলা ভরা গ্রাম্য পথ-ধূলি।
তাই দেখি তাঁর লেখা রচনাসমূহ পড়ে অনাদরে ঘাসে।
সাঁওতালি ভাষা ছাড়া সাঁওতালের অস্তিত্ব, কি করে ভুলি।”^৮

কবিতায় তিনি বলতে চেয়েছেন যে সাঁওতালী ভাষা সাহিত্য ছাড়া সাঁওতাল জাতির অস্তিত্বই থাকবে না। তাই কোনভাবেই যেন ভাষাসাহিত্য অবহেলা করা না হয়। এই জন্য কবিতায় কবি রামচাঁদকে ‘করম’ দেবতা ধামুর সাথে তুলনা করেছেন। যিনি ‘ধামুর’ দেব সেবার মত নীরবে সাহিত্য সেবার মাধ্যমে জাতির ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন। তিনি এও উপলব্ধি করেছেন যে সাঁওতালী ভাষা ছাড়া সাঁওতালীদের অস্তিত্ব কখনো টিকে থাকবে না। তাই বিপ্লব আদিবাসী অস্তিত্বকে বাচাঁবার একমাত্র অবলম্বন ভাষাকেই পাথেয় করার কথা বলেছেন।

আবার সাঁওতালী ভাষার লেখ্য লিপি ‘অলচিকি’ না ‘রোমান’ এই বিতর্কের কথা বলতে গিয়ে ‘যা দেখা যাচ্ছে’ কবিতায় লিখেছেন,

“বেশ ভেবেচিন্তে পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু
তৈরি করলেন অলচিকি।
দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তা।

...
জন্ম হতে লাগল বিচিত্র বর্ণমালার
খুব কম হলেও ন’টার বেশি।
বাঙলা, দেবনাগরি, ওড়িয়া, অসমিয়া
রোমান এমনি কত আছে।”^৯

রঘুনাথ মুরমু অলচিকি লিপি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের নানান রাজ্যে বসবাসকারী আদিবাসী এবং আদিবাসী সংস্থাগুলো সাঁওতালী ভাষার লিপি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে দেখা যায়। কারণ বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী সাঁওতালী মানুষজন তাদের রাজ্যে প্রচলিত ভাষাকেই বা ভাষাতেই সাঁওতালী ভাষা লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে, সাঁওতালী ভাষা যে অচিরেই দুর্বল হবে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নি। এজন্য তিনি পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু’র আবিষ্কৃত ‘অলচিকি’ (লিপি)-কে সমস্ত সাঁওতাল জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে একতা আনার পক্ষপাতী ছিলেন।

আবার সোনা হেমবরম ‘জাতির অবলম্বন’ কবিতায় সাঁওতালী ভাষাকে বিভিন্ন অভিধা যেমন, জাতির ধর্ম, ‘আয়না’ মান, মানুষের অবলম্বন, বা ‘বন্দোলতা’ প্রভৃতিতে অভিহিত করে সাঁওতাল জাতিকে জাগরিত করতে চেয়েছেন। তিলি লিখেছেন,

“ভাষাই হল খেরোয়াল জাতির
সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য আয়না

...

... কিন্তু ভাষা ছাড়া

খেরোয়াল জাতি ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে।”^{১০}

নলিনীরঞ্জন মুরমুর ‘কোথায় শব্দ উঠে’ সাঁওতাল জাতির নির্লিপ্ততা, খাম খেয়ালিপনা বা আমোদ প্রমোদের কারণেই জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলে সে কথা সজোরে ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন,

“আজ জাতির অস্তিত্ব অস্তাচলে

এবং বনে জঙ্গলে হাটে বাজারে তা বিক্রয় হচ্ছে।”^{১১}

গোরাচাঁদ টুডুর ‘অভাগা’ কবিতাতেও ভাষা সংকটের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি লেখেন,

“হায়রে হায় হায় জাতির দুর্ভাগ্য অন্য-মাতৃ ভাষা তোমার মুখে

কচি ও আধপাকা ভাষা যে ঝরে যায়।

আপন মুখভাষা তোমার সাঁওতালি মরেছে মাথা খুঁড়ে মনের দুখে।”^{১২}

আদিবাসীরা তাদের মাতৃভাষা সাঁওতালী ভাষা ভুলে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে ধর্ম। ফলে খেরোয়াল সমাজ সংস্কৃতিতে একটা ভাঙন দেখা দিয়েছে। তাই খেরোয়াল ভাষাকে আপন করে না নিলে জাতির ভবিষ্যৎ অরক্ষিত হবে এটা নিশ্চিত। ফলে মুমূর্ষু জাতির বিপন্ন অস্তিত্ব ও অবহেলিত সাঁওতালী সমাজকে বাঁচানোর জন্য এক জোট, একমত হওয়া দরকার।

আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির এই সংকটাপন্ন অবস্থার মূল কারণ বিশ্বায়ন ও প্রদেশিক সমাজ সংস্কৃতির চাপ। সেই সব জাতির জীবন যাপন ও রীতি সংস্কৃতি আদিবাসীদের থেকে অনেক উন্নত। আর এ সবার মূলে রয়েছে বিশ্বায়ন। এ জন্য সব জাতির সাথে সাথে আদিবাসীরাও প্রভাবিত না হয়ে পারছে না। আর অন্যদিকে স্ব-সংস্কৃতিকেও পুরোপুরি বর্জন করতে পারছে না। ফলে বর্তমানে আদিবাসীরা এক মিশ্র সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে। বলা যায় তা একপ্রকার বাধ্য হয়েই। কেননা আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি অন্য সব অপরাপর জাতির কাছে দুর্বোধ্য হওয়ায় তাদেরকে তুচ্ছ তচ্ছিন্ন করা হয়। অসভ্য অনুন্নত বলা হয়। ফলত বিশেষত শহর ও শহরতলীর বসবাসী আদিবাসীরা এক প্রকার হিনমন্যতা থেকেও নিজেদের সামাজিক সংস্কৃতিকে খোলা মনে পালন করতে পারে না। গোপন রাখে। যারা সমাজের ওপরে থাকে তাদের ওপরই থাকে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতিকে লালন পালন ও পথ দেখানোর ভার। তাই সনাতন আদিবাসীদের ধর্ম ভাষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে অস্তিত্বের সংকটকে মোচন করার আহ্বান জানিয়েছে সাহিত্যিকগণ। তবে সর্বস্তরের সহযোগিতা ছাড়া এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সর্বোপরি বলা যায় যে বিশ্বায়ন যেভাবে বিশ্বের সমস্ত জাতিকে গ্রাস করছে তাতে আদিবাসীদের বিশুদ্ধতা কত দিন রক্ষা করা সম্ভব সে কথা সময়ের হাতেই তোলা থাক।

তথ্যসূত্র:

- ১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ‘সাধু রামচাঁদ অনলমাল’, পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, কলকাতা, পৃ-৭৯।
- ২। পরিমল হেমব্রম (সম্পা), ‘হেই সামালো (নির্বাচিত সাঁওতালি কবিতা), নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ-৫০।
- ৩। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), ‘সাঁওতালী কবিতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৭১।
- ৪। ঐ, পৃ-৮৩।
- ৫। ঐ, পৃ-১৩৯।

- ৬। সুহৃদকুমার ভৌমিক (অনুবাদ ও সম্পা), 'সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পৃ-২৬৬,
- ৭। ঐ, পৃ-৩১২।
- ৮। ঐ, পৃ-১৯৪।
- ৯। ঐ, পৃ-১৯৬।
- ১০। ঐ, পৃ-২৮৩।
- ১১। ঐ, পৃ- ১৬৩।
- ১২। ঐ, পৃ-১১৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিকা:

- ১। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা) 'সাঁওতালী কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
- ২। ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ', বাক্সে পাবলিকেশন কলকাতা, ২০১৩।
- ৩। ধীরেন্দ্রনাথ বাক্সে (সম্পা), 'সাধু রামচাঁদের কবিতা গুচ্ছ', বাক্সে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২।
- ৪। পরিমল হেমব্রম (সম্পা) 'হেই সামালো' (নির্বাচিত সাঁওতালি কবিতা), নির্মল বুক এজেন্সি কলকাতা, ২০০৯।
- ৫। সুহৃদকুমার ভৌমিক (অনুবাদ ও সম্পা), "সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন", সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা। ২০১৩।

পত্র পঞ্জিকা:

- ১। অরূপ বসু (সম্পা), 'আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি ভারতের ভিতর ও বাহির', বারণ রেখা, ষষ্ঠ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা ২০১৭।
- ২। সুইনহো স্ট্রিট, শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৫।

সধবার একাদশী ; একটি নির্দিষ্ট কালের সমাজদর্পন

মৌসুমী পাল

ফেকাল্টি মেম্বার, বাংলা বিভাগ

ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ

আনন্দনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনমূলক নাটক ‘সধবার একাদশী’তে তৎকালীন সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির নৈতিক অবক্ষয় ও উশৃঙ্খল জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে মদ্যপান এবং বেশ্যাবৃত্তির কারণে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকটিকে বিশেষ রূপে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রহসনমূলক এই নাটকে কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দুর্বলতা ও ত্রুটি গুলোকে প্রস্তুটিত করা হয়েছে। কৌতুক ও ব্যঙ্গের ব্যবহার নাটকটিকে দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে বেশ কিছু গম্ভীর বার্তা দর্শকের কাছে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তি বর্গের কর্মচরিত্র ও আদর্শহীন জীবন যাপনকে ফুটিয়ে তুলে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মদ্যপানের কুফল ও বীভৎস চিত্রকে তুলে ধরেছেন। উঠতি ধনী ব্যক্তিগণ নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ ও বিত্তের জোড়ে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে যে সমস্ত কর্মকান্ড ঘটিয়ে থাকেন তারই এক বিশ্বস্ত দলিল হল ‘সধবার একাদশী’। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ –র মতো দীনবন্ধুও ‘সধবার একাদশী’ নাটকে ইংরেজীয়ানার অনুকরণে নিজেদের জীবনের অধঃপতনের বর্ণনা করেছেন কৌতুকের মাধ্যমে। তবে সধবার একাদশী নাটকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি নিমচাঁদের সরব উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি ও হৃদয়াকর্ষণ করে। যদিও কালের গতিতে বা সংকটের আবেগে এই চরিত্রেরও অধঃপতন ঘটেছে। তবে শিক্ষার আলো বা দ্যুতি চরিত্রটি থেকে একেবারে মুছে যায়নি। এছাড়া নিমচাঁদের দাম্পত্য কাহিনীতে তার স্ত্রীর দুর্ভাগ্য ও অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর যন্ত্রনাময় দাম্পত্যের প্রসঙ্গ, সবকিছু মিলিয়ে আলো-আঁধার, যন্ত্রনা-কৌতুক, বিয়োগবেদনা হাসি সমস্ত রসই প্রহসনটিতে পাওয়া যায়।

সূচক শব্দ: ঊনবিংশ শতাব্দির সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষানীতি, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, সমাজে নারীর অবস্থান, ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়, বাবু সম্প্রদায়, মানবিকতা।

মূল আলোচনা:

বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব ও জীবনের ত্রুটি বিচারিতিকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের দ্বারা জীবনের স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) সৃষ্টি করেছিলেন, গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন আলোচ্য। দীনবন্ধু যেহেতু ডাক বিভাগে কাজ করতেন, তাই কর্মসূত্রে তিনি নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের বাহ্য বাস্তব অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেন। দীনবন্ধু এই আলো-আঁধারে ভরা বাস্তবজীবনের উজ্জ্বল চিত্রপটের প্রতি সূত্রির আকর্ষণ প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন নাটকে ও প্রহসনে। দীনবন্ধু সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অভিমতছিল যে দীনবন্ধুর অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং সমাজের প্রতি তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁর নাটক প্রণয়ন।

দীনবন্ধু মিত্রের তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি অতি পরিচিত নাটক হল ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০)। এই নাটকের পর তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এবং শিল্প সৃষ্টির নিপুনতার পরিচয় পাওয়া যায় একটি প্রহসনধর্মী নাটকে। যার নাম ‘সধবার একাদশী’ (১৮৬৬)। রচনাটিকে প্রহসনধর্মী নাটক বলা হল কারণ ‘সধবার একাদশী’ প্রহসন হলেও এটি পুরোপুরি নাটকের রীতিতে গঠিত। তবে একথা স্বীকার করতে বুড়ো দ্বিধা নেই যে, দীনবন্ধু মিত্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ (১৮৬০) ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০) প্রভৃতি প্রহসন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি একথাও অনস্বীকার্য যে, মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব দীনবন্ধু মিত্রের রচনায় সংক্রামিত হলেও, সাধারণ বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব অসহায়তা সমন্বিত জীবনের বিচিত্র রূপ দীনবন্ধুর রচনাতে স্বার্থক ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখানেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব। সাধারণ ও নব্যশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর জীবনের প্রেরণা ও স্বার্থকতার চাবিকাঠি।

বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল ‘সধবার একাদশী’ রচনাটিতে তৎকালীন সময় ও সমাজের প্রতিফলন। এই রচনাটিতে তৎকালীন কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ও অর্ধ-শিত যুবসম্প্রদায়ের লাম্পট্য, মদ্যপান, আদর্শহীন হয়ে বেঁচে থাকা, পরস্পরবিরোধ, গুরুজনদের অসম্মান করা প্রভৃতি চরিত্র ভ্রষ্টতার কাহিনী উঠে এসেছে। তবে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার পূর্বে আমাদের তৎকালীন সময়ে সমাজে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা প্রবাহকে স্মরণ করে নেওয়া প্রয়োজন। দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ এই রচনার কিছু কাল পূর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল, যার সুত্র প্রভাব এই প্রহসনটিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। যথা- ১৮৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা প্রবাহ ভারতবর্ষে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করেছিল, তেমনি গোটা ভারতবর্ষে এক বৃহৎ গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষত, সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বরে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ওপর থেকে ভারত শাসনের ভার, মহারানি ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে নিয়ে নেওয়ার পর, কলকাতা সারা ভারতবর্ষে রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকে। ফলত তখন থেকেই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতায় প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জনসংখ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, মূল্যবোধ, কলকাতার ভৌগোলিক পরিধি প্রভৃতি সমস্ত কিছুই অত্যধিক গুরুত্ব ও বৃদ্ধি পেতে থাকল। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার সূত্রে এই দেশে আসেন হেনরি ডিরোজিও এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই এই দেশের তরুণ ছাত্রদের মনে নতুন করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। তাঁরা ডিরোজিওর নেতৃত্বে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মায়াজাল থেকে নিজেদের তথা সমাজকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। ডিরোজিওর এই অনুরাগীরাই বাংলাসাহিত্যে ও সামাজ্যে ‘ইয়ংবেঙ্গল’ নামে পরিচিত। তবে ডিরোজিওর অনেক শিষ্যরা এমনও ছিল যারা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান আহরণে যেমন সচেষ্ট হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই সামাজিক অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করা, গো মাংস ভক্ষণ, প্রকাশ্যে মদ্যপান, পতিতালয়ে যাতায়াত প্রভৃতি অনাচারকেও অনুসরণ করেছিলেন। ‘ইয়ং বেঙ্গল’র এই ব্যর্থ অনুসরণ-কারীরাই ‘বাবু ইয়ং বেঙ্গল’ নামে পরিচিত হয়। তৎকালীন যুগ জীবনে যুবসমাজের একটা অংশ যেমন সত্যিকারের স্বদেশ প্রেমিক ছিল, পাশাপাশি যুবসমাজের একটা অংশ আবার এই বাহ্যিক বাবুয়ানা দেখাতে গিয়ে সমাজের গহীন অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল।

দীনবন্ধু ‘সধবার একাদশী’ তে নব্যশিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নির্মাঁচাদ চরিত্রটিকে। এই চরিত্রটির মাধ্যমে দীনবন্ধু তৎকালীন নব্য সমাজের আদর্শহীন ও ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কন করেছেন, যা হাস্যরসের বাতাবরণকে অপসারিত করে জীবনের মর্মকেন্দ্রকে উদ্ঘাটিত করে। নির্মাঁচাদ উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী হয়েও সংযমের অভাবে সে মদ খেয়ে নেশার স্রোতে ভেসে গেছে। রচনাটিতে দেখা যায়, নির্মাঁচাদ চিতপুর রোডে গোকুল বাবুর বাড়ীর সম্মুখে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক দাসীর সঙ্গে ও অসঙ্গত কথোপকথনে লিপ্ত হয়েছে-

“নিম। মাসি!

দাসী। “ক্যান বাবা মাসী মাসী কচো? হাজার হোক বড় নোকের হেলে কি না, গোরিব দেখে ঘেন্না করে না, মাসী বলে ডাক্চে - জল এনে দেব মুখে দেবে?”

নিম। তুই এক কর্ম কত্তে পারিস্।

দাসী। কি কর্ম বাবা?

নিম। তুই কুটনী হতে পারিস্?”^১ (২/৩)

তবে পাশাপাশি একটি কথা স্বীকার করতে হয় যে, নির্মাঁচাদ চরিত্রহীন লম্পট নয়, অন্যান্য বদ দোষ তার চরিত্রে নেই। ইংরেজী শিক্ষার নেশায় সে মাতাল হয়ে পড়লেও শিক্ষা ও যুক্তি তর্কের দিকে মাতলামির বোঁকেও আত্মসচেতন।

“নিমাঁচাদ - - - অটল, তোমার মাগ তুমি নিয়ে এলে বাবা, এখন আমার ঘাড়ে ফেলে দিচ্চো। - - -

রামবাবু- তবে কে করেছে ?

নিমাঁচাদ- সময়, সভ্যতার সঙ্গে বিদ্যাভাবের উদ্ধাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়। - - -

নিম - বাবা, আমি মদ খাই আর যে করি, তোকে বারবার বলিচি, রাতে কখন বাইরে থাকিস্নে আপনার ঘরে গিয়ে শুস্।”^২ (৩/৩)

আলোচ্য আলংখ্যটিতে অটলবিহারী হল তৎকালীন সমাজের ধনীর মূর্খ ও সংস্কারহীন, দায়িত্ব কর্তব্য বিমুখ, বারাজ্ঞা প্রিয় কামুক পুত্রের প্রতিনিধি। জ্ঞানস্পৃহা বুদ্ধিচর্চার বিন্দুমাত্র আগ্রহ এই চরিত্রে পাওয়া যায় না। মদ্যপান ও বারাজ্ঞা গৃহে গমন এবং ইন্দ্রিয় লালসাকেই অটল জীবনের পরমার্থ বলে মনে করত। বারাজ্ঞা কাঞ্চনের সঙ্গলাভই হল তার জীবনের পরম পাওয়া। অথচ গৃহে রয়েছে তার স্ত্রী। স্ত্রীর প্রতি স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা তো দূরের কথা, কার্যত অটলের তার স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রয়েছে, আমরা এই রচনাতে তা কোনো ভাবেই অনুভব করতে পারিনা। ধনীর একমাত্র পুত্র হওয়ার সুবাদে, অতিরিক্ত মাতৃস্নেহে ও প্রস্রয়ে অটল চরিত্রটি হয়ে উঠেছে এক আদর্শহীন ও নীতিহীন শ্রেণীর প্রতিনিধি। অটল এতটাই আদর্শহীন যে নেশার ঘোরে সে বারাজ্ঞা কাঞ্চনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে নিজের বোন সৌদামিনীকে। পাশাপাশি চরিত্রটি এতটাই নীতিহীন যে, নিজের ভোগ লালসা ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে নিবারণ করতে গিয়ে সে তার খুড়ী শাশুড়ীকে ধরে আনতে লোক পাঠাতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি-

“কুমু। তুমি কি ছোট খুড়ীকে ধরে আনতে লোক পাঠিয়েছিলে? তোমার কি একটু বুদ্ধি নেই, তোমার কি একটু ধর্মজ্ঞান নেই, তোমার কি মা মাসি জ্ঞান নেই - ছোট খুড়ী যে তোমার শাশুড়ী, শাশুড়ী যে মাও সে-”^৩ (৩/৩)

তৎকালীন সমাজে ও সময়ের নবচেতনার মহৎ মন্ড্রে এই শ্রেণির মানুষ বা চরিত্রগুলি দীক্ষিত হয়নি। সমাজ সংস্কারের মহৎ সংকল্পেও এরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেনি। তৎকালীন সমাজে অতিরিক্ত মদ্যপান, নারী সংসর্গ, পতিতালয়ে গমন এবং বেশ্যাসক্তি নাগরিক জীবনে ভয়াবহ ভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল – যা দীনবন্ধু মিত্র ‘সধবার একাদশীতে’ উল্লিখিত চরিত্রদ্বয়ের দ্বারা প্রকাশিত করেছেন।

-তৎকালীন সময়ে অধর্শিক্ষিত, পদার্থহীন বস্তৃপিত্ব কিছু কিছু লোক ছিল, যাদের প্রতিনিধিত্ব করছে কেনারাম চরিত্রটি। লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন ভারতের বড়লাট, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংরেজী জানা ভারতীয়দেরই শুধু চাকরীতে বহাল করা হবে। আসলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসা – বাণিজ্যের জন্য কিছু কেরানী সৃষ্টি করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। এই পটভূমিতেই সৃষ্ট হয়েছে কেনারাম চরিত্রটি। ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ রামমাণিক্য ও ঘটীরাম ডেপুটির ন্যায় ব্যক্তির সামাজিক আভিজাত্য বজায় রাখবার হাস্যকর প্রয়াসে বিদ্রূপ ও পরিবারিক জীবন সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ, তাদের সে যুগের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত করেছেন।

‘সধবার একাদশী’- তে – বহিঃসমাজ জীবনের ছবি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি কলকাতায় উচ্চবিত্ত শ্রেণির অন্তঃপুরের বা অন্তরমহলের সম্পূর্ণ চিত্র ধরা না পড়লেও একটি স্ক্র্যাচ আমরা অবশ্য তৈরি করে নিতে পারি। যাতে একটু রঙ যদি তুলির টানে দিয়ে দেওয়া যায় তবেই তা সম্পূর্ণ হয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়ে। অটলবিহারীর স্ত্রী কুমুদিনী এবং বোন সৌদামিনীর কথপোকথনের মাধ্যমে নন্দ – বৌদির একটি মিষ্টি সম্পর্ক তথা রঙ্গরসিকতা ও অলস মত্তর জীবন যেমন ধরা পড়ে, তেমনি কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবনের অসহায়তা, হাহাকার ও বঞ্চনার প্রতিফলনও ছায়াপাত করে। কুমুদিনীর বিভিন্ন সংলাপে তার জীবনের বহু বিধ যন্ত্রনার কথা আমরা অনুভব করতে পারি। যথা-

“- - বাবা বড়মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাব, মরণটা হয় ত বাঁচি।”^৪ (২/১)

-কুমুদিনী চরিত্রটির মাধ্যমে দীনবন্ধু তৎকালীন সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তরমহলের সধবাদের বঞ্চনা ও অবহেলার ছবি তুলে ধরেছেন। এখানে সধবারাও যেন বিধবাদের মতই প্রতিনিয়ত নিজেদের সংযমের দ্বারা একাদশী পালন করে যাচ্ছে। প্রহসনটির শেষে নিমচাঁদের সংলাপে সধবাদের এই অসহায়তা বঞ্চনার ও অবহেলার হাহাকার খুব সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে-

“কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চর।
মাতালের মান তুমি, গনিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।”^৫ (৩/৩)

অটলবিহারীর মাতা ‘গিন্নি’ চরিত্রটি তৎকালীন সমাজের বড়লোকের স্ত্রী বা ‘বড়বাড়ি’-র গিন্নিদের আদর্শ চরিত্র হিসেবে দীনবন্ধু অঙ্কন করেছেন। যিনি একমাত্র পুত্র বলে অটলবিহারীর কোন দোষই দেখতে পান না। ঘরে পুত্রবধূ থাকা স্বত্বেও শুধুমাত্র পুত্রের অবাঞ্ছিত আন্দার রক্ষার তাগিদে একজন বারবনিতা বারান্দার কাছেও মাথা নত করতে ও কাকুতি মিনতি করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন। তাই তিনি স্বেচ্ছায় নিজ পুত্রের সমস্ত দায়িত্ব কাঞ্চনের হাতে অর্পণ করতে পারেন। অটল কাঞ্চনের উপর অভিমান হেতু গলায় ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন কাঞ্চন

যখন ঘটনার গতিবেগ বোঝে চলে যায় অটলের বাড়ি থেকে, সেই সময় আমরা গিম্মির মুখে শুনি-

“- -ও কাঞ্চন, আমার মাতা খাস্ মা যাস্নে, তোমায় না দেখলে গোপাল আমরা আবার গলায় দড়ী দেবো।”^৬ (৩/২)

-একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা ও বিনোদনের জন্য গিম্মি চরিত্রটি নিজের জীবনের নীতিবোধ, নারীত্ব ও মাতৃত্বের সঠিক আদর্শ, ধর্মবোধ সমস্ত কিছুই বিসর্জন দিয়েছে।

দীনবন্ধুর একদিকে যেমন ছিল বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, অপদিকে ছিল সমস্ত চরিত্রের সঙ্গে সমপ্রাণতা প্রতিস্থাপনের অসাধারণ ও নিখুঁত দক্ষতা। তাই তিনি প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেছেন ও চরিত্রের ভাষা, উচ্চারণ ও সুর সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণেই সমসাময়িক যুগের একটি সামগ্রিক চিত্রের ধারণা আমরা পেয়ে থাকি তাঁর বিভিন্ন রচনায়। ‘সধবার একাদশী’, ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ (১৮৬৬), ‘জামাই বারিক’ (১৮৭২) কোনোটিই এর ব্যতিক্রম নয়। জীবনের সামগ্রীকতাকে তুলে ধরার জন্য, জীবনশিল্পী দীনবন্ধু কোনো কিছুই বর্জন না করে, ‘পবিত্রতার ভান’ না দেখিয়ে, সমগ্র জীবনের ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণ্য, মার্জিত-অমার্জিত, রুচিবান-রুচিহীন সমস্ত কিছুই তাঁর রচনায় বাণীমূর্তি দান করেছেন। এখানেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠত্ব, দীনবন্ধুর অমরত্ব।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঘোষ, ডক্টর অজিতকুমার (সম্পাদিত), ‘দীনবন্ধু রচনাবলী’ (একখণ্ডে সমগ্র রচনা), হরফ প্রকাশনী, প্র- ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে, পৃ-১৪৬।
- ২। ঐ, পৃ-১৬১-১৬৩
- ৩। ঐ, পৃ-১৬১
- ৪। ঐ, পৃ-১৩৪
- ৫। ঐ, পৃ-১৬৪
- ৬। ঐ, পৃ-১৫৭।

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসে (নির্বাচিত) মধ্যবিভ মানসিকতার প্রতিফলন

মন্দিরা ঘোষ

গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম ১৮-ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে, তাঁর মৃত্যু হয় ট্রাম দুর্ঘটনায় ২২-শে অক্টোবর ১৯৫৪ সালে। মাত্র চুয়ান্ন বছরের জীবৎকালে তাঁর সাহিত্য জীবনের দিকে যদি আমরা দৃকপাত করি তাহলে দেখব কবিতা রচনার পাশাপাশি ছোটগল্প, উপন্যাসও তিনি রচনা করেছেন। তবে ছোটগল্প, উপন্যাস যাই হোক না কেন সবই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। মৃত্যুর পর বেশ কিছু সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর নিজের ছবির প্রয়োজন হয়। তখনই ছবির সন্ধান করতে গিয়ে পাওয়া যায় চারটি ট্রান্স যা আসলে গল্প-উপন্যাস- প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিতে পরিপূর্ণ ছিল। পরে অবশ্য গল্প - উপন্যাস চার খন্ডের সমগ্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। ‘আধুনিক কবি’ পরিচয় এর পাশাপাশি আমরা তাঁর ‘কথাসাহিত্যিক’ এই পরিচয়ও পাই। এমনিতে তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী মানুষ। তবে নাগরিক জীবনে একক মানুষের ব্যর্থতার মূল সংকটকে তিনি তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আর এই প্রকাশ আরো বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে কারণ, জীবনানন্দ ব্যক্তিজীবনে নিজেও এই সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কবি হিসেবে সেই সময় যদি কাব্যজগতে তিনি পরিচিতি পেতেন তাহলে হয়তো তাঁর জীবনটা এরকম হতো না। কিন্তু না, এর বিপরীতটাই যে ঘটেছে তাঁর জীবনে। কবিতার অঙ্গীলতার দায়ে জীবনানন্দকে প্রায় সে সময় কোণঠাসা করা হয়েছিল, তবে তিনি আপোষ করেননি বরং মেনে নিয়েছেন বেকারত্বকে, প্রতিকূল পরিস্থিতিকে। আর এর প্রভাব পড়ে তাঁর দাম্পত্য জীবনেও। এসব নানা কারণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এসেছিল এক ধূসরতার মেঘ। মধ্যবিভ মানসিকতায় বড় হওয়া জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানুষের মনের অলিগলিকে, নিজের জীবনেও তিনি এর থেকে বেরোতে পারেননি। খ্যাতি বা একজন সং নিষ্ঠাবান মানুষ নয়, মধ্যবিভ সমাজ চায় শুধু অর্থ। এই অর্থের কাছে যদি নিজের স্বত্ত্ব বিক্রি হয়েও যায় তবুও তারা ভালো থাকে। আর কোনো পরিবারে যদি অন্যের থেকে ভালো, সুখে থাকার ‘অর্থ’ দিন আনা দিন খাওয়ার মত হয়, তাহলে সেখানে দেখা যায় অশান্তি, অসুখের পরিবেশ। জীবনানন্দের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে আমরা মধ্যবিভ শ্রেণির মানসিকতা, পারিবারিক কাঠামোকে খুঁজে পাই। যা আসলে আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়েও আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের সুপ্ত মানসিকতাকেই নির্দেশ করে।

সূচক শব্দ: মধ্যবিভ সমাজ, মধ্যবিভ মানসিকতা, অর্থ, বেকারত্ব, দাম্পত্য সম্পর্ক, একাকিত্ব।

মূল আলোচনা:

দেশভাগ, দাঙ্গা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তরের মতো রাজনৈতিক নানা ইস্যুতে ভারতমাতা যখন ক্ষতবিক্ষত ঠিক সেই সময়টাতে ১৯৪৬-৪৭ কবি জীবনানন্দ দাশ দ্বিতীয়বারের জন্য ঔপন্যাসিকের কলম হাতে তুলে নিলেন। তবে ১৯৩১-৩৩ সময়পর্বে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ তাঁর একক ব্যক্তিমনের সংকটকে ভাষা দিয়েছিলেন উপন্যাসের মধ্যে। পরবর্তী সময়ের অস্থিরতা যে

শিকড়হীনতার জন্ম দিয়েছিল মানুষের মনে - তাই জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসে একক মানুষের সংকট হিসেবে স্থান পায়। দ্বিতীয় পর্বে পাই, বিশ্বের মানুষের সমষ্টিগত সংকটের ছবি। ১৯২৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত এই ২২ - ২৩ বছরে তিনি প্রায় কুড়িটির মতো উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তবে তা প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসিকের অবর্তমানে।

জীবনানন্দের প্রকাশিত উপন্যাসের রচনাকাল অনুযায়ী তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘জ্যোতি’ (১৯২৬)। এই উপন্যাসটিতে কলকাতার একটি কলেজে এক অধ্যাপকের চাকরি করা, কলকাতার ভাড়া বাড়িতে থাকা এক অবিবাহিত যুবকের গল্প পাওয়া যায়। ‘জ্যোতি’ উপন্যাসের নায়ক জ্যোতি, সে শিক্ষিত, সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে পছন্দ করে। সে শিল্প - সাহিত্য - সংস্কৃতিচেতনা সম্পন্ন হলেও বাস্তব জীবনের পথে চলতে গিয়ে অর্থের প্রয়োজনকে কখনোই এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই কলেজে শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে অধিক উপার্জনের জন্য পোট কমিশনার্স ডিপার্টমেন্টের চাকরির জন্য হাজির হয় চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে। এই কাজ যেখানে কোনো ভদ্রলোকের ছেলে করে না, সেখানে গ্র্যাজুয়েট, ইংরেজিতে এম.এ জ্যোতি হাজির হয়েছে চাকরির আশায়। তবুও তার চাকরির কোনো বন্দোবস্ত হয় না। ইতিমধ্যে তার একটি মেয়েকে ভালো লাগে। কিন্তু নারীর মন সে বুঝতে পারে না। জ্যোতির মধ্যে আমরা মধ্যবিত্ত মানসিকতার নানা দিকের পরিচয় পাই। সমাজে উচ্চবিত্ত - মধ্যবিত্ত - নিম্নবিত্ত - এই তিন শ্রেণীর মধ্যে মধ্যবিত্তের অবস্থা সবথেকে করুণ। তারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে সমাজের মধ্যস্তরের অবস্থান করে। কোনো কিছুতেই তারা যেন সন্তুষ্ট হতে পারে না। এক প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন চলে। কোন কাজ করলে জীবনে সুখ-শান্তি আসবে এই দোলাচলতায় চলতে থাকে তারা। উপন্যাসের নায়ক জ্যোতির মধ্যেও আমরা এই মানসিকতার পরিচয় পাই। সে কখনো ভাবে আধুনিক যুগে বাংলার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির কবিতার সমালোচনার লিখে মাসিক পত্রে প্রকাশ করবে। আবার কখনো ভাবে রেস খেলে, লটারি খেলে আর্থিক অনটন দূর করবে। রাতারাতি কিছু একটা উপায় বের করে ব্যবসা করার কথাও ভাবে সে। কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। এই হঠকারী ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সে হুজুগের বসে রেসে গিয়ে দশ টাকার টিকিট কিনে ফেলে, তবে সেখানে অর্থপিষাচ মানুষদের ভিড়ে নিজে অস্বচ্ছন্দ বোধ করে। নায়ক জ্যোতির মাধ্যমে আমরা সমগ্র মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিফলন দেখতে পায়। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ দাশও এর ব্যতিক্রমী নন। এক মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা একজন মানুষের জীবনে চলার পথে অর্থের প্রয়োজন কতখানি এবং সেই অর্থের জন্য কত কিছু করতে হয় মানুষকে তা আমরা ব্যক্তি জীবনানন্দের মধ্যে যেমন পাই, তেমনি স্রষ্টার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখি।

জীবনানন্দের বিবাহের পরে লেখা প্রথম উপন্যাস ‘পূর্ণিমা’ (১৯৩১)। এই উপন্যাসে সন্তোষ পূর্ণিমার দাম্পত্য জীবন অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে এক প্রকার চলে যাচ্ছিল। অসাধারণ রূপবতী লক্ষ্মীমতি পূর্ণিমা সন্তোষের মতো একজন শিক্ষিত বেকার যুবককে বিয়ে করেও জীবনে অসফলতা নিয়ে কখনোই ভাবিত ছিল না বরং সে তার স্বামীকে ভরসা যোগাত, ‘চাকরি বাকরি টাকাকড়ি সচ্ছলতা শিগগিরই হবে তাদের।’ পূর্ণিমা এটাও ভাবতো যে স্বামীর চাকরির কোনো ব্যবস্থা হলে সে তার দিদি ছোট বোন এবং মামাকে নিজের কাছে এনে রাখবে। ভবিষ্যতের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যাশাতেই তার দিন কাটছিল। কিন্তু মানুষ জীবনে যা পায় তা নিয়ে কখনোই খুশি থাকতে পারে না। অন্যের সঙ্গে বিশেষত যদি কোনো নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তুলনায় নামে, তাহলে তখন থেকেই তার জীবনে পরিপূর্ণতার অধ্যায়ে সমাপ্তি

ঘটে। পূর্ণিমার মধ্যেও আমরা এই মধ্যবিন্দু মানসিকতার পরিচয় পাই। তার দিদির ধনীর বাড়িতে বিয়ের সুখবর আশায় তার জীবনে যেন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। দিদির বিবাহিত জীবনের ঐশ্বর্যের বিপরীতে যখন সে নিজের আর্থিক অনটনক্লিষ্ট দাম্পত্য জীবনের প্রতিতুলনা করতে থাকে তখনই তার অন্তর যেন হাহাকারে ভরে ওঠে। কিন্তু জীবনের অন্ধকারের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার ক্ষমতা হয়তো পূর্ণিমার মতো আমাদের কারোরই নেই। দিদির সুখে নিজেকে আশ্বস্ত করার মধ্যে দিয়ে পূর্ণিমা সুখী হতে চাই। কিন্তু তার অন্তরের ব্যথা গোপন থাকে না। স্বামীর উপযুক্ত চাকরি খোঁজা নিয়ে তার মধ্যে সংশয় তৈরি হয়। আমরা ভাগ্যের পরাজয়কে মেনে নিতে পারি। কিন্তু কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারি না, পূর্ণিমাও পারেনি। একরকম হতাশা ব্যর্থতা এবং গ্লানিবোধে জর্জরিত পূর্ণিমা সন্তোষকে কটাক্ষ করে বলে, ‘উপায় অর্জন করার মতো শক্তি তোমার হলো না কেন? কেন তবে বিয়ে করতে গেলে? বোঝানি কি যে বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম দায়িত্ব এসে মানুষকে জড়ায়?’^২ বিরাজ - চামেলীর সুখী দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি সন্তোষ পূর্ণিমার দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যর্থতাকে ঔপন্যাসিক এখানে প্রকাশ করেছেন। একদিকে অন্তঃসত্ত্বা পূর্ণিমা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে আর অন্যদিকে তার স্বামী সন্তোষ স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করছে। আর কিই বা করার আছে তার। দুজনে কেউই তাদের জীবনে সঠিক জিনিসটি পাইনি। হয়তো এভাবেই সন্তোষ পূর্ণিমার জীবনটা চলে যেত। কিন্তু বাধ সাধে দিদি চামেলির ঐশ্বর্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবনের চিত্র। শুধুমাত্র ভালোবাসা নয়, একজন মানুষ কতটা অসহায় হলে তবে স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। আর্থিক সচ্ছলতা নয়, মানুষ যখন নিকটজনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যায়, তখন শুধুমাত্র তার আত্মসম্মান বেঁচে থাকে। এইজন্যই সন্তোষ স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে বিরাজ - চামেলীর ঐশ্বর্যের উচ্ছলতা থেকে পূর্ণিমাকে বাঁচানোর জন্য। পূর্ণিমা সন্তোষের মধ্যে আমরা মধ্যবিন্দু শ্রেণীর ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে জীবনের পথে হেরে যাওয়ার চিত্র পাই। মধ্যবিন্দু শ্রেণীর অবস্থা খানিকটা বড়শিতে বাধা মাছের মত। কোনো দিকেই সে যেতে পারে না, কেবল বাঁচার জন্য ছটফট করতে থাকে। আর সেই ভালোভাবে বাঁচার জন্য অনেক সময় মৃত্যুকেও গ্রহণ করে।

জীবনানন্দের অন্য আরেকটি উপন্যাস হল ‘কল্যাণী’। এই উপন্যাসে আমরা দেখি কল্যাণী শিক্ষিত এবং সচেতন, পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে নিজের স্বাধীনচেতা মানসিকতাকে বিসর্জন দিয়ে চিরাচরিত সংস্কার এবং স্বামী সংসারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে। কলকাতার মডার্ন হালচালে অভ্যস্ত কল্যাণীর আদব কায়দায় তার বাবা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তিনি মেয়ের বিবাহের তোড়জোড় শুরু করেন। বাড়ির পছন্দের চন্দ্রমোহনের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আগে কল্যাণী তার ভালোবাসার মানুষ শিক্ষিত বেকার অবিনাশের কাছে যায় কিন্তু অবিনাশও তাকে প্রেম নয়, জীবনে চলার পথে যা একান্ত প্রয়োজন সেই অর্থের কথাই বলে। মধ্যবিন্দু মানসিকতাকে আমরা এখানে অবিনাশের মধ্যে খুঁজে পাই। বিয়ের পর কল্যাণী যখন বুঝতে পারে স্বামী চন্দ্রমোহন কতবড় ধাপ্তবাজ মানুষ, তখন সে আর কোনো অভিযোগ জানায় না। স্বামীর এই ভদ্মামি, ধূর্ততা, মিথ্যাচারকে তার অশোভন বলে মনে হয় না। বরং অতি নিষ্ঠার সঙ্গে সে তার স্বামীকে সেবা করে। জীবনানন্দ নিজে বড় হয়েছেন মধ্যবিন্দু পরিমণ্ডলে। তাই মধ্যবিন্দু মানসিকতা, তাদের জীবনের সংগ্রামকে তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভালোবাসার মানুষের যদি আর্থিক জোর না থাকে তাহলে সে সম্পর্ক পূর্ণতা পায় না। তখন বাড়ির দেখা পাত্রকেই বিয়ে করতে হয় ভবিষ্যৎ অজানা জেনেও। স্বামী যেমনই হোক না কেন বিবাহের পর একটি মেয়ের স্বামীই যে সবকিছু। ভালোবাসা থাক বা না থাক এ সম্পর্ক থেকে

বেরিয়ে এসে বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়া তো বাবা-মাকে আরো কষ্ট দেওয়া। তার থেকে নিজেকে নিয়তির হাতে সঁপে দিয়ে স্বামীর ঘরে থাকাই ভালো। কল্যাণীর মত আমাদের সকলের মানসিক কাঠামো এটি। এখান থেকে আমরা বেরোতে পারি না। কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে আছে সমাজের ভয় যা উচ্চবিত্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই ভয়কে তারা আজীবন বয়ে নিয়ে চলে। স্বামীকেই মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে কল্যাণীর সমাজের প্রতি এক মর্মান্তিক আর্তি ব্যক্ত হয়েছে যা পাঠক সমাজ অনুভব করতে পারে।

‘প্রেতিনীর রূপকথা’ উপন্যাসটি প্রকাশ পায় ১৯৩৩ সালে। এই উপন্যাসের নায়ক সুকুমার বেকার, ছয় সাত মাস ধরে সে কলকাতায় যাতায়াত করেও চাকরির কোনো সুরাহা করতে পারেনি। এমনকি স্কুলে মাস্টারের চেষ্টা করেও সুকুমার ব্যর্থ। বেকারত্ব, পারিবারিক আর্থিক দুরবস্থার ছাপ তাদের দাম্পত্য জীবনেও লক্ষ্যণীয়। কয়েক পুরুষের জমি জায়গা থাকলেও আজ তা নেই। ঋণের দায়ে যখন পৈতৃক বাড়ি বিক্রি হয়ে যায় তখন স্ত্রী মালতি বলে, ‘শুনেছিলাম জায়গা জমি আছে, জমিদারের ছেলে, ভেবেছিলাম আমার কপাল খুলল বুঝি, কিন্তু বিয়ের আগেই বুঝেছিলাম, অত সুখ কি আমার সহিবে ! তা সহিবে না।’ মালতীর এই স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা এবং বিবাহিত জীবনে অসুখের ইঙ্গিত দিয়ে প্রেতিনীর রূপকথা উপন্যাসের সূচনা হয়। অসহায় মালতি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করে যে এই অবস্থায় সে কি বাপের বাড়ি চলে যাবে অর্থাৎ মালতীর এই জিজ্ঞাসা স্বামী সুকুমারের প্রতি তার শিথিল বন্ধন এবং পারস্পরিক নিবিড়তার অভাবটিকে ব্যক্ত করে না বরং আমরা সুকুমারের স্ত্রীর মধ্যে মধ্যবিত্ত এক গৃহবধূর মানসিকতার পরিচয় পাই। মধ্যবিত্ত সমাজ কাঠামোয় দেখে শুনে বাবা মা যখন মেয়ের বিবাহ দেয়, তখন এটি আশা করা হয় মেয়ের শ্বশুরবাড়ি এবং ছেলে সহায়সম্বলহীন নয়। যদি কখনো এ অবস্থার অবনতি ঘটে তখন স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতের প্রতি প্রশ্ন ওঠে। মালতির মধ্যে স্বামী সংসারের প্রতি একপ্রকার উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। এক অব্যক্ত বেদনাকে অন্তরে নিয়ে মালতির জীবন চলছে। সুকুমারের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি অসহ্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, স্বামীর আর্থিক অনটন, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিণতি - এজন্যই মালতির মধ্যে কি এতটা নিম্প্রহতা। সেও হয়তো প্রত্যাশা করেছিল সুখী দাম্পত্য, স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা। এই সামান্য চাওয়া যে কত বড় মিথ্যে তা মালতি সুকুমার উভয়েই জানে। তাই হয়তো তারা শুধু অগ্নিসাক্ষী করা বিয়েটাকে টিকিয়ে রেখেছে বাইরে থেকে, যার ভেতরটা একদম ফাঁকা, অন্তঃসারশূন্য। এই অন্তঃসারশূন্যতাকেই বয়ে চলি আমরা মধ্যবিত্তরা। কারণ আমাদের না আছে চূড়ান্ত সত্যকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা, না আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা।

‘বাসমতীর উপাখ্যান’ উপন্যাসের নায়ক সিদ্ধার্থ সেন বাসমতী কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক, মানবিক বোধ যুক্ত, পরোপকারী। দুর্দিনে সে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বাইরে সকলের কাছে শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেলেও বাড়িতে যে ভালোবাসা মর্যাদা পাবেন এতটা ভালো নয় তার স্ত্রী ভাগ্য। সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি এসে সিদ্ধার্থের সেবার পরিবর্তে জোটে কেবল গঞ্জনা। দুশো টাকার চাকরি স্ত্রী সুনীতার পছন্দ নয়। তাই সে নানা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু করে - যা সিদ্ধার্থকে আরো ক্লান্ত করে দেয়। স্বামীর কোনো কিছুর প্রতিই তার কোনো আকর্ষণ নেই। কেবল সে স্বামীকে বিষবাক্য নিষ্ক্ষেপ করতেই অধিক যত্নশীল। ব্যবহারিক জীবনে টাকা-পয়সার দরকার আছে - এ কথা বিশ্বাস করে সিদ্ধার্থ, তবে যেমন তেমন ভাবে উপার্জনে সে বিশ্বাসী নয়। স্ত্রী সুনীতা এসব বোঝে না। সে মনে করে অর্থই সবকিছু। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় স্বামী

স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য। আমরা সুনীতার মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ কাঠামোয় বড় হওয়া এক গৃহবধূর মানসিকতার পরিচয় পাই। এখানে আমরা কখনোই বলতে পারি না সুনীতা তার স্বামীকে নিয়ে খুশি নয়। আসলে আমরা যা পাই তা নিয়ে কখনোই খুশি থাকতে পারি না। কেবলই আরো চাই এর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে থাকি। সিদ্ধার্থর সঙ্গে স্ত্রী সুনীতার মানসিকতার এখানেই তফাৎ। সুনীতা কখনোই খুশি হতে পারে না স্বামীর সামান্য উপার্জনে। সে অন্যদের মতো ভালো থাকতে চায়, চায় স্বামীর উপার্জন আরো বাড়ুক - এই চাওয়াতে সত্যিই কোন অপরাধ নেই। আছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার ছায়া।

বরিশালের এক সাধারণ ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। কবিতা লেখার স্বভাবটি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে। আজ জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবি হিসেবে যতটা জনপ্রিয়, ততটা জনপ্রিয় তিনি হতে পারেননি একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে। তবে তিনি কবিতা লেখার পাশাপাশি ছোটগল্প, উপন্যাস লিখেছেন যা অবশ্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। তাঁর মাত্র চুয়ান্ন বছরের যাত্রাকাল ছিল এক অস্থির সময়ের মধ্যে। ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল, দেশভাগের যন্ত্রণা, দাঙ্গা, খুন, হানাহানি, বেকারত্ব - এই অস্থির সময় কবি জীবনানন্দকেও প্রভাবিত করেছিল। তিনিও চাকরির জন্য ছুটে গেছেন এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোথাও একটু ভরসা পেয়েছেন আবার কোথাও সেটুকুও পাননি। তবুও থেমে থাকেননি, তিনি পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে গেছেন অবিরত। মধ্যবিত্ত সমাজ কাঠামোয় বড় হওয়া জীবনানন্দ দেখেছেন বাস্তবের সঙ্গে মানাতে না পারা মানুষের অসহায়তা। এর আঁচ নিজের বিবাহিত জীবনেও তিনি পেয়েছিলেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলো সকলেই পৃথকভাবে তাদের সমস্যাকে ব্যক্ত করেছে। তবে মূলসূত্রটি একই। নারী পুরুষের কর্মময় জীবনের ছবি, সংসারী মনোভাব, তাদের দৈনন্দিন জীবন এখানে অনুপস্থিত। একমাত্র প্রকট রূপে উপস্থিত মধ্যবিত্ত সমাজ কাঠামো, মধ্যবিত্ত মন-মানসিকতা। উপন্যাসে সাত পাঁকে বাঁধার মতো বৈবাহিক সম্পর্কে দেখানো হয়েছে একটা পলকা সুতোর মতো। যা একটু হ্যাঁচকা টানেই ছিড়ে যেতে পারে। এই সুতোর বাঁধন আলাগা থাকবে না শক্ত থাকবে - সবকিছু নির্ভর করে একটি বিষয়ে উপর। অর্থই হলো সেই বিষয় যা মধ্যবিত্ত সমাজ কাঠামোর প্রধান স্তম্ভ। এই স্তম্ভের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে নারী পুরুষের ভালোবাসা, পারিবারিক বন্ধন, দাম্পত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা - ভালবাসা। দূরদর্শী জীবনানন্দ দাশও পারেননি নিজের জীবনে এই অর্থের স্তম্ভকে শক্ত করে দাঁড় করাতে। তাই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন স্তম্ভ পতনের সংকট। আর এই সংকটকেই তিনি উপন্যাসগুলোতে বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন।

আমরা সামাজিক জীব। তাই সমাজকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের নেই। জীবনানন্দও পারেননি। তাই হয়তো সমাজের আগল, দাম্পত্য সম্পর্কের অসম বাঁধন কবিচিত্তকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। তারই ফলপ্রকাশ আমরা পাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। কথাসাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্প, উপন্যাসের মধ্যে আমরা তৎকালীন সময়ের অস্থিরতা বেকারত্ব দাম্পত্য সম্পর্কের অসারতার ছবি পাই। আর সবথেকে বেশি ভাবে লক্ষ্য করা যায়, মধ্যবিত্ত সমাজ কাঠামো এবং মধ্যবিত্ত মানসিকতা। মধ্যবিত্তের সমস্যা, তাদের মানসিকতা যে শুধু সেই সময়েই বর্তমান ছিল তা নয়, আজও কিন্তু আমরা সেই ধারাকেই বয়ে নিয়ে চলছি। আমরা মুখেই শুধু আধুনিকতা শিক্ষার বড়াই করি। কিন্তু আজও বেরোতে পারিনি মনের অন্ধকারময় দিক থেকে। আজও আমরা অন্যের সঙ্গে প্রতি তুলনায় নামি। নিজের সংসারের

শান্তি বিঘ্নিত করে অন্যের সুখ শান্তি, ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হই। নিজের যা আছে তা নিয়ে সুখে যে থাকতে পারিনা এ যে আমাদের চিরকালের সমাজ কাঠামো। জীবনানন্দ দাশও এর বাইরের নন। স্ত্রী লাবণ্যদেবীর মনোবাসনা, চাহিদা তিনি মেটাতে পারেননি, তাই এক অতৃপ্ত অসুখী দাম্পত্য জীবনকে বয়ে বেরিয়েছেন আমৃত্যু। আমরা কোনোদিনই ব্যক্তি জীবনানন্দকে সেভাবে বুঝতে চাইনি। না বুঝেই তাঁকে বিচার করে গেছি। তবে আজ একশো পঁচিশতম জন্মশতবার্ষিকীতে এসে আবার যখন জীবনানন্দ দাশকে স্মরণ করছি তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে নিয়ে আলোচনা করছি, তখন তাঁর গল্প উপন্যাসে উল্লিখিত এই বিষয়গুলি কি সত্যিই আমাদের ভাবায় না? আমরা যে এই মানসিকতা এই সমাজ কাঠামো থেকে বেরোতে পারব না কোনোদিনই - তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হয়তো তিনি এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা তাঁর উপন্যাস ছোটগল্পে বলে যাননি।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, বইমেলা ২০১৭, ‘জীবনানন্দ দাশ উপন্যাস সমগ্র’, কলকাতা, কামিনী প্রকাশালয়।
২. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪।
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

ভাসপ্রণীত ব্যাযোগ শ্রেণির নাট্যপ্রয়োগ-রীতি

লিটন মিত্র

সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

এবং

অনিন্দিতা দাশ

সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: ‘রূপারোপাতু রূপকম্’ অর্থাৎ রূপের আরোপ করা হলে তা-ই রূপক। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রানুসারে রূপক দশ প্রকার। এর মধ্যে ব্যাযোগ একটি শ্রেণি। সংস্কৃত সাহিত্যঙ্গনের প্রথিতযশা নাট্যকার ভাস তেরোটি রূপক লিখেছেন; তন্মধ্যে ব্যাযোগ শ্রেণির দুটি রূপক রয়েছে (যেমন : *দূতবাক্য* এবং *মধ্যমব্যাযোগ*)। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাযোগের সংজ্ঞা সহ নাট্যতত্ত্বের প্রয়োগ অর্থাৎ সন্ধি, অর্থ-প্রকৃতি, অবস্থা, অঙ্গসমূহ বিচারপূর্বক ভাসপ্রণীত ব্যাযোগ শ্রেণির রূপক নির্ণীত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: রূপক, ব্যাযোগ, পঞ্চঃসন্ধি, পঞ্চঃঅর্থপ্রকৃতি, পঞ্চঃবস্থা।

মূল আলোচনা:

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতকের ভাস একজন প্রতিভাবান প্রথিতযশা নাট্যকার। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই নাট্যকার সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক, প্রকরণ, ব্যাযোগ, উৎসৃষ্টিকাক্ষসহ বিভিন্ন রকমের রূপক লিখেছেন। তবে তাঁর রচনাসমূহে সম্পূর্ণরূপে *নাট্যশাস্ত্র* অনুসরণ করা হয়নি। ১৯০৯ সালে ডা. টি গণপতি শাস্ত্রী একটি তালপাতার পুঁথিতে ভাসের ১৩ টি রূপক আবিষ্কার করেন। রূপকগুলো হলো: প্রতিমা, অভিষেক, পঞ্চঃরাত্র, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, মধ্যমব্যাযোগ, দূতবাক্য, বালচরিত, স্বপ্নবাসবদন্তম্, প্রতিজ্ঞাযোগক্ষরায়ণ, চারুদত্ত এবং অবিমারক। এগুলোর মধ্যে একাক্ষবিশিষ্ট রূপক হচ্ছে দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, মধ্যমব্যাযোগ এবং দূতবাক্য। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যাযোগ শ্রেণির রূপক *দূতবাক্য* এবং *মধ্যমব্যাযোগ* নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার এবং উরুভঙ্গ- এগুলো একাক্ষবিশিষ্ট রূপক হলেও তা ব্যাযোগ নয়। এই তিনটি রূপকে করুণ রস প্রধান, নারীদের ক্রন্দন বা বৈধব্য, নায়কের মৃত্যু বা পরাজয় দেখানো হয়েছে, তিনের কম সন্ধির ব্যবহার সহ প্রভৃতি বিষয়াদি রয়েছে যা কি না ব্যাযোগের বৈশিষ্ট্য নয়।

ব্যাযোগ :

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ ব্যাযোগের সংজ্ঞায় বলেছেন :

খ্যেতিবৃত্তো ব্যাযোগঃ স্বল্প-স্ত্রীজনসংযুতঃ।

হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ।।

একাক্ষশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।

কৈশিকীবৃন্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ।।

রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।

হাস্যশৃঙ্গার শান্তেভ ইতরেহত্রাঙ্গিনো রসাঃ।।^{১২}-(সা.দ. ২৩১-২৩৩)

অর্থাৎ ব্যাযোগে প্রসিদ্ধ পুরাণাদিবাণত ঘটনা থাকে; স্ত্রী চরিত্র অল্প থাকে; গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি থাকে না; বহু মানবের সমাবেশ থাকে; এতে অঙ্ক একটি; এখানে স্ত্রীলোকের জন্য ব্যতীত অন্য কারণে যুদ্ধ হবে; কৈশিকী বৃত্তি থাকবে; বিখ্যাত রাজর্ষি বা দিব্যপুরুষ বা ধীরোদ্ধত কোনো ব্যক্তি নায়ক হবেন। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্তি রস ব্যতীত অন্যান্য রস এর অঙ্গীরস হবে। নিম্নে ভাসপ্রণীত ব্যাযোগ শ্রেণির রূপকের নাট্যপ্রয়োগ-রীতি নির্ণয় করা হলো :

ব্যাযোগ শ্রেণির রূপক 'দূতবাক্য'-এ নাট্যপ্রয়োগ রীতি:

এই নাটকের পৃষ্ঠভূমি সভাভবনের নির্মাণ-যেখানে দুর্যোধন সভায় সেনাপতি পছন্দের বিষয়ে আলাপ করবেন। অতএব অতি সংক্ষেপে সূত্রধার রূপকের বীজ স্থাপন করেছেন। এই রূপকে পাঁচ অবস্থার যোগসূত্র রয়েছে। পঞ্চাবস্থা সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণ-এ বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন-

পঞ্চাবস্থা:

অবস্থাঃ পঞ্চ কার্যস্য প্রারন্ধস্য ফলার্থিভিঃ।

আরম্ভ-যত্ন-প্রত্যাশা-নিয়তাপ্তি-ফলাগমাঃ।।^{১৩}-(সা.দ. ৬/৭০)

-ফলাভিলাষী ব্যক্তির প্রারন্ধ কার্যের অবস্থা হচ্ছে পাঁচটি : আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম।

আরম্ভ:

ভবেদারম্ভ উৎসুকাং যনুখ্যফলসিদ্ধয়ে।-(সা.দ. ৬/৭১)

-মুখ্যফলসিদ্ধির জন্য যে উৎসুক্য, তা হলো আরম্ভ।

প্রযত্ন:

প্রযত্নস্ত ফলাবাঞ্ছৌ ব্যাপারোহতিত্বরাশ্বিতঃ।-(সা.দ.)

-ফলপ্রাপ্তির জন্য অতি ত্বরাস্থিত চেষ্টাকে প্রযত্ন বলে।

প্রত্যাশা/ প্রাপ্ত্যাশা:

উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তি-সম্ভবঃ।-(সা.দ. ৬/৭২)

-উপায় ও অপায় শঙ্কার মধ্যে যেখানে ফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে প্রত্যাশা বা প্রাপ্ত্যাশা হয়।

নিয়তাপ্তি:

অপায়াভবতঃ প্রাপ্তিনিয়তাপ্তিস্ত নিশ্চিতা।-(সা.দ.)

-অপায়ের অভাবহেতু নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তিকে নিয়তাপ্তি বলে।

ফলাগম/ফলযোগ:

সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।-(সা.দ. ৬/৭৩)

-যে অবস্থার সমগ্র ফলের উদয় হয়, তাকে ফলাগম/ফলযোগ বলে।

ভাস তাঁর এই রূপকে পঞ্চাবস্থা কিভাবে প্রয়োগ করেছেন তা দেখা যাক।

সূত্রধার চলে যাওয়ার পর কণ্ঠুকী আসে এবং দুর্যোধন দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সাথে সন্ধি প্রস্তাবের নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংকেত করে। মন্ত্রণা শব্দ দ্বারা দুর্যোধনের উৎসুকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব এখানে স্পষ্ট 'প্রারম্ভ' নামক অবস্থা।

এরপর সভায় সভাসদের যথাস্থানে বসার পর দুর্যোধনের সেনাপতি নির্বাচনের জন্য প্রশ্ন করেন-'উচ্যতাম-অস্তি মমৈকাদশাক্ষৌহিনীবলসমুদয়ঃ। অস্য কঃ সেনাপতির্ভবন্তৌমহান্ খল্বয়মর্থঃ।'^{১৪} প্রশ্নের উত্তরে শকুনি দ্বারা ভীষ্ম পিতামহের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করার কথা

শুনে তার অনুমোদন করেন এবং ভীষ্ম পিতামহের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে দুর্যোধনের কাজ ‘প্রযত্ন’ নামক অবস্থার অন্তর্গত।

বাসুদেব দূত রূপে দুর্যোধনের সভায় প্রবেশ করে তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে সভায় সভাসদ রাজাগণ দুর্যোধনের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়। বাসুদেব তাকে প্রশ্ন করেন-‘ভোঃ সুযোধন! কিমাস্তে।’^৪-বাসুদেবের এই প্রশ্নে দুর্যোধন আসন থেকে পড়ে যান এবং বলতে থাকেন- ‘অহো বহুমায়োহয়ং দূতঃ।’^৫ এই স্থলে ‘প্রাপ্ত্যাশা’ নামক অবস্থা।

বাসুদেব দুর্যোধনের সাথে ‘সাম’ এর মাধ্যমে নিজ বশে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন তিনি মানেন না তখন কটু শব্দ প্রয়োগ করেন। তর্ক বাড়তে থাকে। দুর্যোধন বাসুদেবের ইচ্ছা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। জানার পর বাসুদেবকে বাঁধতে চেষ্টা করেন- ‘ভবতু, অহমেব পাশৈর্বধামি।’^৬ দুর্যোধনের একথা শুনে সন্ধিবর্তা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সূচনা তৈরি হয়। অতএব এখানে ‘নিয়তান্তি’ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

বাসুদেব বিশ্বরূপ দেখানোর সময় ধৃতরাষ্ট্রের আর্তস্বর শুনতে পান এবং দাঁড়িয়ে থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবের পায়ের উপর গিয়ে দুর্যোধনের কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সন্ধিবর্তা পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয়ে যায়। বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ‘গচ্ছতু ভবান্ পুনর্দর্শনায়’^৭-এরূপ বলায় ভগ্ন মনোরথ পুনরায় ফিরে আসে। এখানে ‘ফলাগম’ নামক অবস্থা।

একাক্ষ হওয়ার কারণে রূপকের কথাও অল্প। অতএব এখানে পাঁচ অর্থপ্রকৃতির প্রয়োগ পাওয়া যায় না। এতে বীজ, বিন্দু এবং কার্য এই তিন অর্থপ্রকৃতির সমাবেশ ঘটেছে। বীজ, বিন্দু এবং কার্য সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণ-এ বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন-

বীজ:

অল্পমাত্রং সমুদ্ভিষ্টং বহুধা যদ্ বিসপতি।

ফলস্য প্রথমো হেতুবীজং তদভিধীয়তে।। -(সা.দ. ৬/৬৫)

-অল্পমাত্র প্রদর্শিত হলেও যা বহুভাবে বিস্তার লাভ করে এবং ফলসিদ্ধির যা আদি কারণ তাকে ‘বীজ’ বলে।

বিন্দু:

অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্। -(সা.দ. ৬/৬৬)

-অবান্তর কথার দ্বারা অর্থবিচ্ছেদ হলেও যা (প্রধান বস্তুর) অবিচ্ছেদেরও কারণ, তা বিন্দু।

কার্য:

অপেক্ষিতং তু যৎসাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।

সমাপনং তু যৎসিদ্ধে তৎকার্যমিতি সংমতম্।। -(সা.দ. ৬/৬৯)

-যে সাধ্যবস্তু অপেক্ষিত (অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রাসঙ্গিক নয়), যার উদ্দেশ্যে ব্যাপার-প্রবৃত্তি এবং যা সিদ্ধ করবার জন্য সামগ্রীর আয়োজন, তাকে কার্য বলা হয়।

আলোচ্য রূপকে সূত্রধারের রঙ্গমঞ্চ থেকে চলে যাওয়ার পর কণ্ঠকীর পদার্পণ হয় এবং তিনি বলেন-‘ভো ভোঃ প্রতিহার্যধিকৃতাঃ। মহারাজো দুর্যোধনঃ সমাজ্ঞাপয়তি-অদ্য সর্বপার্থিবৈঃ সহ মন্ত্রয়িতুমিচ্ছামি। তদাহুয়ন্তাং সর্বে রাজান ইতি।’^৮ এই স্থলে ‘বীজ’ নামক অর্থপ্রকৃতি।

দুর্যোধন বাসুদেবের কথা মানেন না এবং তাঁকে অপমান করতে গিয়ে সভা থেকে চলে যায়। বাসুদেব দুর্যোধনের এই চেষ্টায় অত্যন্ত রেগে যান এবং তাকে বধ করার জন্য সুদর্শনের স্মরণ করেন। এরপর সুদর্শন আসে এবং বাসুদেবকে স্মরণ করিয়ে পুনরায় তার ফিরে যাওয়া,

অন্য অস্ত্রের (যেমন - কৌমোদিকী, পাঞ্চজন্য, নন্দক প্রভৃতি) ঘটনাস্থলে আসা এবং সুদর্শনের দ্বারা তাদের ফিরে যাওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ কথোপকথন রূপকে কোনো প্রকার মহত্বপূর্ণ স্থান নেই। এভাবে অস্ত্রসমূহকে ফিরিয়ে দেবার পর রূপকে কোনোপ্রকার কম মনে হয় না। বরঞ্চ এসব কথোপকথন বিষয়বস্তুর গতিশীলতাকে অবরুদ্ধ করেছে। এসব কথোপকথন বিষয়বস্তুতে বিচ্ছিন্নতা এনেছে। বাসুদেব চিন্তা করেন ‘যাবদহমপি পাণ্ডবশিবিরমেব য্যাস্যামি।’^{৯৮} তবে এর সাথে সাথেই ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠে শোনা যায়, ‘ন খলু ন খলু গন্তব্যম্।’^{৯৯} আর এর মধ্য দিয়েই পুনরায় কাহিনিতে সংযোগ স্থাপন হয় এবং কথাবস্তুতে এক ধারা নির্মিত হয়। অতএব এখানে ‘বিন্দু’ নামক অর্থ প্রকৃতি।

বাসুদেব পাণ্ডবদের যে সন্ধিবার্তা নিয়ে দুর্যোধনের রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন, সেই সন্ধিবার্তার ভঙ্গ হওয়াই এই রূপকের ‘কার্য’ নামক অর্থপ্রকৃতি। যার সূচনা ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিতে হয়েছে :

মম পুত্রাপরাধাত তু শার্ঙ্গপাণে! তবানুনা।

এতন্মে ত্রিদশাধ্যক্ষ! পাদয়োঃ পতিতং শিরঃ।। ৫৫^{১০০}

অর্থাৎ হে শার্ঙ্গপাণি, দেবশ্রেষ্ঠ, আমার পুত্রের অপরাধে আমিই এখন আপনার চরণে আমার এই মাথা নত করেছি।

এভাবে এ রূপকে অবস্থা এবং অর্থপ্রকৃতির ব্যবহার হয়েছে।

সন্ধিসমূহের বিশ্লেষণ:

একাক্ষবিশিষ্ট রূপক দূতবাক্য। দুর্যোধন নিজ সহায়ক বীরদের একত্র করে অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি নির্বাচন করার অভিলাষী হন। আর একারণে দুর্যোধনের দ্বারা ভৃত্যবর্গকে মন্ত্রণাগৃহের নির্মাণের নির্দেশের মধ্য দিয়ে রূপকের আরম্ভ হয়। আর এখানেই মুখসন্ধির প্রারম্ভ রূপ বীজ বপনের সূত্রপাত। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে,

যত্র বীজসমুৎপত্তিনার্মার্থরসসম্ভবা।

প্রারম্ভেন সমায়ুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্।। - (সা.দ. ৬/৭৬)

-যেখানে ‘আরম্ভ’ নামক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা বৃত্তান্ত ও রসসম্ভাবনায়ুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়, তাকে ‘মুখসন্ধি’ বলা হয়।

মুখসন্ধি রূপকে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় কতগুলো অঙ্গসমূহ দ্বারা। যেমন: উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্বেদ, করণ এবং ভেদ।

কণ্ঠস্বরী দুর্যোধনের আজ্ঞা পেয়ে সন্দেশ দিতে গিয়ে বলেন, আজ রাজা নিজে সভায় সব বীরদের সাথে মন্ত্রণা করতে চান। অতএব মন্ত্রণা গৃহে গমন করার কথনে কাব্যার্থের সমুৎপত্তিজনিত বীজের ‘উপক্ষেপ’ অঙ্গ হয়েছে।

দুর্যোধন মন্ত্রণাগৃহের সভায় বীরদের বসার আদেশ দেন তখন উৎপন্ন কাব্যার্থের বাহুল্যবশত ‘পরিকর’ নামক অঙ্গ।

কণ্ঠস্বরের দ্বারা বাসুদেবের দূত রূপে আগমন সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের কথন বীজন্যাসের বাহুল্য রূপ ‘পরিকর’ এর সন্ধির বিধায়ক হওয়াতে এটা ‘পরিন্যাস’।

দুর্যোধন বাসুদেবের কৃষ্ণমতি তথা যুধিষ্ঠিরের বচন যে স্ত্রীলোকের সমান কোমল তা বলেন। যা বাসুদেবের দূত রূপে আগম রূপী বীজের ব্যবস্থাপন হওয়ায় ‘সমাধান’ নামক অঙ্গ হয়েছে।

বাসুদেব অহঙ্কারী দুর্যোধনের সমুখে দূত রূপে আসায় বীজের পুনরুৎপত্তি হয়েছে। ফলে এখানে মুখসন্ধির ‘উদ্বেদ’ নামক অঙ্গ হয়েছে।

নিজের কথানুযায়ী অনুরূপ কার্যের আরম্ভ প্রকটভাবে করেছেন। অতএব এটা ‘করণ’ নামক অঙ্গ।

দুর্যোধনের বাসুদেবের প্রতি উক্তিতে ‘ভো দূত! ন জানাতি ভবান্ রাজ্যব্যবহারম্। অর্থাৎ দেখ দূত! তুমি রাজ-রাজত্বের বিষয়ে কিছুই জানো না। মিলন ভঙ্গ অর্থাৎ কার্যে অনুৎসাহিত করার জন্য ‘ভেদ’ নামক অঙ্গ হয়েছে।

বাসুদেব তথা দুর্যোধনের বাক্যলাপে দুর্যোধনের উক্তি : ‘সর্বথা বধিত্ত্বয়া কংসঃ’ অর্থাৎ কংসকে সর্বদিক থেকে তুমি বধিত্ত্ব করেছ। এছাড়াও মায়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করায় বাস্তবিক লক্ষ্য অলক্ষিত হয়ে যায়। অতএব এখানে প্রতিমুখ সন্ধি। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে,

ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।

লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ ॥ - (সা.দ. ৬/৭৭)

-মুখসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট মুখ্য ফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত ও কিছুটা অলক্ষিত হয়ে যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাকে প্রতিমুখ সন্ধি বলে।

এ সন্ধির অঙ্গসমূহ হচ্ছে : বিলাস, পরিসর্প, বিধূত, তাপন, নর্ম, নর্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার। তন্মধ্যে পরিসর্প, নর্ম, প্রগমন, পুষ্প এবং বজ্র এই সন্ধ্যঙ্গসমূহের উপলব্ধ হয় এই রূপকে। যেমন: বাসুদেব এবং দুর্যোধনের আলাপনে দেশকালের স্থিতি বিষয়ক বার্তা পরিহাসে পরিণত হওয়ায় ‘নর্ম’ সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। বাসুদেব যে দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডবদের উপকার এবং শৌর্যের বর্ণনা করেন তা ‘প্রগমন’ নামক অঙ্গ। বাসুদেব দুর্যোধনের কাছে অর্ধেক রাজ্য দেওয়া সম্পর্কিত আলাপে যে বাক্য দ্বারা বীজের উদ্ঘাটন হয়েছে তাতে ‘পুষ্প’ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। বাসুদেব দুর্যোধনের জন্য কুরুকুল-কলঙ্ক, নির্লজ্জের প্রারম্ভিক আলাপ ‘বজ্র’ নামক অঙ্গ।

নাট্যকার ভাস বাসুদেব তথা দুর্যোধনের বার্তালাপের শেষের পর্যায়ে অর্থৎ দুর্যোধনের ‘অভ্যাস্তম্’ অর্থাৎ তুমি কথা বলার অযোগ্য, এমন কথার মধ্য দিয়ে উপসংহারে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে ‘নির্বহণ’ সন্ধি হয়েছে। আর সন্ধির অঙ্গসমূহ যেমন: সন্ধি, বিরোধ, গ্রন্থন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগৃহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্যসংহার এবং প্রশস্তি। এসবের মধ্যে সন্ধি, বিরোধ, গ্রন্থন, নির্ণয়, প্রসাদ, ভাষণ, এবং প্রশস্তি অঙ্গসমূহ এ রূপকে প্রাপ্ত হয়েছে।

বাসুদেব দুর্যোধনকে বলেন, ‘ত্বদর্থাৎ কুরুবংশোহয়মচিরান্নাশমেয্যতি’^{২২} অর্থাৎ তোমার কারণে কুরুবংশ অচিরেই ধ্বংস হবে। একথার মধ্য দিয়ে রূপকে পুনরায় দূতকার্য রূপ বীজের উদ্ভাবনা হওয়ায় ‘সন্ধি’ নামক সন্ধ্যঙ্গ হয়েছে। দুর্যোধন বাসুদেবকে ‘অহমেব পাশেব্ধামি’ অর্থাৎ আমিই তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলি। এমন বলায় দূতকার্যের পুনরায় খোঁজ করতে থাকে। অতএব এটা ‘বিরোধ’ নামক অঙ্গ। বাসুদেব পাণ্ডবদের কার্য নিজেই সম্পন্ন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই সন্দর্ভে নাট্যকার নিজে সমস্ত কার্যকে এক স্থানে সমাহৃত করে দিয়েছেন। অতএব এটা ‘গ্রহণ’ নামক অঙ্গ। বাসুদেব সময়মতো সুদর্শনকে নিয়ে যে বার্তালাপ তা ‘ভাষণ’ নামক অঙ্গ। বাসুদেব পৃষ্ঠের ভারকে দূর করার হেতু ‘সুদর্শনের আগমন’ ঘটান। পরিস্থিতি মোকাবেলায় অনুভূত বিষয় বলা বা বিচার করা হেতু ‘নির্ণয়’ নামক অঙ্গ হয়েছে। কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বধ করতে চাইলে সুদর্শন বলেন- ‘ভোঃ সুযোধনহতক! ...প্রসীদতু প্রসীদতু ভগবান্ নারায়ণঃ’ অর্থাৎ আঃ, বেচারা সুযোধন! ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হন। কৃষ্ণকে শান্ত করার এই চেষ্টায় ‘প্রসাদ’ নামক অঙ্গ হয়েছে। নির্বহণ সন্ধিতে ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবকে অর্ঘ্য দিয়ে প্রসন্ন করলে তিনি বলেন, ‘সর্বং

গুহামি। কিং তে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি’। অর্থাৎ সবই গ্রহণ করলাম। আর কোন প্রিয় বস্তু আপনাকে উপহার দিতে পারি। তাঁর এই বরদানের ইচ্ছা প্রকাশে ‘কাব্যসংহার’ অঙ্গ হয়েছে। সবশেষে নাট্যকার রাজসিংহ-কে একচ্ছত্র রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এমন অভিলাষ দ্বারা ভরতবাক্য ব্যবহার করেছেন। এখানে এমন স্বস্তিবাচক বার্তায় ‘প্রশস্তি’ নামক অঙ্গ হয়েছে। আলোচ্য রূপকে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষয়বস্তুনির্ভর। এ রূপকে গর্ভ ও বিমর্ষ সন্ধি নেই। পুরুষ চরিত্রের বাহুল্য রয়েছে। নারীচরিত্র নেই। বীররসের প্রাধান্য রয়েছে, স্থায়ীভাব উৎসাহ। বাসুদেব এবং দুর্যোধন- এ দুজনের মধ্যে কে নায়ক এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যেহেতু দুর্যোধন দ্বারা রূপকের সব ভেদে ফলপ্রাপ্তি হয়েছে সুতরাং রূপকটির নায়ক দুর্যোধন। এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বলা যায় এটি ব্যাযোগ্য শ্রেণির রূপক।

ব্যাযোগ্য শ্রেণির রূপক ‘মধ্যমব্যায়োগ্য’-এ নাট্যপ্রয়োগ রীতি:

রূপকের নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম স্থান প্রস্তাবনা। নান্দীপাঠের পরেই সূত্রধারের আগমনের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনা শুরু হয় যা কিনা রূপকের পৃষ্ঠভূমি হিসেবে বিবেচিত। প্রস্তাবনায় রূপকের বিষয়বস্তু, বীজ, পাত্রপাত্রীদের প্রস্তুত করা হয়। সূত্রধার এখানে জনসমক্ষে নিবেদনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত করেছেন। তবে বিভিন্ন রূপে ভিন্ন স্থানেও সূত্রপাত হয়ে থাকে। নিম্নে এ রূপকটির নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হলো:

অবস্থাসমূহ নির্ণয়:

সূত্রধার মঙ্গল শ্লোকের পাঠ করার পর যখনই কিছু বলতে যাবেন ঠিক তখনই কোলাহল শোনা যায়। ভদ্রমহোদয়দের এ কোলাহল সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে তিনি বলেন: ‘হস্ত দৃঢ়ং বিজ্ঞাতম্। এষ খলু পাণ্ডবমধ্যমস্যাঙ্ঘজো হিড়িম্বারণিসংভূতো রাক্ষসান্নিরকৃতবৈরং ব্রাহ্মণজনং বিত্রাসয়তি। ভোঃ কষ্টম্।’^{১২} অর্থাৎ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে। মধ্যমপাণ্ডবের সন্তান এই রাক্ষস। রাক্ষস তো নয়, যেন আগুন। হিড়িম্বা সেই আগুনের ইন্ধন। যারা কারো প্রতি শত্রুতা করে না। যারা কারো প্রতি শত্রুতা করে না সেই ব্রাহ্মণদের সে ভয় দেখাচ্ছে। আহা রে, কী কষ্ট! সূত্রধারের এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রূপকের পৃষ্ঠভূমি তৈরি হয়েছে। রূপকের স্থাপনাতেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এরপরই পাত্রগণের প্রবেশ ঘটে মঞ্চে। এখানে ঘটোৎকচের দ্বারা মঞ্চে প্রবেশের ঘটনা ঘটে।

আলোচ্য রূপকের মুখ্য কার্য অথবা ফল ভীম-হিড়িম্বার মিলন। একে সম্পন্ন করার জন্য হিড়িম্বাসূত ঘটোৎকচ অত্যধিক সহায়ক চরিত্র। যখন ব্রাহ্মণ এবং তার পরিবার ব্যক্তি ঘটোৎকচের ভয়ে ভীত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখন ঘটোৎকচ বলেন: ভো! কষ্টম্।

জানামি সর্বত্র সদা চ নাম দ্বিজোত্তমাঃ পূজ্যতমাঃ পৃথিব্যাম্।

অকার্যমেতচ্চ ময়াদ্য কার্যং মাতুর্নিয়োগাদপনীয় শঙ্কাম্।। ৯^{১৩}

অর্থাৎ আঃ কী যন্ত্রণা। আমি জানি পৃথিবীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁরা সর্বত্র এবং সর্বদা পূজনীয়। তবু মায়ের আদেশ পালনের জন্যে সব শঙ্কা ঝেড়ে ফেলে এই অকাজ আমাকে করতে হবে। এখানে এভাবেই ‘প্রারম্ভ’ নামক অবস্থার সূত্রপাত।

এরপর ঘটোৎকচ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে পুত্রের যাঞ্চণ করে তখন ভীম-হিড়িম্বা মিলনের ক্ষেত্রে এটা ‘প্রযত্ন’। ঘটোৎকচ বলেন: অস্তি মে তত্রভবতী জননী। তয়াহমাজ্ঞপ্তঃ। পুত্র! মমোপবাসনিসর্গার্থমস্মিন্মনপ্রদেশে কশ্চিনমানুষঃ প্রতিগৃহ্যানেতব্য ইতি। ততো ময়াসাদিতো ভবান্।

পত্ন্যা চারিত্রশালিন্যা দ্বিপুত্রো মোক্ষমিচ্ছসি।

বলাবলং পরিজ্ঞায় পুত্রমেকং বিসর্জয়।। ১২^{১৪}

অর্থাৎ আমার মা আছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, পুত্র! এই অরণ্যে আমার উপবাস ভাঙার জন্য একটি মানুষ ধরে নিয়ে এসো। তারপরই আমি তোমাদের পেয়েছি। সাধ্বী ভার্যা এবং দুইটি পুত্রকে নিয়ে নিজেকে যদি বাঁচাতে চাও তবে, গুণাগুণ বিচার করে একটি পুত্র সমর্পণ কর।

পরন্তু ঘটোৎকচ এই প্রার্থনা করলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ত্রুণ হয়ে ওঠে। এতে ঘটোৎকচ ধমক দিয়ে বলেন যদি পুত্র না দাও তবে তুমি সপরিবারে ধ্বংস হবে। তখন কোনোরূপ উপায় না পেয়ে বৃদ্ধ স্বয়ং মৃত্যুকে বরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। একথা শুনে ব্রাহ্মণী স্বামীর পরিবর্তে নিজেই মৃত্যুর জন্য রাজি হন। তবে ঘটোৎকচ এতে রাজি হন না। তখন সকলের আলোচনার পর স্থির হয় মধ্যম পুত্র যাবে। ঘটোৎকচও মায়ের জন্য এক মানুষ পাওয়া গেছে ভেবে খুশি হন। এ স্থলে রূপক ফলাফলের দিকে অগ্রসর হওয়ায় ‘নিয়তাণ্ডি’ অবস্থা হয়েছে।

এরপর মধ্যম পুত্র পানি পানির জন্য গেলে ঘটোৎকচ মধ্যম বলে ডাকতে থাকে। আর এই ডাক শুনে সেখানে উপস্থিত হন মধ্যম পাণ্ডব ভীম উপস্থিত হন এবং সব শুনে হিড়িম্বার নিকট যান এবং ভীম-হিড়িম্বার মিলন হয়। এই মিলন ‘ফলাগমত’ নামক অবস্থা।

আলোচ্য রূপকে এভাবে পাঁচ অবস্থার পরিবর্তে মোট চার অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। ‘প্রত্যাশা’ নামক অবস্থা এখানে নেই।

অর্থপ্রকৃতির ক্ষেত্রেও এ রূপকে চারটি অর্থপ্রকৃতি সমাবিষ্ট হয়েছে। একাঙ্কবিশিষ্ট রূপকে বিষয়বস্তুর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়। একারণে পতাকা ও প্রকরীর ব্যবহার সম্ভব নয়। তবে এই রূপকে পতাকার প্রয়োগ রয়েছে। নিম্নে আলোচ্য রূপকে বীজ, বিন্দু, পতাকা এবং কার্য-এই চার অর্থ-প্রকৃতির ব্যবহার নির্ণীত হলো:

অর্থপ্রকৃতি নির্ণয়:

ঘটোৎকচ-কে দেখে ব্রাহ্মণ পরিবার অত্যধিক ভীত হয়ে পড়ে এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটোৎকচ তাদের নিষেধ করে ব্রাহ্মণকে বলেন ‘ন গন্তব্যম’। এখানেই রূপকের বীজ উগ্ঠ হয়েছে।

মধ্যম পুত্র যখন ঘটোৎকচের সাথে যেতে প্রস্তুত তখন নিশ্চিত মৃত্যু জেনে শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য সে জল পান করতে যায়। সেখানে ঘটনাক্রমে মধ্যম পাণ্ডব ভীম এলে তিনি যখন হিড়িম্বার কাছে যেতে চান তা রূপকের নির্বহণতা। রূপককে ফলাফলের দিকে অপরূদ্ধতা কাটিয়ে গতিপথকে ধাবিত করে। এখানে ঘটোৎকচ এবং ভীম পরস্পর শক্তি সম্পর্কে জানা যায় যা রূপকের মূল উদ্দেশ্যকে বিচ্ছিন্ন করে। তবে তাঁদের বার্তালাপের মধ্যে ঘটোৎকচের উক্তি (যেমন: ‘অয়ে পাতিতঃ পাশঃ। কিমিদানীং করিষ্যে। ভবতু দৃষ্টম্। ভোঃ পুরুষ! পূর্বসময়ং স্মর’। অর্থাৎ আরে আরে! পাশ যে ছিন্ন হয়ে গেল। এখন কী করি! আচ্ছা দেখছি। ও মশাই, তোমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করো।) পুনরায় রূপকের সূত্রগাথা হয়। তাই এখানে ‘বিন্দু’ নামক অর্থ-প্রকৃতি।

ব্রাহ্মণ পরিবারের আলোচনা ‘পতাকা’ নামক অর্থপ্রকৃতি। পতাকা বস্তুর বিস্তৃত হয় এমনকী রূপকের শেষ অবধি চলতে পারে। পতাকার কার্য ফল সিদ্ধিতে সহায়ক। পতাকা সম্পর্কে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন,

ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভীধীয়তে। -(সা.দ.)

-শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং প্রাসঙ্গিক যে বৃত্তান্ত তাকে পতাকা বলে।

ঘটোৎকচের ‘মধ্যম আস’ একথা শুনে ভীম উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ পুত্রের স্থলে ভীম স্বয়ং যান। পতাকার এই পুত্রের আর কোনো কাজ না থাকলেও ভীম নামক ব্যক্তি দ্বারা ফলপ্রাপ্তি হয় এবং ব্রাহ্মণ পরিবার রক্ষা পায়।

হিড়িম্বা এবং ভীমের মিলন ‘কার্য’ নামক অর্থপ্রকৃতি।

সন্ধি-নিরূপণ:

একাক্ষবিশিষ্ট এই রূপকে মুখ এবং নির্বহণ—এই দুই সন্ধি রয়েছে। আলোচ্য রূপকের অধিকাংশই মুখসন্ধি আর শেষ ভাগের অল্প কিছু অংশ নির্বহণ সন্ধি। এসব সন্ধির কিছু অঙ্গসমূহ রয়েছে যা কিনা নানারূপে রূপকের ফলাফল প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। অঙ্গসমূহের ফলাফল ছয় প্রকারের হয়ে থাকে:

১. ঈঙ্গিত বিষয়ের রচনা
২. চমৎকারিত্ব সৃষ্টি
৩. নাটকীয় বস্তুর বিচার
৪. নাট্যবিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টি
৫. গোপনীয় বিষয়কে গোপন করা এবং
৬. প্রকাশ্য বিষয়কে প্রকাশ করা।

মুখসন্ধির অঙ্গসমূহ হচ্ছে: উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি, প্রাপ্তি, সমাধান, বিধান, পরিভাবনা, উদ্বেদ, করণ ও ভেদ। আবার নির্বহণ সন্ধির অঙ্গসমূহ হচ্ছে: সন্ধি, বিরোধ, গ্রন্থন, নির্ণয়, পরিভাষণ, কৃতি, প্রসাদ, আনন্দ, সময়, উপগূহন, ভাষণ, পূর্ববাক্য, কাব্যসংহার এবং প্রশস্তি। নিম্নে অঙ্গসমূহ সমেত সন্ধিসমূহ নির্ণীত হলো:

ভীতসন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারকে রুদ্ধ করে দুর্গমিত হৃদয়ে ঘটোৎকচ বলেন, ব্রাহ্মণ সর্বদা পৃথিবীতে পূজ্য হলেও কেবল মাতার আজ্ঞা পালনে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হলেও তাকে একজন মানুষ নিয়ে যেতে হবে। এখানে রূপকের ‘মুখসন্ধি’ শুরু হয়েছে। এই সন্ধির অঙ্গসমূহের সমাবেশ ঘটেছে উপযুক্তরূপে যা রূপকের গতি প্রদান করেছে।

ঘটোৎকচের বক্তব্যে রূপকের যে বীজ উণ্ড হয়েছে তাতেই প্রথম মুখাঙ্গ ‘উপেক্ষক’ প্রযুক্ত হয়েছে। ঘটনাক্রমে যখন ঘটোৎকচের কাছে বন্দি ব্রাহ্মণ মুক্তি পেতে চাইলে তিনি শর্ত দিয়ে বলেন: ‘আমার মা আছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, পুত্র! এই অরণ্যে আমার উপবাস ভাঙার জন্য একটি মানুষ ধরে নিয়ে এসো। তারপরই আমি তোমাদের পেয়েছি।’ এই বক্তব্যে ‘পরিকর’ মুখাঙ্গের যোজনা হয়েছে। এর পরের বক্তব্যে বীজের পরিপক্বতা দান করেছে অর্থাৎ ঘটোৎকচ যখন বলেন, ‘সাক্ষী ভার্যা এবং দুইটি পুত্রকে নিয়ে নিজেকে যদি বাঁচাতে চাও তবে, গুণাগুণ বিচার করে একটি পুত্র সমর্পণ কর।’

উপক্ষেপ-এ বীজের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং সেই বীজ পরিকর-এ পরিপক্বতা পেয়েছে এবং সেই বীজের ফল নির্বহণ সন্ধিতে যোগ্য করার জন্য কার্য করেছে ‘পরিন্যাস’ নামক মুখাঙ্গ।

ঘটোৎকচের এই প্রার্থনায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের খুব স্বাভাবিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তিনি বলেন: হং ভো রাক্ষসাপদ! কিমহমব্রাহ্মণঃ!

ব্রাহ্মণঃ শ্রুতবাস্তুদ্বঃ পুত্রং শীলগুণাস্থিতম্।

পুরুষাদস্য দত্তাহং কথং নিবৃতিমাণ্যাম্।। ১৩^{১৫}

অর্থাৎ বটেই হতভাগা রাক্ষস! আমি কি ইতর ব্রাহ্মণ? শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হয়ে সচ্চরিত্র গুণবান পুত্রকে নরখাদকের হাতে তুলে দিয়ে কেমন করে আমি শান্তি পাব?

তার এই কথার পর ঘটোৎকচের অস্তিত্বসংকট হয় এবং শক্তির বিষয়ে স্মরণ করিয়ে বলেন, ‘আমার প্রার্থিত একটি পুত্রকে যদি না দাও তবে অচিরেই সপরিবারে বিনষ্ট হবে’। এই স্থলে ‘ব্যবসায়-এর যোজনা হয়েছে’।

বৃদ্ধ বা তার স্ত্রী ঘটোৎকচের কাছে গৃহীত না হলে মধ্যম পুত্র রাজি হয় যাওয়ার জন্য। এত ঘটোৎকচ অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন, ‘অহে প্রীতিহস্মি। শীঘ্রমাগচ্ছ’। জলপানের ইচ্ছা পোষণ করলে শীঘ্র ফিরে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ঘটোৎকচ। এ স্থলে ‘বিলোভন’ নামক মুখাঙ্গ হয়েছে।

আবার যখন মাতার ভোজনের সময় অতিক্রম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্রাহ্মণ পুত্র আসছে না বলে ত্রুণ হয়ে বলছেন, ‘ভবতু দৃষ্টম্। ভো ব্রাহ্মণ। আহুয়াতাং তব পুত্রঃ’। এই বক্তব্যে বীজের আগমন হেতু ‘সমাধান’ নামক মুখাঙ্গ হয়েছে।

রূপকের পতাকা অংশে ভীম ঘটোৎকচের সমুখে এলে তিনিই হিড়িম্বার নিকট যেতে চান এবং বাকযুদ্ধও শুরু হয়। মুখের কথাতেই দুজন দুজনের শক্তি সম্পর্কে বলতে থাকেন। একপর্যায়ে ভীম বলেন-

ব্যপনয় বলদর্পং দুষ্টসারোহসি বীর!

ন হি মম পরিখেদো বিদ্যতে বাহুযুদ্ধে। ১৪৬^{১৬}

অর্থাৎ শক্তির দম্ব পরিহার করো। তোমার দম্ব বোঝা গেছে। মল্লযুদ্ধে আমার ক্লান্তি আসে না।

এখানে উদ্দেশ্যের স্থিরত্ব হেতু ‘যুক্তি’ নামক মুখাঙ্গ হয়েছে।

এই রূপকে অল্প সময়ের জন্য প্রতিমুখ সন্ধির স্থিতি রয়েছে। ব্রাহ্মণ পুত্র জলাশয়ে চলে যাওয়ার পর বীজ অলক্ষিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে পুনরায় অন্বেষণের উদ্দেশ্যে আহ্বানের প্রয়োজন পড়ে। এভাবেই প্রতিমুখ সন্ধি প্রযুক্ত হয়েছে। আর এখানে পরিসর্প, পুষ্প, প্রগমন এবং উপন্যাস অঙ্গ সমাবিষ্ট হয়েছে।

নিবর্হণ সন্ধিতে বিরোধ, গ্রন্থন, পরিভাষণ, প্রসাদ, কাব্যসংহার এবং প্রশস্তি অঙ্গ সমাবিষ্ট হয়েছে।

এই রূপকে তিন সন্ধি, একাক্ষ, বীর রস এবং সাত্ত্বী বৃত্তি পাওয়া যায়। একদিনের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। নায়ক হচ্ছে ভীম। ধীরোদ্ধত শ্রেণির নায়ক তিনি। দুজন নারী চরিত্র (হিড়িম্বা এবং ব্রাহ্মণী) ব্যতীত সবই (যেমন: ভীম, ঘটোৎকচ, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং তার তিন পুত্র) পুরুষ চরিত্র। হাস্য বা শৃঙ্গার রসের অভাব রয়েছে। নাটকের শুরুতেই ভয়ানক বাতাবরণ রয়েছে। ঘটোৎকচের রৌদ্র রূপ দেখে ব্রাহ্মণ সহ তার পরিবারের সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হন। ঘটোৎকচের কাছে মধ্যম পুত্র দিতে গেলে সেসময় করুণ রসের সৃষ্টি হয়। ভীম আসলে আবার অদ্ভুত রস সৃষ্টি হয়ে তা বীর রসের সূচিকা প্রস্তুত করে অর্থাৎ ভীম- ঘটোৎকচের বাকযুদ্ধের সময়কাল। শেষ দৃশ্যে হিড়িম্বার ব্যবহারে আশ্চর্য হতে হয়। এসব কিছু পর্যালোচনাপূর্বক রূপকটিকে বলা যায় একটি সফল ব্যাঙ্গোপাঙ্গ।

পরিশেষে বলা যায়, রূপকের ঘটনাসমূহ অলংকারশাস্ত্রের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক রীতি অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হয়ে থাকে। ‘দূতবাক্য’ ও ‘মধ্যমব্যাঙ্গোপাঙ্গ’ রূপক দুটি ‘সাহিত্যদর্পণ’ অনুসারে ব্যাঙ্গোপাঙ্গ শ্রেণির বৈশিষ্ট্যসমূহ সুবিন্যস্ত হয়েছে সফলভাবে।

তথ্যসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত সম্পাদিত, ১৩৭৬, সাহিত্যদর্পণঃ, গঙ্গাধর লেন, পৃ-৫১১

২। প্রাণ্ড, পৃ-৪০৪

৩। Edited by C. R. Devadhar, 1937, *Plays Ascribed To Bhāsa*, Poona, p-৪৪৩

৪। প্রাণ্ড, পৃ-৪৪৩

৫। প্রাণ্ড, পৃ-৪৪৩

৬। প্রাণ্ড, পৃ-৪৫১

৭। প্রাণ্ড, পৃ-৪৫৬

৮। প্রাণ্ড, পৃ-৪৪১

৯। প্রাণ্ড, পৃ-৪৫৫

১০। প্রাণ্ড, পৃ-৪৫৫

১১। প্রাণ্ড, পৃ-৪৫৬

১২। প্রাণ্ড, পৃ-৪২১

১৩। প্রাণ্ড, পৃ-৪২৩

১৪। প্রাণ্ড, পৃ-৪২৫

১৫। প্রাণ্ড, পৃ-৪২৫

১৬। প্রাণ্ড, পৃ-৪৩৫।

শক্তিপদ রাজগুরুর ‘মণিবেগম’ : উপন্যাসের আধারে ইতিহাসের নবনির্মাণ

শিল্পী বকসী

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

সারসংক্ষেপ: রাঢ় বাংলার কথাসাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘মণিবেগম’ (১৯৭৩ খ্রি.)। ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বাইরে এখানে এমন অনেক সত্য উঠে এসেছে—যা ইতিহাসের নবনির্মাণে সহায়ক। আসলে ঔপন্যাসিক শক্তিপদ রাজগুরু এখানে সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন— ইতিহাসের পাতায় যা খানিকটা উপেক্ষিত; অথচ ইতিহাস সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা অপরিসীম।

‘মণিবেগম’ উপন্যাসটি শক্তিপদ রাজগুরু মহাশয় বাংলার একটি অতীত গুরুত্বপূর্ণ সময়কালকে প্রেক্ষাপটে রেখে রচনা করেছেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালীন বাংলার শাসনব্যবস্থার দিকটি এখানে লেখকের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। ইতিহাসসত্য এখানে ঔপন্যাসিকের কল্পনার রসে জারিত হয়ে উপন্যাসটিকে পাঠকের সম্মুখে প্রাণবন্ত রূপে পরিবেশন করেছে।

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের কাছে বাংলার পরাজয়ের কারণ রূপে যে কেবল মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাকে দায়ী করা যায় না, তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাও যে এক্ষেত্রে সমানভাবে দায়ী—তা উক্ত উপন্যাসটি থেকে জানা যায়। আবার ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত মীরজাফর চরিত্রের বিশ্বাসঘাতক রূপটির আড়ালে যে এক প্রায়শ্চিত্তকামী মানুষের রূপ লুকিয়ে থাকতে পারে— তা ‘মণিবেগম’ উপন্যাস পাঠের আগে হয়তো মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। আবার মীরজাফরের এক অবৈধ স্ত্রী তথা তাঁর ‘মণি’ নামে এক বেগম একটি অখ্যাত চরিত্র হয়েও বাংলার সিংহাসন লাভের ইতিহাসে যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তা উক্ত চরিত্রটির নামাঙ্কিত আলোচ্য উপন্যাসটি পাঠ করার পর জানা যায়। বাংলার সিংহাসনে ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা স্বরূপ মহারাজ নন্দকুমার চরিত্রটি অতি নিখুঁতভাবে উক্ত উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে, যা অপর কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ইতিহাস গ্রন্থে বিরল। পাশাপাশি, ওয়ারেন হেস্টিংস চরিত্রের উত্থান-পতন, রাজকার্য পরিচালনায় দক্ষতা-ব্যর্থতা প্রভৃতি সকল তথ্যই ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটি পাঠক-সমাজকে প্রদান করে।

আলোচ্য ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটির প্রধান বিশেষত্বই হল—এখানে কাহিনির সূত্রে প্রতিটি ঐতিহাসিক চরিত্রের মানবিক দিকটিকে ঔপন্যাসিক সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। আপাত অচেনা- অজানা চরিত্রগুলোর সম্পর্কে সেখানে এমনভাবে বিবরণ দেওয়া হয়েছে—যা তাদেরকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে পাঠকের অত্যন্ত সন্নিগটে উপস্থিত করেছে। ইতিহাসের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে এক নিরপেক্ষ- স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমস্ত কিছু বিচার করে কাহিনির আধারে ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক এখানে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে এই সিদ্ধান্তবানী উঠে আসে যে-- আলোচ্য ‘মণিবেগম’ উপন্যাসে সত্যিই ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ তথা নবনির্মাণ ঘটেছে।

সূচক শব্দ: মীরজাফর, মীরকাশিম, লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস, সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর যুদ্ধ, মুর্শিদাবাদ, বিলাসিতা, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, নবাব, আত্মদহন।

মূল আলোচনা:

ধূলিধূসরিত বাংলার লাল মাটির সন্তান সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু। রাঢ় অঞ্চলের বুকে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। অন্যদিকে, তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় শহর কলকাতার বুকে। আর এই শহরেই তাঁর জীবনপরিধির সমাপ্তি ঘোষিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখালেখিতে রাঢ় বাংলার নানান স্মৃতি যেমন জীবন্ত রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে; তেমনি শহর কলকাতার চিত্রও সেখানে এক ভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বহু বিচিত্র ধরনের মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। বহু স্থান তিনি পরিভ্রমণও করেছিলেন। ফলে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার পরিধি ছিল সুবৃহৎ। অন্যদিকে, বহুবিধ সাহিত্য পাঠ তথা বহু বিচিত্র ধারার গ্রন্থ পাঠে তাঁর আগ্রহ থাকায় তাঁর পাঠ-পরিধিও ছিল যথেষ্টই সুবিস্তৃত। একদিকে বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতা, অন্যদিকে বৃহৎ পাঠপরিধি এবং এর সঙ্গে কল্পনাশক্তির প্রাবল্যের কারণে শক্তিপদ রাজগুরু বাংলা সাহিত্যে ‘মণিবেগম’ নামে একটি ব্যতিক্রমী ঐতিহাসিক উপন্যাস উপহার দিতে পেরেছিলেন। ইতিহাস বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে তিনি পাঠকের কাছে কিছু অজানা ইতিহাসকে সেখানে উপস্থাপিত করে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক চরিত্রদেরকে বিচার করতে চাইলেন এবং সত্যতা ও কল্পনার সংমিশ্রণে তিনি যেন তাঁর উপন্যাসটিতে ইতিহাসের এক নবনির্মাণ ঘটালেন।

‘মণিবেগম’ (১৯৭৩ খ্রি.) শক্তিপদ রাজগুরুর লেখা প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটি রচনার ইতিহাস বিষয়ে আমরা সমালোচক নিতাই নাগের ‘কথাসাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ রাজগুরু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি’ গ্রন্থে যে তথ্য পাই, তা হল— সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু কোনো একদিন কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের পুরাতন বইয়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, আর তখন একটি ইতিহাস বিষয়ক বই তাঁর নজরে আসে। এটি ছিল প্রিভি কাউন্সিলে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত একটি বই। লেখক নিতাই নাগের মতে— “ফুটপাতে কেনা এই পুরনো বইটি লেখকের মনে মণিবেগম উপন্যাস রচনার ইচ্ছা জাগায়।”^১ এই বইটি হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং বাংলার ইতিহাস বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া তথ্যাদির সঙ্গে সাহিত্যিকের কল্পনাদৃষ্টির সংমিশ্রণের ফসল হল তাঁর ‘মণিবেগম’ উপন্যাস।

উপন্যাসটি মূলত ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধোত্তরকালীন বিপর্যস্ত বাংলার পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। উক্ত উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ঔপন্যাসিক মণি নামে মীরজাফরের এক বেগম তথা তাঁর এক অবৈধ স্ত্রীকে দেখিয়েছেন। আমরা জানি, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজ শক্তি বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত প্রবল যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেরা বিজয়ী হয় এবং বাংলার সিংহাসন নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। এ তথ্য তো ইতিহাসই আমাদেরকে প্রদান করে। কিন্তু সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু এসব তথ্যের অতিরিক্ত বেশ কিছু তথ্য আমাদেরকে প্রদান করেন। আসলে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসসত্যের অতিরিক্ত সেখানে যোগ হয় উপন্যাসকারের কল্পনা। সমালোচক অশীন দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’ গ্রন্থটিতে মত প্রকাশ করেছেন যে— “ইতিহাসের তথ্য অতীতের অনন্ত তথ্য থেকে বেছে নিতে হয় এবং ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এই তথ্যের চরিত্র পালটায়।”^২ সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু পলাশীর যুদ্ধের পশ্চাৎপট

ও তার পরবর্তী শাসনব্যবস্থার চিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে ইতিহাসের স্বল্প তথ্যের সঙ্গে আপন কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পাঠককুলের কাছে একটি কাহিনি পরিবেশন করে এখানে যেন ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটিয়েছেন।

‘মণিবেগম’ উপন্যাসটিতে আমরা প্রথমে মণি নামে এক বাঁদিকে দেখি, যে অসাধারণ রূপবতী এবং নৃত্যপটীয়সী একটি মেয়ে। সেকেন্দার কাছে মরুভূমির বালুস্তরের মাঝখানে থাকা একটি ছোট্টো বসতি বালকুণ্ডায় অতি দারিদ্র্যময়তায় তার প্রথম জীবন কাটে। অথচ সে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী— সুখাভিলাষী একটি চরিত্র। তাই বিলাসিতার প্রলোভন দেখিয়ে তার মা তাকে জাহানাবাদের নবাবি দুনিয়ায় তওফাওয়ালী বিশ্ববেগের কাছে চড়া দরে বিক্রি করে দিয়ে চলে যায়। এখানে বিশ্ববেগের নৃত্যশিক্ষাকে লুকিয়ে আয়ত্ত করে মণি বিশ্ববেগের মেয়ে বুঝুকে পরাজিত করে নিজে সেরা তওফাওয়ালীর শিরোপা জিতে নেয়। এই গুণ ও রূপের জৌলুসকে চাবিকাঠি করে পরবর্তীকালে সে মীরজাফরের হারেমের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারে। ধীরে ধীরে সে নবাব মীরজাফরের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং একসময় মীরজাফরের সন্তানকে আপন গর্ভে ধারণ করে। বাংলার নবাব মীরজাফরের জীবনে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়াও যে এরূপ মণি নামক কোনো বাঁদির উপস্থিতি ঘটেছিল বা বাঁদি মণি মীরজাফরের জীবনে অবৈধভাবে প্রবেশ করে মণিবেগম রূপে মীরজাফরের জীবনসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল, এমনকি মীরজাফরের ঔরসজাত দুই সন্তানের জন্ম দিয়ে ও মীরজাফরকে পুতুল নবাবে পরিণত করে বাংলার সিংহাসন আপন করায়ত্ত করেছিল— তা শক্তিপদ রাজগুরুর উক্ত ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটি থেকে আমরা জানতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালীন সময়ের বাংলার শাসনব্যবস্থার যে চিত্র ইতিহাস থেকে আমরা নিখুঁতভাবে জানতে পারি না, সেই ঐতিহাসিক তথ্যকে কাঙ্ক্ষনিক কাহিনির মোড়ক দ্বারা আবৃত করে তাকে একটা শারীরিক অবয়ব দিয়ে ঔপন্যাসিক যেন এখানে ইতিহাসকে নতুন এক রূপ দিয়েছেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পলাশীর প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই এবং তাতে সিরাজের পতনের কারণ হিসেবে আমরা ইতিহাস থেকে যে তথ্য পাই, তাতে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়। কিন্তু এই সিরাজের পতনের পর সিংহাসনে বসা মীরজাফর যে প্রতিনিয়ত কতখানি আত্মদহনে জর্জরিত হতেন, তা আলোচ্য উপন্যাসটিতে সিরাজের ছবির নিচে দণ্ডায়মান মীরজাফরের হৃদয় বিদারিত ক্রন্দনধ্বনি এবং বিলাপে স্পষ্ট বোঝা যায়। অনুশোচনায় দগ্ধহৃদয় মীরজাফর প্রতিনিয়ত স্বকৃত অন্যায়কে স্মরণ করে যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইতেন। এহেন মীরজাফর চরিত্রকে হয়তো আমরা কখনই ইতিহাসে দেখতে পেতাম না। কিন্তু শক্তিপদ রাজগুরুর ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘মণিবেগম’-এর সুবাদে আমরা মীরজাফর চরিত্রের এই পৃষ্ঠদেশটিকে দেখবার সুযোগটুকু পেলাম।

আবার পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজকে অন্যায়ভাবে পরাজিত করার বিরুদ্ধে যে শ্লোগান চতুর্দিকে প্রচারিত হয়েছে—তা খানিকটা হলেও ভিন্ন রকমভাবে ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটি থেকে উঠে আসে। এখানে আমরা দেখি যে, তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনকে হারানোর পিছনে নিজেও অনেকাংশেই দায়ী ছিলেন। তাঁর চরম বিলাসিতাময় জীবনযাত্রা এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশকে অগ্রাহ্য করা তাঁর পতনকে সুনিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মহারাজ নন্দকুমারের নাম করা যেতে পারে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, নন্দকুমারের পিতা মুর্শিদাবাদে আমিনের কাজ

করতেন। আর পিতার কাজে সহযোগিতা করার জন্যই নন্দকুমার প্রথমে এ বিষয়ে কাজে নামেন। স্বাভাবিকভাবে, মুর্শিদাবাদি নবাবদের হেপাজত করাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য ছিল। সিরাজউদ্দৌলার শাসনকালে নন্দকুমার হুগলি জেলায় ফৌজদারির কাজে নিযুক্ত হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে তিনি যথাসাধ্য সহায়তা করতেন। এহেন নন্দকুমার বহু পূর্ব থেকেই ইংরেজশক্তির দ্বারা বাংলায় সিংহাসন দখলের অভিপ্রায়কে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই এর প্রতিরোধার্থে তিনি নিজেও অনেক প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বাংলার নবাব সিরাজকেও তিনি বারংবার সাবধান করতে চেয়েছিলেন। সিরাজের কাছে ইংরেজ শক্তির অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে তাঁকে বাংলার সিংহাসন রক্ষা করার বিষয়ে নন্দকুমার সতর্ক হতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু বিলাসিতায় মত্ত সিরাজ তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি। হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শকে অবহেলা করলে যে পতন সুনিশ্চিত – তা সকলেরই জানা। তাই সিরাজ চরিত্রের উক্ত দিকটিকে উন্মোচিত করে ঔপন্যাসিক যেন পাঠককুলকে একটা ভিন্নরকম ধারণা লাভে সহায়তা করলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের সম্পর্কে ইতিহাস পাঠককুলকে খুবই স্বল্প তথ্য প্রদান করে। সেখান থেকে জানা যায় যে, মীরজাফরের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে ইংরেজদের তথা লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের চক্রান্তে জড়িয়ে মহারাজ নন্দকুমারকে মিথ্যা অপরাধে ফাঁসানো হয় এবং অন্যায়ভাবে মিথ্যা বিচারে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয়। ইতিহাসের এটুকু তথ্যে মহারাজ নন্দকুমারকে ভালোভাবে চেনার অবকাশটুকু মেলেনা। অন্যদিকে, শক্তিপদ রাজগুরুর ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটি পাঠের ফলে মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের বহু অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হয়। সেখানে ব্যক্তি-মানুষ নন্দকুমারের সরল অন্তঃকরণ- অনাড়ম্বর জীবনশৈলীকে যেমন চেনা যায়; তেমনি অন্যদিকে এক সুদক্ষ প্রশাসক- প্রবল বুদ্ধিদীপ্ত - বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ব্যক্তি হিসেবেও তাঁকে আমরা দেখতে পাই। ইংরেজশক্তি যে বাংলার সব কিছু লুণ্ঠ করে নিয়ে চলে যেতে চায়, তা নন্দকুমার বহু আগে থেকেই বুঝতে পেরে গেছিলেন। তাই নিজেই ইংরেজের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পার্শ্ববর্তী রাজাদের সঙ্গে আপসের পথে নেমে তিনি তাঁর দলের পরিসর বৃদ্ধি করেছিলেন। ফরাসিদের চন্দননগর কুঠির সঙ্গে যোগাযোগ করা, কাশীর বলবন্ত সিং-এর সহায়তায় শাহি ফৌজের সঙ্গে সন্ধি করা— এ সমস্ত ক্রিয়াকলাপে তাঁর রাজনৈতিক কুশলতার পরিচয় মেলে। কিন্তু এককভাবে বাংলাকে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাজ্যরক্ষা বিষয়ে সিরাজের উদাসিনতা নন্দকুমারকে খুবই ব্যথাক্ত করেছিল। ফলে বাংলার সিংহাসন ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। যাই হোক, এহেন বিচক্ষণ-ন্যায়পরায়ণ নন্দকুমার চরিত্রটিকে আমরা ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটিতে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হতে দেখি। এছাড়াও এই প্রবল সাহসী চরিত্রের পাশাপাশি নন্দকুমারের দানধ্যানশীল- মায়া মমতাপূর্ণ চেহারার পরিচয়ও উক্ত উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক তাঁর রচনাকৌশল দ্বারা প্রস্ফুটিত করে তা তুলে ধরেছেন। সীতানাথের স্ত্রী মায়া চরিত্রের প্রসঙ্গটি এনে ঔপন্যাসিক নন্দকুমারের মমতাপূর্ণ মনের চিত্রকে অঙ্কিত করে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে, দাতা নন্দকুমারকে নিয়ে পল্লিকবিদের গান বাঁধার কথা জানিয়ে ঔপন্যাসিক সাধারণ জনগণের মনের মধ্যে নন্দকুমারের অবস্থান বিষয়ে এক প্রতিচ্ছবিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন। সেখানে ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন— “পল্লী অঞ্চলের রাখাল বাগালও তাঁর নাম জানে,...জনসাধারণের কাছে তিনি পূজ্য বরোণ্য।”^৩ জীবনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া একটি মহাজীবনরূপ এই নন্দকুমার চরিত্রটির নবনির্মাণ ঘটিয়ে ঔপন্যাসিক ব্যতিক্রমী সত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

এবার আসা যাক লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রসঙ্গে। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ইংরেজ চরিত্র। তার কূটনীতি, বাংলায় নিজের শাসন-কর্তৃত্ব স্থাপন, প্রভূত অন্যায্য কার্যে তার পারঙ্গমতা—এ সমস্ত বিষয়ে তথ্য আমরা ইতিহাস থেকে লাভ করে থাকি। কিন্তু কেমনভাবে ফন্দি এঁটে সে মীরজাফরকে আপন বশীভূত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করে নেয়, তারপর মীরজাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসায়, আবার এতেও আপন স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটলে পর মীরজাফরকে হঠিয়ে মীরকাশিমকে সিংহাসনে বসায়, পরে মীরজাফরের বেগম মণির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে মণি বেগমের সঙ্গে মিলিতভাবে রাজ্য পরিচালনা করে এবং দুজনে মিলে একের পর এক অন্যায্য কার্য করে বাংলার মৃত্যুদূত হয়ে ওঠে—এই সমস্ত তথ্যকে এক কাহিনি দ্বারা ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটিতে পরিবেশিত করে ঔপন্যাসিক শক্তিপদ রাজগুরু বিদেশি ইংরেজ প্রশাসক ওয়ারেন হেস্টিংস ও মীরজাফরের চরিত্রটিকে যেন খুবই চেনা এক চরিত্রে পরিণত করে দিলেন। পাশাপাশি, উপন্যাসের শেষাংশে মণিবেগম ও ওয়ারেন হেস্টিংসের চরম দুরবস্থার পরিচয় প্রসঙ্গে হেস্টিংসের আত্মদহন তথা আত্মগ্লানি- অনুশোচনার চিত্রটি দেখিয়ে ঔপন্যাসিক এখানে ওয়ারেন হেস্টিংস চরিত্রের আপন জীবনোপলব্ধির বিষয়ে এমন একটি দিককে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করলেন, যা সত্যিই কল্পনাতীত। অন্যায্যকারী যত বড়োই হন না কেন, পরিণতিতে যে তাঁকে আত্মদহনে দক্ষ হতেই হয়—‘মণিবেগম’ উপন্যাসে মণিবেগম ও হেস্টিংস চরিত্রের জীবনের অন্তিম পর্বে সেই বাণীই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

‘মণিবেগম’ উপন্যাসে মণিবেগম চরিত্রটিকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে তথা পাঠকের কাছে মণিবেগম চরিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিবেশিত করতে ঔপন্যাসিক উক্ত উপন্যাসে ওয়াজিদ আলি বীণকার নামে এক কাল্পনিক চরিত্রকে সৃজন করেছেন। মণিবেগমের জীবনে চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তার দ্বারা করা ভুলগুলোকে ধরিয়ে দিতে এবং তাকে উচিত-অনুচিত শিক্ষা দিতে বীণকার চরিত্রটি প্রতিনিয়ত মণির সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। আবার মণির মনের মধ্যে চলতে থাকা নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পাঠকের সামনে প্রস্তুত করবার জন্যও যেন ঔপন্যাসিক মণির জীবনে দর্পণের ন্যায় প্রতিনিয়ত বিদ্যমান বীণকার চরিত্রটিকে সৃজন করেছেন। এভাবে শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘মণিবেগম’-এ ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে আপন কল্পনার সংমিশ্রণে এমন এক কাহিনি নির্মিত করেছেন—এতে প্রতিটি ঐতিহাসিক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ চেহারা পাঠকের সামনে পরিস্ফুট হয়। এছাড়া ইতিহাসের জগতে অতি স্বল্প স্থানাধিকারী কিছু চরিত্রও যে বাংলার ইতিহাস গড়ে তুলতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল—তা উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে মণিবেগম চরিত্রটিকে বিশেষভাবে অঙ্কিত করে ঔপন্যাসিক তা স্পষ্টতই পাঠককে বুঝিয়ে দিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে বাংলার তথা মুর্শিদাবাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, তা বেশ কয়েকটি ধাপে ঔপন্যাসিক তাঁর ‘মণিবেগম’ উপন্যাসের গায়ে প্রতিস্থাপিত করেছেন। সেখানে প্রথমে মুর্শিদাবাদের চরম বিলাসিতাময় বাহারি রঙের জৌলুসে ভরা জীবনযাত্রাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তারপর এসেছে মীরকাশিমের আমলের জৌলুসহারা টিলেঢালা জীবনের এক চেহারার পরিচিতি। এরপর মীরকাশিমকে সিংহাসন থেকে হঠানোর পর যখন মণিবেগম ও হেস্টিংস সম্মিলিতভাবে রাজত্ব চালায়, তখন বাংলায় যে প্রচণ্ড পরিমাণ অরাজকতা চলতে থাকে, যেমন-রাস্তা ঘাটে চুরি ডাকাতি ছিন্তাই, রাজস্ব আদায়কারীদের অত্যাচার, বল প্রয়োগের দ্বারা পরস্পর হরণ, এমনকি বাংলার বৃকে ঘনিজে আসা মন্বন্তর—এ সমস্ত কিছু ঔপন্যাসিকের লেখনী

দ্বারা উপন্যাসগাত্রে চিত্রিত হয়েছে। এমনকি মুর্শিদাবাদের এই নবাবি আমলে কলকাতার বৃকে সদ্য গজিয়ে ওঠা বাবু সমাজের মধ্যে যে কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি- চরম ভোগবিলাস- যথেষ্টাচার চলতে থাকে, সেই চিত্রটিও ‘মণিবেগম’ উপন্যাসে নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ মিত্র, নন্দরাম সেন, নবু ধর প্রমুখ বাবুদের প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়— ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটিতে কাহিনির আকারে ইতিহাসের তথ্যকে সুচারু রূপে পরিবেশিত করে ঔপন্যাসিক সত্যিই যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ‘বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস’ গ্রন্থেও গ্রন্থকার মত প্রকাশ করেন যে, শক্তিপদ রাজগুরুর ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটি “ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ এবং উহার মধ্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনকথা কাহিনীর আকারে বিবৃত।”^৪ ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলি তো বটেই; তার পাশাপাশি আরও অনেক অপ্রধান অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে এবং তাদের কথাকে কাহিনির বাঁধনে বেঁধে ঔপন্যাসিক যেন তাঁর ‘মণিবেগম’ উপন্যাসটিতে ইতিহাসের নবনির্মাণ ঘটিয়ে পাঠক সমাজের কাছে একটি যুগের ইতিহাসকে নতুন রূপে উপহার দিলেন।

তথ্যসূত্র:

- ১) নাগ নিতাই। ‘কথাসাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ রাজগুরু : স্রষ্টা ও সৃষ্টি’; প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ (ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ)। সাহিত্যলোক প্রকাশনী, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬ (পৃষ্ঠা - ৪৯)।
- ২) দাশগুপ্ত অশ্বিন। ‘ইতিহাস ও সাহিত্য’। জানুয়ারি ১৯৮৯ খ্রি। কলিকাতা আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড (পৃষ্ঠা- ২৪)।
- ৩) রাজগুরু শক্তিপদ। ‘মণিবেগম’; চতুর্থ মুদ্রণ-আশ্বিন ১৩৯০ বঙ্গাব্দ। করুণা প্রকাশনী; কলকাতা- ৯ (পৃষ্ঠা- ২৯)।
- ৪) সেন অপর্ণাপ্রসাদ। ‘বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস’; প্রথম সংস্করণ- ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। ক্যালকাটা বুক হাউস; ১/১ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা- ১২। (পৃষ্ঠা - ১৯৭)।

বিদ্যাসাগরের রসবোধ

রুবেল পাল

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ

কামারপুকুর, হুগলী

সারসংক্ষেপ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে একজন মহা পণ্ডিত রূপেই বেশি পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি অধিক পরিচিত গদ্য সাহিত্যের জনক রূপে। আবার তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণকে স্মরণিকরণ করেছেন তার নিজ প্রতিভায়। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি দয়ার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। তবে তার জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং জীবনের শেষ পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্দশা জর্জরিত। এখন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এইসব ঘটনা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু জীবনের এত উত্থান পতনের মধ্যেও তিনি যে একজন আদ্যোপান্ত রসিক লোক ছিলেন তা আমরা অনেকেই হয়তো জানি না বা আলোচনাই করি না। বর্তমান এই প্রবন্ধে আমি বিদ্যাসাগরের এই রসিকতাময় জীবনের বিভিন্ন দিকগুলি সাহিত্যের আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ: সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ, ভগবতী দেবী, মধুসূদন দত্ত, কার সাহেব, রসময় দত্ত, বাদুর বাগান, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

মূল আলোচনা:

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল। এই সময় যেমন ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের বিরোধিতা করে গর্জে উঠেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাই রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালে যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তারই বিরোধিতা করে ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। এর কিছুদিনের মধ্যেই যখন রামমোহন বিদেশ যাত্রা করেন, তখন হিন্দু সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব এসে পড়ে ইয়ংবেঙ্গল তথা ডিরোজিয়ানদের হাতে। এরপর নবীন ইয়ংবেঙ্গল এবং প্রবীণ ধর্মসভাপন্থীদের সাথে বিরোধ চরমে ওঠে। অপরদিকে তখন যেহেতু সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই প্রাঙ্গণের বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত ছিল, সেহেতু ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সালে তার ছাত্র জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত বিদ্যাসাগর এই বিরোধকে অত্যন্ত সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং উপলব্ধিও করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সাক্ষী ছিলেন নূতন ও পুরাতনের মধ্যে নানান সংঘাতের তথা হিন্দু সমাজের বিবিধ বাদানবাদের। আর সামাজিক এই সংকটের মধ্যেই বিদ্যাসাগর নিশ্চিত করেছিলেন তার কর্মজীবনের গতিপ্রকৃতি। এরপর তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'বিদ্যার সাগর', 'দয়ার সাগর', 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র'- ইত্যাদি আরও কত কি। এর ফলে সামাজিক এত অবক্ষয়, এত দুর্গমতা ও কঠিনতার মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনের অঙ্গস্বরূপ দারিদ্রতা, বিদ্যানুরাগ, দয়া, নারীশিক্ষা, ধর্মীয় চিন্তা, দর্শনবোধ, - এইসব অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আলোচনা করতে করতে তুলে যাই তার জীবনের অতি সরল ও সাবলীল দিকগুলি। এই দিকগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, রসবোধ ইত্যাদি।

আমরা যদি বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাবো যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তার সমগ্র ইহজীবন তথা মৃত্যুর পরেও দৈবজীবন প্রত্যক্ষভাবে তথা পরোক্ষভাবে শুধুমাত্র মানুষের উপকারেই সমর্পিত ছিল। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন যে শুধু সুখময় ছিল তা কিন্তু একেবারেই নয়। তার জীবনে ছিল বহু কষ্ট, বহু যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, অপমান, তিরস্কার, যা তিনি যেমন তার নিজের অতি নিকট আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-পরিজনদের কাছ থেকে পেয়েছেন, তেমনি আবার যাদের উপকার করেছেন তাদের কাছ থেকেও প্রতি পদে পদে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পেয়েছেন। যে পিতার কষ্ট দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর নিজে উপার্জন করে পরিবারের অন্যান্য ভাইদের পড়াশুনা করিয়েছেন, তথা পরিবারের সংসার কাজেও সাহায্য করেছেন, সেই পিতাই আবার বিদ্যাসাগরকে এমন ভুল বুঝেছেন যে, বিদ্যাসাগরের উপর মানে অভিমানে গৃহত্যাগ করে চিরতরে কাশি চলে গেছেন। শোনা যায় বিদ্যাসাগরের সাথে তার পিতার আর কোনদিন দেখা হয়নি। আবার অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার পুত্র ঈশান চন্দ্রকে এবং নাতি নারায়ণ চন্দ্রকে কলিকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে বাধ্য দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চেয়েছিলেন তার পুত্র নারায়ণ চন্দ্র কলিকাতা এসে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। এই নিয়ে বিদ্যাসাগর এবং তার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটা চিঠিকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝি পর্যন্ত হয়। অথচ এই পুত্র নারায়ণ চন্দ্রও একটা সময় বিদ্যাসাগরের কাছে এতটাই বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেন যে বিদ্যাসাগর তার প্রিয় পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকে ত্যাজ্য পুত্র করতে বাধ্য হন। এছাড়া তো বিদ্যাসাগরের নানান প্রকার দৈহিক কষ্ট ছিলই। মেরী কাপেন্টারের সাহায্যে শিক্ষা প্রসার করতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনায় বিদ্যাসাগরের লিভার এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, পরিণামে তিনি লিভার ক্যান্সারে অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে মারা যান। শুধু তাই নয় সমাজ সংস্কারের যে প্রধান কাজটি করেছিলেন বিদ্যাসাগর তা হলো বিধবা বিবাহ প্রচলন। বিধবা বিবাহের সমর্থনে তিনি তার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সাথে বিবাহ দেন। নারী শিক্ষার জন্য নির্মাণ করেন বেথুন কলেজ। অথচ যারা প্রথমে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে সমর্থন করেন পরে তারাই আবার তার তীব্র বিরোধিতা করেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্যাসাগরের বেথুন কলেজকে ভারতীয় নারী জাতির দুর্দশার কারণ রূপে ব্যক্ত করেন। এইরকম নানা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর এতটাই ব্যথিত ও জর্জরিত হয়ে ওঠেন যে তিনি তার শেষ জীবনের প্রায় ১৭টা বছর ঝাড়খণ্ডের করমাটর অঞ্চলে আদিবাসীদের সাথে জীবন কাটান। আমরা সকলেই বিদ্যাসাগরের জীবনের এই প্রতিকূল ও অনুকূল জীবন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত আছি। তবে এত কষ্ট-যন্ত্রণা বহুল বিষময় জীবনের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর তার জীবন কাটালেও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির। আজ আমরা এই প্রবন্ধে তার রহস্যময় জীবনের কিছু বৈচিত্র্যময় ঘটনা বিশেষভাবে আলোচনা করব।

বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ারসাগর। শোনা যায় এক ব্যক্তি একবার বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চাইতে এসে বলেন, - মহাশয়! আমি অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে আছি। তখন বিদ্যাসাগর সরস নয়নে সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বেশ রসিকতার ছলে বলেন, - তা তোমার আকার দেখেই বুঝতে পারছি। বিদ্যাসাগরের এহেনো উক্তি শুনেই আমরা বুঝতে পারছি বিদ্যাসাগর কতটা রসিক প্রকৃতির ছিলেন অর্থাৎ তার রসবোধই বা কি উচ্চমানের ছিল।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময় নিজ নিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্য তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্তের কুনজরে পড়েন

এবং পরিনামে গভীর হতাশা ও মনঃকষ্ট নিয়ে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। এটা খুবই সত্যি কথা যে সে সময় বিদ্যাসাগরের মতো একজন দরিদ্র পণ্ডিতের পক্ষে মাসিক ৫০ টাকা বেতনের চাকরি ছাড়াটা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কাজই ছিল। কিন্তু এরকম এক কঠিন পরিস্থিতিতেও যখন রসময় দত্ত একজনের কাছে বিক্রপের ছলে বলেছিলেন, -"বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিলে খাবে কি?"^১, তখন বিদ্যাসাগর সেই বিক্রপের উত্তরে আর তীব্র রসিকতার ছলে বলেছিলেন, -"দত্ত মশায়কে বোলা যে বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"^২ এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের জীবনের এইরকমই বিভিন্ন রহস্যময় দিকগুলি তার সমগ্র জীবন পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কথায় আছে, 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেই পরিচয়।' চুল আসল কথা তেঁতুল গাছে কখনো আম হয় না। বিদ্যাসাগর ও এমনই বৃক্ষের ফল অর্থাৎ যথা মাতা তথা পুত্র। তার মায়ের কাছ থেকে তিনি অনেক গুণই পেয়েছেন। এই গুণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো রসিকতা। বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীও ছিলেন অত্যন্ত রসিক স্বভাবের। এখানেই প্রসঙ্গে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করব। একবার হ্যারিসন সাহেব এক ইংরেজ বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার কাছে কত টাকা আছে। তখন মা দেশ রসিকতার ছলে উত্তর দিয়েছিলেন আমার কাছে অনেক টাকা আছে। তারপর ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগর সহ তাঁর চার ছেলেকে দেখিয়ে সগৌরবে বলেছিলেন, এই যে আমার চার ঘড়া ধন। বিনয় ঘোষ তার 'যুবপুরুষ বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখছেন, -"সলজ্জ কণ্ঠে ভগবতী দেবী মিষ্টি করে বলেন, 'আমার অনেক টাকা, চারঘড়া টাকা আছে' পাশে ছিলেন বিদ্যাসাগর ও তার তিনটি ছোট ভাই। তাদের দিকে দেখিয়ে ভগবতী দেবী বলেন, 'এই যে আমার চারঘড়া ধন। ছেলেদের সম্বন্ধে ভগবতী দেবী খুব গর্ববোধ করতেন। হ্যারিসন সাহেব তার উত্তর শুনে অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।'"^৩

বিদ্যাসাগর একবার গ্রাম থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। সেই সময় মদন মন্ডল নামে গ্রামের এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের সাথে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মদন মন্ডলের এ কথা শুনে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ চন্দ্র অত্যন্ত অবাক হয়ে বলেন, 'আপনি কি বাবার সাথে পায়ে হেঁটে পারবেন।' পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের এ কথা শুনে মদন মন্ডল উত্তর দেন, 'হ্যাঁ পারব।' তারপর বিদ্যাসাগর এবং গ্রামের সেই ভদ্রলোক মদন মন্ডল দুজনে পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পর মদন মন্ডল অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েন। মদন মন্ডলের হাতে ছিল একটা মস্ত লাঠি। তারপর এই ভদ্রলোক লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাঠিতে ভর করে আরো বেশ খানিকটা পথ চললেন। এরপর মদন মন্ডল বিদ্যাসাগরকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন কোন একটা চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর মদন মন্ডলের কোন কথাই ভ্রক্ষেপ করলেন না, বরং তিনি ভিতরে ভিতরে মৃদু হাসতে হাসতে আরো এগিয়ে যান। এইভাবে কিছুক্ষণ পর মদন মন্ডল নামে সেই ব্যক্তি যখন শারীরিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে সামনের একটা চটিতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে পড়েন, তখন বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে সেই ব্যক্তিকে বিদায় দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। আসলে বিদ্যাসাগর প্রথমই সেই ব্যক্তিকে না বলে দিতে পারতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত রসিক স্বভাবের। তাই তিনি এই ধরনের পথ চলতে চলতে মজা দেখার জন্য মদন মন্ডলকে সঙ্গে নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। এবং তারপর যখন তার রসবোধ একেবারে তৃপ্ত হয়, তখন তিনি হাসতে হাসতে মদন মন্ডল নামে গ্রামের সেই ব্যক্তিকে একটি চটিতে

বিদায় দিয়ে নিজে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে জীবনীকার বিনয় ঘোষ তাই পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের মুখে সুন্দর বর্ণনা করেছেন,- "মদন নিরুপায় হয়ে বাবাকে বলল, 'শোন, একটা কথা বলি, পাতায় গিয়ে কাজ দরকার নেই আজ আর কলকাতায় গিয়ে দরকার নেই। কাছে একটা চটি (সরাইখানা) আছে, সেখানে থাকা যাক। 'বাবা হেসে বললেন, 'বলেছিলে যে পারবে? তুমি তাহলে চটিতে থাকথাক, আমি যাই। আমাকে যেতেই হবে। 'মদন সেখানে চটিতে রইল, বাবা একলা কলকাতায় চলে এলেন।"^৪

বিদ্যাসাগর বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির ছিলেন। এইরকমই একটি চমৎকার রসিকতার ঘটনা ঘটেছিল, যখন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়ত। তৎকালীন কলেজের কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়। অধ্যাপক গোপাল মহাশয় একদিন ক্লাসে সকলে ছাত্রদের 'গোপলায় নমোস্তু মে' এই লাইনটি কে চতুর্থ চরণ করে শ্লোক লিখতে বলেছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি সংস্কৃত শ্লোক আসলে চারটি চরণযুক্ত হয়। আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর ছন্দমঞ্জরীতে বলেছেন, - 'পদ্যং চতুষ্পদী।'^৫ কিশোর ঈশ্বরচন্দ্র এতটাই রসিক ছিলেন যে সে অধ্যাপক গোপাল মহাশয়ের উক্ত আদেশ শুনে বললেন, - মহাশয় কোন গোপালকে নিয়ে বর্ণনা করব? আমাদের সম্মুখে যে গোপাল আছে সেই গোপাল, নাকি বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন সেই গোপাল। বিদ্যাসাগরের এহেল রসিকতা শুনে সেই ক্লাসের সবাই যেমন বেসে ছিলেন, তেমনি জয় গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ও বললেন, - বেশ বেশ! তাহলে বৃন্দাবনের গোপালের বিষয়েই বর্ণনা করো।^৬

ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগরের জীবনের আরেকটি রসিকতার ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যাসাগর একবার তার বেশ কয়েকজন সহপাঠীদের নিয়ে সভা বা গোষ্ঠী করেছিলেন। এই সভার নাম ছিল 'ভোজনসভা'। ভোজন সভার কাজ ছিল জনে জনে মানুষের বাড়িতে ভোজনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা। সেরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল একবার এক বন্ধুর বাড়িতে ভোজন করার পর। ভোজন সভার ভোজনের শেষে এক বন্ধু প্রচণ্ড পেটের অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন সবাই মিলে ঠিক করা হয় সেই বন্ধুকে এই ভজন সভা থেকে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই বন্ধু যখন পেটের অসুখ ঠিক হওয়ার পর আবার সেই ভোজন সভায় সভ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হলো, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা নীরবতা ভেঙে সকল সদস্যদের উত্তর দিলেন, না না। একে কোনমতেই ভোজন সভা থেকে বাদ দেওয়া চলবে না। সবাই কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছাত্র বিদ্যাসাগর বেশ রসিকতার ছলে বলে উঠলেন, যে ভোজন সভার জন্য এইভাবে জীবন দিতে পারে তাকে তো আজীবন সদস্যপদ দেওয়া উচিত। বিদ্যাসাগরের এই হেনো রসবত শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন এবং সম্মতি দিলেন।

এখানে মদ খাওয়ার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বিশেষ মজার ঘটনা আছে। এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারবো বিদ্যাসাগর রসিকতার ছলে মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপত্যকা দিতেন। একবার এক ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের কাছে এসে বললেন, - মহাশয়! শুনেছি আপনি মদ খাওয়ার জন্য টাকা দেন। বিদ্যাসাগর সেই ব্যক্তিকে বললেন, - হ্যাঁ। তুমি ঠিকই শুনেছ। সেই ব্যক্তি আরও উৎসাহের সাথে বললেন, আপনি নাকি মধুসূদনকে বিদেশে টাকা পাঠান। বিদ্যাসাগর বললেন হ্যাঁ পাঠাইতো। সে ব্যক্তি বললেন আপনি কি জানেন না মধুসূদন ওই টাকা দিয়ে মদ খায়। বিদ্যাসাগর আবারও বললেন হ্যাঁ জানিতো। এবার সেই ব্যক্তি আরও অধিক উৎসাহে বললেন আপনি তাহলে মদ খাওয়ার জন্য আমাকেও টাকা দেবেন। বিদ্যাসাগর আবারও বললেন হ্যাঁ দেবো। সেই ব্যক্তি এবার বিলম্ব না করে বলে ফেললেন, - তাহলে

আমাকে টাকা দিন। আমিও মদ খাব। বিদ্যাসাগর এবার বেশ দৃঢ়তার সাথে বললেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেবো। আগে তুমি একটা 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনা করো। এবার সেই ব্যক্তি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগরের সামনে থেকে দৌড়ে পালেন। এই ভাবেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বোনের নানান ক্ষেত্রে রসিকতার ছলে মানুষকে অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষা দিতেন।^৭

একবার মেদিনীপুর থেকে বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাদুরবাগানের বাড়িতে চারজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর তার বাড়ির বাগানে মালির কাজ করছিলেন। একজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে মালি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, -বিদ্যাসাগর মহাশয় কি বাড়িতে আছেন। বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন হ্যাঁ! আছেন, আপনারা ভিতরে গিয়ে বসুন। কিছুক্ষণ পর বিদ্যাসাগর ভিতরে গিয়ে মালির পোশাক পরিবর্তন করে সেই চারজন ভদ্রলোকের সামনে আবার এসে উপস্থিত হলেন। তখন একজন ভদ্রলোক বললেন আপনি তো বেশ লোক, আমাদেরকে বসিয়ে এখনো পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে ডাকলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথায়। তখন সে মালি রসিকতার ছলে উত্তর দেয়, আজ্ঞে বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনাদের সামনে এখন উপস্থিত। এই চারজন ভদ্রলোক কিছু বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় আমাদের সামনে তিনি। তখন সেই মালি বলেন, আমি আসলে পন্ডিত শরৎচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের এহেন রসিকতা শুনে সেই চারজন ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন। এই রসিকতাময় ঘটনার সুন্দর বিবরণ দেন জীবনীকার বিনয় ঘোষ তার গ্রন্থে, - "বিদ্যাসাগর- আজ্ঞে হ্যাঁ, খবর দিয়েছি, তিনি এসেছেন।

ভদ্রলোকরা-' এসেছেন? কোথায় এসেছেন? আবার রসিকতা হচ্ছে?

বিদ্যাসাগর- আজ্ঞে না, ভদ্রলোকদের সঙ্গে রসিকতা করতে পারি? তিনি সত্যিই এসেছেন। আজ্ঞে আমারই নাম পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"^৮

তখন হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজ একই সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছু প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য পার্শ্ববর্তী হিন্দু কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জেনারেল কার সাহেবের কাছে যেতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর এই ইংরেজ ভদ্রলোকের কক্ষে প্রবেশ করা সত্ত্বেও কার সাহেব তার জুতাশুদ্ধ চরণ জুগল তুলে লৌকিক শিষ্টাচারকে উল্লঙ্ঘন করে অশালীনভাবে নিজের চেয়ারেই বসে ছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের কাজ সেরে মুখ বুজে আপন কর্মস্থানে ফিরে যান। তারপর বেশ কয়েকদিন পরে সেইকার সাহেবকে হিন্দু কলেজের একটি বিশেষ কাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় এর কাছে আসতে হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই দেখেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তার চটি জোড়া পায়ে নিয়েই টেবিলের উপর পা তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরের এহেন রসিক অথচ যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেখে কার সাহেব বুঝতে পারেন বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কি ধরনের ছিল।^৯

এরকম আরো কয়েকটি রসিকতার ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যখন কলকাতার বাদুরবাগানের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে দেখে সহসা বলে উঠলেন এতদিন তিনি খাল বিল ডোবা নদী দেখেছেন, এখন তিনি যেন সাগর দেখছেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর ছিলেন জ্ঞানের সাগর, দয়ার সাগর। বিদ্যাসাগর তখন নিজের প্রশংসা শুনে খুব হালকা করার জন্য বেশ রসিকতার ছলে শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সাগরে যখন এসেছেন একটু নোনা জলও নিয়ে যান। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই ঘটনাটির খুব সুন্দর উল্লেখ

করেছেন, - "রামকৃষ্ণ- আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন আল-বিল হুদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) - তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ- না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য) তুমি ক্ষীর সমুদ্র! (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর- তা বলতে পারেন বটে। (বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রইলেন)"^{১০}

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরের অগাধ পাণ্ডিত্য ও দয়ার প্রশংসা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে সিদ্ধ পুরুষ রূপে অভিহিত করেন এবং উপমা হিসাবে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের কোমলতাকে বোঝাতে গিয়ে আলু পটল সিদ্ধের সাথে তুলনা করেন, তখন বিদ্যাসাগর অত্যন্ত রসিকতার ছলে উত্তর দেন কলাইবাটা সিদ্ধ তো কোমল অর্থাৎ নরম নয়, তা শক্তই হয়। এখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাটির উল্লেখ করা হচ্ছে,- "শ্রীরামকৃষ্ণ- তোমার কর্ম সসাত্ত্বিক কর্ম।.... কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিকাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর- মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)- আলু পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) - কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)"^{১১}।

তথ্যসূত্র:

১. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ৪৯
২. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ৪৯
৩. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ১১৩
৪. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ১১৯
৫. আচার্য গঙ্গাধর্যের 'ছন্দোমঞ্জরী'
৬. <https://www.facebook.com/share/1ZHna4ueCb/>
৭. <https://www.facebook.com/share/1ZHna4ueCb/>
৮. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর বিনয় ঘোষ ,পৃষ্ঠা- ১২০-১২১।
৯. বিদ্যাসাগর চরিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা ৪৭।
১১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-০৩, প্রথম সংস্করণ-১৯৮৬-৮৭, মুদ্রিত।
২. পাণ্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (প্রথম ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।
৩. পাণ্ডে, গোপালদত্ত, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত- কৌমুদী (তৃতীয় ভাগ), চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারানসী, পুনর্মুদ্রণ-২০১২।
৪. মুখোপাধ্যায়, সচ্চিদানন্দ, সিদ্ধান্তকৌমুদী (সমাস প্রকরণ),সাহিত্য নিকেতন, কলকাতা- ৭, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৯-২০১০।
৫. M. M. JHA, অষ্টাধ্যায়ী সূত্রানুক্রমণিকা, Google plystore Applicatuon.

১৯৬ | এবং প্রান্তিক

৬. দে, পূর্ণচন্দ্র, ব্যাকরণ-কৌমুদী (প্রথম ভাগ), The sansket press Dipository, calcutta-30.
৭. হালদার, গুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা -০৬।
৮. সামন্ত, অমিও কুমার, বিদ্যাসাগর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪।
৯. ইসলাম, নূরুল, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের রূপরেখা, শ্রীধর প্রকাশনী, ২০১৮।
১০. বন্দোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, রায়, বণিক, বিদ্যাসাগর, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিকেশন, ১৯৯০।
১১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, বিদ্যাসাগর: সংগঠন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৭।
১২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী প্রগতি, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন লিমিটেড, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।
১৩. শ্রীমঙ্গলগদগীতা (শ্লোকসার্থসহ) গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পুনর্মুদ্রণ - 2016।
১৪. ব্যাকরণ মহাভাষ্য (পপ্পসাহিত্যিক) দন্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, সম্পাদিত, কলকাতা।
১৫. উপনিষদ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, 2003।
১৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড), মাইতি বুক হাউস, কলকাতা।
১৭. ঘোষ, বিনয়। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর। পাঠভবন বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা-১২।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা : বর্তমান উপযোগিতা

শংকরদেব মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শরৎ সেন্টিনারী কলেজ

সারসংক্ষেপ: নিজেদের অবস্থান জানার জন্য পথ চলার নিশানা পিছন ফিরে দেখে নেওয়ায় পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে; একথা স্বীকার করে নিয়েও ঠিক পথে চলার উদ্দেশ্যেই অতীত নিয়ে চর্চার প্রয়োজনীয়তা আছে, আগামী দিনেও থাকবে বলে মনে হয়। বাংলা সাহিত্য-মহাকাশের চিরভাস্বর নক্ষত্র, তথা প্রধান ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবিধ চর্চা এতদিন ধরে চলে আসছে। বহু মননশীল পণ্ডিত-ব্যক্তিত্ব তাঁর সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্বগ মহৎ সাহিত্যবোদ্ধাগণের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে একান্ত নিজস্ব ভাবনায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক মননচর্চার আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যসেবার উদ্দেশ্য ('পরোপকার') সম্পর্কে জানি। আমাদের আলোচনার বিষয় হল বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাভাবনার উপযোগিতা অনুসন্ধান। সমকালচেতনা-প্রসূত এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন নির্ণায়ক ভাবনার উদ্বোধন জাতীয়জীবন গঠনে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ অবদান। একই রকম সমস্যা যদি দীর্ঘকাল সমাজ-দেহে বিদ্যমান থাকে তাহলে তার নিরসন পথের সন্ধান বহাল থাকতেই পারে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ মহান স্রষ্টার ভাবনা কীভাবে কালগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে বর্তমান কালেও প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরতে পারে, তার সন্ধানই হল আমাদের ভাবনার পরিসর।

সূচক শব্দ: নিশানা, অতীত নিয়ে চর্চা, মননচর্চা, উদ্দেশ্য, উপযোগিতা, প্রশ্নচিহ্ন।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড় জাতীয় অবদান। সেকালের শিক্ষিত জনমনে দেশাত্মবোধ জাগানোর জন্য তাঁকে বহু যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। একক প্রচেষ্টায় তিনি বাংলা সাহিত্যকে সব বিষয়ে প্রয়োজন সাধনক্ষম করে তুলেছিলেন।

‘আধুনিক সাহিত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থের ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, -

“যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য-দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।”^১

এই মন্তব্য যথার্থ। আর এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্যতম উত্তরসূরি। বঙ্কিমচন্দ্র সমকালের সকল শিক্ষিত বাঙালিকে বাংলা ভাষায় লিখে, বক্তব্য বলে সাধারণ অশিক্ষিত স্বজাতির মনের কাছে পৌঁছাতে আহ্বান করেছিলেন। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশ ও লেখকগোষ্ঠী তৈরি শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মনোভাব আদান-প্রদানের সেতুপথ হয়ে উঠেছিল (যদিও আজকের দৃষ্টিতে তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক এবং খুবই সীমাবদ্ধ পরিসরে)। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রীতি-ব্যঙ্গ-শংকায় বারংবার বাঙালি জাতির আত্মজাগরণের প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। উদ্দেশ্য একই, পথ একই, প্রতিবন্ধকতা (বিরূপ সমালোচনা) একই

রকমের; কিন্তু তাঁরা স্বজাতির মঙ্গলচিন্তা থেকে বিরত হননি। তবে ক্রমশ বাঙালির জাতীয় চেতনার সরণবিন্দুর পরিবর্তন ও বিস্তার হয়েছে। সেই চেতনার পরিবর্তন বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য আমরা নির্বাচন করেছি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘লোকশিক্ষা’ প্রবন্ধটি (অন্যান্য অনেকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে)। প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবল যুক্তিবাদী লেখক। যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ পরম্পরায় তাঁর প্রবন্ধ-শরীর গঠিত। যুক্তি ও উদাহরণ সন্নিবেশে তাঁর বিখ্যাত জ্ঞানের পরিধি উপলব্ধি করা যায়।

আমরা প্রথমে ‘লোকশিক্ষা’ প্রবন্ধ প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে চাই। কারণ, একমাত্র এই প্রবন্ধেই, গঠনমূলক পরিকল্পনা মাফিক না হলেও, মূলত দেশীয় সাধারণ মানুষের শিক্ষা বিষয়ক বঙ্কিম চিন্তাভাবনা বেশী মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশ বিষয়ক যেকোনো প্রবন্ধেই তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির সমাজ-মানসিকতার কল্যাণে আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, আধুনিক শিক্ষার সুফল সাধারণ মানুষের মধ্যে কীভাবে বিতরণ করা যায়, ‘লোকশিক্ষা’ প্রবন্ধে তার উপায় নির্দেশও করে দিয়েছেন। বাঙালি চরিত্রের ঐতিহ্যবিরুদ্ধতা, পরানুকরণ প্রবণতা ও হীনমন্যতা অর্থাৎ সমকালীন বাংলাদেশের এমন বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিষয় অবলম্বন করে তিনি ব্যঙ্গ-কৌতুকে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উদ্দেশ্য, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের শ্রদ্ধাবোধের উদ্বোধন। বিশিষ্ট সমালোচক মন্তব্য করেছেন,-

“বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সর্ববিধ প্রবন্ধই বিশেষভাবে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।”^২

এ মন্তব্য যথার্থ। যেহেতু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সেহেতু প্রচারধর্মীও। বঙ্কিম প্রবন্ধের এই প্রচারধর্মিতা বিশেষ মঙ্গলবোধ থেকেই উদ্ভোধিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র একারম্ভে তৎকালীন সমগ্র বাঙালির সাংস্কৃতিক, বৃত্তিগত এবং মূল্যবোধের শিক্ষা বিষয়ক ভাবনাচিন্তা তাঁর ‘লোকশিক্ষা’ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, -

“চিন্তাবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্যে দক্ষতা, কর্তব্য কার্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা।”^৩

সংখ্যাতত্ত্বগত দিক থেকে বাংলার বিপুল জনতা (হয় কোটি ষাট লক্ষ) থাকা সত্ত্বেও কোনো উন্নতি হচ্ছে না, বাঙালিরা চেতনা লাভ করছে না, উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। জাতীয় উন্নতি বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলায় ‘লোকশিক্ষা’ না থাকাই এর কারণ হিসাবে লেখক নির্দেশ করেছেন। সেকালে সার্বিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই সমগ্র সাধারণকে একসঙ্গে বিদ্যালয়ের বই, ব্যাকরণ-সাহিত্য, জ্যামিতি শেখানো সম্ভব নয়, একথাও তিনি জানতেন। কিন্তু কীভাবে সার্বিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তার সর্বকালীন নিদান দিলেন, -

“মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য হয়।”^৪

কোনো ভাব বা চেতনা উপলব্ধি করার জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন। বঙ্কিম সমকালে যাঁরা বাঙালি জাতির নানাবিধ উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা সর্বসাধারণের শিক্ষার কথা ভাবেন নি- যে শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ‘লোকশিক্ষা’ বলেছেন। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল এবং ভাষামাধ্যম ছিল বিজাতীয়। মূলত সংস্কৃত ও ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি অথবা ফারসী ভাষা ছিল শিক্ষার মাধ্যম। আপামর বাঙালির মুখের ভাষা বাংলায় শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পতুগীজ মিশনারীরা এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষই দেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় নিজেদের স্বার্থে প্রথম শুরু করে।)। সমগ্র জনগণের বিদ্যালয়-শিক্ষার ব্যবস্থা তখনকার বিশ্বে একমাত্র ‘প্রুসিয়া’য় (বর্তমান জার্মানি) ছিল

বলে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ইউরোপের অনেক দেশে লোকশিক্ষার নানাবিধ উপায় ছিল। তার মধ্যে ‘সংবাদপত্র’ একটি প্রধান উপায় হিসাবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উন্নত দেশে সভা-সমিতির বক্তৃতাও লোকশিক্ষার একটি অন্যতম মাধ্যম। সভার বক্তৃতার সারাংশ সংবাদপত্র-বাহিত হয়ে গ্রামে-নগরে বহুদূর প্রান্তের সাধারণ লোকে শিক্ষিত হয়। তুলনামূলক আলোচনায় লেখক দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশে (বাংলায়) সংবাদপত্রের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি সভায় যে বক্তৃতা হয় সেগুলো আত্মোন্নতি বা চেতনা ও শিক্ষালাভের অনুকূল নয়। লেখক তুলনামূলক আলোচনায় যা বলেছেন,-

“বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনো দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না।”^৫

সংবাদপত্র সরাসরি পাঠের জন্য শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা বোঝার জন্যও তা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন। বাংলায় সংবাদপত্র প্রচার হলে, যারা পড়তে পারেন, তাদের কাছে শুনে অক্ষরজ্ঞানহীনজনও চেতনা লাভ করতে পারে। সঠিক তথ্যবহুল, নিয়মিত প্রকাশ সংবাদপত্র বাংলায় তখনো পর্যন্ত খুব বেশী ছিল না। আর একথাও মানতে হবে, তখনকার দিনে যেসব সংবাদপত্র ছিল, তার প্রচারের পরিধিও ছিল খুবই সংকীর্ণ- মূলত শহরকেন্দ্রিক। তাই সিংহভাগ মানুষ যারা সাধারণ গ্রামবাসী, তারা উক্ত পরোক্ষ শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র গভীর মননসম্মুখভাবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন দেশীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন। বাংলা শুধু নয়, বিষয়ানুগভাবে সমগ্র পরাধীন ভারতের কথাই তিনি তুলে ধরেছেন। অতীত দিনে আমাদের দেশে শাকসিংহ (গৌতমবুদ্ধ), শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মীয় ও দার্শনিক জটিল মতবাদ ও ধারণা লোকশিক্ষার মাধ্যমেই প্রচার করতে পেরেছিলেন। মূলত তাঁদের মতাদর্শ অনুসারী শিক্ষিত, প্রস্তুত ও উদ্বোধিত বদান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সরাসরি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বক্তৃতা ও কথকতার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন। লেখকের বর্ণনা,-

“সমগ্র ভারতবর্ষকে- গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মুর্থ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিক্ষাইয়াছিলেন।”^৬

লোকশিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় ‘কথকতা’। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে ‘লোকশিক্ষা’র আকর বলেছেন। প্রাচীনকালে ও সাম্প্রতিক অতীতে কথকতার মাধ্যমে সমস্ত জনসাধারণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষালাভ করতে পেরেছে। স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করেও কথকতার মাধ্যমে বাংলার তথা ভারতবর্ষীয় জনসমাজ ধর্ম, নীতি ও আদর্শ, মানবিকতা, পরোপকার, সুরুচি, পাপ-পুণ্য, সৎ জীবনাদর্শ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ সহাবস্থান শিক্ষালাভ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজাতীয় শিক্ষা- বার্থ ইংরেজি শিক্ষার জন্য লোকশিক্ষার একটি প্রধানতম উপায় কথকতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই কথায়, অর্থাৎ সরাসরি ইংরেজি শিক্ষাকে আমাদের দেশীয় লোকশিক্ষার উপায় বিলুপ্তির কারণ হিসাবে ধরে নিলে বিতর্ক উঠবে- এ বিষয়ে লেখকের স্পষ্ট ধারণা ছিল। আর কথকতার বিষয় হিসাবে যেসব উদাহরণ লেখক উল্লেখ করেছেন তা মূলত সংস্কৃত ভাষাবাহী ছিল। সেখানে ভাষা প্রতিবন্ধক হয়নি, তার কারণ হিসাবে বলা যায়- সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি কথকতার সময় তাঁর জ্ঞান বিতরণ করতেন সাধারণের আঞ্চলিক ভাষায়। বাংলা ভাষা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমকালের আশু প্রয়োজনে বাঙালিদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল। খাওয়া-পরার নিশ্চিত ব্যবস্থাপনার জন্য ইংরেজের অফিসে চাকরি গ্রহণ ছিল মুখ্য

লক্ষ্য। কখনো কখনো দেশীয় নব্য শিক্ষিত সমাজ কতৃপক্ষের কাছে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বিলেতি খাওয়া-পরা, বিনোদনের অনুকরণের জন্য তৎপর হয়েছে। তাতে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা বিঘ্নিত হয়েছে। সেই কারণে সাধারণ দেশীয় লোকেদের সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণির জ্ঞানের মননের এবং রীতি-নীতি বা আদব-কায়দার পার্থক্য প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে লেখক থিয়েটারের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। নব্যরুচির (কুশিক্ষা গুণে) শিক্ষিতরা কথকতা ছেড়ে থিয়েটারে ঝুঁকছে। একথা বলা বাহুল্য যে, নব্য শিক্ষিতদের দৈনন্দিন জীবনে কথকতা শ্রবণ ও থিয়েটার দর্শন- এর কোনোটাই খুব অপরিহার্য ছিলনা। নব্য বিনোদন মাধ্যমের প্রতি নব্য যুবসমাজের বেশী ঝোঁক হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তবে সকল প্রগতিপন্থীরা মদ্যপান করে প্রতিনিয়ত থিয়েটার বিহার করতো- এ তথ্য ঠিক নয়। লেখক বলেছেন,-

“অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।”^৭

এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। লেখক প্রবন্ধের শেষে সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, -

“ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্কুল কারণ বলি- শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।”^৮

তথাকথিত শিক্ষিতজন, সাধারণ অশিক্ষিতজনের মনের কোনো খবর রাখতেন না। তাদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজদের কাছে স্থায়ী বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা লাভ করা। প্রায় সমস্ত বাঙালি (প্রবন্ধে বর্ণিত ছয় কোটি ঊনষাট লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ) নব্য শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, -

“সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।”^৯

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে ‘লোকশিক্ষা’ (১২৮৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ‘বঙ্গদর্শন’) প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় সাড়ে ছয় বছর আগে ‘বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা’ রচনায় (বৈশাখ, ১২৭৯) লেখক একই মানসিকতা ব্যক্ত করেছিলেন। খুব জোরের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন দেশীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং উন্নত দেশগুলির প্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা সাপেক্ষে মন্তব্য করেছেন, -

“যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির সম্ভাবনা নাই।”^{১০}

নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য বঙ্কিমচন্দ্র আন্তর্জাতিক ও উন্নত সাহিত্যসম্পদ সমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষাচর্চার বিরোধী ছিলেন না। তাঁর মানসিকতাটা আমাদের বুঝে নিতে হবে; যে বিদ্যা শিক্ষিতজন লাভ করেছেন, তা যদি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাতে সমগ্র বাঙালির উপকার সম্ভব ছিল। উন্নত জাতি গঠনের জন্য ভাবনায়, মানসিকতায় সকলের সমান আদর্শ, মানসিক সাম্য থাকা প্রয়োজন। মূল কথা হল- লেখক অধীতবিদ্যার ফলিত প্রয়োগ চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি পারম্পরিক সংসর্গের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালিরা আঞ্চলিক তথা দেশীয় ভাষায় সৃষ্টিশীল রচনায় প্রবৃত্ত হলে সেটা সম্ভব ছিল। তিনি শিক্ষিত কৃতবিদ্যাদের

বাংলা রচনায় এবং বাংলা রচনা পাঠের জন্য আহ্বান জানানেন। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় তার পাদপীঠ তৈরি করে দিলেন। ফল স্বরূপ তখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বাংলায় লিখবার আগ্রহ লাভ করলেন। কিন্তু যা তা লিখলেই তো হবে না; বঙ্কিমচন্দ্র অনুমোদন করবেন না। তাঁর যে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে- লেখকদল এবং পাঠকবর্গের উন্নত মানস গঠন করতে হবে। পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করে লিখতে হবে। তাই বাংলার নব্য লেখকদের জন্য কিছু নীতি-নির্দেশিকা তৈরি করে দিলেন। এখনই চেষ্টাকৃত যশের জন্য, বিদ্যা প্রকাশের জন্য, টাকার জন্য এবং প্রমাণহীন লেখা লিখতে নিষেধ করলেন। এরকম বারোটি নিয়মের কথা বলেছিলেন। সবচেয়ে চমৎকৃত কথা হল,-

“লিখিয়া যদি দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।”^{১১}

বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালি লেখকগোষ্ঠী ও পাঠকগোষ্ঠী তৈরির কঠিন সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, -

“বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লক্ষ্যে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।”^{১২}

কারণ, বাঙালি জাতির উন্নতির প্রথম সোপান হল উন্নত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। বঙ্কিম বলেছিলেন যে, বাংলা সাহিত্য, বাংলার ভরসা।

‘লোকরহস্য’ প্রবন্ধগ্রন্থের ‘ইংরাজস্তোত্র’ প্রবন্ধে শাসক ইংরেজদের অনুকারী ইংরেজি ভাষা শিক্ষিত বা ইংরেজি ভাষা অনুশীলনকারীদের চমৎকার মনোবিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। পরানুকরী বাঙালিদের দেশীয় সংস্কৃতি, রীতি-নিয়ম, ভাষা, সাহিত্য পরিত্যাগের সংকীর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ মানসিকতাকে শ্লেষপূর্ণ সাংকেতিক বর্ণনার মাধ্যমে যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করতে পেরেছেন তাতে তাঁর বেদনামথিত দেশপ্রেমিক মনের সন্ধান পাওয়া যায়। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-প্রশাসনিক পরিস্থিতি শিক্ষিত দেশবাসীকে যে অন্ধ ও অমোঘ আত্মবিচ্ছিন্ন কক্ষপথে পরিচালিত করেছিল; তা ব্যঙ্গবিদ্য করে, প্রাবন্ধিক শল্যাচিকিৎসকের মতো দেশীয় জনসমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি ক্রমিক উদ্ধৃতি তুলে ধরছি,-

- ১। “তুমি বেদ, আর ঋকযজুর্ষাদি মানি না; তুমি স্মৃতি- মন্ত্রাদি ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি দর্শন-ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম করি।”
- ২। “হে অন্তর্ধানি! আমি যাহা কিছু করি, তোমাকে ভুলাইবার জন্য। তুমি বিদ্বান্ বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি।”
- ৩। “হে মিষ্টভাষিন! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব;”
- ৪। “আমার স্পীচ শুন, আমার এশে পড়, আমায় বাহবা দাও, - আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না।”^{১৩}

আমরা বুঝতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের রচনার দ্বারা পাঠকের মনে হাঙ্কা রসের বাতাবরণ তৈরি করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র বাঙালির চৈতন্যোদয়। অন্যত্র, উচ্চশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিতের সংসর্গের ফলশ্রুতির নিদর্শন স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাধ্যমে

এত মনোরম করে তুলে ধরেছেন যাতে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত যাকে বলছেন, তার অকারণ উল্লাসিকতা চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে,-

“কি জান- বাঙ্গালা ফাঙ্গালা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ও সবার আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের শোভা পায়?”^{১৪}

কারণ, উক্ত উচ্চশিক্ষিতরা ‘Polished society’র লোক। তাছাড়া সাহেব লোকের কাছে বাংলার কোনো মূল্য নেই। এ রকম আরো উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনা থেকে উদ্ধার করা যায়। আশা করি আমরা বঙ্কিম মানসিকতার পরিচয় ইতিমধ্যেই পেয়েছি।

বঙ্কিম পূর্ববর্তীকালে, সমকালে ও পরবর্তীকালে অনেক বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা আপামর বাঙালির শিক্ষা বিষয়ে অনেক গভীর মননশীল ভাবনাচিন্তা ব্যক্ত করেছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার বিকাশ-বিস্তার বাঙালির চেতনাকে বিপুলভাবে জাগিয়েছে। বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও চেয়েছিলেন শিক্ষিতজন সাধারণ মানুষের ভাষায় বিদ্যার চর্চা করুন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশার শেষ প্রান্তে এসে ‘বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার’ (২৩ জুলাই, ১৮৯৩) প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৯৪-এ ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ নাম রাখা হয়)। সমকালে শিক্ষাপরিষদ ও শিল্পবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রমে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শুভকামনা ফলবতী হয়েছিল। সাধারণের মুখের ভাষা বাংলায় সর্ববিদ্যার চর্চা এককালে সম্ভব হয়েছিল। তারপর বহু বছর পর আজ ধীরে ধীরে বিজাতীয় ভাষার আগ্রাসন ও নব্য ভাষা-উপনিবেশ বাংলায় বলবান হচ্ছে। ভুবনায়নের কবলে পড়ে ব্যস্ততার অজুহাতে বাংলা ভাষার অনুশীলন শিক্ষিত-সমাজে ক্রমহ্রাসমানই বলতে হয়। তাই বর্তমান অবস্থা এবং অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বঙ্কিম মানসিকতার চর্চা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

উল্লেখপঞ্জি:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, ‘আধুনিক সাহিত্য’, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজন্মী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ৫৩৭
২. দে, ড. অধীর, ‘আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা’ (প্রথম খণ্ড), উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৫৪
৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘লোকশিক্ষা’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ‘বঙ্কিম রচনাবলী’ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংশোধিত চতুর্দশ মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ৩২৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৪
৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৪
৭. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৪
৯. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৫
১০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ‘বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা’, ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ‘বঙ্কিম রচনাবলী’ (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংশোধিত চতুর্দশ মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ২৪৫

১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', 'বিবিধ প্রবন্ধ' (দ্বিতীয় খণ্ড), 'বঙ্কিম রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংশোধিত চতুর্দশ মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ২৩৭
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'আধুনিক সাহিত্য', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (পঞ্চম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ৫৩৩
১৩. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'ইংরাজস্তোত্র', 'লোকরহস্য', 'বঙ্কিম রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংশোধিত চতুর্দশ মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ৮-৯
১৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর', 'লোকরহস্য', 'বঙ্কিম রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংশোধিত চতুর্দশ মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ৪৩।

‘রবীন্দ্রনাথ ও লাইব্রেরি-ভাবনার নবদিগন্ত’

দীপঙ্কর দেবনাথ

গ্রন্থাগারিক, রাজগঞ্জ কলেজ

জলপাইগুড়ি

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা-ভাবনা সর্বত্রগামী। একজন সচেতন মানুষ হিসেবে তিনি দেশ ও জাতির শিক্ষা তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে গূঢ়ভাবে ভেবেছেন এবং তার পরিকাঠামোগত অনেক রকম পরিবর্তনও তিনি করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে কত ব্যপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ তিনি তা নিজের জীবন দিয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। তাই লাইব্রেরিকে নিয়ে তাঁর কর্ম, ভাবনা, অন্যান্য গঠনমূলক কর্মের দ্বারা বারবার নবগঠিত করতে চেয়েছেন। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীতে যেমন নিজের চেতনালব্ধ লাইব্রেরি তৈরি করতে আগ্রহী ছিলেন তিনি তেমনি ছোটো ছোটো গ্রামীণ লাইব্রেরিকে গ্রামের শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এছাড়াও ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির ধারণা তো তাঁর সর্বকালের আধুনিক ও অনন্য ধারণা। তাঁর লাইব্রেরিকে ঘিরে কর্ম থেকে যদি ভাবনার দিকে ফিরে তাকাই তবে চিঠিপত্র ও নানান লেখালেখি এবং বক্তৃতায় তাঁর লাইব্রেরিকে ঘিরে অনেক ভাবনা প্রকাশ পেতে দেখি। তাঁর দু’খানি প্রবন্ধ পাওয়া যায় যা শুধুমাত্র লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করেই লেখা। আসলে তা বক্তৃতারূপে প্রথমে প্রকাশ পেয়েছিল। এই-সব কিছুর আলোকে ‘রবীন্দ্রনাথ ও লাইব্রেরি-ভাবনার নবদিগন্ত’ শিরোনামে এই প্রবন্ধ লিখিত হল রবীন্দ্রনাথের আর এক রূপকে চিনে নিতে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, লাইব্রেরি, পরিকাঠামো, সঞ্চয়, সজীব, বহমানতা।

মূল আলোচনা:

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ বাঙালীকে নতুনভাবে জ্ঞানের পথের পথিক করে তুলেছিল। আর সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার অর্থাৎ জ্ঞান আহরণের প্রধান আশ্রয় গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগার তথা লাইব্রেরিকে ধর্মস্থান হিসেবে মান্য করতে শিখিয়েছিল। ভারতীয় তথা বাংলার নবজাগরণ যে কয়জন ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে একেবারে একটি ভিন্ন মাত্রায় গ্রহণ এবং তার বিকাশকে করতে আগ্রহী ছিলেন। তৎকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রণালীকে তিনি সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেননি। শিক্ষাকে দেশ-মাটি তথা জাতির সজীব অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গিত করে তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে সমীকৃত রূপ দিতে আগ্রহী ছিলেন। আর এই শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারকে তিনি মূল আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। আর গ্রন্থাগারই সেই আঁকড় যেখানে একজন স্বশিক্ষিত মানুষ তৈরি হওয়ার রসদ লুকিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটো থেকে বাড়িতে ছোটো ছোটো গ্রন্থাগার দেখে অভ্যস্ত ছিলেন। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের ঘরের বইয়ের আলমারি পুত্র রবীন্দ্রনাথকে টানত। তারপর, রবীন্দ্রনাথ যত বড় হয়ে উঠতে থাকেন তত তার লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ ও বিশ্বাস বাড়তে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাংলার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতার অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট হলে ১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের

সভাপতিত্বে যে সম্মেলন হয় সেখানে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার নিয়ে নিজের স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন। সেখানেই অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সূচনা হয়। সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক সুশীলকুমার ঘোষ। ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। সেখানেই পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি হয়। তার আগে ১৯২৮ সালে ২৬ এবং ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন হয় যেখানে সভাপতি নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ। অসুস্থতার কারণে তিনি সভায় না গেলেও বক্তৃতা লিখে পাঠিয়েছিলেন যা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর একটু পিছিয়ে গেলে দেখতে পাই ১৮৯১ সালে কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীর সঙ্গে গভীর যোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের, ছিলেন সেখানকার একসময়ের সভাপতিও। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে যেমন একটি বিজ্ঞান সম্মত লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি তিনি যখন গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন সেখানে ছোটো ছোটো লাইব্রেরি গড়ে তোলার দিকে ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এমন কি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির ভাবনাও তাঁর মাথা থেকে বেড়িয়েছিল। যার প্রধান কর্মীরা ছিলেন তাঁর ব্রতী ছেলের দল। এই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর কাজ ছিল গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঠকের হাতে বই তুলে দেওয়া। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি বই এবং বই-এর আগারকে ঘিরে তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ও কর্মতৎপরতা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরিকে নিয়ে যেমন কাজ করেছেন তেমনি লিখেছেন তাঁর ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে। ‘রাশিয়ার চিঠি’তে বারংবার সে দেশের শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নতিতে লাইব্রেরির ভূমিকাকে নিয়ে ভেবেছেন এবং তাকে সম্মানও জানিয়েছেন। লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে দুটি প্রবন্ধ পাওয়া যায় তাঁর যা গ্রন্থাগারকে ঘিরে তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব বক্তব্যকে সৃষ্টি করে তোলে। ‘জীবনস্মৃতিতে’ তিনি যেমন তাঁর বিলেতে দেখা লাইব্রেরীর প্রসঙ্গ এনেছেন তেমনি ‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থে ‘যথাস্থান’ কবিতাতেও বলেন -

পাষাণ গাঁথা প্রাসাদ’ পরে

আছেন ভাগ্যবন্ত,

মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি

পঞ্চ হাজার গ্রন্থ

সোনার জলে দাগ পড়ে না,

খোলে না কেউ পাতা,

অ-স্বাদিতমধু যেমন

যুথী অনাস্রাতা।”^১

বই-এর পূর্ণতা, তা পাঠের মাধ্যমে। অনাস্রাতা যুথী আর পঞ্চ হাজার গ্রন্থ তাঁর কাছে সমান ভাবে আগ্রহের বিষয়। যুবক বয়সে ‘বালক’ পত্রিকায় ১২৯২ সালের পৌষ সংখ্যায় (পৃষ্ঠা ১৭-২০তে) লেখেন ‘লাইব্রেরি’ নামক প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। ভাবতেও অবাক লাগে ২৩-২৪ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরি সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা কত গভীর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল। আবার ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে লেখেন ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’। এইদুটি প্রবন্ধে তিনি গ্রন্থাগারকে যেভাবে দেখেছেন তাঁর কথাতাই তা ব্যক্ত করতে হবে - “মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কঙ্গোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন

বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।”^২

উপমার জাদুকর লাইব্রেরিকে যে মহা সমুদ্র ও বন্যা বেঁধে রাখার কঠিন বরফের সাথে তুলনা করেছেন এমন বোধহয় বিশেষ আর কেউ করেননি। মানব সভ্যতার প্রবাহের কিছু যদি সংরক্ষিত থেকে যায় তবে তা বই আকারেই রূপ পায়। হয়তো কাগজে নয়, হয়তো বা পাথরে, পাহাড়ের গুহায় বাইসনের ছবি আকারে কিন্তু তার চিহ্ন ধরে রাখে গ্রন্থাগারেই। নিঃশব্দ আলো-আঁধারি কুঠিতে হাজার, হাজার বছরের মনিষা তার শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে পাঠকের আঙ্গুলের অপেক্ষায়, এ সত্য রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ যখন ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ লেখেন তখন বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লাইব্রেরি পরিচালনার যে পরিকাঠামোগত উন্নতির কথা লেখেন, তাতে ধরা থাকে গ্রন্থবিজ্ঞান নিয়ে ভারতের প্রথম পদক্ষেপ। তিনি একজন লাইব্রেরি পরিচালক বা গ্রন্থাগারিকের যে কর্তব্যগুলির কথা বলেন তাতে গ্রন্থবিজ্ঞানের জনক রঙ্গনাথনের বেশ কিছু সূত্র চলে আসে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথ যখন ১৮৮৬ তে লাইব্রেরি নিয়ে কথা বলছেন তখন জন্মাচ্ছেন রঙ্গনাথন ভারতবর্ষের আর এক কোনে। রবীন্দ্রনাথ ‘লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য’ প্রবন্ধে যা বলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যকে সূত্রাকারে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়---

- ১। ‘অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহ বাতীকগ্রস্ত। তার বারোয়ানা বই প্রায়ই কাজে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিক্ষিত গ্রন্থপুঞ্জ কোনঠাসা করে রাখে।’^৩
- ২। ‘লাইব্রেরি তার যে অংশ মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে। কিন্তু সে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা। লাইব্রেরিকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলবার চিন্তা ও পরিশ্রম লাইব্রেরিয়ান প্রায় স্বীকার করতে চায়না, তার কারণ সঞ্চয়বহুলতার দ্বারাই সাধারণের মনকে অভিভূত করা সহজ।’^৪
- ৩। ‘সে (লাইব্রেরি) অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে।’^৫
- ৪। ‘শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।’^৬
- ৫। ‘লাইব্রেরিয়ানের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভান্ডার হলে চলবে না।’^৭
- ৬। ‘সেইজন্য আমি মনে করি বড়ো বড়ো লাইব্রেরি মুখ্যত ভাণ্ডার, ছোট ছোট লাইব্রেরি ভোজনশালা তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।’^৮
- ৭। ‘প্রত্যেক লাইব্রেরি অন্তরঙ্গ সভ্য রূপে একটি বিশেষ পাঠক মণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়।’^৯
- ৮। ‘বিশেষ বিশেষ বিষয়ে যে কোনো বই বৎসরে বৎসরে খ্যাতি অর্জন করে তার তালিকা লাইব্রেরিতে বিশেষভাবে রক্ষিত হলে একটা অত্যাব্যশ্যক কর্তব্য সাধিত হয়।’^{১০}
- ৯। ‘নিখিল ভারত লাইব্রেরি পরিষদ থেকে ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক এমন একটি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত যাতে অন্তত ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ভালো বই প্রকাশ হচ্ছে যথাসম্ভব তার বিবরণ প্রকাশ করা যেতে পারে।’^{১১}

এইসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করে যা প্রকাশ করতে চাইলাম তা হল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিজ্ঞান সম্মতভাবে লাইব্রেরিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ। প্রথমত তিনি লাইব্রেরিকে ভাণ্ডার নয় রান্নাঘর রূপে দেখতে চেয়েছেন যা স্বাস্থ্য, শক্তি বৃদ্ধি

করবে পাঠকের। দ্বিতীয়ত তিনি লাইব্রেরি পরিচালককে এই লাইব্রেরির প্রধান আয়ুধ রূপে দেখতে চান যিনি লাইব্রেরিকে পাঠকের কাছে নিয়ে যাবেন। তার জন্য তাকে হতে হবে ‘মাষ্টার অফ মাষ্টার্স’ এবং একজন যথার্থ সম্পাদক। তাঁর কাজ লাইব্রেরির সম্পদকে গুছিয়ে পাঠকের নজরের সামনে নিয়ে আসা, তার জন্য চাই নিরলস পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ের। রবীন্দ্রনাথ কোনদিন সঞ্চয়ে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং সঞ্চয়কে বিলিয়ে তাকে রক্ত-মাংস-মজ্জা পরিণত করায় বিশ্বাস রাখতেন। তাই বইকে তিনি সজীব সত্ত্বা রূপে যেমন দেখতে চেয়েছেন, তেমনি বই-এর আগরকেও সজীব-প্রাণবন্ত নিত্য পরিবর্তনশীল এক অস্তিত্ব রূপে কল্পনা করতে চেয়েছেন। হতভাগ্য বাঙালী তথা ভারতীয়রা রবীন্দ্রনাথকে কোন দিন, কোন দিকে থেকে বুঝে উঠতে পারেনি, বলাবাহুল্য গ্রন্থাগার ভাবনায়ও তাকে ছুঁতে পারেনি। কতগুলি সূত্রে আওড়ে নির্জীব কারাগার হয়ে উঠছে দিন দিন এই গ্রন্থাগারগুলি যা থেকে রবীন্দ্রনাথ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছিলেন বহু পূর্বেই।

তথ্যসূত্র:

- ১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যথাস্থান, ক্ষণিকা (কাব্যগ্রন্থ), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৩০৭ সাল, পৃষ্ঠা-২৬
- ২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লাইব্রেরি, বিচিত্র প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩১৪ সাল, পৃষ্ঠা ৪৪
- ৩) অসিতাভ দাস, আলোর ঠিকানা, শুভা প্রকাশনী, উঃ ২৪ পরগণা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা-৬৬
- ৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৬
- ৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৬
- ৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৬
- ৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৬
- ৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৬
- ৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭
- ১০) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭
- ১১) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭

সহায়ক গ্রন্থ ও সূত্র:

- ১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যথাস্থান, ক্ষণিকা (কাব্যগ্রন্থ), বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৩০৭ সাল
- ২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লাইব্রেরি, বিচিত্র প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩১৪ সাল
- ৩। অসিতাভ দাস, আলোর ঠিকানা, শুভা প্রকাশনী, উঃ ২৪ পরগণা, ১৯৬৩
- ৪। রামকৃষ্ণ সাহা, রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮
- ৫। বিমল কুমার দত্ত, রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৮৯
- ৬। ড: দেবব্রত বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় ‘লাইব্রেরি’, ব্যঞ্জনবর্ণ ফাউন্ডেশন, কলিকাতা, ২০২২.
Retrieved from-<https://byanjanbarnafoundation.org/debobrata-biswas/>
- ৭। বিদ্যালয়ের ভিত পত্তন হল এই লাইব্রেরি দিয়ে, সম্পাদকীয়, আনন্দ বাজার কলিকাতা ২০১৯.
Retrieved from - <https://www.anandabazar.com/editorial/the-foundation-of-this-school-was-done-through-it-s-library-1.1014923>।

বাঙালির সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

নিতাই প্রসাদ ঘোষ

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? সংস্কৃতি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বিশেষ সমাজের সাহিত্য, সংগীত, লালিত কলা, ক্রীড়া, মানবিকতা, সাহিত্য, জ্ঞানের উৎকর্ষ। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে সংস্কৃতি হলো মানুষের জ্ঞান, আচার-আচরন, বিশ্বাস, রীতিনীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, সমষ্টিগত মনোভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্জিত কীর্তি-সমূহ, জাতির ইতিহাস, ভাষা, সার্বভৌমত্ব, চিন্তাভাবনা, শিল্পকলা, সাহিত্য তথা যা কিছু সৃজনশীল। অর্থাৎ বাঙালি সংস্কৃতি নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনভূমি। আর বাঙালি সংস্কৃতির রয়েছে চার হাজার বছরের ইতিহাস। মোট কথা বাংলা তথা বাঙালি সংস্কৃতির সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, থিয়েটার, নাচ, চিত্র, স্থাপত্য, স্বর্ণালঙ্কার, কাপড়, পোশাক, মৃৎশিল্প, নৌকা, রিকশা, খাবার, চলচিত্র, বিয়ে, উৎসব, খেলাধুলা প্রভৃতিতে বিশ্বায়নের ঢেউ ঠিক কিভাবে পড়েছে সেই দিকটি এই পরিসরে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আসলে আমরা যদি আমাদের বিবেকবোধের জাগরণ ঘটাই, পরিশীলিত ও পরিশ্রুত চেতনায় অধিকারী হই এবং প্রযুক্তির ক্ষতিকারক দিকগুলিকে সযত্নে পরিহার করে এর ভালো দিকগুলোকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করি তাহলে বাঙালি সংস্কৃতি পরিশীলিত যেমন হবে তেমনি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে টিকে থাকবে।

সূচক শব্দ: সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা, চর্যাগীত, জাতীয়তাবোধ।

মূল আলোচনা:

সংস্কৃতি হল উপলব্ধির বিষয়, অনুভবের বিষয়, হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয়। আসলে সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারার প্রতিফলন। মানুষের জ্ঞান, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, নীতিবোধ, চিরাচরিত প্রথা, ভাষা, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত। এই সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই আমরা একটি জাতির মনন বৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে থাকি। বিপুল এই পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি সম্পন্ন মানব সমাজ।

বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান সময়ে আমাদের দেশ তথা সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিশেষত নগরগুলির সংস্কৃতির ব্যাপক অবক্ষয় সুস্পষ্ট রূপে চোখে পড়ছে। কৃষ্টি তার সৃজনশীল সীমা হারিয়ে ফেলে সংকীর্ণ চটকদার উপস্থাপনায় বিকাশিত হচ্ছে। ফলে সংস্কৃতি রূপান্তরিত হচ্ছে অপসংস্কৃতিতে। আর তার কুপ্রভাব সমগ্র জাতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

মানুষের সাধারণ চিন্তা তথা শিক্ষা থেকে নৈতিকতা হচ্ছে অপসারিত। মানুষ পরিনত হচ্ছে যুক্তির দাসে। পশ্চিম সংস্কৃতির অথবা দেশি উগ্র হিন্দুত্ববাদী অন্ধ অনুসরণে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার আজ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। সৌভ্রাতৃত্ব, নারীর প্রতি সম্মান-এখন কমে গিয়ে চলছে বিবাহ বিচ্ছেদ পরিবারের প্রতি অবিশ্বাস আর অবাধ যৌনতা। এভাবেই বিশ্বায়নের প্রভাবে ঘণ ধরেছে আমাদের মানবিক মূল্যবোধে। যুব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি আজ আর খেলার মাঠে শরীর চর্চা নয়, এ সময়ের সংস্কৃতি সারাদিন মোবাইলে ব্যস্ত থাকা। এরফলে দেশের সংস্কৃতির প্রধান স্তম্ভ যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে।

বিদেশী পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ বন্ধ করতে হবে। উন্নত দেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে গা না ভাসিয়ে প্রয়োজনীয় উন্নত ভাবনা গুলিকে ও তার গ্রহণ, সঠিক প্রয়োগ, ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমাদের ঐতিহ্যকে যথা- যথ ভাবে তুলে ধরতে হবে। আমাদের দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিতে হবে। শিশুদের পাঠ্য তালিকার মধ্যে দিয়েই আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চেনাতে হবে।

ভারতের ঐতিহ্যের মূল ধারণা হলো- "বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান"। এই ধারণা আজ আক্রান্ত। সমস্ত ধর্ম ও ভাষাভাষী মানুষের দেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তা হলো বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পারসী, খ্রীষ্টান সকলেই লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। এভাবেই গড়ে উঠেছিল ভারতের ধারণা। এটা ঠিক যে হিন্দুত্বের ধারণা বা মুসলিম ধারণার সাহায্যে এই ভারতের ধারণাকে বারবার আঘাত করা হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। স্বাধীন ভারতে যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ভিত্তি হল এই ধর্মনিরপেক্ষতা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের 'ভারত বিধাতা' কবিতার প্রথম স্তবক, পরবর্তী অংশ বেশ দীর্ঘ এবং তাঁর প্রতিটি ছত্রেই রয়েছে ভারতীয় ভাবধারার প্রকাশ।

এই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে তিনি বলেছেন:

“অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বানী
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খ্রীষ্টানী
পূর্বব আসে পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে প্রেমহার হয় গাঁথা
জনগণ-ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা,
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।”

আর,

রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহাস্পদ কাজী নজরুল ইসলাম বলেন,

“মোরা একই বৃত্তে দুটি কুসুম
হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নের মনি
হিন্দু ভাহার প্রাণ।”

এটাই এদেশের ঐতিহ্য, এটাই আমাদের সংস্কৃতি। এই পরম্পরাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যা সুরক্ষিত নয় উভয় মৌলবাদীদের হাতে।

'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী culture- যার প্রতিশব্দ হিসাবে বাঙলায় এখন বেশ চলছে। civilization বা 'সভ্যতা' বললে আমরা ব্যাপক ভাবে উৎকর্ষ-প্রাপ্ত বা উন্নত মানব সমাজের বহিরাঙ্গ- তার উন্নত জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তার সামাজিক রীতিনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রূপশিল্প, বাস্তবশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তার সাহিত্য ও ধর্ম, এইসব বোঝা যায়, এবং তার culture বা সংস্কৃতি বললে বোঝা যায় উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি - তার অধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ তার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ- তার বাহ্য সভ্যতার অভ্যন্তর প্রাণবস্ত যা মুখতঃ তাই বুঝি। সভ্যতা তরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' এই শব্দটি প্রাচীন ভারতে প্রযুক্ত হতো- ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা এই 'সংস্কৃতি' শব্দ পাই- যার দ্বারা কোন বস্তু 'সংস্কৃত' অর্থাৎ মার্জিত বা উন্নত হয় তাই 'সংস্কৃতি'।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন লেখক সাম্প্রতিককালে বাঙালি সংস্কৃতিকে খুব পুরোনো এমনকি, পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো বলে দাবী করেছেন। কিন্তু সাধারণ বিবেচনায় বাঙালি সংস্কৃতি আদৌ তত প্রাচীন নয়। কারণ বাংলা ভাষা দূরে থাক তার জননীও জন্ম তখন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছরের কাছাকাছি, তখনও বঙ্গদশ বিভক্ত ছিল গৌড়, বরেন্দ্র, সমতট, সূক্ষ্ম, বঙ্গ ইত্যাদি নানা ভাগে। প্রকৃতপক্ষে, এই সব ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে একটি অখণ্ড বঙ্গভূমি পাল- বর্মণ - সেন রাজা- দেব সময়েও গড়ে ওঠেনি। কাজেই সেই যুগে যারা বাস করতেন তাদেরও বাঙালি বলা যায় না। আর একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা- পূর্ব সেই পুরোনো কালের লোকদের যে সংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ছিল, তা ধুয়ে মুছে সেখানে নতুন সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি; বরং সেই পুরোনো সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন নতুন উপাদানে গড়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির ইমারত।

"আর্যপূর্ব ও আর্যসংস্কৃতিকে মিলিয়ে বাঙালির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, এই যুগেই তার ভিত তৈরি হয়ে যায়। বাংলার ভৌগলিক সত্তা সেই সময়েই গড়ে উঠেছিল। বাংলা লিপি ও ভাষার গোঁড়া খুঁজতে গেলেও এই চারশো বছরের মধ্যে খুঁজতে হবে। পাল বংশকে কেন্দ্র ও আশ্রয় করে বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক-সংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে উঠেছিল।"^১

আর্যরা বঙ্গদেশে আসার পর প্রায় পনেরোশো বছর পরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় বলে অনুমান করা হয়। অবশ্য বাংলার উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ি লোকেরা এ ভাষা গ্রহণ করেনি। কিন্তু সমতল ভূমির লোকেরা বাংলাকে মেনে নিয়েছেন। বাংলা ভাষা, গড়ে ওঠার আগেকার সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের লোকেরা বর্জন করতে পারেনি।

যে ভাষার ওপর ভিত্তি করে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেই বাংলা ভাষা কখন জন্ম লাভ করে তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় সবচেয়ে পুরোনো যে নমুনা পাওয়া গেছে চর্যাপদে, সেই চর্যাপদের বয়স পুরো এক হাজার বছর হয়েছে কিনা, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। নেপালের রাজ দরবার থেকে উদ্ধার করে এসে হর প্রসাদ শাস্ত্রী বিশ শতকের গোড়ায় তাকে এক হাজার বছরে পুরোনো বলে দাবী করেছেন।^২

শহীদুল্লাহ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের সময়টাকে একটু পিছিয়ে দিলেও তাঁরা এটা স্বীকার করেছেন যে, চর্যাপদের ভাষাকে ঠিক বাংলা ভাষা বলা যায় না। চর্যাপদেরও পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব। চর্যার বয়স এক হাজার হয়ে থাকলো, বাংলা ভাষার বয়স এখনও এক হাজার বছর হয়নি।

"সুতরাং বাংলা ভাষাকে বাঙালি সংস্কৃতির অভিন্ন উপাদান বলে গণ্য করলে, বাঙালি - সংস্কৃতির ইতিহাসকে এক হাজারের চেয়ে কম বয়সী বলে মনে করাই সম্ভব। তবে সমস্ত বিতর্ক বাদ দিয়ে এক হাজার বছরের পুরোনো বলে চিহ্নিত করছি।"^৩

বাঙালি জাতি, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় - "বাঙালি জাতি বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙলা ভাষাকে 'মাতৃভাষা'রূপে বা ঘরোয়া ভাষা রূপে ব্যবহার করে, সেই জনসমষ্টিকে বুঝি। বাংলাদেশে বাঙলাভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই "বাঙালি সংস্কৃতি"। এবং এই সংস্কৃতি বাঙালি ভাষার সৃষ্টিকাল হইতে বাঙালি ভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই "বাংলা সাহিত্য"।"^৪

বাঙালি সংস্কৃতির দিকে নজর দিলে যতটা বৈচিত্র্য দেখা যায়, ততটা ঐক্য পাওয়া যায়না। তবে যাতে সবচেয়ে বেশী মিল লক্ষ্য করা যায় তা হল বাংলা ভাষার। সেজন্য এ সংস্কৃতির সূচনা এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে হলে বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং বিবর্তনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে বোধ হয় লোক সংখ্যার দিক থেকে বাংলাভাষীদের স্থান সপ্তম। একটু ওপরেও হতে পারে। কারণ, স্বভাবতই ঘরে বাইরে যারা বাংলা বলে তারাই তারাই বাঙালি। আগামী সেলস না পেলে সঠিক বলা যাবেনা তাদের সংখ্যা কত। এখন প্রায় কুড়ি কোটির অধিক লোকে বাংলা ভাষায় কথা বলে। প্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি- এদের প্রত্যেকের অধিবাসীদের চেয়ে বাঙালি জাতি অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যা অনেক বেশী। ভারতবর্ষের অধিক সংখ্যক ব্যক্তি মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা বলে; সংখ্যাধিক ছাড়াও বাংলার সাহিত্য গৌরবও অন্য পাঁচটি ভাষার মধ্যে অগ্রগণ্য। আজকাল জাতীয়তা বা স্বাভাবিকের প্রধান অধার হচ্ছে ভাষা। যেখানে বিভিন্ন ভাষা সেখানে ধর্ম, মানসিক সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থান এক হলেও সম্পূর্ণ ঐক্য হওয়া কঠিন-সম্পূর্ণ স্বাভাবিকবোধ আসা একরকম অসম্ভব।

বাঙালি সংস্কৃতির দিকে নজর দিলে যতটা বৈচিত্র্য দেখা যায় ততটা ঐক্য পাওয়া যায় না। তবে যাতে সবচেয়ে বেশী মিল লক্ষ্য করা যায় তা হল বাংলা ভাষার। সেজন্য এ সংস্কৃতির সূচনা এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে হলে বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নমুনা হল চর্যাপদ'। চর্যাপদগীতগুলিকেই আমাদের ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

বাংলা ভাষা উন্মেষের আগেকার কিছু লক্ষণ অবশ্য তারও আগেকার কিংবা সমকালীন কোনও কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায়। সদুক্তি-কর্ণামৃত-র টীকার কথা, সর্বানন্দকৃত অমরকোষের টীকার কথা এবং প্রাকৃতপেঙ্গলের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বাংলার একটি-দুটি লক্ষণ কিংবা বাংলার কিছু স্থাননাম থাকলেই পুরো বইটিকে তো আর বাংলা ভাষার বই ধরে নেওয়া যায় না। সেদিক থেকে চর্যাপদগীতগুলিকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরে নিতে হবে। মহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো কোনও-কোনও বিদ্বজ্জন এই গীতগুলিকে আরও অনেক প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে চর্যাপদ গুলোর রচনাকাল দশম একাদশ শতক বলে মনে নিষেছেন ভাষা- তাত্ত্বিকেরা। এটাও মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে অষ্টাদশ শতকের আগে বাংলা ভাষা যথার্থ আধুনিক হয়ে উঠেনি। এবং এটা বলা যেতেই পারে যে বাংলা ভাষা সেই দশম শতকে যাত্রা শুরু করে প্রায় আট শতাব্দী কাল ধরে অবিরাম পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় রূপ লাভ করেছে।

ভাষাতাত্ত্বিকরা এবং আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা লক্ষ্য করেছেন যে প্রাচীন বাংলার একমাত্র নমুনা যদি-বা চর্যাপদ হয়, মধ্যযুগীয় বাংলার জন্য আমাদের ততটা অসহায় রোধ করতে হয় না। কেননা মধ্যযুগীয় বাংলার নমুনা হিসাবে আমরা দেখাতে পারি কৃষ্ণকীর্তনকে এবং আরও পরবর্তী সময়ে রচিত বিশিষ্ট সব সাহিত্যকৃতিকে, যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ন গান, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, দেখাতে পারা যায় আদি মঙ্গল কাব্যের কিছু নমুনাকে। চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের কাব্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত আর বৈষ্ণব পদাবলীতে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে দশম শতাব্দী

নাগাদ যখন ভারতের নানা অঞ্চলে বাংলা সমেত আধুনিক মৌখিক ভাষাগুলির উদ্ভব হয়, সেই সময় বাংলা ভাষা শৈশবের সমস্ত অনিশ্চয়তা, সমস্ত অপূর্ণতা ও অপকৃত্য নিয়েই হাজির হয়েছিল। ক্রমে মধ্যযুগের সাহিত্যেই বাংলা ভাষার বিকাশের অভ্রান্ত প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল। সেই ভাষাই বহুশত বছর ধরে বহু উৎস থেকে বহুসূত্রে, বহু উপাদান ও ঋণ আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে, পারিপক্য অর্জন করেছে। চর্যাগীতির ভাষা থেকে আধুনিক বাংলা ভাষায় এই উত্তরণ বিবর্তন ও অগ্রগতির ইতিহাস প্রধানত বাঙালির সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

সুকুমার সেন লিখেছেন, “হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহজবুদ্ধিতে চর্যাপদের ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন।”^{১৫} অর্থাৎ তিনি গভীর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করেই একে বাংলা ভাষা বলে মত প্রকাশ করেছেন। সুকুমার সেনই বলেছেন যে, হরপ্রসাদ কোন ভুল করেননি, কেননা পরে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার পুজ্ঞানুপুজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে-ও-ভাষা বাংলাই। সুনীতি কুমার যদিও বলেছেন চর্যার ভাষা বাংলা, তবু সংশয় কোন কোন মহলে থেকেই যায়। সেকালের বাংলাভাষায় অপভ্রংশে প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। আর অন্য যেসব আঞ্চলিক ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব বহন করছিল, তাদের সঙ্গে সেকালের বাংলা ভাষার মিল তাই অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। এটা দেখা গেছে চর্যার ভাষায় রয়েছে বাংলা ভাষার বহু বৈশিষ্ট্যের অভ্রান্ত চিহ্ন।

বঙ্গীয় ১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিলা গ্রাম থেকে যে পুথি উদ্ধার করেছিলেন এবং ১৩২৩ বঙ্গাব্দে যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটিই আজ পর্যন্ত সময়ের বিচারে বাংলা ভাষার দ্বিতীয় নিদর্শন এবং এই গ্রন্থখানির রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সাধারনভাবে স্বীকৃত মত অনুসারে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। একথা আমাদের মনে কোন অসুবিধে নেই যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই’ মধ্য বাংলার প্রথম নিদর্শন। ভাষাবিদ ও সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ মনে করেন আদি মধ্য বাংলার একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। অন্যদিকে অন্ত মধ্য বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শনের জন্য আমাদের হাতড়ে বেড়াতে হয়না। এই পর্বে রয়েছে ‘রামায়ণ’, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বনে রচিত কাব্য ‘বৈষ্ণব পদাবলী’ ও চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্য, আছে মঙ্গলকাব্য আর নানান রাজসভার কবিতা।

আমাদের মনের যে ভাবের আকুতি তাকে ভাষার বেষ্টনে বাঁধতে হয়। এই কারণে সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব এবং ভাষার সমান মূল্য। ভাবকে যদি বলা যায় কাব্যের আত্মা তবে ভাষা তার দেহ। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হয় যে, কেবলমাত্র ভাষার কারুকার্য দিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। ভাবের সঙ্গে ভাষার সাযুজ্যকেই বলে সাহিত্যের আর্ট। দুয়ে মিলে রসসৃষ্টি। একথা সত্য, কাব্যের পক্ষে যা অত্যাৱশ্যক গদ্যের পক্ষে তা অত্যাৱশ্যক নয়। কাব্যে অল্প- বিস্তার অতিশয়তার জন্য সকলই প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু গদ্যে সেটা অনেকেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

প্রত্যেক জাতির যেমন কতকগুলো মূলগত বৈশিষ্ট্য থাকে, তার ছাপ সে দেশের মানুষের মুখাবয়বে এবং দেহাবয়বে প্রকাশ পায়, ভাষার বেলাতেও অনুরূপ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর উভয়েই বাংলা ভাষার স্বভাব-ধর্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখে বাংলা গদ্যের ভিত রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভিতের উপর সৌধ নির্মাণ করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্য যে অভাবনীয় সমৃদ্ধি লাভ করেছে তারও মূল প্রধানত বঙ্কিম প্রতিভায় নিহিত।

এমনকি বাংলা ভাষার গদ্যে আজ যে কথ্যভাষার প্রচলন হয়েছে তারও বীজ উগ্ঠ হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বহুনির্দেশিত গুরুচণ্ডালি দোষ-দুষ্ট ভাষার মধ্যে। ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যতখানি সচেতন ছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী লেখকরা ততখানি ছিলেন না। তাঁর নিজের প্রয়োজনেই ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে।

সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অপত্য হিসাবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য নিত্যন্ত নিঃসম্বল অবস্থায় যাত্রা শুরু করেনি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই সে মূলধন অল্প-বিস্তর ব্যবহার করেছেন।

সকল দেশেই দেখা গিয়েছে প্রথম দিকে পদ্যের এবং গদ্যের ভাষা ছিল আলাদা, এটা অস্বাভাবিক। পদ্যেই হোক, গদ্যেই হোক সাহিত্যের মধ্যে একটা স্বচ্ছন্দ গতি থাকা প্রয়োজন। প্রথম দিকে গদ্যে পদ্যে কোথাও সেই স্বচ্ছন্দ গতি ছিল না।

ভাষাকে বাগ মানানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। বুনো ঘোড়ার মত ভাষার মধ্যে একটা একগুয়ে একরোখা ভাব থাকে, সেই অবাধ্যতাকে ভেঙে দিয়ে তাকে বশ মানাতে হয়।

ভাষার মধ্যে দুটি বিপরীত জিনিষের সংঘাত নিরন্তর চলতে থাকে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রচলিত ধারা, অপরটি যুগধর্মের উৎক্ষেপে উত্থিত নিত্য-পরিবর্তনশীল জীবনের এক নতুন ইডিয়ম। এই দুয়ের সংঘর্ষে মধ্যপথগামী যে-ভাষার সৃষ্টি হয়, সেটাই যুগোপযোগী ভাষা। ভাষা এভাবেই অগ্রসর হতে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নমুনা হল চর্যাপদ। শশীভূষণ দাশগুপ্ত নেপালে গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুক-দের মুখে মুখে শোনা গানের কিছু রেকর্ড করে এনেছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পদগুলো খুবই মূল্যবান। এই গানগুলোর মধ্যে দিয়ে একধারে প্রাচীন বাংলা ভাষা এবং ঠিক তার আগেকার ভাষার নমুনা পাওয়া যায়, জানা যায় সেকালের সমাজের কিছু খবর।

চর্যাপদের পর বাংলা সাহিত্যের যে উল্লেখ্যযোগ্য নমুনা পাওয়া গেছে তা হল বড় চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। চর্যাপদের মত এ হারিয়ে গিয়েছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে চতুর্দশ, শতকের দ্বিতীয় ভাগের রচনা বলে গণ্য করেছেন। অন্য পণ্ডিতেরা একে খাঁটি বাংলা ভাষায় লেখা সবচেয়ে পুরোনো নমুনা বলে স্বীকার করেছেন।

তখনকার আর একটি কাব্যেও বাংলা ভাষার পুরানো নমুনা রক্ষা পেয়েছে বলে কেউ কেউ দাবী করেছেন। এই কাব্যটির নাম ইউসুফ জোলেখা, শাহ মোহাম্মদ সগীরের লেখা।

আর একটি প্রাচীন কাব্য হল কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এ কাব্যও ঠিক কবে লেখা তা জানা যায় না। এর ভাষা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের মত প্রাচীন নয়, তার ওপর জনপ্রিয়তার কারণে একের পর এক লিপিকরের দৌলতে তার বানান এবং ভাষাও ব্যাপকভাবে বদলে গেছে।

দেশীয়দের মধ্যে বৈষ্ণবেরা সতের শতকেই বাংলা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। রূপ গোস্বামীর 'কারিকা', চণ্ডীদাসের 'চৈতন্য রূপ প্রাপ্তি' প্রভৃতিতে এই গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুত, বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটেছিল নতুন যুগের, নতুন জীবনযাত্রার তাগিদে। সমাজে, সরকারী কাজে, লেখাপড়া এবং সংবাদপত্রের প্রয়োজনে, প্রাত্যহিক জীবনের তাগিদে, তখন পর্যন্ত অজানা কাজকর্মের জন্য বাংলা গদ্যের ডাক পড়ল যখন, তখন একটা নতুন ভাষা তুলতে হল।

গোড়াতে বাংলা সাহিত্য রচিত হয়েছিল ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে। চৈতন্যদেব ষোল শতকের গোড়ার দিকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার শুরু করেন। তার আনুষ্ঠানিক সহজ প্রেমের ধর্ম

রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দু'কুল প্লাবিত করা বন্যার প্রভাব সাহিত্যের ওপরেও পড়েছিল।

পনের শতকের শেষ দিকে বাংলা সাহিত্যে আর একটি ধারার পত্তন হয়- মঙ্গল কাব্য। এই ধারার প্রথম কাব্য মনসা মঙ্গল, রচনা করেন বিপ্রদাস পিপলাই। মনসা মঙ্গল প্রথম মঙ্গল কাব্য হলেও তার থেকে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল প্রায় এক শতাব্দী পরে রচিত মুকুন্দরাম চন্দ্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর একটি ধারা হল অনুবাদ সাহিত্য। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের কবিরাই অনুবাদ মূলক রচনায় অবদান রেখেছিলেন। অনেকের মতো অনুবাদের কাজে সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন কৃত্তিবাস।

লিখিত সাহিত্যের কথাই আমরা বেশি জানি। কিন্তু মধ্যযুগে কাগজে লেখা সাহিত্য অত প্রসার লাভ করেনি, যতটা করেছিল মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য। তবে মৌখিক বলেই এই লোকসাহিত্য হারিয়ে গেছে। লোক-সাহিত্যের কবিরা পৌরানিক বিষয় অবলম্বন না করে গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী রচনা করেছেন। লৌকিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এর সমন্বয়ী মনোভাব- যা আনুষ্ঠানিক ধর্মের সোপানে বিন্যস্ত সমাজের বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য করেই মানবতাকেই তুলে ধরে। এটাই বাঙালির সংস্কৃতির রূপ এবং প্রকৃতই বাঙালিদের স্বরূপ। পঞ্জিকার হিসাব মত এ সাহিত্য নতুন যুগের নয়, তা সত্যিকার অর্থেই অধুনিক। পৌরানিক কাহিনীর স্থান দখল করল প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী। প্রকৃত অর্থে ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে সৃজনশীলতার স্ফুরণ প্রতীয়মান হয়, প্রবলতা এবং ব্যাপকতা উভয় দিক দিয়েই তা একান্ত বিস্ময়কর।

"ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না; এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তাবোধও আসেনা।" বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বাংলা ভাষার উৎপত্তির কথা পুনরুদ্ধার করা যায়, সেগুলি থেকে বুঝতে পারা যায় যে বাংলা এখন থেকে মাত্র হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল। তার আগে বাংলা সৃজমান, তখন বাংলাদেশের ভাষা অপভ্রংশ ও প্রাকৃত অবস্থায় ছিল। বাংলাদেশ হিমাচল-কন্যা গঙ্গার দান; পলিমাটিতেই বাংলার উদ্ভব। বাংলা দেশের ভাষাও তেমনি উত্তর ভারতে উদ্ভূত আর্য ভাষা, প্রাকৃত থেকেই উৎপন্ন। আর্য ভাষা প্রাকৃত এই বাংলায় এসে ক্রমে বাংলা ভাষার রূপ ধারণ করল, প্রাকৃতের সঙ্গে তার ধাত্রীরূপে সংস্কৃত এল। এইরূপ অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য- এই তিন জাতির মিলনে বাঙালি জাতির সৃষ্টি হয়।

সেন ও পাল রাজাদের আমলে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। আবার বাংলার সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে পুষ্টিলাভ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙালি সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নতুন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করেছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে বাঙালির হৃদয়ের, তার রসানুভূতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা শ্রীচৈতন্যদেবেরই অনুপ্রেরণার ফল। এছাড়াও বাংলার জন-সংগীত কীর্তনগানও সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ।

আবার বাংলার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রাম্য জীবনকেই অবলম্বন করে পুষ্টি লাভ করেছিল। প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয়কেই আশ্রয় করে সভ্যতার প্রকাশ ঘটেছিল। গ্রামের বড় দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা।

বাংলা দেশে যে সংস্কৃতি গত এক হাজার বছর ধরে গড়ে উঠছে, যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করে তা আত্মপ্রকাশ করেছে তার কিছু দিকদর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলার বাস্তব সভ্যতা: বাংলার খড়ের চালের কুটির, প্রাচীন কালের কাঠের কাজ-ঘর ও চন্ডী-মণ্ডপের খাম বা খুঁটি, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এগুলি বর্তমানে প্রায় লুপ্ত) ইটের খোদাই মন্দিরের বাস্তববিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত, চিত্রবিদ্যা- পুঁথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত) এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙালি বা চিত্রপদ্ধতি, যেমন-পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, কালিঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা এগুলির অধিকাংশই প্রায় লুপ্ত; বাংলার পিতল কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল-কাঁসা, দাঁইহাট-কাটোয়ার, বর্ধমান বনপাসের পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি ঢালাই ইত্যাদি।

বাংলার খাদ্য-দ্রব্য-বাংলা দেশের বিশিষ্ট শাক শুভ্জন, ঘন্ট, নিরামিশ ব্যঞ্জন ও তরকারী, মাছ ও মাংসের পাকের বিশেষ রীতি, খেজুর গুড়ের পাটালি, মুড়ি মুড়কি, বাংলার কাসুন্দি, ছড়া তেঁতুল, আচার, কদমা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা, খাজা, বীরখন্ডি, ক্ষিরের তৈরী পিঠে ইত্যাদি।

বাংলার পরিধেয়- মিহি মখমল, ঢাকার জামদানি, টাঙ্গাইল, শান্তিপুর-চন্দ্রকোনা, ফরাসডাঙ্গা স্থানের ধুতি ও শাড়ি, বীরভূম, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম, তাঁতিপাড়া ও কড়িধ্যার তসর হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমি কম্বল প্রভৃতি।

বাংলার নিজস্ব কৃষি শিল্প - নানা প্রকারের ধান, পাট, মাছের চাষ। বাংলার অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতি-বাংলার সামাজিক বিধি ও ধর্ম-সাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, সামাজিকতা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি এবং জাতি, কুটুম্ব ও মিত্র, সম্মেলনের বিশেষ রীতি, দুর্গাপূজা, কালিপূজা, দোল, রাস, সত্যনারায়ণ, বিশ্বকর্মা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি।

মেয়েদের আলপনা আঁকা, কাঁথা সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব। মহরমের অনুষ্ঠান প্রভৃতি। বাংলার মানসিক-অধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—

টোল-চতুপাটী (লুপ্ত প্রায়), সংস্কৃত বিদ্যা, জয়দেব থেকে শুরু করে বাংলার সংস্কৃতি, কবি, দার্শনিক, পণ্ডিতদের কীর্তি, বৃন্দাবনের গোস্বামীগন বাংলার আধ্যাত্মিক পদ, বৌদ্ধ চর্যাপদ, শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যাক্তিত্ব, ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলি সাহিত্য, শাক্ত পদ-রামপ্রসাদ, রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা রূপ, মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজা, বাউল, ভাটিয়ালি গান, রুমুর, কবি গান, যাত্রাগান, সারি, মুসলমান মারফতি গান, মর্সিয়া গান, বাংলার ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, ঢপ খেমটা প্রভৃতি।

বাংলার সাহিত্যে কৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য ও বৈষ্ণব গুরুগণের চরিত্র বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু- গীতি কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করে ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে এর কতকগুলো বিষয় একেবারে লোপ পেয়েছে। কতকগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। আধুনিক কালের বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর উল্লেখ করা যায় যেমন- বাংলার ব্রাহ্ম ধর্ম, বাংলার হিন্দু ধর্মের নবীন জাগৃতি আধুনিক বাংলার, সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্র, বাংলার সাহিত্য, বাংলার নবীন শিল্প পদ্ধতি। নাট্য শিল্পের প্রয়োজনায় বাঙালির কৃতিত্ব, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বাংলা সংগীতের নতুন ধারা, বাংলার সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা ও সংরক্ষণ, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক সার্থক গবেষণা। মূলত বিশিষ্ট

বাঙালি সংস্কৃতির কতকগুলি লক্ষণীয় অঙ্গ বা উপজীব্য বস্তু, অনুষ্ঠান ও প্রকাশের মোটাদাগে উল্লেখ করা হোল।

এখন বাংলা সংস্কৃতিতে যে যুগ চলছে, তার মূল কথা হচ্ছে- বাঙালির জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচন্ড আঘাত, বাঙালির জীবনে ক্রমবর্ধনশীল অর্থনৈতিক অবনতি ও তার আনুসঙ্গিক, মানসিক ও নৈতিক অবনমন এবং আদর্শ-বিপর্যয়।

বাঙালি ভারতের আর পাঁচটি জাতির মতই একটি প্রধান ভারতীয় জাতি। আমাদের ভাবুকতা আছে, আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের যথেষ্ট শিল্প-বোধ আছে। ভারতের, সভ্যতার ভাঙারে আমরা কেবল হাত পাতিয়া লই নাই দিয়াছিও যথেষ্ট, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংগীত, আমাদের বিদ্যা, গবেষণা ও আবিষ্কার, আমাদের হিন্দু যুগের ও মধ্য যুগের মন্দির-শিল্পও ভাস্কর্য্য, পট ও ইটে খোদাই-এসব গর্ব করার বস্তু, ভারতের সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ-স্বরূপ এগুলি বিশ্বজন-সমাজে দেখাইবার যোগ্য এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব কোনও কোনও বিষয়ে বিশ্ব-জনও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ও করিবে এই খানেই আমাদের পূর্ণ সার্থকতা।^৭

তথ্যসূত্র:

- ১। মুখোপাধ্যায় সুভাষ-বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭৯, ২০২৩ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলা আকাদেমী, কলকাতা ২০২১।
- ২। মুরশিদ গোলাম - হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-১৭ অবসর প্রকাশন, ২০১৫ ঢাকা বাংলাদেশ।
- ৩। তদেব, পৃ-২৭
- ৪। চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার- বাঙ্গালির সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-১১, পঃ বঃ বাংলা আকাদেমী, ষষ্ঠ মুদ্রন ২০২০, কলকাতা
- ৫। দ্বিজেন্দ্রলাল বসু - বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৫৬, ১৯৮০
- ৬। তদেব - বাঙ্গালির সংস্কৃতি- পৃষ্ঠা-১৮
- ৭। চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার বাঙ্গালির সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৪৭

গ্রন্থ সূত্র:

- ১। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি-শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পঃবঃ বাংলা আকাদেমী
- ২। হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি-গোলাম মুরশিদ, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৫
- ৩। বাঙালির ইতিহাস - সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- ৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - শ্রী সুকুমার সেন, সাহিত্য একাদেমি ২০১২, নতুন দিল্লী
- ৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়
- ৬। উনিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি - স্বপন বসু ও ইন্দ্ৰজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০২৩।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পুরাণ ও মহাকাব্যিক

চরিত্রের অনুসৃজন

পীযুষ পোদ্দার

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বহু কৌণিকতায় কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা ছুঁয়ে থাকে দেশকালের পরিধি। তাঁর কবিতায় বৌদ্ধিক প্রয়োগ আমাদের বিস্মিত করে। নতুন সময়ের ক্ষতচিহ্নময় দিনকাল তুলে ধরতে তিনি অনেক সময়েই পুরাণের আখ্যানকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনেক কবিতায় অন্তর্বিরোধ থেকে উঠে এসেছে আত্মতিরস্কারের স্বর। নিজের অস্তিত্বকে আমরা সন্ততির মধ্যে প্রবাহিত করতে চাই। কিন্তু অনেক সময় তা ভিতর-বাহিরের নানা বাঁধায় হয়ে ওঠে না। আমাদের আত্মপরিচয় ও দেশগত পরিচয়হীনতার সময়ে পুরাণ ও মহাকাব্যিক চরিত্রকে তিনি নতুন করে অন্বেষণ করেছেন। আর এই অন্বেষণ ও সৃজনে কবি শঙ্খ ঘোষের হাতে পৌরাণিক চরিত্রগুলি নতুন রূপে নির্মিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: সৃজন, নির্মাণ, বিনির্মাণ, পুরাণ, মহাকাব্য, নবমাত্রা।

মূল আলোচনা:

সাহিত্যের অঙ্গে সামাজিক চিহ্নায়ন বহুকালাগত। সামাজিক প্রেক্ষিত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও পরিবর্তিত কালের চিহ্নায়নে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নতুন যুগের সৃজনে পুরাতন নতুন রূপে আবিষ্কৃত হয়। শিল্পী, সাহিত্যিকের অন্তঃপ্রেরণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনিবার্য হলেও সামাজিক সত্তার অংশ রূপে স্রষ্টা সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, আর্তি বেদনাকেও ধারণ করেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। সমকালের দর্পণে নবরূপে গড়ে ওঠে পুরাণ ও মহাকাব্য। সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষিতে পুরাণ-মহাকাব্যের ঐতিহ্যের নবনিরীক্ষা বর্তমান সাহিত্যের বিশেষ প্রবণতা। এই প্রবণতা থেকে আমরা শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রের পুনর্নির্মাণকে পর্যবেক্ষণ করতে চাই। সাম্প্রতিক কালের হৃদস্পন্দনে কেমন করে কবি শঙ্খ ঘোষ পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলি উপস্থাপন করেছেন, কেমন করেই বা ঐতিহ্যের জারকরস থেকে নবতর রূপ পেয়েছে চরিত্রগুলি তার বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যে শিরোনামাঙ্কিত নিবন্ধের অবতারণা। শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পুরাণ ও মহাকাব্য বিষয়ক কবিতাগুলি হল ‘সপ্তর্ষি’, ‘কবর’, ‘জাবাল’, ‘আরণি উদ্দালক’, ‘জাবাল সত্যকাম’, ‘যাদব’, ‘নচিকেতা’ প্রভৃতি। কবিতা সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, ‘যতুগৃহ’, ‘হেতালের লাঠি’, ‘শ্যামা’, ‘দুর্যোধন’ প্রভৃতি কবিতা। ‘গোটা দেশজোড়া জউঘর’ গ্রন্থের ‘সৌপ্তিক পর্ব’ কবিতা ছাড়াও বিভিন্ন কবিতায় শঙ্খ ঘোষ পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুষ্ঙ্গ চমৎকার ভাবে ব্যবহার করে এ যুগের নানা সংকট তুলে ধরেছেন। বর্তমান বিশ্বের বহুমাত্রিক মানুষের প্রেক্ষিতে তাঁর কবিতায় পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলি নতুন আয়তন লাভ করেছে। ‘পৌরাণিক’ কবিতায় শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছেন -

ভুলে যাই শুধু তৃণ চূড়ায়

তির্যক হয়ে দাঁড়ালে
অজ্ঞাতবাস প্রতীক্ষা করে
শমীবৃক্ষের আড়ালে।

(পৌরাণিক/শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১)

বর্তমান বিশ্বে অজ্ঞাতবাসের আড়ালের পরিসর ক্রমাগত কমে আসছে। বহুকৌণিক স্বর নিয়ে বিপন্ন বর্তমানের মানুষেরা পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুষঙ্গে কেমন রূপে প্রকাশিত হয়েছে শঙ্খ ঘোষের কবিতায় তার অন্বেষণ চলতে পারে।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের 'যমুনাবতী' কবিতাগুচ্ছ শুরু হয়েছে 'কবর' কবিতা দিয়ে। লজ্জা, ব্যথা, উপেক্ষা-অপমানে ভরা জীবন থেকে কবি সর্বসহা পৃথিবীর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সীমাহীন নির্মমতা আর রক্তভরা বীভৎসতার থেকে কবি মাটির নীচের কোমলতা ও কারুণ্য প্রার্থনা করেছেন। আগলে আগলে রাখা দীন-হীন জীবন পৃথিবীর কোনো কাজে আসেনি, তাই পৃথিবীর কাছে তিনি কবরের আশ্রয় চেয়েছেন। তবে আশ্রয় প্রার্থনার সঙ্গে কবির একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা জড়িয়ে আছে যে মাটির নীচে মাটি হয়ে যাবার পর তাঁর সবটুকু থেকে যেন শস্য ফলে ওঠে। পুরাণের দধীচির মতো করে পৃথিবীতে মানুষ হবার যজ্ঞে যেন কবির হাড় দিয়ে অস্ত্র গড়া হয় - 'নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী / আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা / মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে / অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।' নিজের ব্যর্থ জীবনের প্রতি আর দধীচির আত্মত্যাগের মহতী কামনার আলোতে ভরে আছে 'কবর' কবিতা।

'সপ্তর্ষি' কবিতার শুরুতে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের একটি উদ্ধৃতি আছে— 'strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto Life: and few there be that find it'। শঙ্খ ঘোষের নির্মাণে এই উদ্ধৃতির অর্থ হয়েছে 'জীবনের দ্বার সংকীর্ণ এবং পথ দুর্গম / অল্প লোকেই তা পায়'। বর্তমান হনন মেরুর পৃথিবীতে পথ আরো দুর্গম হয়েছে। বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, মরিচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই সপ্ত ঋষি আকাশে নিত্য জাগলেও আমরা আমাদেরই মুদ্রা দোষে পথ হারিয়ে ফেলেছি। প্রাত্যহিক স্বপ্নের দিনযাপন যেন গল্পকথা। জীবনের রাশীকৃত অনিশ্চয়তার চোরাবালিতে আমরা আকণ্ঠ ডুবে আছি। ইতিহাস বড়ো নির্মম, প্রত্যেকেই কৃতকর্মের ক্রুশকাঠ বহন করতে হয়, প্রত্যুষে পাখির কূজন ঘুমভাঙানোর বার্তা আনবে জেনেও যে নিরাসক্ত, ইতিহাসের কুঠার তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। সপ্ত ঋষির মহতী দেদীপ্যমান উপস্থিতি ও প্রশ্ন বিদ্রোহী নবকেতন তুলে কুয়াশালীন পথের প্রস্তুতি শুরু করে। মৃত্যু পরিকীর্ণ জীবনে মেঘ ছিন্ন বৃষ্টিতে আমরা সিক্ত হই। আমাদের আশ্রয় ভূমি ভেসে যায়, খাদ্যহীন গ্রহর কাটে, তবু তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য, নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে আমরা দুর্গম পথকেই জয় করতে চাই। প্রশ্নায়িত সপ্ত ঋষি দিক নির্দেশক হয়ে ওঠে।

'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যের 'জাবাল' কবিতাটিতে পুরাণের অনুসঙ্গ এসেছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে। বিশ্বাসহীন প্রতিবেশে রাস্তা দেখানোর কেউ নেই, খাণ্ডব দাহনে চারপাশ পুড়তে থাকলেও নিষ্ক্রমণের পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়। জরদগব সমাজের কাছে প্রত্যাশা রাখা বৃথা, কেননা ব্যক্তির রক্তক্ষরণে কিছুই এসে যায় না তার। আর কোনো কিছুতেই কিছু আসে না যাওয়ায় পতনের ফাটল বাড়তে থাকে ক্রমশ। ভুল দিকনির্দেশে পরিচালিত হয়ে

আমরা ডুবে যেতে থাকি। তবু আসন্ন সর্বনাশ থেকে মুক্তির উপায় আমাদেরই বের করতে হবে, এই নির্দেশের কথাই বলেছেন শঙ্খ ঘোষ 'জাবাল' কবিতায় 'যত দেরি হোক / জবালা, যাবার পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে।' অসুখ প্রহর আর মনখারাপের দিনগুলি রাতগুলি পেরিয়ে রাত্রির গভীর বৃত্ত থেকে সকালকে ছিনিয়ে আনার ব্রতই আমাদের অগ্নি আখরের শপথ।

পশ্চিম দেশগুলির তীব্র মাদকময় পণ্যজৌলুসে আমাদের চেতনা লুপ্ত হতে থাকে। পণ্যবিশ্বের কাছে একে একে আমাদের সব যায়, ধন যায়, মান যায় জীবন-যৌবন যায়। কবি শঙ্খ ঘোষ 'ভিখারী বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী নও' কবিতায় হর গৌরীর রূপকে আমাদের বর্তমান সময়কে উপস্থিত করেছেন। যে পশ্চিমী পণ্যবাদ আমাদের ভিখারী বানিয়ে পায়ের কাছে নত করতে চায় দেবী অন্নপূর্ণার মত গুণ তার নেই। সুন্দরীর রূপকে কবি পশ্চিমের সর্বগ্রাসী দানবীয় রূপ তুলে ধরেছেন। সভ্যতার কৃত্রিমতা কেড়ে নিতে চায় আমাদের যাপনের নিজস্বতা; নিয়ন্ত্রণ করতে চায় চেতনাহীন পুতুলের মত -

চাও শুধু সমর্পণ, একে সব নাও খুলে
মেদ মজ্জা হৃদয় মগজ
তারও পরে চাও আমি খোলাপথে হাঁটু ভেঙে বসে
হাতে নেব এনামেল বাটি
জড়াও রেশমদড়ি কত জরি ছড়াও সুন্দরী
দিনে দিনে চাও পদতলে

ভিখারি বানাও, কিন্তু মনে মনে জানানি কখনো
তুমি তো তেমন গৌরী নও।

(ভিখারী বানাও কিন্তু তুমি তো তেমন গৌরী
নও/শ.ঘো. কবিতা সংগ্রহ-১)

অথচ যে গুণে অন্নপূর্ণা শিবঠাকুরকে গ্রহীতা করেছিল কবিকে, আমাদেরকে গ্রহীতা করার মত কোন গুণই পণ্যশাসিত পৃথিবীর নেই। পণ্যায়িত বিশ্বকে কবি প্রত্যাখ্যান করতেই বলেছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সত্যকাম কাহিনিতে পিতৃপরিচয়হীন সত্যকামকে কর্মের গুণে ও সত্যবাদিতায় গুরু তাকে ব্রাহ্মণের শিরোপা দিয়েছিলেন। কবিতার সূচনার পূর্বে প্রসঙ্গ সূত্রে শঙ্খ ঘোষ জানিয়েছেন—

আচার্য বললেন, এমন বাক্য ব্রাহ্মণেই সম্ভব। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ
করো, তোমায় উপনীত করব, কারণ সত্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হওনি।
ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারশো তাঁকে পৃথক করে দিয়ে বললেন,
অনুগমন করো। বনাভিমুখে তাদের চালিত করে সত্যকাম জানালেন
'সহস্র পূর্ণ না হলে ফিরব না'।

(জাবাল সত্যকাম/শ.ঘো. কবিতা সংগ্রহ-১)

শঙ্খ ঘোষের কবিতার অন্যত্রও আমরা শুনতে পাই ‘কর্মে ছিল অধিকার আমার কী সমর্পণ সাজে’। বহুপরিচর্যাজাত সত্যকামের আত্ম পরিচয়ের ট্র্যাজেডি আমাদের সমকাল জুড়ে প্রবল ভাবে উপস্থিত। ব্যক্তির আত্মসংকটের পরিচয় বাড়িয়ে তোলে দেশের সংকট। সুতপা ভট্টাচার্য ‘গাঢ় শঙ্খের খোঁজে’ গ্রন্থে বলেছেন যে, দেশের কোনো সংকট মুহূর্তে যদি দেশের মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধই প্রকট হতে দেখা যায়, তবে তা অস্তিত্বের বোধও বিপন্ন হয়ে ওঠে। ব্যক্তির অপমানবোধ থেকেও ব্যক্তির অপমানবোধ দেশগত পরিচয়হীনতার অপমান বড়ো হয়ে ওঠে। সত্যকামের পরিচয়হীনতাকে কবি নতুন রূপে নির্মাণ করেন, পূর্ববঙ্গ থেকে শিকড়চ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসার ব্যক্তিগত উপলব্ধি আর শিয়ালদা প্ল্যাটফর্ম দেশহীন মানুষদের কোনো রকমে জীবন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে কবি আত্ম পরিচয় খুঁজে চলেন। কেননা আয়তনহীন দশদিকে কবি কোন দুঃখের সমব্যথী কোনো ভারতবর্ষকে আবিস্কার করতে পারেন না। শরীর ও হৃদয় হয়ে ওঠে অঞ্জলী প্রদানের সমিধ, আর তারই মাঝে খুঁজে চলতে হয় আত্মপরিচয় -

এনেছি সমিধ

আমার শরীর নাও দুই হাতে পুঁথি ও হৃদয়

তুমি চাও আত্ম পরিচয়

শস্যময় ভালোবাসা প্রান্তরে নিহিত বর্তমান

আমার তো নাম নেই, তুমি বলেছিলে সত্যকাম।

(জাবাল সত্যকাম/ শ.ঘো. কবিতা সংগ্রহ-১)

‘জাবাল সত্যকাম’ কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়বে ‘আরুণি উদ্দালক’ কবিতার কথা। মহাভারতের আদি পর্বে গুরুগৃহে জ্ঞানার্থী আরুণি গুরুর নির্দেশে ক্ষেত্রের আল বাঁধতে গিয়েছিল, জল প্রবাহ রোধ করতে না পেরে নিজেই আলের উপর শুয়ে শরীর দিয়ে জলপ্রবাহ রোধ করেছিল। গুরু অভিভূত হয়ে আশীর্বাদ করে বলেন সমস্ত বেদ তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক। মহাভারতের এই কাহিনিকে আমাদের সময়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন করে শঙ্খ ঘোষ দেখতে পান আত্মপতনময় এই সময়ে আমরা কেবলই নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত হই। ১৯৬৮ সালে লক্ষ্মীপুজোর দিন জলপাইগুড়িতে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়, আগে থেকে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বন্যায় জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ ও পশুর মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে থাকে, জল সরে যাবার পর খাদ্য ও ত্রাণের জন্য তুঁচে থাকা মানুষদের আত্মস্থর বাতাস ভারী করে তোলে। এরই পাশাপাশি কয়েকদিনের মধ্যে নগর কলকাতা দীপাবলীর আলোতে ঝলমল করে ওঠে, বাজির আলোক রোশনাই-এ শহর উথাল পাথাল। কবি শঙ্খ ঘোষ এই বৈপরীত্যের কারণ অনুসন্ধান করেন। কলকাতার আলোর ফুলঝুরির সঙ্গে বন্যা বিধ্বস্ত জলপাইগুড়িতে মৃত মহিষদেহে শকুনের রক্তচিহ্ন একে দেওয়ার ছবি থেকে তীব্র ব্যঙ্গে কবি নির্দয় নাগরিক সভ্যতাকে কবিতায় তুলে ধরেন—

হে নগর, দীপাশ্রিতা ভাস্বতী নগরী

আকণ্ঠ নগরী

মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন

তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি

পোহালে শর্বরী তোমারই প্রভাতফেরি মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে।

(আরুণি উদ্দালক/ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১)

মৃত্যু আকীর্ণ জলপাইগুড়ি অন্যদিকে আনন্দ হিল্লোলের কলকাতার দুই বিপরীত ছবির মধ্যেই কবি নগর সভ্যতার হৃদয়হীনতাকে চিহ্নিত করেন। সকলেই লক্ষ্মী উপাসনায় অর্থৎ ধনদৌলতের সন্ধানে ছুটে চলেছে, সহনাগরিকের মৃত্যু বা মানুষের আত্ম স্বরে কিছুই এসে যায় না আমাদের। এই তীব্র হৃদয় বিদারক বর্তমানে কবি তাই খুঁজে চলেন আরুণিকে যে নিজের শরীরের বিনিময়ে হলেও ধ্বংস প্রবণ, পতনশীল আত্মধ্বংসী সভ্যতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, সর্বস্বের বাঁধ ভেঙে যাওয়া কালবেলাকে প্রতিরোধ করবে। ‘কবিতার মুহূর্ত’ গ্রন্থে কবি সেই আরুণিদেবকেই অশ্বেষণ করেছেন -

তিস্তার বাঁধ ভেঙে গেছে। আরো আগে ভেঙে গেছে আমাদের সর্বস্বের বাঁধ। মনের মধ্যে সবকিছু জড়িয়ে যেতে থাকে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পুরাণ, আমাদের অভিজ্ঞতা। প্রতিরোধ কি নেই কোথাও? মনে হয় না তা। বন্দুকের নলের সামনে বুক রেখে দাঁড়াতেও পারে কেউ। মনে পড়ে আরুণির গল্প। এখনো কি নেই কোনো আরুণি? সবাইকে কি বলি দিতে নিয়ে গেছে তৃষ্ণাদেবতার বেদিমূলে^১।

লোকে ভুলে যেতে চাইলেও কবি আরুণিদের ভুলে যেতে পারেন না। হাজারো বিপন্নতার মধ্যেও কবি খুঁজে চলেন প্রতিরোধের, প্রতিবাদের ভাষা। কেউ আছে কোথাও, তাই নিজের কাছে আবার ফিরে আসা। দিনানুদিনের পাপক্ষয় থেকে পরিপার্শ্বিকে ভালোবেসে কবি জীবনের কাছে ফেরেন। কেননা আজও, প্লাবনে-সংক্ষোভে-বাঞ্ছাশূন্য মেঘে সমস্ত জ্ঞান চেয়ে কেউকেউ আল বেঁধে দিতে পারে।

‘আরুণি উদ্দালক’ ও ‘জাবাল সত্যকাম’ কবিতাদুটিতে বহুস্বরিক দ্যোতনায় শঙ্খ ঘোষ ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী ২০-২৫ বছরেও দেশের মানুষ সঠিক আত্মপরিচয় ও দিশাহীন। আবার পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষেরা দেশ ও আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলে নানা সংকট তৈরি হয় কবি প্রশ্ন রাখেন - ‘আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয়। কেন চাও আত্ম পরিচয়?’ এই আত্মপরিচয়ের উদ্দেশ্যে সমকালের দর্পণে নিজেদেরকে একবার দেখে নেওয়া, উপনিষদ ও মহাভারতের কাহিনিসূত্রকে ব্যবহার করে শঙ্খ ঘোষ আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞানে বহুমাত্রিক অর্থে স্বকালকে চিহ্নিত করেছেন।

কঠোপনিষদের নচিকেতা পিতৃআদেশ পালনে যমলোকে গিয়ে যমকে সন্তুষ্ট করে তিনটি বর লাভ করেছিল পিতার সন্তুষ্টি, স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান বা আত্ম মুক্তি। সংকটদীর্ণ বর্তমানে শঙ্খ ঘোষ উত্তর পুরুষের অভিশাপগ্রস্ত উত্তরাধিকারকে নির্দেশ করেছেন। মিথ্যা কুহকে আচ্ছন্ন সম-সময়ের সংকটের আবর্তে কেবল দহন পরিসর বেড়ে চলে। কবি উপলব্ধি করেন সমকাল যেন আজকের নচিকেতাদের বলি চায়, দ্রাণ, শ্রুতি, স্পর্শ সব দিয়ে তবেই কী ক্রম মুক্তি?

যা কিছু করেছি আর করিওনি যত

এবার যজ্ঞের শেষে দিতে হবে সব।

এবার নিভৃত এই অপমান শোকে

যে কটি অন্তিম জবা উঠেছিল জ্বলে
আগুনে বরিয়ে দিতে হবে। আর তোকে
যমের দক্ষিণ হাতে দিতে হবে আজ
চায় তোকে দৃষ্টিহীন বধির সমাজ।

(নচিকেতা/ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১)

ঔপনিষদের কথাবীজ থেকে শঙ্খ ঘোষ বর্তমানকে গড়ে তোলেন, আত্মমন্ত্রের ইতিহাস সূত্রে নির্মিত হয় প্রতিবাদের দিনলিপি, ক্ষতচিহ্নময় কালকে ধারণ করে আছে ‘নচিকেতা’ কবিতাটি।

‘প্রহরজোড়া ত্রিতাল’ কাব্যগ্রন্থের ‘কঙ্কাল’ কবিতাগুলোর দ্বিতীয় কবিতা ‘জতুগৃহ’। ‘প্রহরজোড়া ত্রিতাল’ কাব্যগ্রন্থের রচনাকাল ১৯৭৭-৮১ সাল। এই সময়ের বাংলা তথা ভারতবর্ষের সুখ-দুঃখময় স্পন্দনগুলি ফুটে উঠেছে এই কাব্যের ‘কঙ্কাল’ কবিতাগুলোতে। মহাভারতে দুর্যোধন জতুগৃহে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল পাণ্ডবদের। কবি শঙ্খ ঘোষ জতুগৃহের রূপকে সমগ্র ভারতবর্ষের সংকটকালীন পরিস্থিতি তুলে ধরলেন। এই কবিতায় জরুরি অবস্থা পরবর্তী সময়ে দিশাহীন যুব সমাজের তীব্র মাদকাসক্তি, আশাহীন দিনযাপন, চোরাগোষ্ঠা আক্রমণ, হত্যা মিলিয়ে গোটা দেশ যেন জতুগৃহে পরিণত হয়েছে বারণাবতের উৎসবে যেন মেতেছে সকলে। পুরানো বা নতুন সকল সম্ভাবনারই যেন অপমৃত্যু ঘটে গেছে। নিবিড় আমাদের চারপাশ জুড়ে মানুষ কেবলই ছিন্ন ভিন্ন, পরিপাটি দাঁতের বহরে রক্তাক্ত হওয়া:

দেশজোড়া মূঢ় বারণাবতের
উৎসবে মেতে উঠেছে নগর
গোপনে গোপনে নিজেদের হাতে
এখানে ওখানে বানিয়ে রেখেছি
বুকফাঁপা ঘুমে আততায়ী ঘর
একজন নয় বহু পুরোচন।

(যতুগৃহ/ গোটাদেশজোড়া জউঘর)

আততায়ী ঘর আর ক্ষমতার দন্ডের কাছে সাধারণ মানুষ ও যুবসমাজের স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে গেছে। সাতের দশকের শুরুতে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তাকে কঠোরভাবে দমন করেছে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র। রাষ্ট্রীয় প্রত্যাঘাতের ফল হয়েছিল মারাত্মক। মণীন্দ্রগুপ্তের ভাষায় তরুণেরা সব কাটা নলী আর বুলেট ফুটো বুক নিয়ে মাটির নীচে শান্তিতে শুয়ে আছে। অ-মানবিক সময়ের দৈত্যমুখের গ্রাসে পরাস্ত হয়ে যুবকেরা মাদকের আড়ালে সব ভুলে থাকতে চাইল। দেশজুড়ে বিষাদ সিন্ধুর এই করুণ রাগিনী ধ্বনিত হয়েছে ‘যতুগৃহ’ কবিতায়। কেবল পথ নির্দেশক বিদুরেরই কোনো দেখা নেই। তাই মহাভারতের যতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা মুক্তি পেলেও বর্তমানের দাহ্য সময়ে সম্মুখে দণ্ড হওয়াই যেন ভবিতব্য, কবি গভীর খেদের সঙ্গে বলেছেন ‘আজ দেশজোড়া বারণাবতের / প্রস্তুত সব জতুগৃহ’।

‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কাব্যের ‘হেতালের লাঠি’ কবিতাটি মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যধারার অনুসৃজন। দৃঢ়প্রত্যয়ী চাঁদ সওদাগর আর পূজা প্রার্থী মনসার দ্বন্দ্বের কথা হলেও আসলে আমাদের স্বপ্ন সংহারক সময়কেই কবি চিহ্নিত করেছেন। হেতালের লাঠি জ্ঞান ও চেতনার প্রতীক। জ্ঞান ও চেতনাহীন হলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতায়

কবি শঙ্খ ঘোষ পিতার যে আততি নিয়ে সন্তানের আরোগ্য কামনা করেছিলেন, তেমনই আততি নিয়ে উত্তর প্রজন্মের সুখ-সফলতার জন্য হেতালের লাঠি হাতে জাগ্রত থাকতে চান। চারপাশ থেকে মায়াঘুম, কলঘুম তাকে গ্রাস করতে চাইলেও তিনি সচেতন, সচেতন করেন অন্য সকলকে, স্বপ্ন দেখেন:

তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর করে
নক্ষত্রবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর।

(হেতালের লাঠি/শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১)

ধানে ভরে যাওয়া তো জীবন সার্থক হওয়া, দশদিক জুড়ে চক্রান্ত আর অন্ধকার-অমানিশার প্রহর পার হয়ে যেতে তিনি জ্ঞান ও সচেতনতার প্রতীক হিসাবে হেতালের লাঠিকে চিহ্নিত করেন। চম্পক নগর অলীক কিছু নয় তা আমাদের যাপনের পরিধি জুড়ে আছে, আর কানীর চক্রান্ত আসলে আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত দান।

যুগ সংকট, মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয়কে কবিতায় রূপ দিতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ পুরাণ ও মহাকাব্যের অনুসৃজন করেছেন। সমকালের তীব্র কোনো সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন পুরাণের বা মহাকাব্যের চরিত্রের মাধ্যমে। আবার ব্যঙ্গের মাধ্যমেও তিনি মহাকাব্যিক চরিত্রকে দিয়েছেন নবতর তাৎপর্য। ‘ধুম লেগেছে হৃৎকমলে’ কাব্যের ‘অন্ধবিলাপ’ কবিতাটি ব্যঙ্গের দ্যোতনায় সমকালের শাসকের স্বরকে চিনিতে দেয়। কবিতার মুহূর্তগ্রন্থে ‘অন্ধবিলাপ’ কবিতার প্রসঙ্গ সূত্রে জানা যাচ্ছে:

তখন আমরা ব্যস্ত আছি রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশ বছর নিয়ে।
তখন আমরা ব্যস্ত আছি রংভরা উৎসবের আয়োজনে।... ঠিক
এইরকম এক সময়ে, পাঞ্জাব থেকে নয়, বিহার থেকে ছুটে
এল খবর। ন-কাঠা জমির সমস্যা নিয়ে তেইশ জন মানুষকে
গুলি করে মেরেছে পুলিশ, আরওয়ালা, তিন দিক ঘিরে এক
গান্ধী মাঠে, এপ্রিলের উনিশ তারিখ^৭।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতাও রাষ্ট্রের সমর্থন পায়, আবার প্রশাসনের অনুমোদনে তৈরি হয় গুণ্ডাবাহিনী ভূমিসেনা, ব্রহ্মর্ষি সেনা, রণবীর সেনা প্রভৃতি। ক্ষমতার দর্পে কৃতপাপের কোন চিহ্ন থাকেনা, আর চিহ্ন থাকলেও বিচার হয় না। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত প্রশাসন ও যেন অন্ধ, স্বার্থপর। সময়ের বিকার ও বেদনাকে শঙ্খ ঘোষ প্রকাশ করেন তীব্র ব্যঙ্গে -

তিনদিকে তিন দেয়াল ঘেরা সাতান্ন রাউন্ড গান্ধীমাঠে
ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে।
অধর্ম? কে ধর্ম মানে? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি?
মারব না কি নিভূর্মিকে? নিরস্ত্রকে? নিরস্ত্রকে?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে?
এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন

সৈন্যে শস্ত্র ছুঁচ্ছে তা নয় কোষ থেকে তা আপনি ছোটো

-অন্ধবিলাপ

দায়িত্বহীন ক্ষমতায় দাপিয়ে বেড়ায় বীরপুঙ্গবের দল। মিথ্যা ভাষণে যুবারা না কি ক্ষমতার কাছে ভেড়ে। পঙ্গু, আতুর সময়ে যুগের ব্যথিকে প্রকাশ করেছেন শঙ্খ ঘোষ। এ-ও যেন এক নব কুরুক্ষেত্র যারা অন্ধ তারাই যেন চোখে দেখে বেশি। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ‘শব্দ পেরিয়ে শব্দহীনতার দিকে’ প্রবন্ধে অন্ধবিলাপ সম্পর্কে বলেছেন -

রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্ররা সবসময়েই অন্ধ থাকেন আর কৌরবদের জয় চান। একুশ শতকের ভারতবর্ষেও ছবিটা এতটুকু বদলায়নি। ন্যান অপটিকন পদ্ধতিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগে রাষ্ট্র আজ প্রতিটি নাগরিকের দিকে নজর রাখবে। মহাভারতের অতীত স্মৃতি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উঠে আসে^৬।

‘লাইনেই ছিলাম বাবা’ কাব্যের ‘দুর্যোধন’ কবিতাটিতেও কবি ব্যঙ্গের আধারে সমকালীন সমাজকে সমালোচিত করেছেন। আমাদের দৈনন্দিনের চারপাশ জুড়ে কেবলই অস্ত্রের আক্ষালন, পেশি প্রদর্শন। এই কালবেলায় মস্তিষ্ক, হৃদয়, চেতনা শব্দগুলি লুপ্তপ্রায়, রোবটের চেতনায় ধ্বংস হাতে ছুটে চলে নারায়ণী সেনা। ভাবলেশহীন, বিকারহীন, কেবল আঞ্জাপালন। আর দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা প্রতাপাশ্রিত স্বরে ঘোষণা করে -

সমস্ত মাঠের বিন্দু আমারই ধর্মের ধান বোনা
সূচ্যগ্র মাটিও আমি অন্য কোনো শরিককে দেবনা
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
আমিই গম্বুজ চূড়া আমি দেশ আমিই সমাজ।
(দুর্যোধন/ লাইনেই ছিলাম বাবা)

নিজেকে সর্বসর্বা ঘোষণা করে হিমাচল থেকে সাগর পর্যন্ত সম্রাটের রাজত্ব কায়াম করতে চায় এ যুগের বলদপী দুর্যোধনেরা। কবি শঙ্খ ঘোষ সেই দাস্তিক, ক্ষমতার স্বরকে আমাদের চিনিতে দেন।

‘গোটাদেশজোড়া জউঘর’ কাব্যটি শঙ্খ ঘোষের প্রতিবাদী কাব্যগুলির অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। ‘সৌপ্তিক পর্ব’ এই কাব্য গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা। প্রেমে বা যুদ্ধে নীতিহীনতার কথা দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে। নিদারুণ সংহার সময়ে শত্রু-মিত্রহীনভাবেই কেবলই অস্ত্র চালনা, যুদ্ধের পথ ন্যায়-অন্যায় তাড়িত নয়, শুধু জয়ের লক্ষে ধাবিত হওয়া। প্রবল বহমান বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কুশীলবেরা সুযোগের প্রতীক্ষা করে প্রতিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য -

হে মাতুল, দ্বিধা নয়, অন্ধকার ঘিরেছে সময়
এসো আমরা হত্যাযন্ত্র নিয়ে
অস্ত্র হাতে ঢুকে পড়ি অতর্কিতে ঘুমন্ত শিবিরে।

(সৌপ্তিক পর্ব)

অস্ত্র হাতে, অস্ত্রের দৌড়ে মেতেছে একবিংশের পৃথিবী। রীতি, নীতি সব বিসর্জিত হয়ে শুধু সর্বনাশের প্রহর গোনে। পুরাণ, মহাকাব্য নানা অর্থের দ্যোতনা নিয়ে হাজির হয়। কবি

শঙ্খ ঘোষের সৃজন বিশ্লেষণে পুরাণ ও মহাকাব্য নতুন আয়তনে এ যুগের সামাজিক মানুষকে ছুঁয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ শঙ্খ, ২০০৭ ‘শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ-১’, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২৫
২. ভট্টাচার্য সুতপা, ২০০৩ ‘গাঢ় শঙ্খের খোঁজে’, কলকাতা প্যাপিরাস, ফেব্রুয়ারি, পৃ. ৫
৩. ঘোষ শঙ্খ, ১৯৯৭ ‘কবিতার মুহূর্ত’, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা, অনুষ্টিপ প্রকাশনী, পৃ. ৩৫
৪. ওই, পৃ. ৩৫।
৫. ওই, পৃ. ৯৭
৬. সিংহ শান্তি (সম্পা.), ২০১৩, ‘শঙ্খ ঘোষ’, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন, পৃ. ১৬২।

নতুন মানবিক সমাজ গঠনে সমন্বিত শিক্ষার ভূমিকা : শ্রী অরবিন্দের দর্শনভিত্তিক চিন্তাধারা

প্রিয়ান্বিতা নন্দর

সহকারী অধ্যাপক, বি.এড. বিভাগ
দেব নারায়ন শিক্ষা সংস্থান কলেজ (বি.এড. ও ডি.এল.এড.)

সারসংক্ষেপ: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাদর্শন একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা মানুষের সামগ্রিক বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমন্বিত শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। এই প্রবন্ধটি একটি নতুন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য অবিচ্ছেদ্য শিক্ষার অবদান পরীক্ষা করে। এই গবেষণা পত্রে শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তার মূল দিকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তা কিভাবে এক নতুন মানবিক সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে। বর্তমান শিক্ষায় সমন্বয় শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা কতটা তা আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ গৌণ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, এবং গুণগত গবেষণা ভিত্তিক বিষয় পর্যালোচনা হয়। শিক্ষার বিভিন্ন মাত্রাকে সমন্বিত করার মাধ্যমে মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্য রেখে এক প্রগতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে, সমন্বিত শিক্ষা আজ ব্যক্তির মধ্যে অপরিসর্য মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এবং আত্মসচেতনতা বোধ গড়ে তোলে।

সূচক শব্দ: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন, সমন্বিত শিক্ষা, মানবিক সমাজ গঠন, বর্তমান শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা।

মূল আলোচনা:

আধুনিক শিক্ষা হল মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন উন্নত মানুষ তৈরি করা, যারা শুধুমাত্র জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় ও দক্ষতাই সমৃদ্ধ হবে না, সং ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক সচেতনতা বোধ গড়ে তোলে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সারা জীবন ধরে শিখতে উৎসাহিত করে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। যার ফলে শিক্ষার্থী নিজেদের মধ্যে এক সৃজনশীলতার সম্ভাবনার সন্ধান পায়, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায়। কিন্তু এখন শিক্ষা বিশ্বের অর্থ, স্থায়িত্ব এবং পরিচয়ের সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, উপযোগীবাদী এবং বস্তুবাদী মূল্যবোধে আবদ্ধ। সেখানে আধ্যাত্মিকতা প্রায়শই অবহেলিত হয়। তাই ব্যক্তিকে নিজের অস্তিত্বের সাথে সমাজের চাহিদার মেলবন্ধন ঘটাতে মোকাবিলা করতে হয়। অনেক সময় ব্যক্তি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের যোগ্য বিপ্লবী, দার্শনিক, যোগী ও শিক্ষাবিদ হলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। তিনি ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট কলকাতার কাছেই কোল্লগরে জন্মগ্রহণ করেন (এলোমেলো শিক্ষা, ২০১৮)। পিতা ছিলেন কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতা স্বর্ণলতা ঘোষ। ইংল্যান্ডে প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেন তিনি এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেশাল ট্রাইপোজে প্রথম হয়ে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক স্তর উত্তীর্ণ হন। ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি আই.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তিঙ্কতার সহিত ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার বিমুখ হয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না (এলোমেলা শিক্ষা, ২০১৮)। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। দেশে ফিরে তিনি দেশীয় সংস্কৃতি ও দর্শনকে গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় বিপ্লবী বালগঙ্গাধর তিলকের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন (এলোমেলা শিক্ষা, ২০১৮)। "১৯০২ সালে তিনি দেশের বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন (হালদার, ত. ২০১৬)।" ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকাপাকিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে তিনি কারাগারে বন্দিও হন। তখন শ্রী অরবিন্দের মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। ভগবত গীতাই তাঁর আত্ম অনুসন্ধানের পথ দেখায়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান এবং সেখান থেকে পন্ডিচেরিতে চলে গিয়ে আশ্রম তৈরি করেন। তিনি অনুভব করেন সকল মানুষের চিত্রের মুক্তির মাধ্যমে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের সাথে ব্যক্তি নিজেই নিযুক্ত করে, মানসিক স্তরকে উন্নত করতে সক্ষম হয়। আত্ম উপলব্ধিতে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। এইভাবে তিনি রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে আধ্যাত্মিক হওয়ার পথকে খুঁজে পান। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরি আশ্রমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যা (১৯৫২) বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র (আরাহিল) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এখান থেকেই তার শিক্ষা দর্শনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫০ সালে ৫ই ডিসেম্বর তিনি ইউরেমিয়া রোগে আক্রান্ত হন এবং দেহত্যাগ করেন (উইকিপিডিয়া)।

শ্রী অরবিন্দের প্রস্তাবিত অখণ্ড শিক্ষা, মানুষের সমস্ত দিককে প্রভাবিত করে এবং জীবন পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সমন্বিত শিক্ষা একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। (স্যান্যাল, আই. এবং গাঙ্গুলি, এ. ২০১১): গবেষকরা এই গবেষণাপত্রে শ্রী অরবিন্দের উপনিষদ ভিত্তিক সামগ্রিক শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। শ্রী অরবিন্দের সমন্বিত শিক্ষা একটি শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিক থেকে সমগ্র বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে উচ্চ সত্তায় পরিণত করা। এই বিভাগটি সমন্বিত শিক্ষার দর্শন এবং একটি নতুন মানবতা গড়ে তোলার জন্য প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় দেয়। (সাহা ও মাঝি, ২০১৩) : তাদের গবেষণা পত্রে শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তাভাবনা আলোচিত হয়েছে। শ্রী অরবিন্দের সমন্বিত শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক বিকাশের এক সামগ্রিক পদ্ধতি। তিনি শিক্ষার্থীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করার শিক্ষার কথা বলেন।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণা পত্রটির মূল উদ্দেশ্য হল -

১. শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তা-ধারার মূল দিকগুলি বিশ্লেষণ করা।
২. সমন্বয়ধর্মী শিক্ষা কিভাবে এক নতুন মানবিক সমাজ গঠনে অবদান রাখে তা বিস্তারিত আলোচনা করা।
৩. বর্তমান শিক্ষায় শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণা বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে গুণগত গবেষণা ভিত্তিক চর্চিত হয়। বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য গৌণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন জার্নাল, গবেষণা পত্র, গ্রন্থপঞ্জি ও বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি: 'A system of national education' থেকে আমরা শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারি, তাঁর মতে "শিক্ষা হলো ঐশ্বরিক জীবনের জন্য মানুষকে তৈরি করা ও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করা (চন্দ, বি., হালদার, টি., পেজ ৩৮৪)।" তিনি দার্শনিক হিসেবে একজন ভাববাদী ছিলেন। ভারতীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে অরবিন্দ ঘোষের চিন্তাধারা তৈরি হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপরে জোর দেয়। তাই শিক্ষা সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ চিন্তাধারা "পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা" (Integral Education) নামে পরিচিত। গবেষণায় শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের সামগ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন পর্যালোচনা করে গবেষকরা উপলব্ধি করেন শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দিককে অন্তর্ভুক্ত করে সামগ্রিক শিক্ষা, যার লক্ষ্য ব্যক্তির মননশীলতা অনুশীলন ও মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া। এই শিক্ষা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ব্যক্তিকে শক্তিশালী করে তোলে (দাস, কে এবং রায়, এস ২০২৪)। "শ্রী অরবিন্দ বলেন, শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির জীবন, মন ও আত্মাকে তার প্রতিবেশীদের জীবন, মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে সহায়তা করে (রায়, স. ২০১৬)।" তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে মানব সত্তার পাঁচটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যথা- শারীরিক, প্রাণিক, মানসিক, আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই হোক যা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্পদকে জাগ্রত করে বা অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, যার পরবর্তীকালে প্রকাশ ঘটে। এই গবেষণাপত্রে শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা শিক্ষার্থীর মনসামাজিক এবং জীবন দর্শন এবং আত্ম উপলব্ধি মূলক শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা পর্যালোচনা হয় (ঘোষ, এস. এবং রায়, এস. ২০২৩)।

শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে দেশীয় প্রেম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে চেতনা বোধ ঘটনা সম্ভব। তাই তিনি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রী অরবিন্দ আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করতেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই গবেষণা পত্রটি শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তা ধারা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর সংযোগ নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষা নিয়ে শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক উন্নয়নী জ্ঞান ও ব্যক্তির সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমসাময়িক ভাবে ব্যক্তি ও সমাজের সামগ্রিক বিকাশ নিয়ে পর্যালোচনা করেন (হোসেন, আই.এ. এবং মল্লিক, এল., ২০২৫)। প্রকৃত শিক্ষা হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে, মাতৃভাষা সম্পূর্ণ হলে অন্য ভাষায় শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা পড়ে না বলে তিনি মনে করতেন। জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। ক্রমশ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যক্তির মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে, তাই পুরনো মূল্যবোধের সাথে নতুন মূল্যবোধ সংযুক্ত হতে থাকে। তিনি মনে করেন উচ্চ মূল্যবোধই হল একা, যা পরিবর্তনশীল সমাজে ব্যক্তিকে একসাথে বেঁধে রাখে।

সমন্বিত শিক্ষার মূল ধারণা: শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাব্যবস্থা প্রাচীন বেদভিত্তিক। তিনি মনে করতেন প্রকৃত শিক্ষা হলো ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা, সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্বমানব সত্তার সমন্বয়। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাদর্শন হলো তাঁর জীবন দর্শন। তিনি শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেছেন, এটি একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। যথা -

১. ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলোকে বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।
২. এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
৩. শিক্ষা ব্যক্তিকে সর্বজনীন, সর্বশক্তিমান বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। শ্রী অরবিন্দ এই ধরনের শিক্ষাকে Integrated Education বা সমন্বিত শিক্ষা বলেছেন। অর্থাৎ শিক্ষা অন্তর জগৎ ও বাহ্যিক জগৎ এর মেলবন্ধন। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন - "Integral Education aims at integrating the material and spiritual dimension of personality." অর্থাৎ শিক্ষার একটি লক্ষ্য হল, ব্যক্তিসত্তার বস্তুনিষ্ঠতা এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা (রায়, স.)।

সমন্বয় শিক্ষার মূল দিকগুলি হল শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও জীবনমুখী শিক্ষা। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো অরোবিল স্কুলে শ্রী অরবিন্দের সমন্বয় শিক্ষার দুটি দিক শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুশীলনের সমালোচনামূলক তুলনা করা। শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমন্বয় শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি স্কুল অন্য স্কুলের তুলনায় শারীরিক দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে একটি স্কুল অন্য স্কুলের থেকে এগিয়ে। সমস্ত স্কুলে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দিকের বিকাশ ঘটিত কার্যকলাপ আয়োজন করা উচিত তা গবেষক অধ্যয়নে আলোচনা করেন (যাদব, এস. এবং শর্মা, আর. আর. ২০১৮)। সমন্বয় শিক্ষার মূল দিকগুলি নিম্নে আলোচিত-

- **শারীরিক শিক্ষা:**

যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর শারীরিক বিভিন্ন দিকের বিকাশের পরিপূর্ণভাবে গঠনে সাহায্য করে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে পরিণত করে, তা হলো শরীরচর্চা মূলক শিক্ষা। শিক্ষার্থীর শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য উন্নত সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া খুব প্রয়োজন যেমন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে খেলাধুলা, যোগাড় করে দৌড়ঝাঁপ, জলপিয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি।

- **মানসিক শিক্ষা :**

মানসিক শিক্ষা বলতে বোঝায় সাধারণত বুদ্ধি প্রবালক শিক্ষা। মানসিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর মনকে কর্ষণ করা। মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ও প্রসারণ ঘটানো। তিনি মানসিক শক্তি বলতে বুঝিয়েছেন বুদ্ধি, প্রবণতা, চেতনা, স্মৃতিশক্তি, প্রেমা ও আগ্রহ ইত্যাদিকে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান বৃদ্ধি ও চিন্তা করার ক্ষমতা কে উৎকর্ষণ করতে হলে পাঠক্রমে ভাষা, গণিত সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- **আধ্যাত্মিক শিক্ষা:**

এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর আত্মাকে পরমাত্মার সাথে যোগ সাধন ঘটায়। আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তি আত্মার বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তি নিজের আত্মাকে বিশ্ব জগতের কাছে সমর্পণ করে, যাতে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় ঘটে। তাহলে ব্যক্তির

অন্তর্নিহিত চেতনার বিকাশ সাধন সম্ভব। ধ্যান, প্রার্থনা, মহান ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি কার্যাবলী পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী।

• **জীবনমুখী শিক্ষা:**

শ্রী অরবিন্দ বলতেন শিক্ষা যেন সার্বিক বিকাশ ঘটায় এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সেই শিক্ষাকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে। তবেই সেই শিক্ষা জীবনমুখী শিক্ষাতে পরিণত হবে। সাধারণত জীবন শক্তির বিকাশ বলতে ব্যক্তির সামাজিক ও ব্যক্তিসত্তার বিকাশ কে বোঝায়। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ইন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ। তাই পাঠক্রমে পর্যবেক্ষণ যুক্ত, সৌন্দর্য অনুভূতি যুক্ত ও সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি কার্যাবলী রাখা হবে। যাতে শিক্ষার্থীকে একজন স্বাবলম্বী ও উপযোগী সুনাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

আত্মোন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য তিনি বৃত্তিমুখী শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন। তাই পাঠক্রম স্তরে কলা, চিত্রন, ফটোগ্রাফি, কাঠের কাজ, সেলাই, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, নৃত্য, সংগীত ও নাটক ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অরবিন্দের মতে এই ধরনের পাঠক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার বিকাশ ঘটায়।

সমন্বয় শিক্ষার গুরুত্ব:

১. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ:

শ্রী অরবিন্দের মতে, শিক্ষা শুধু তথ্য সংগ্রহ করা নয়, সেই বিষয়কে নিয়ে চিন্তা করা, অনুভব করা, আচরণ ও আত্ম প্রকাশ ঘটানো। এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে আর প্রকৃত অর্থে "মানুষ" হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

২. আত্মসচেতনতা ও আত্মোপলব্ধি:

শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তি, গুণাগুণ ও সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব। তখন শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মসচেতনতাবোধ গড়ে ওঠে। এই আত্মসচেতনতা একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

৩. নৈতিক উন্নয়ন:

তিনি মনে করতেন শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো ধর্মবোধ। ধর্ম বলতে ব্যক্তির কাজকে বোঝায়। সামগ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে ভালো মন্দের অনুভূতি, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহনশীলতা সমস্ত গুণাবলীর উন্নয়ন মূলক চেতনা গড়ে তোলে, যা সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৪. শারীরিক বিকাশের গুরুত্ব:

তিনি মনে করতেন শারীরিক বিকাশ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই শরীরচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুস্থ দেহে সুস্থ মনের অস্তিত্ব রয়েছে। তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী মন ও আত্মার বিকাশ সম্ভব।

৫. সৃজনশীলতা ও চিন্তাশক্তি উন্নয়ন:

শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞান অর্জন করা নয়, তিনি মনে করতেন শিক্ষা শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতাকে জাগিয়ে তোলে, যা জীবনে চলার পথে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে দক্ষ করে তোলে।

নতুন মানবিক সমাজের গঠনে সমন্বিত শিক্ষার ভূমিকা:

সমন্বিত শিক্ষা হলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশকে সমন্বিত করে বা ঐক্যবদ্ধ করে। যা একটি নতুন মানব সমাজ গড়ে তুলতে অপরিণীম অবদান রাখে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়। "শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়গুলি ঘটতে পারলে, ব্যক্তি তার জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে (রায়, স., ২০১৬)"। তাই এই শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ উন্নয়নে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। যথা-

নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা :

নৈতিকতা ও মূল্য বোধ ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে দায়িত্বশীলতা সহনশীলতা, সহযোগিতা ও ন্যায়পরায়ণতা গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। যা আগামী দিনে স্থিতিশীল এবং উন্নয়নমূলক সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাম্য, ঐক্য ও সহযোগিতামূলক সমাজ গঠন:

এই শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে এক সম্প্রীতি ও সৌন্দর্যের সম্পর্ক গড়ে তোলে যা বিশ্বে শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে। সামাজিক বৈষম্যকে দূরে সরিয়ে প্রত্যেক মানুষকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে ও সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে।

ব্যবহারিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষা :

সামগ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে দক্ষশীল করে তোলে এবং বাস্তবমুখী চিন্তাধারায় গড়ে তোলে। যেখানে একটি কর্মমুখী সমাজ গড়ে ওঠে।

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বিত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বিত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমন্বয়যোগ্য। আধুনিক ও সমন্বিত শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। একটি সুসংগঠিত সমাজ, দক্ষ মানবসম্পদ ও নৈতিকভাবে উন্নত নাগরিক গড়তে এই দুইয়ের সমন্বয় আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১. জ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়:

প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা এখন তথ্যভিত্তিক হয়ে উঠেছে। এই তথ্যভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু শুধুমাত্র প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। নীতিবোধ ও মূল্যবোধ এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সমন্বিত হয়ে সহনশীল সমাজ গঠনে সহযোগিতা করে।

২. ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক:

আধুনিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়। সমন্বিত শিক্ষা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে, যা একজন শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে, দায়িত্বশীল গুণাবলী বিকাশে ও সহনশীল নেতৃত্ব সম্পন্ন সুনাগরিক হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে।

৩. সমাজে সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ

সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হয়। সহযোগিতা ও সহর্মিতা গুণাবলীর দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজে একসাথে সহাবস্থান করতে উৎসাহিত করে। Delors commission

এ শিক্ষার চারটি পিলারের কথা উল্লেখ পাই। সেখানে সহবাস্থানের কথা বলা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর delors কমিশনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৪. বহুমাত্রিক দক্ষতা অর্জন

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ ঘটানো। তাই শিক্ষার্থী শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করবে তা নয়, বিভিন্ন কর্মেও সে সম পারদর্শী হবে। তবেই সে সমাজের টিকে থাকতে সক্ষম হবে। একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী বিশেষ অবদান রাখে।

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাদর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা:

ভগবত গীতাকে কেন্দ্র করে শ্রী অরবিন্দের জীবনদর্শন প্রভাবিত হয়। তার জীবন দর্শনের কেন্দ্র হল ব্যক্তি ও সমাজ। তিনি শিক্ষা চিন্তায় যেমন ব্যক্তি ও সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন তেমন নৈতিক ও ধর্মীয়বোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটানো। তাই শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তা বর্তমান শিক্ষার চাহিদাকে পরিপূর্ণ করে। গবেষক এই অধ্যয়নে শ্রী অরবিন্দের শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তাঁর শিক্ষা চিন্তা হল বোধমূলক ও বর্তমান শিক্ষায় প্রাসঙ্গিক। শ্রী অরবিন্দের সমন্বিত শিক্ষা ব্যক্তির শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক ও আত্মার সংযোগ ঘটিয়ে জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করে (শেখ, এ. এইচ. ২০২০)। বর্তমান শিক্ষা শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের সুযোগ দেয়, যা তিনি অনেক আগেই তাঁর শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার্থীর চাহিদা কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের শিক্ষায় সমস্যাগুলি বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা:

১. কর্মসংস্থান ও শিক্ষার মধ্যে ফারাক রয়ে যাচ্ছে। পুঁথি-ভিত্তিক তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে সক্ষম নয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষায় সুযোগ খুবই কম। তাই শিক্ষার্থী কর্মজগতে অসফল থেকে যায়।

২. অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত শিক্ষার উপকরণের অভাব রয়েছে ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও অভাব রয়েছে যার কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে। ফলে শিক্ষার গুণগতমানের অভাব দেখা যাচ্ছে।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীলতার অভাব রয়েছে। এখনো শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবক শিক্ষার্থীর মুখস্ত বিদ্যার উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর শিক্ষার ফলাফলের অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। তাদের চিন্তা ক্ষমতা ও সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় অবহেলিত হচ্ছে।

৪. অর্থনৈতিক বৈষম্যতার কারণে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে। এখনো অত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে সরকারি প্রাপ্ত স্কলারশিপ শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছয় না, ফলে তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী থাকে না।

৫. আধুনিক শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। দরিদ্র পরিবার থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই তারা শিক্ষার মূল স্রোত থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে। বর্তমানে, শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহারে গ্রামীণ ও শহরের শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

সমাদান:

১. প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসূচি ও দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ব উন্নয়নের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

২. উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা উপকরণের সুব্যবস্থা রাখা। এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক নির্দেশনা পায়। শিক্ষার গুণগত মানকে উন্নত করতে অত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ডিজিটাল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে আনন্দমূলক ও সৃজনশীল করে তুলতে হবে। যাতে শিক্ষার্থী অনেক বেশি শিক্ষাগ্রহণে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নিজের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রকাশ ঘটায়। পাঠ্যসূচির সাথে সাথে সমস্যা ভিত্তিক ও প্রকল্প ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. প্রান্তিক ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার উপবৃত্তি ও ফ্রি টিউশনের প্রোগ্রামগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে আর্থিক সমস্যা বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। শিক্ষা হল সমাজের মেরুদণ্ড। শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে নেতৃত্বপরায়ণ, দায়িত্বশীল সুনামগ্রহীত্ব করে উঠতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী মানবিক ও সহনশীল মানুষে পরিণত হয়, যা সমাজে শান্তি ও একসাথে বসবাস করার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে। শিক্ষিত মানুষই হল দক্ষ মানবসম্পদ, যারা সমাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ও নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। সমাজে আর্থিক উন্নতিতে সহযোগিতা করে। শিক্ষার্থীকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করে টেকসই মূলক শিক্ষা। তাই শিক্ষা ছাড়া উন্নত সমাজ গঠন কখনোই সম্ভব নয়।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি শ্রী অরবিন্দ ছিলেন একজন মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও মহান শিক্ষাবিদ। শ্রী অরবিন্দের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক বিকাশ ও সমন্বিত ব্যক্তিসত্তা গঠন, জাতীয় সংহিতা গড়ে তোলা, ব্যক্তি সত্তার সাথে সামাজিক অঙ্গীকার এক আদর্শ সমাজ বা দেশ গঠন করা। তার শিক্ষা চিন্তা ধারায় দেশীয় সংস্কৃতি ও দেশীয় জনগণের চাহিদা প্রধান স্থান পায়। শ্রী অরবিন্দের সমন্বয়ে শিক্ষা দর্শন ব্যক্তির বস্তুবাদ জ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার সাথে যুক্ত করে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের প্রতিষ্ঠা করে। এই শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ ঘটানো যা আধুনিক অগ্রগতির সাথে জড়িত। সমন্বিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এক সুস্থ মানবিক সমাজ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই গবেষণা পত্রে শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা ও তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাদর্শন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা একটি নতুন মানবিক সমাজ গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যসূত্র:

রায়, স. (২০১৬), প্রারম্ভিক শিক্ষা তত্ত্বের রূপরেখা, শোভা পাবলিকেশন, পেজ: ২৬২-২৬৩।

হালদার, ত. (২০১৬), প্রজ্ঞা ও পাঠ্যক্রম, আহেলি পাবলিকেশন, পেজ: ৮২-৮৩

দাস, কে. এবং রায়, এস. (২০২৪), শ্রী অরবিন্দের শিক্ষামূলক দর্শন: সামগ্রিক শিক্ষার জন্য একটি অতুলনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট*.

<https://eprajournals.com>

হোসেন, ই. এ. এবং মল্লিক, এল. (২০২৫), ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন ও জাতীয় শিক্ষা ২০২০ এর প্রাসঙ্গিকতা : একটি দার্শনিক অনুসন্ধান, *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রেন্ডস*, ৭(৪), ২২৪-২৩৩।

Shaikh, A. H. (2020), Philosophical thoughts of Aurobindo: Its impact on Modern Educational System, *International Journal of engineering applied Sciences and technology*.vol.5, Issue.8, ISSN No.2455-2143, pages:232-234.

Ghose, S. & Roy, S. (2023), An Insight into Rishi Aurobindo's Thoughts on Education: Assimilated Views, *The Social Science Review A Multidisciplinary Journal*. Vol. 1. Issue 2. 89-96, ISSN: 2584-0789.

Yadav, S. & Sharma, R.R. (2018), Shri Aurobindo's integral Education: Practice of Physical and Spiritual in Auroville schools, *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, ISSN: 2230-7540, Vol- 15, Issue no 9, pages 305-311.

বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

প্রেম কুমার মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কলকাতার বাইরেও যে মফস্সল শহরগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার অন্যতম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট। স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বালুরঘাটের নাট্য ঐতিহ্য বেশ সমৃদ্ধশালী - যা বহন করেছে ‘বালুরঘাট নাট্যমন্দির’। দেশভাগের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ‘নাট্যমন্দির মঞ্চ’ একের পর এক সফল নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে বালুরঘাটের মানুষকে দারুণভাবে নাট্যমনস্ক করে তোলে। মন্মথ রায়ের মতো যশস্বী নাট্যকার ও অভিনেতা এবং নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন গুহ, ফণী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক নিবেদিত চিত্র মঞ্চকর্মীর নিষ্ঠায় সত্তরের দশকেই বালুরঘাট পুরোপুরি নাটকের শহর হয়ে ওঠে। এই শহরেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ছাত্রজীবনেই গড়ে তোলেন ‘তরুণতীর্থ’ নাট্যদল। কলকাতায় পড়তে গিয়ে হাওড়ার ‘নটনাট্যম’ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগমোহন মজুমদারের নির্দেশনায় অভিনয় করতে থাকেন। কলকাতা থেকে ফিরে ১৯৬৯ সালে গড়ে তোলেন ‘ত্রিতীর্থ’ নাট্যদল। শুরুর দিকে ত্রিতীর্থের প্রযোজনা বালুরঘাট শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৭২ সালে কলকাতার ম্যাক্সমূলার ভবনে ‘তিন বিজ্ঞানী’ ও ‘ভাঙ্গাপট’ নাটকদুটি অভিনয় করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কলকাতার দর্শকদের কাছেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর নাটকে, অভিনয়ে ও নির্দেশনায় উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের মানুষের সুখ-দুঃখ, লোকাচার, ভাষা ও সংস্কৃতি। সমগ্র উত্তরবাংলা জুড়ে গ্রুপ থিয়েটারের ঐতিহ্যকে ধারণ করে হরিমাধব তার রেশ পৌঁছে দিয়েছেন কলকাতার মঞ্চেও - স্থান করে নিয়েছেন কলকাতার খ্যাতনামা নির্দেশকদের সাথেই একই বন্ধনীতে।

সূচক শব্দ: উত্তরবঙ্গ, বালুরঘাট, কলকাতা, নির্দেশক, সংস্কৃতিক আন্দোলন, নাটক।

মূল আলোচনা:

বাংলার যেকোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা সামাজিক আন্দোলনে কলকাতার গুরুত্ব স্বীকার করেও বলতে হয় কেবল কলকাতা কেন্দ্রিকতা নয়, কলকাতার বাইরেও ছোট শহরগুলি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তেভাগা আন্দোলন ও নকশাল আন্দোলনের সূতিকাগার যেমন হয়েছে জেলা তথা গ্রামীণ এলাকা তেমনি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কলকাতার সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে জেলার মফস্সল শহরগুলি। এক্ষেত্রে দুর্গাপুরের ‘কল্লোল থিয়েটার গ্রুপ’, ‘প্রগতি’, ‘স্মারক’, খড়দহের ‘তরুণ সংঘ’, শিলিগুড়ির ‘কর্ণিকা’, ‘মিত্র সম্মিলনী’, রায়গঞ্জের ‘বিবেকানন্দ নাট্যচক্র’, বালুরঘাটের ‘নাট্য মন্দির’, ‘ত্রিতীর্থ’, বহরমপুরের ‘রেপার্টেরি’ প্রভৃতি দলগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নাট্য-আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করেও যে শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল তার অন্যতম কারণ ছিল কিছু নাট্যকর্মীর নিরলস প্রয়াস ও নিষ্ঠা। তাঁদের অন্যতম বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ নাট্যদলের অন্যতম সংগঠক তথা নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণস্রবতার একটি দিক প্রথম থেকেই উত্তরবঙ্গ ধারণ করেছে। উত্তরবঙ্গের রংপুর (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) শহরের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা এবং এখানকার নাট্যসংস্কৃতির কথা আমাদের অজানা নয়। কেননা, এই অঞ্চলেই বেড়ে উঠেছিলেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ি এবং তাঁর প্রথম নাটকও ('দুঃখীর ইমান') এই অঞ্চলের মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই রচিত। এছাড়াও রবি রায়, ভূমেন রায়, কালিন্দী সেন-এর মতো থিয়েটার শিল্পীরা বেড়ে উঠেছিলেন রংপুরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। তৃপ্তি মিত্রের মতো শিল্পীরাও যে শৈশবেই নাটকের সাথে পরিচয় ঘটে তা এই রংপুর করোনেশন থিয়েটারে। কুমার রায়ের মতো শিল্পী এসেছিলেন দিনাজপুর থেকে। একইভাবে উত্তরবঙ্গের নাট্য সংস্কৃতির আর একটি পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৩ সালে জেলা ভাগের ফলে এই বালুরঘাট হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শহর।

বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের যুগে – স্টার থিয়েটার যখন সাফল্যের মধ্যগগনে, এক বছর আগেই মারা গেছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, সেই সময় কলকাতা থেকে প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার দূরে ১৯০৯ সালে 'বালুরঘাট থিয়েট্রিকাল অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়ে 'হ্যামলেট' নাটকের বাংলা সংস্করণ 'হরিরাজ' নাটকের অভিনয়ের মধ্যদিয়ে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের সূচনা হয় বালুরঘাটে। ১৯১১ সালে এর নাম হয় 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন' – স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যা 'বালুরঘাট নাট্য মন্দির' নামে বিখ্যাত হয়। দেশভাগের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে পঞ্চগশ ও ষাটের দশকে 'নাট্য মন্দির মঞ্চ' একের পর এক সফল নাট্য প্রযোজনার মাধ্যমে বালুরঘাটের মানুষকে দারুণভাবে নাট্যমনস্ক করে তোলে। মন্মথ রায়ের মতো যশস্বী নাট্যকার ও অভিনেতা এবং নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন গুহ, ফণী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেক নিবেদিত চিত্র মঞ্চকর্মীর নিষ্ঠায় সত্তরের দশকেই বালুরঘাট পুরোপুরি নাটকের শহর হয়ে ওঠে। একের পর এক গড়ে ওঠে 'প্রাচ্য ভারতী', 'তরুণতীর্থ', 'ত্রিশূল', 'তুণীর' প্রভৃতি নাট্য সংস্থা।

বালুরঘাটের এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ১৯৪১ সালের ৩রা এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও মাতা সরোজিনী মুখোপাধ্যায়। পিতা ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত কীর্তন শিল্পী। সুদর্শন পুরুষ নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় অভিনয়ও করতেন। যুক্ত ছিলেন 'বালুরঘাট নাট্য মন্দির'ের সঙ্গে, অভিনয় করেছেন 'বিল্বমঙ্গল', 'চণ্ডীদাস' প্রভৃতি নাটকের মুখ্য চরিত্রে। ফলে একদিকে নাটক যেমন তাঁর রক্তে ছিল, একই সাথে পারিবারিক নাট্যিকপরিমণ্ডল এবং বালুরঘাটের সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে উঠতেই তাঁর মধ্যে নাটকের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে সপ্তম শ্রেণির বালক হরিমাধব বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'তরুণতীর্থ' নাট্যদল। নিজের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন 'বন্দীবীর' নাটকটি।

বালুরঘাট হাই স্কুল থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতার সিটি কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬২ সালে স্নাতক হন। এরপর ১৯৬৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এইসময় তিনি হাওড়ার 'নটনাট্যম' দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জগমোহন মজুমদারের নির্দেশনায় 'বিজ্ঞাপন', 'করুণা কোরোনা', 'পাখির বাসা', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে দর্শক প্রিয়তা যেমন লাভ করেন তেমনি কলকাতার নাট্যমহলেরও পরিচিত হয়ে ওঠেন। 'উত্তাল'-এর কুড়ি বছর ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের

নাট্যকৃতির ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় অরুণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন – “হরিমাধবের সঙ্গে আমার চেনা-জানা অনেক আগে থেকে। ‘ত্রিতীর্থ’র পরিচালক হিসেবে তখনও তার আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। তখন সে হাওড়ায় থাকতো এবং হাওড়ার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা ‘নট-নাট্যম’এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীর পরিচালক জগমোহন মজুমদারের সঙ্গে আমার সখ্যতা ছিল। তাঁর পরিচালনায় একটি নাটকে ... হরিমাধবের অভিনয় দেখে আমি চমকৃত হই এবং জগমোহনবাবুর কাছ থেকে জানতে চাই এমন একজন চৌকস অভিনেতাকে আবিষ্কার করলেন কোথা থেকে? তারপরই হরিমাধবের সঙ্গে আমার আলাপ এবং তখন থেকেই হরিমাধব আমার কাছে মাধব হয়ে গেল।”^১ ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এই নাট্যদলের সাথে যুক্ত ছিলেন। এর পরে তিনি বালুরঘাটে ফিরে আসেন এবং ‘বালুরঘাট নাট্য মন্দিরে’ নির্দেশক হিসেবে কাজ শুরু করেন। অবশ্য কলকাতায় থকাকালীন সময়ে মাঝে মাঝেই বালুরঘাটে এসে ‘তরুণ তীর্থের’ প্রযোজনায় একাধিক নাটক নিজের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘বন্দীবীর’, ‘সিরাজের স্বপ্ন’, ‘ছেঁড়া কাগজের বুড়ি’ ‘পাপ ও পাপী’, ‘আক্কেল সেলামী’ ‘নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’, ‘শেষ থেকে শুরু’, দায়ে পড়ে দারগ্রহ’, ‘পাখির বাসা’, ‘রজনীগন্ধা’, ‘বিজ্ঞাপন’ প্রভৃতি।

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ‘নাট্য মন্দিরের’ সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে ‘তরুণ তীর্থের’ সাথে যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি। ‘নাট্য মন্দিরে’ তিনি ‘চার প্রহর’, ‘অমৃত্য পুত্রাঃ’, ‘ছায়ানায়িকা’, ‘অমৃত অতীত’, প্রভৃতি নাটকে নির্দেশনা দেন। অল্পদিনের মধ্যেই (১৯৬৯) তিনি তাঁর দলবলসহ ‘নাট্য মন্দির’ থেকে বেরিয়ে যান এবং ‘তরুণ তীর্থ’ ও ‘ত্রিশূল’ নাট্যদলদুটিকে একত্র করে ১৯৬৯ সালে গড়ে তোলেন ‘ত্রিতীর্থ’ নাট্যদল। এরপর থেকে তাঁর নাট্যকার জীবনের সিংহভাগ জুড়ে আছে ‘ত্রিতীর্থের’ নাট্যচর্চা। অবশ্য কেবল ত্রিতীর্থ নয়, সমগ্র উত্তরবাংলা জুড়েই নাটকের মানুষ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের অবাধ বিচরণ। তাঁকে বাদ দিয়ে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার পর্যালোচনা অপর্যাপ্ত থেকে যাবে।

শুরুর দিকে ‘ত্রিতীর্থ’ তাঁদের প্রযোজনা একদিকে যেমন বালুরঘাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে অন্যদিকে তাঁদের প্রযোজনাগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে কলকাতার পপুলার প্রযোজনাগুলি তাঁরা মফসসলে মঞ্চস্থ করেছে। এই প্রযোজনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘পুতুল খেলা’, ‘বৃষ্টি বৃষ্টি’, ‘শের আফগান’, নাট্যকারের সন্ধানে ছ’টি চরিত্র’, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটা সময় পর হরিমাধব মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি করলেন নাট্যক্ষেত্রে নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে গেলে নিজস্ব নাটক চাই। ১৯৭১ সালের দিকে তাঁর এই উপলব্ধি। ১৯৭২ সালেই তিনি তাঁর দল নিয়ে এলেন কলকাতা। ম্যাক্সমূলার ভবন এবং নীহার ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় ও অনুবাদে মঞ্চস্থ করলেন দুটি জার্মান নাটকের অনুবাদ – ‘তিন বিজ্ঞানী’ ও ‘ভাঙ্গাপট’। পরিচালক হরিমাধব মেলে ধরলেন নিজেকে। ‘নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে পরিচালনার সামগ্রিক সাফল্য শৈল্পিক ও সংহতরূপে প্রকাশ পেল।’ এই প্রযোজনার মধ্যদিয়েই কলকাতার প্রথম শ্রেণির দলগুলির পাশাপাশি হরিমাধব নিজের এবং দলের জায়গা করে নিলেন। কলকাতার সাফল্য সবদিক থেকেই তাঁকে সাহায্য করেছে। একদিকে যেমন নিজের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন, তেমনি একইসাথে তার প্রভাব কেবল বালুরঘাট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র উত্তরবঙ্গে। এমনকি তাঁর নাট্যশৈলীর কলকাতাকেও প্রভাবিত করেছে। ‘উত্তাল’-এর কুড়ি বছর ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় ‘পরিপূর্ণ থিয়েটারের প্রাণবন্ত মাধব’ নিবন্ধে অরুণ

মুখোপাধ্যায় লিখেছেন – মাধবের পরিচালনায় পরবর্তী পর্যায়ে যেসব নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে – যার মধ্যে ‘জল’ ও ‘দেবাংশী’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –তার প্রযোজনার রীতি-পদ্ধতি, আঞ্চলিক ভাষা / পরিবেশ আমাদের অন্য উপলব্ধি এনে দিয়েছে যা কলকাতায় সহজলভ্য ছিল না। হাবিব তনবীরের ‘চরণদাস চোর’ যেমন কলকাতাকে অনেকদিন ধরে মাতিয়ে রেখেছে – অন্য ভাষা, অন্য রীতি আমাদের মনকে টেনেছে – তেমনভাবে বা ততটা না হলেও অভিজিৎ সেনের অসাধারণ গল্পের নাট্যরূপ ‘দেবাংশী’ মাধবের পরিচালনায় এমন এক ব্যঙ্গনা পেয়েছে – যা দেখার জন্য আমরাও ব্যাকুল থেকেছি।” কলকাতার সাফল্যের পর হরিমাধব মুখোপাধ্যায় দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বালুরঘাটের দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন যার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অন্যান্য দলের ওপর। ফলে দর্শকদের রুচি ও শিল্পবোধের মানেরও উন্নতি ঘটেছে।

কলকাতা থেকে ফিরে ১৮৭২ সালে ‘দেবীগর্জন’ নাটকটি করবেন বলে মনস্থ করেন। সেই মত নাটকটির প্রস্তুতি চলল। বিজন ভট্টাচার্যের রচিত, নির্দেশিত ও অভিনীত ক্যালকাটা থিয়েটার্সের এই বিখ্যাত নাটকটি। তবে অভিনেতারা বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষাকে আত্মস্থ করে নিলেন উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় – যা অনেক সহজেই উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে ‘ভাঙ্গাপট’ নাটকেও উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার (বাহে ভাষা) ব্যবহার করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। ত্রিতীর্থের ‘দেবীগর্জন’ প্রথম অভিনীত হয় নিজস্ব মঞ্চ ‘গোবিন্দ অঙ্গন’-এ বিজন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ১৯৭৩ সালে। বিজন ভট্টাচার্য প্রযোজনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর পরে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য নির্দেশনা ‘গ্যালিলেও গ্যালিলে’। নীহার ভট্টাচার্যের অনূদিত ব্রেক্স্টের এই নাটকটি ম্যাক্সমুলার ভবনের সহায়তায় ১৯৭৮ সালে ব্রেক্স্টের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনীত হওয়ার উপলক্ষে ম্যাক্সমুলার ভবনের আর্থিক সহায়তায় মাত্র তিন সপ্তাহে নির্মিত হয়ে ত্রিতীর্থের নিজস্ব মঞ্চ ১৯৭৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম অভিনীত হয়। ৩০-এ সেপ্টেম্বর নাটকটি ম্যাক্সমুলার ভবনে মঞ্চস্থ হওয়ার কথা থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয় না। কলকাতায় অবশ্য নাটকটি অনেক পরে ১৯৮২ সালে অভিনীত হয়। ১৯৮০ সালে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ত্রিতীর্থ ‘জল’ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পুরুলিয়ার উপভাষায় মহাশ্বেতা দেবীর এই কাহিনীর নাট্যরূপ দেন হরিমাধব নিজেই। ১৯৮১ সালে ২১ ও ২২-এ জানুয়ারি কলকাতার বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সামনে ত্রিতীর্থ ‘গ্যালিলেও গ্যালিলে’ ও ‘জল’ নাটক দুটি অভিনয় করেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী, নির্মল ঘোষ, অঞ্জন দত্ত, রাণা দাস, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সমর মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। দুটি প্রযোজনাই বিশিষ্টজনদের দ্বারা প্রশংসিত হয়।

এর পরেই হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য নাটক ‘দেবাংশী’। উত্তরবঙ্গের মানুষের দৈনন্দিন জীবন, লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস নিয়ে নির্মিত অভিজিৎ সেনের এই গল্পের নাট্যরূপ দেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। নির্দেশক হরিমাধব প্রথমে গল্পকারকেই গল্পটির নাট্যরূপান্তর করে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সে রূপান্তর মনঃপূত না হওয়ায় নিজেই নাট্যরূপান্তরে হাত লাগান। অভিনেতা ও নির্দেশক হিসেবে বাংলা থিয়েটারের জগতে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। নাটককার হিসেবে এর আগে কেবল যৌথভাবে নির্মলেন্দু তালুকদারের সঙ্গে ‘শিশুপাল’ (অপেরাধর্মী), এবং এককভাবে ‘পঁচিশ পাঁচাত্তর (বেতার নাটক), ও মহাশ্বেতা দেবীর ‘জল’ গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন। অভিজিৎ সেনের

গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি কেবল একজন পরিচালক ও অভিনেতাই নন, একজন বড়মাপের সাহিত্যিক ও নাট্যকার। ‘উত্তাল’-এর কুড়ি বছর ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির ৪০ বছর পুস্তিকায় ‘মাধবায় নমঃ অথবা দেবাংশীর জন্মকথা’ নিবন্ধে ‘দেবাংশী’র গল্পকার অভিজিৎ সেন লিখেছেন – “আমার নাটক বাতিল করে মাধব “দেবাংশীর” জন্য নতুন নাটক তৈরি করলেন। আমি খুব কাছ থেকে শক্তিম্যান এক নাট্যকারের কাজ দেখা এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পেলাম। ... মাধবের নাটকে (“দেবাংশী”) পূর্বোক্ত স্থূল সোচ্চার আবেগে উদ্দীপ্ত চরিত্ররা, যারা আমার গল্পে শুধু ইঙ্গিত, উঁকিমাঁরা বা সামান্য ভূমিকায় ছিল, একেবারে তেড়েফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করল। এই আত্মপ্রকাশ “দেবাংশী” নাটকে এমন অসামান্য প্রাণসম্পন্ন করল যে, গল্পকার আমি স্বয়ং চমকিত হ’লাম। দেবাংশীর স্ত্রী আমার গল্পে দেবাংশীর দ্বন্দ্বপীড়িত এক বিনিন্দ্র রাত্রি সামান্য সময়ের জন্য নিজেকে উন্মোচিত করেছিল। মাধব সেই সূত্রটুকু ধ’রে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং অসাধারণ চরিত্র তৈরী করলেন। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন দেবাংশীর স্বরূপ খুলে দেখাতে এই চরিত্রটি একটি অসাধারণ সহায়ক চরিত্র। ঠিক তেমনি জোতদারের স্ত্রী এবং জোতদারের উপপত্নী চরিত্র দুটি। এই চরিত্র দুটি আমার গল্পে সম্পূর্ণ পরোক্ষে আছে, আছে কথাকারের বিবৃতিতে। মাধবের নাটকে এই দুই চরিত্র রক্তমাংসে এমন জমজমাট এবং নাটকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংকে তাদের দাপুটে উপস্থিতি এমন দিক্‌দর্শক যে নাটক তৈরী হওয়ার পর আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবছিলাম যে এমন দুটি চমৎকার সম্ভাবনাকে আমি নিজে বিকশিত না করে কেন নাট্যকারের ব্যবহারের সুযোগ করে দিলাম! আছে এমন আরও কিছু চরিত্র যা অনেকের চোখে না পড়া সম্ভাবনাকে নাট্যকার বিকশিত করে পূর্ণাঙ্গ করেছেন, নাটকের পাঠক ও দর্শকের সাথে আমাদেরও চমৎকৃত করেছেন।”^২ মোটামুটিভাবে গ্রুপ থিয়েটারের আগে পর্যন্ত নাটককে সাহিত্য হিসেবেই বিচার করা হয়েছে। এমনকি, গ্রুপ থিয়েটার পর্বের প্রথম দিকে প্রায় সত্তরের দশক পর্যন্ত এই বিচারবোধে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। এর পর থেকেই যেন সেই ভাবনায় একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তাই বোধহয় মনোজ মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তীরা সেভাবে সাহিত্য সভায় ডাক পাননি বা এখনও পান না। সেই একই সারিতে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় – যে সাহিত্যিক মন না থাকলে মহাশ্বেতা দেবী বা অভিজিৎ সেন-সহ একাধিক সাহিত্যিকের কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৩ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে ত্রিতীর্থের নিজস্ব মঞ্চ গোবিন্দ অঙ্গনে। নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নাটকের সংলাপ ব্যবহার থেকে শুরু করে আবহে সানাই, বাঁশি প্রভৃতি লৌকিক যন্ত্রে ব্যবহারের মধ্যদিয়ে অন্য মাত্রা স্পর্শ করেছিলেন যা কলকাতার দর্শককেও মুগ্ধ করেছিল। ১৪. ০৩. ১৯৮৩ সালে আজকাল পত্রিকায় নাটকটির সমালোচনা করতে গিয়ে দেবাংশি দাসগুপ্ত লিখেছেন – “ত্রিতীর্থ কোনোভাবেই কলকাতার ধারায় চলেন না – তাই অচেনা ভাষাও কলকাতার লোক শিখে নেয় – এই সর্বত্রগামী হওয়াটাই শিল্পের বড় কথা। এখানেও ডায়ালেঞ্চে নাটক হয়। কিন্তু কোথায় যেন শহুরে পালিশ। এখানেও জোতদার থাকে, তবে সবই যেন পেটোপাড়া থেকে ছাঁচে বানান, এখানেও শোষণ প্রতিবাদ থাকে, তবে সবাই যেন এক নোটবই থেকে মুখস্থ করে পরীক্ষা দেন – ত্রিতীর্থ অন্যরকম, তাই কলকাতাও সাগ্রহী।” ১৯৮৪ সালে নান্দীকারের জাতীয় নাট্যমেলায় নাটকটি অভিনীত হয়। ‘দেবাংশী’ নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ ১০. ০৩. ১৯৮৪ তারিখে লিখেছে – “Harimadav Mukhopadhyay has shown his wonderful skill in assimilating the details of the story to enrich the

drama. The sequences are planned and develop in such a way that the different thematic facades can be early displayed.

‘দেবংশী’ পরে ত্রিতীরের উল্লেখযোগ্য নাটক ‘বিছন’, ‘মন্ত্রশক্তি’, ‘অনিকেত’ – যেগুলির নাট্যরূপান্তর করেছিলেন নির্দেশক নিজেই। তবে তিনি শুধু নিজের দলের হয়েই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন দলের হয়েই নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরমধ্যে তুণীর, বিচিত্রা, উত্তাল প্রভৃতি দলে একাধিকবার নির্দেশনার কাজ করেছেন। নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও কেবল নাট্যরূপান্তর নয়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায় কিছু মৌলিক নাটকও লিখেছেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অশ্রুকুমার সিকদার ‘উত্তাল’-এর কুড়ি বছর ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির ৪০ বছর’ পুস্তিকায় ‘হরিমাধব সেলাম’ নিবন্ধে লিখেছেন – “মফস্সলের শূন্যতায়, অন্তরস্থিত উচ্চমানে স্থিরলক্ষ্য হয়ে কাজ করে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। মফস্সলের একটা মধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে যা উর্ধ্বগামীকে টেনে নামায়। কতোখানি পুঞ্জীভূত তেজ থাকলে এই মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে, পিছুটানকে অতিক্রম করে সর্বভারতীয় কক্ষপথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাই ভাবি, আর হরিমাধবের দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের শেষ হয় না।”^৩

এবার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটকগুলির একটি তালিকা তুলে ধরা হল -

ক্রমিক নং	নাটকের নাম	নাটককার/কাহিন্যসূত্র	প্রথম অভিনয়
১.	পুতুল খেলা	ইবসেন/শম্ভু মিত্র	২৭. ১১. ১৯৬৯
২.	বৃষ্টি বৃষ্টি	রিচার্ডে ন্যাস/অসিত দে	২৯. ১২ ১৯৬৯
৩.	এবং ইন্দ্রজিৎ	বাদল সরকার	৩১. ০১. ১৯৭০
৪.	প্রতিদিনের নায়ক (একাক্ষ)	পার্থপ্রতিম বরুী	১১. ০২. ১৯৭০
৫.	অমৃতস্য পুত্রাঃ	রতন কুমার ঘোষ	১৯. ০২. ১৯৭০
৬.	বিশে জুন	বীরু মুখোপাধ্যায়	১২. ০৪. ১৯৭০
৭.	শের আফগান	পিরানদেল্লা/অজিতেশ মুখোপাধ্যায়	২৩. ০৫. ১৯৭০
৮.	নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র	পিরানদেল্লা/রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত	০৩. ১০. ১৯৭০
৯.	বিজ্ঞাপন	জগমোহন মজুমদার	০৬. ১২. ১৯৭০
১০.	করণা করোনা	জগমোহন মজুমদার	০৪. ০৪. ১৯৭১
১১.	চোখের আলো (একাক্ষ)	সুরজিৎ বসু	১৩. ০৬. ১৯৭১
১২.	সংকট (একাক্ষ)	হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়	১৩. ০৬. ১৯৭১
১৩.	ছুটির খেলা	মিখাইল সেবেস্টাইন / অমিতা রায়	০৪. ০৯. ১৯৭১

১৪.	মঞ্জরী আমের মঞ্জরী	চেকভ/অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫. ০১. ১৯৭২
১৫.	তিন বিজ্ঞানী	ডুরেনম্যাট/নীহার ভট্টাচার্য	০২. ০৯. ১৯৭২
১৬.	ভাঙ্গাপট	হাইনরিখ ক্লাইস্ট / নীহার ভট্টাচার্য	১৫. ০৯. ১৯৭২
১৭.	দেবী গর্জন	বিজন ভট্টাচার্য	২৫. ০৮. ১৯৭৩
১৮.	শিশুপাল (অপেরাধর্মী)	নির্মলেন্দু তালুকদার ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	১৮. ০৫. ১৯৭৪
১৯.	মঙ্গলাচরণের বিবাহ	বোর্টল্ট ব্রেখ্ট/নীহার ভট্টাচার্য	১৫. ১০. ১৯৭৪
২০.	বহুরূপী (একাক্ষ)	শুভ্রাংশু মৈত্র/কাহিনী- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	০৯. ০৩. ১৯৭৫
২১.	বন্দী সম্রাট	শুভ্রাংশু মৈত্র/হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	১৮. ০৪. ১৯৭৬
২২.	বল্লভপুরের রূপকথা	বাদল সরকার	০৮. ০৮. ১৯৭৬
২৩.	কর্ণকুন্তী সংলাপ	বিমল কর	০৪. ১২. ১৯৭৬
২৪.	পরবাস	মনোজ মিত্র	০৯. ১০. ১৯৭৭
২৫.	গ্যালিলেও গ্যালিলে	বোর্টল্ট ব্রেখ্ট/নীহার ভট্টাচার্য	২৭. ০৯. ১৯৭৮
২৬.	ক্ষুরস্যা ধারা	এ্যালবেয়ার ক্যামু/সুভাষ চট্টোপাধ্যায়	০৪ ১০. ১৯৭৯
২৭.	জল	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবী	২৪. ০২. ১৯৮০
২৮.	তুঘলক	গিরিশ কানরাড/চিত্তরঞ্জন ঘোষ	১৬. ০৭. ১৯৮২
২৯.	দেবাংশী	কাহিনী- অভিজিৎ সেন/হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	১৩. ১১. ১৯৮৩
৩০.	বিহন (হিন্দি)	কাহিনী- মহাশ্বেতা দেবী/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৪. ১১. ১৯৮৫
৩১.	কেমনে তারে মিছে বলা যায়	বার্নার্ড শ/শুভ্রাংশু মৈত্র	২৬. ০৮. ১৯৮৬
৩২.	চিরকুমার সভা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭. ০৩. ১৯৮৮
৩৩.	মন্ত্রশক্তি	সূত্র- স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য/হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	০৩. ০৪. ১৯৮৮
৩৪.	অনিকেত	সূত্র- আশাপূর্ণা দেবী/	২৫. ০৪. ১৯৯০

৩৫.	ঠাকুরদা	হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সূত্র – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ নির্মলেন্দু তালুকদার ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬. ০৮. ১৯৯১
৩৬.	বিপুলৌষধি	পরশুরাম/হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	২৬. ০৮. ১৯৯১
৩৭.	অর্থ অনর্থম্	সূত্র – শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়/ শুভ্রাংশু মৈত্র ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ১৯৯২
৩৮.	বোধোদয় (শিশুদের দ্বারা অভিনীত)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২২. ০৫. ১৯৯৩
৩৯.	উপলদ্ধি (একাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ১৯৯৫
৪০.	পপণ	সূত্র – দুর্লভ ভৌমিক/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	১৭. ০৬. ১৯৯৬
৪১.	অন্তর্ধান	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	১৩. ০৩. ১৯৯৭
৪২.	পত্রশুদ্ধি	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ১৯৯৯
৪৩.	মাতৃতান্ত্রিক	সামারসেট মম/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	০৫. ০৩. ২০০০
৪৪.	প্রপন্না	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০০
৪৫.	চৌর্যাপদ (একাঙ্ক)	জয় মুখোপাধ্যায়	২৬. ০৮. ২০০২
৪৬.	আক্কেল সেলামী (একাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০৩
৪৭.	লুকোচুরি	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০৪
৪৮.	অন্যমনস্ক চোর (একাঙ্ক)	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০৫
৪৯.	কুরকুহক	চেকভ/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০৬
৫০.	যদি এমন হত	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০৭
৫১.	সরল অংক	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	২৬. ০৮. ২০০৮
৫২.	বীজমন্ত্র	সূত্র- কৌশিক চট্টোপাধ্যায়/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৬. ০৮. ২০০৯
৫৩.	পীরনামা	সূত্র – সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ /নাটক - হরিমাধব	২৬. ০৮. ২০১১

৫৪.	অর্ধচন্দ্র (রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের খাতা অবলম্বনে)	মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	২৩. ০৯. ২০১২
৫৫.	অগ্নিশুদ্ধি	কাহিনী- শদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	১৭. ০৩. ২০১৩
৫৬.	ভগীরথের মূর্তি	মনোজ মিত্র	০২. ০৫. ২০১৩
৫৭.	ভূলাচোর	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	০৩. ০৩. ২০১৪
৫৮.	বানপ্রস্থ	সূত্র- সুজিত সেন/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	০৮. ০৬. ২০১৪
৫৯.	পোকামাকড়ের কুটুম	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	২৬. ০৮. ২০১৪
৬০.	ভোজন দক্ষিণা	কাহিনী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/নাটক- হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	০৭. ১২. ২০১৪
৬১.	ব্যাপিকা বিদায়	অমৃতলাল বসু	২৩. ০৮. ২০১৫
৬২.	দেখিনি শুনি বলিনি	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	১৯. ০২. ২০১৭
৬৩.	রক্তকরবী (কথ্য রাজবংশীতে রূপান্তর)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	০৩. ০৯. ২০১৭
৬৪.	তৈঁতুল গাছ	মনোজমিত্র	২৬. ০২. ২০১৯
৬৪.	বন্দুক	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	১৪. ০৩. ২০১৯
৬৫.	খারিজ	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।	--

ত্রিতীর্থের প্রধান নির্দেশক তথা দলের একজন অন্যতম সংগঠক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে নিজের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি দখল করে নিয়েছেন। ভূষিত হয়েছেন দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন পুরস্কারে:

১৯৭০ সালে লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় ‘নাট্যকারের সন্মানে ছটি চরিত্র’ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং হরিমাধব মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হন।

১৯৭৬ সালে ‘দেবীগর্জন’ নাটকের জন্য নির্দেশক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত দিশারী (উত্তরবঙ্গ বিভাগ) পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত দিশারী পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৮৭ সালে ‘বিহ্ন’ নাটকের অভিনেতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৯৭ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার লাভ করেন।

২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রদত্ত দিশারী গোল্ডেন পুরস্কার লাভ করেন।

২০০৭ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাডেমি (রবীন্দ্রভারতী) প্রদত্ত দৃশ্য ও চারুকলা পুরস্কার লাভ।

২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক দীনবন্ধু পুরস্কার প্রদান।

২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বঙ্গভূষণ সম্মান লাভ।

২০১৯ সালে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের প্রথম সমাবর্তনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে সাম্মানিক ডিলিট প্রদান করেন।

বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষ থেকে একুশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার সঙ্গে একজন অভিনেতা হিসেবে, একজন নির্দেশক হিসেবে জড়িয়ে রয়েছেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রযোজনায় বারবার মিশিয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গের মানুষের সুখ-দুঃখ, লোকাচার ও লোকভাবনাকে। সেখানকার মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে কাছে থেকে অনুধাবনের নিয়ত অনুসন্ধানে রত থেকেছেন দশকের পর দশক। নাটকের মাধ্যমে তাকে উপস্থাপিত করেছেন নানা প্রান্তের মানুষের সম্মুখে। নাট্যকর্মীদের সহযোগিতার আস্থানে ছুটে গেছেন হৃদয়ের উষ্ণতার স্পর্শ নিয়ে। তাই ‘উত্তাল’-এর কুড়ি বছর ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির ৪০ বছর’ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকার ‘কিছু কথা’ অংশে যথার্থই বলা হয়েছে – “অভিনয়, পরিচালনা, লেখায় বা সাংগঠনিক কাজে প্রথম শ্রেণির দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কলকাতার ‘স্টার আর্টিস্ট’ হবার লাইনে না দাঁড়িয়ে মিডিয়ার প্রলোভন উপেক্ষা করে নিজের শহরেই বিশ্বাসের সঙ্গে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছেন। দলবল নিয়ে কলকাতায় গিয়ে নাটক করেছেন, শ্রদ্ধা আদায় করেছেন, এমনকি কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যালোচনার মুখ ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন আপন বিশিষ্টতায়। দিনাজপুরের মাটির গন্ধেভরা তাঁর নাটক এতটাই বিশ্বস্ত, প্রয়োগ বা অভিনয় এতটাই নিখুঁত যে, তিনি কোনো নতুন কাজ করলে তা সাংস্কৃতিক খবর হয়ে ওঠে। দেবীগর্জন, ভাঙ্গাপট, তিন বিজ্ঞানী, জল, বিহ্ন, দেবাংশী – একের পর এক প্রযোজনায় তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছেন, বিস্মিত করেছেন।”^৪

তথ্যসূত্র:

১. হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির ৪০ বছর, এপ্রিল ১৯৯৮, উত্তাল, দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি।
২. তদেব।
৩. তদেব।
৪. তদেব।

পরিবেশ রক্ষার্থে মানবের প্রাণীদের প্রতি মানবের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ

প্রতিমা ঢালী

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

পোলবা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: পরিবেশ হলো পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তাই সচেতন মানুষ পরিবেশকে বাঁচাতে মাঝে মাঝেই রাস্তায় নেমে পড়ছে। পরিবেশে বা প্রকৃতিতে মানুষ যেহেতু শ্রেষ্ঠতর তাই পরিবেশ রক্ষার্থে মানুষের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। মানুষ শ্রেষ্ঠতর হলেও মানবের প্রাণীরাও কিন্তু তুচ্ছ নয়। তারাও পরিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে রয়েছে। কারণ তারাও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রবন্ধে আমি মূলত এটাই দেখার চেষ্টা করব যে পরিবেশ রক্ষার্থের কথা মাথায় রেখে মানবের প্রাণীদের প্রতি পরিবেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানবের কি কি নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত।

সূচক শব্দ: মানবের প্রাণী, নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবেশ রক্ষা, পরিবেশ নীতিবিদ্যা।

মূল আলোচনা:

প্রকৃতি বা পরিবেশ হলো মানুষ এবং মানবের প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ পরিবেশ ছাড়া মানুষ এবং মানবের প্রাণী কেউই বেঁচে থাকতে পারে না। গাছপালা নদী, নালা, পাহাড়-পর্বত বাতাস, সাগর, জীবজন্তু আমাদের আশেপাশে অবস্থিত সমস্ত কিছু নিয়েই এই পরিবেশ। এই পরিবেশ দুই রকমের হতে পারে একটি চেতন এবং অন্যটি অচেতন। চেতন পরিবেশ তাদের নিয়ে গঠিত হয় যাদের মধ্যে চেতন শক্তি রয়েছে এবং অন্যটি অচেতন পরিবেশ যাদের মধ্যে চেতন শক্তি নেই অর্থাৎ যারা জড়। প্রায়োগিক নীতিবিদ্যার একটি অংশ হলো পরিবেশ নীতিবিদ্যা। এই নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল পরিবেশে অবস্থিত উচ্চতর শ্রেণী এবং নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীর প্রতি মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, পরিবেশ কেন দূষিত হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান এবং দূষণ থেকে কিভাবে পরিবেশকে রক্ষা করা যায় তার মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনা করা।

বর্তমানে পরিবেশ নানা প্রকার বিপর্যয় এবং সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে পরিবেশকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবেশের আজ যে বিপর্যয় ও সমস্যা উৎপন্ন হয়েছে তার মূল কারণ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার অনৈতিক কর্মকে উল্লেখ করা যায়। বিগত দশকের পর দশক থেকে মানুষেরা তার অনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা প্রকৃতিকে দূষিত করে চলেছে। যে সমস্ত কার্যকলাপকে আমরা জনজাতির প্রগতি বলে চিহ্নিত করছি সেগুলি নানাভাবে পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে। যেমন শিল্পায়নের নামে আমরা সমুদ্র ও নদীর জলকে দূষিত করছি, অরণ্যের বিনাশ, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাহীন ক্ষতি, বিভিন্ন প্রাণী শিকার, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ইত্যাদি। অরণ্যের বিনাশের ফলে অরণ্যের উপস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রাণী কীটপতঙ্গ প্রভৃতি

বিনষ্ট হয়ে গেছে। বায়ু দূষণ হয়েছে ফলে অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে। বিভিন্ন কারণে আমরা জল দূষিত করছি যার ফলে জলজ প্রাণী, কৃষি ক্ষেত্র এমন কি মানুষেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এইভাবে যদি আমরা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকি তাহলে পরিবেশকে আর রক্ষা করা যাবে না। পরিবেশের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।

প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে আমরা একেবারেই উদাসীন। কিন্তু পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের কিছু নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। যা আমরা কিছুতেই অবহেলা করতে পারি না। কারণ এই নৈতিকতা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমিত নয়। তা সমস্ত পরিবেশ অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এমনকি পাহাড়-পর্বত, নদী-নালাও তার মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশ নীতিবিদ্যা তাই মানুষের উদাসীনতা কাটিয়ে মানুষকে তার পরিবেশের প্রতি নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি মনে করিয়ে দেয়। পরিবেশ রক্ষার্থে মানুষের যে সকল বিষয়ের উপর বিশেষ করে নজর দেওয়া উচিত তার মধ্যে মানবের প্রাণী অন্যতম কারণ। পরিবেশ রক্ষার্থে তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ফলে তাদের সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী।

পৃথিবীতে নানান প্রকার জীবন বৈচিত্রের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষই হলো এমন একমাত্র জীব যে নিজের বুদ্ধি সত্তার প্রয়োগ করে এগুলিকে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করে থাকে। পৃথিবীতে যে নানা প্রকার প্রাণী আছে তার প্রতি মানুষের কি নৈতিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনীয় তা নিয়ে পরিবেশ নীতিবিদ্যা আলোচনা করে। মানুষ ছাড়াও পরিবেশে নানা প্রাণী ও উদ্ভিদ রয়েছে মানুষের যেমন স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে অন্যান্য প্রাণীদেরও সমানভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। তাদের এই অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারোর থাকতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের যেমন কিছু নৈতিক মূল্য রয়েছে মানবের প্রাণীদেরও তেমনি নৈতিক মূল্য রয়েছে। এই নৈতিক মূল্যকে স্বীকার করে তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করা অনুচিত কর্ম বলে স্বীকার করা হয়েছে। মানবের প্রাণীরাও মানুষের মত সমান মূল্যের অধিকারী। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বা মানুষের উপযোগিতার জন্য মানবের প্রাণীর ভূমিকা অস্বীকার করার মত কোন স্থান নেই। কারণ মানবের প্রাণী ছাড়া পরিবেশ অর্থহীন।

প্রকৃতিতে যে সকল প্রাণী রয়েছে তারা কেউই মূল্যহীন নয় বা অপ্রয়োজনীয় একেবারেই নয়। এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীও স্বতঃ মূল্যবান। অনেকেই মনে করেন যে মানুষ যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব তাই কেবল তারই মূল্য রয়েছে। কিন্তু একথা একেবারেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পরিবেশে অবস্থিত সকল কিছুই স্বতঃ মূল্যবান। সেগুলিকে নষ্ট করা পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাই সকলের প্রতি সহানুভূতি দেখানোকে নৈতিক দায়িত্ব বা কর্তব্য বলা হয়েছে।

মানুষ যেমন বিচার বুদ্ধি রয়েছে বা চিন্তাশক্তি রয়েছে মানবের প্রাণীর তেমন চিন্তাশক্তি বা বিচার বুদ্ধি না থাকলেও তাদের সুখ দুঃখ অনুভূতি রয়েছে। মানুষের অনেক সময় মানবের প্রাণের প্রতি নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ করে থাকে যা কোনমতেই কাম্য নয়।

পরিবেশকে সুস্থ ও অখণ্ড রাখার জন্য মানবের প্রাণীদের প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও বিলুপ্ত ও দুর্লভ প্রজাতির পশু, পাখি ও জীব জন্তুদের রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ আজ যারা দুর্লভ প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে তা কিছু অংশে মানুষের কারণেই হয়েছে। অতএব মানুষেরই উচিত ওই সকল প্রাণীর রক্ষার দায়ভার নিজের কাঁধে নেওয়া।

মানুষকে তার বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বা অকারণে কোন প্রাণীর হত্যা করা ক্ষতি করা বা তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা কোন বুদ্ধি বৃত্তি সম্পন্ন মানুষের উচিত কর্ম নয়। মানুষের মানসিক উৎকর্ষ এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য যদি প্রাণী ব্যবহার একান্তই প্রয়োজন হয় তবে আহারের জন্য প্রাণী হত্যা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে নিলেও বিকল্প পথ থাকলে সেই পথ গ্রহণ করাই উচিত। কারণ মানুষের অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যা কিভাবে দূষণের কারণ হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার বলেছেন আমিষ খাদ্যের প্রয়োজনকে সংযত করা উচিত। প্রয়োজন সংযত হলে মাত্রাধিক পশু পালনেরও প্রয়োজন হবে না। পশু পালনের জন্য বনাঞ্চলের ধ্বংসের প্রয়োজনও হবে না। সে ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সুরক্ষিত থাকবে। মানুষের মাত্রাধিক লোভ ও প্রয়োজন যাতে পরিবেশের বিনষ্ট না করে মানুষ ও প্রাণীর জগতকে বিপন্নর দিকে না নিয়ে যায় তার জন্য পরিবেশগত নৈতিকতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সম্প্রতিকালে পল টেলার প্রাণ ও জীবনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার ভিত্তি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন জগতের সকল জীব তার বুদ্ধি বিকাশ ও বংশধারার মাধ্যমে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ ঘটায়। প্রত্যেক প্রাণবান সত্তার জীবন লক্ষ্যভিমুখী তারা নিজেদের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সদাই সচেতন।

টেলার পরিবেশের প্রতি মানুষের মোট চারটি কর্তব্য পালনের কথা বলেছেন।

- ১। কারোর ক্ষতি না করা।
- ২। কোন প্রাণীর স্বাধীন জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ না করা।
- ৩। লোভ দেখিয়ে বন্যপ্রাণীকে প্রবঞ্চিত না করা।
- ৪। কোন প্রাণীর ক্ষতি করলে আমাদের কর্তব্য হবে সেই ক্ষতিপূরণ করা।

অতএব বলা যায় টেলার এর মতে মানব জীবনেরই মতো মানবেতর প্রাণী সমান মূল্যবান তাই তাদের ক্ষতি সাধন না করাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। মানুষের মত মানবেতর প্রাণীরাও পরিবেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সকল উপাদানই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোন উপাদানের তারতম্যই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে পরিবেশের বিনাশ অনিবার্য হয়ে পড়বে। অতএব পরিবেশের রক্ষার্থে আমাদের উচিত এদিকে লক্ষ্য রাখা যাতে মানবেতর প্রাণীরা তাদের খাদ্য, বাসস্থান এবং স্বতঃমূল্য নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে পারে। মানবেতর প্রাণীদের সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার আছে। অতএব মানবেতর প্রাণীদের সংরক্ষণ নৈতিক কর্তব্য হিসেবে প্রত্যেক মানুষের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্ব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। দীক্ষিত গুপ্ত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৭।
- ২। সঞ্জীব ঘোষ, নীতিবিদ্যা, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।
- ৩। সন্তোষ কুমার পাল, ফলিত নীতিশাস্ত্র, প্রথম খন্ড, লেভান্ত বুকস, কলকাতা ২০১২।
- ৪। Peter Singer, Practical Ethics, 2nd edition Cambridge University Press 1993।
- ৫। P Taylor, Respect for Life: A Theory of Environmental Ethics, Princeton University Press, Princeton, 1986।

পুরাতত্ত্ব ও মন্দির : পুরাকীর্তির আলোয় পাড়া

মঙ্গল মণ্ডল

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ

সাঁওতালডি কলেজ, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত পাড়া থানা হলো এক অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল। এই পাড়া থানায় রয়েছে অনেক প্রাচীন জৈন মন্দির। মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম হল পাড়া গ্রামের কুইরি পাড়ায় অবস্থিত নারায়ন বা রঘুনাথ মন্দির, যেটি পূর্ব দিকে মুখ করে রয়েছে। মন্দিরটি পাথর, ইট ও লোহা দিয়ে তৈরি। মন্দিরটি মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত। মন্দিরের দুটি চূড়া, বর্তমানে একটি চূড়া নষ্ট হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা জানান একসময় এই মন্দিরে সোনার মূর্তি ছিল, পরবর্তীকালে কাশীপুরের রাজা মূর্তিটি নিয়ে যান। গ্রামবাসীরা জানান পরিবালা কুইরী স্বপ্ন পেয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ খুঁড়ে শাখ, পাথরি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কুইরী মন্দিরটি সংস্কার করেন। বর্তমানে একটি বেদির উপর নারায়ণের মূর্তি রয়েছে। মূল মন্দিরের ভিতর চারটি বড় কুলুঙ্গি রয়েছে, তাছাড়া দুটি ছোট কুলুঙ্গি রয়েছে। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারে একটি পাথর খোদিত লিপি রয়েছে, লিপিটি বর্তমানে অস্পষ্ট। তবুও যা বোঝা যাচ্ছে ‘ওঁ নমো বিষ্ণু’ শব্দটি হয়তো লেখা রয়েছে। মন্দিরের গায়ে চারিদিকে বিভিন্ন মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। মন্দিরের নিচের অংশ পাথর ও উপরের অংশ ইট দিয়ে তৈরি। মন্দিরের প্রবেশদ্বার মূলত তিনটি। মন্দিরটির উচ্চতা আনুমানিক ৪৫ ফুট। বর্তমানে মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন লতাপাতা, ঝোপঝাড়, বড় গাছ গজে উঠেছে। মন্দিরের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, যে কোন মুহূর্তে মন্দিরটি চাপা পড়ে যেতে পারে। গ্রামবাসীদের দাবি যদি মন্দিরটি সংস্কার করা হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির উপহার দিতে পারব।

এই মন্দিরের কিছু দূরেই পাশাপাশি দুটি মন্দির রয়েছে -একটি চন্ডী মন্দির অন্যটি লক্ষ্মী মন্দির। দুটি মন্দিরের মাঝের দূরত্ব প্রায় ৩৫ মিটার। মন্দির দুটিতে উড়িয়া মন্দির শৈলীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আনুমানিক দশম - একাদশ শতকে নির্মিত চন্ডী মন্দিরটি ইটের তৈরি, অন্যদিকে লক্ষ্মী মন্দিরটি কালো বেলে পাথরের তৈরি। মন্দির দুটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে রয়েছে। চন্ডী মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট, অন্যদিকে লক্ষ্মী মন্দিরটি তুলনামূলক কম উচ্চতা বিশিষ্ট। লক্ষ্মী মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৪ ফুট। এর মধ্যে লক্ষ্মী মন্দিরটির শিল্পকলা অভূতপূর্ব। মন্দিরের দেওয়ালে নৃত্যরতা মহিলা, যক্ষ, লক্ষ্মী, সূর্য, ফুলের নকশা প্রভৃতি চিত্র তথা সামাজিক ও ধর্মীয় চিত্রকলার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। মন্দির দুটি বর্তমানে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে। তবে গ্রামবাসীরা জানান মন্দিরগুলিতে সংস্কারের ফলে কিছুটা পুরাতন ঐতিহ্য লোপ পেয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

সূচক শব্দ: গর্ভগৃহ, দেউল, শ্রাবক, সরাব, গ্রিবা, কুইরি।

মূল আলোচনা:

ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত ‘মানভূম’ তথা অধুনা পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন অসংখ্য পুরাকীর্তি। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তার ‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’ গ্রন্থে বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন

- ‘বনে জঙ্গলে, পুরোনো গ্রামে, পুরানো নগরে এখনও গাড়ী গাড়ী মূর্তি পাওয়া যাইতে পারে। ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য আমাদের অন্যত্র যাবার প্রয়োজন নেই। পুরুলিয়া জেলার পাড়াতে পরিভ্রমণ করলেই তা প্রমাণিত হবে।

পুরুলিয়া জেলার প্রাচীনত্বের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। জৈন ভগবতীসূত্রে যে তিনটি জনপদ - অঙ্গ, বঙ্গ ও লাঢ় বা রাঢ় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুলিয়া ছিল সেই লাঢ় বা রাঢ় জনপদে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় - চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ ‘আচারঙ্গ সূত্র’ নামক গ্রন্থে রাঢ় অঞ্চলের কথা উল্লেখ আছে। খ্রিস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর পর্বত - অরণ্য পূর্ণ রাঢ় দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তখনই এই অঞ্চলের জনগন তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।^১

পুরুলিয়া জেলাতে যে সমস্ত বৃহৎআকারের দেউল পাওয়া গিয়েছে- বেশিরভাগই যাদের নির্মাণকার্য মোটামুটি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এইসব দেব দেউল, পুরাকীর্তি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সিংহ ভাগই জৈন সংস্কৃতির। জৈন ধর্মাবলম্বী ‘স্রাবক’ সম্প্রদায় মানভূম তথা অধুনা পুরুলিয়ায় ‘সরাক’ নামে পরিচিত। এই সরাকগণ বর্তমানেও নিরামিষাশী। নৃতত্ত্ববিদ রিজলির ‘Tribes and castes of bengal’ গ্রন্থে সরাকদের নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তবে কালের নিয়মে সরাকদের মধ্য হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়লেও, মনের দিক দিয়ে আজও তারা জৈন ধর্মাবলম্বী। মানভূম অধুনা পুরুলিয়ার কংসাবতী ও দামোদর তীরবর্তী প্রত্নক্ষেত্রগুলি যে সরাক সম্প্রদায়ের সেকথা ডালটন সাহেব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন - “The saraks appear to have colonized along the banks of the Rivers and we find their temples ruins on the bank of the damodar, the Kasai.....” তবে জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসার নদী তীরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র মানভূমে ব্যাপক বিস্তারলাভ করেছিল। জৈন সংস্কৃতির নিদর্শন পাড়াতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আমরা পাড়া গ্রামের জৈনধর্মের নিদর্শন ও পুরাকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

পুরুলিয়া জেলার অন্যতম দেউলমন্দির শৈলীর উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হল ‘পাড়া দেউল’। এই গ্রামেরই পূর্বপ্রান্তে চোখে পড়ে দুটি প্রাচীন দেউল। একটি পাথরের অন্যটি ইটের। দুটি দেউলই দক্ষিণমুখী। ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম “নাগড় স্থাপত্যশৈলী” বা “উত্তর ভারতীয় মন্দির শৈলী” আমাদের এই পাড়া দেউলে খুব সুন্দরভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাড়াতে যে দেউল দুটি দেখা যায়সেটিকে বলা হয় ‘শিখর দেউল’। দেউল শৈলী অনুযায়ী উপরের অংশটি ছিল গম্বুজাকৃতি এবং এতে আমলক (চক্রজাতীয়, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উপর দেখা যায়), কলস (কলসী) এবং পতাকা দণ্ডের অস্তিত্ব ছিল।

ইটের তৈরী দেউলটি এক রেখ দেউল। এর উপর অংশ বা মস্তক ভাগ পুরাপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে অবশিষ্ট অংশের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। বর্তমানকালের তিনতলা ছাদের মতো এই দেউলের তিনটি অংশ ছিল - যার দুটো অংশ এখনো দেখা যায়। সমগ্র অংশেই এককালে হয়তো জৈবিক চূনের আবরণ ছিল, যার ওপরে অঙ্কিত হয়েছিল নানান জ্যামিতিক নকশা। পাতলা পাতলা ইটের তৈরী এই দেউলটিতে চুন ও ইটের গুঁড়ি দিয়ে ফুল, লতাপাতা, দেবদেবী ও হরতন আকৃতির চৈত্য। চৈত্য এবং বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই দেউলটির গঠন হুবহু জয়পুরের দেউলঘাটার দেউলের মতো। প্রবেশপথ ত্রিকোণাকৃতির। মন্দিরের অলংকরণ হিসাবে শিল্পীরা ছোট ছোট দেউলের রূপ ইটের সাহায্য ফুটিয়ে তুলেছেন। দেউলের ভিতরে দেবতার মূর্তি স্থাপনের জন্য কুলুঙ্গির ব্যবহার দেখতে

পাওয়া যায়। এই ইটের দেউলে জৈবিক চুনের আস্তরণে ফুল - লতা - পাতা - মুক্তমালা, দেবদেবীর মূর্তি, জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আমার মনে হয় জয়পুরের দেউলঘাটার এবং পাড়ার দেউলগুলির শিল্পীরা ছিলেন একই সময়ের। আনুমানিক দশম - একাদশ শতকের নিদর্শন এই দেউলটি। যেখানে প্রায় দুই - ফুট লম্বা এবং দেড়ফুট চওড়া পাথরের উৎকীর্ণ এক অষ্টভুজা দেবীমূর্তি সম্বন্ধে রক্ষিত। তবে সরজমিনে সমীক্ষাতে গিয়ে জানতে পারি গ্রামবাসীরা সেই দেবীমূর্তিকে উদয়চন্ডী রূপে পূজা করেন। এই দেবী মূর্তিটি হয়তো বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগের। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বর্তমানে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার বহু জৈন মন্দির বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী কিংবা হিন্দু দেবদেবীরা দখল করেছেন। এই অষ্টভুজা দেবীমূর্তিটি সাধারণ মানুষের কাছে উদয়চন্ডী রূপে পূজিত হোন। প্রতি মঙ্গলবার আড়ম্বর সহকারে দেবীর পূজা হয়। দুর্গাপূজার সময় নবমীতে এখানে মেলা বসে।^৭ মন্দিরটি বর্তমানে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সংস্কার করা হয়েছে। তবে গ্রামবাসীরা আক্ষেপের সঙ্গে জানান মন্দিরগুলোতে সংস্কারের ফলে কিছুটা প্রাচীন ঐতিহ্য লোপ পেয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

ইটের তৈরি দেউলের পাশেই অবস্থিত পাথরের দেউলটি। এটি মূলত কালো বেলেপাথর দিয়ে তৈরী। দুটি দেউলের মাঝের দূরত্ব প্রায় ৩৫ মিটার। মন্দির দুটিতেই উড়িয়া মন্দির শৈলীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই প্রস্তর নির্মিত দেউলটিও দক্ষিণদিকে মুখ করে রয়েছে। তবে এর উচ্চতা ইটের দেউলের থেকে কম। বর্তমানে এই দেউলের উচ্চতা প্রায় ৩৪ ফুট। এই বেলেপাথরের তৈরি দেউলটি পুরুলিয়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন জৈন মন্দির। আনুমানিক নবম - দশক শতকের এই দেউলটি। এই দেউলে দুই পাথরের সংযোগস্থলে লোহার খিলানের ব্যবহার চোখে পড়ে। দেউলের মস্তক অংশ ভেঙে পড়েছে। মস্তক অংশের আমলক অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে, কলস ও পতাকাদন্ড লুপ্ত। সবেমিলে এই দেউল অতীতে হয়তো আরও বেশী উচ্চতা ছিল। এটি একটি রেখ দেউল। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় দেউলটিকে নিখুঁতভাবে দেখলে বোঝা যায় এর সারা শরীরেই ছিল অলংকরণ। গ্রামবাসীদের অনেকে মনে করেন, এটি পূর্বে কোনারকের সূর্যমন্দিরের মতো অলংকৃত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালে নৃত্যরতা মহিলা যক্ষ, লক্ষ্মী, ঘোড়া, সূর্য, ফুলের নকশা ইত্যাদি এবং আরও চারটি অস্পষ্ট নকশাচিত্র তথা সামাজিক ও ধর্মীয় চিত্রকলার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এই দেউলটির বিশেষত্ব হল, এর উপরের অংশে যে চক্রাকার আমলকটি দেখা যায় সেটি অনেক ছোট, গ্রীবা ও বেকিটিও খুবই ছোট। এই মন্দির দেউলটি বিগ্রহশূন্য। স্থানীয় মানুষের কাছে মন্দিরটি লক্ষ্মী মন্দির নামে বর্তমানে পরিচিত। এই মন্দিরের বিগ্রহটি নাকি কাশীপুরের রাজ বাড়ীতে বর্তমানে রয়েছে।^৮ পাড়ার লক্ষ্মী মন্দিরটি হরণাকৃতি চৈত্যগবাক্ষ অলংকরণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।^৯

পাথরের দেউলটির গঠন প্রণালী বান্দা বা তেলকুপির অনুরূপ, তবে এটি অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত। নরম বেলেপাথরের তৈরী এই দেউলটিতে হয়তো শিল্পীরা কারুকার্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই, এই নরম বেলেপাথরকে পছন্দ করেছিলেন। দুয়ারে কারুকার্য মন্ডিত কোনো পাথরের ফ্রেম নেই, যেটা আবার বান্দা দেউলে দেখতে পাওয়া যায়। পাড়ার এই পাথরের দেউলটি জৈনদেরই প্রতিষ্ঠিত। এটিরও তিনদিকে রয়েছে তিনটি কুলুঙ্গি। হয়তো এইসব কুলুঙ্গিতে অতীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্ষুদ্র তীর্থঙ্করমূর্তি। কুলুঙ্গির দুপাশে দুটি করে নারীমূর্তি চামরহাতে দাঁড়িয়ে আছে - যা জৈন স্থাপত্যের অন্যতম বিশেষত্ব। যদিও বর্তমানে দেউল এর ভিতরে কোনমূর্তি নেই। বর্তমানে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। জে. ডি. বেগলার সাহেব দেউলের অভ্যন্তরে গজলক্ষ্মী দেখতে পেয়েছিলেন (১৯০৩খ্রি:)। বর্তমানে অবলুপ্ত। আমার অনুমান সেটি

ছিল জৈনতীর্থঙ্কর অজিত নাথের শাসনদেবী। জে. ডি. বেগলার সাহেব যখন পাড়াতে আসেন তখন তিনি অনেকগুলি মূর্তিও ভাস্কর্য দেখতে পেয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি বীরস্তুম্ব (বর্তমানে নেই)। মেগালিথিক সংস্কৃতিতে 'শিলাস্তুম্ব' পূজো ধীরে ধীরে শিবপূজার প্রতীকে মিশে গেছে। আদিবাসী জীবনের 'বীরস্তুম্ব' (Menhir) মেগালিথিক বা প্রস্তর স্মৃতিস্তুম্ব যুগের পরিচয় দেয়।^৫

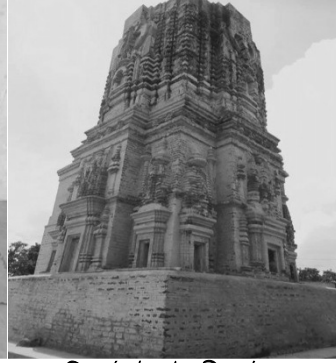
গ্রামের অভ্যন্তরে পশ্চিমপ্রান্তে বর্তমানে কুইরীপাড়ায় রয়েছে একটি মিশ্র দেউল। যার নীচের অংশ পাথর এবং উপরের অংশ ইট দিয়ে তৈরী। বাইরের থেকে দেখলে দুটি আলাদা মন্দির মনে হবে। মন্দিরের দরজাটি অর্ধবৃত্তাকার এবং পাথরের খিলান দিয়ে তৈরী। ইট নির্মিত অংশটি ছোট হতে হতে মিলিত হয়ে চূড়া তৈরী করেছে। সেখানে থাকা বড় বেদীতে যেএ কসময় কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে মূর্তি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। অনেকে মনে করেন মানসিংহের সঙ্গে আসা বৈষ্ণব পুরুষোত্তম দাস রাধারমন মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকেই এই মন্দির এলাকাবাসীর কাছে রাধামাধবের মন্দির নামে পরিচিত। তবে মন্দিরটির গঠন প্রণালী দেখে অনুমান করা যায় এটি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর।^৬ গ্রামবাসীদের মতে পুরুষোত্তমদাস প্রতিষ্ঠিত রাধারমন মূর্তিটি, তৎকালীন কাশীপুরের রাজা সম্ভবত শঙ্করীপ্রসাদ সিংদেও নিয়ে যান। বর্তমানে এখানে জন্মাষ্টমীতিথিতে পূজো পাঠ হয়। বর্তমানে মন্দিরটির উপরিভাগ আগাছায় পূর্ণ। ইটে ফাটল ধরেছে। গ্রামবাসীদের দাবী নিয়মিত পরিষ্কার করে অন্তত রক্ষা করা আবশ্যিক প্রয়োজন, নচেৎ এটি অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

কুইরী পাড়ার মন্দিরটি, যেটি গ্রামবাসীদের নিকট বর্তমানে রঘুনাথ মন্দির নারায়ণ মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরটি পূর্ব দিকে মুখ করে রয়েছে। মন্দিরটিতে পাথর, ইট ও লোহা দিয়ে তৈরী। মন্দিরটি মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত। মন্দিরের দুটি চূড়া, বর্তমানে একটি চূড়া নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরের উচ্চতা আনুমানিক ৪৫ ফুট। গ্রামবাসীরা মনে করেন এই মন্দিরে এক সময় সোনার মূর্তি ছিল। গ্রামবাসীরা জানান পরিবালা কুইরী স্বপ্ন পেয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহ খুঁড়ে শাখ, পাথরি পেয়েছিল। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কুইরী মন্দিরটি সংস্কার করেন। মূল মন্দিরের ভিতরে চারটি বড় কুলুঙ্গী রয়েছে। মূল মন্দিরের প্রবেশদ্বারে একটি পাথর খোদিত লিপি রয়েছে, লিপিটি বর্তমানে অস্পষ্ট। এই শিলালিপিটি পাঠোদ্ধার হলে বহু অজানাতথ্য জানা যাবে।^৭ কিন্তু দিনের পর দিন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট অত্যাচারে লিপির যা অবস্থা, তাতে হয়তো কোনদিনই সেসব তথ্য উদ্ধার করা যাবে না।

তবে এই দেউলে ফুটে উঠেছে সুস্মৃতিসুস্ম কারুকার্য। যদিও দেউলের কোন অংশে শিল্পীর নাম বা নির্মাণকাল উল্লেখ পাওয়া যায়নি। হয়তো শিল্পীদের নাম - যশ - খ্যাতি - প্রতিপত্তির প্রতি মোহ ছিল না। তাই শিল্পীরা নিজেদের নাম খোদাই করেননি, হয়তো বা শিল্পকর্মের মাধ্যমেই দিয়ে গেছেন নিজ পরিচয়। লোকগবেষক ড: সুভাষ রায়ের মতে - এই দেউলগুলির নির্মাণকাল নবম থেকে একাদশ শতাব্দী।^৮



চিত্র: অষ্টভূজা দেবী মূর্তি



চিত্র: ইটের তৈরী দেউল

বর্তমানে এই রঘুনাথ মন্দিরের উচ্চতা আনুমানিক ৪৫ফুট। মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন লতাপাতা, ঝোপঝাড়, বড় গাছ গজে উঠেছে। মন্দিরের দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, যে কোন মুহুর্তে মন্দিরটি চাপা পড়ে যেতে পারে। গ্রামবাসীদের দাবী যদি মন্দিরটি সংস্কার করা হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির উপহার দিতে পারবো।



চিত্র: কুইরী পাড়ার মিশ্র দেউলের গায়ে ফাটল



চিত্র: কালো বেলে পাথরের দেউল

তথ্যসূত্র:

- ১) দেবপ্রসাদ জানা; অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (প্রথম পর্ব); কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন; ২০০৩; পৃষ্ঠা-১১৮
- ২) সাক্ষাৎকার: নাম - কাজলী বাউরী, বয়স -৮০, ঠিকানা - কুইরী পাড়া।
- ৩) সাক্ষাৎকার: নাম- বিন্দুবালা কুইরী, বয়স-৭৫, ঠিকানা - কুইরী পাড়া।
- ৪) দেবপ্রসাদ জানা; অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (প্রথম পর্ব); কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন; ২০০৩; পৃষ্ঠা- ১৩৫
- ৫) ড: শান্তিসিংহ; লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ঝুমুর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমি (১৯৯৭), পৃষ্ঠা-৪৯
- ৬) সুভাষ রায়; প্রসঙ্গ: পুরুলিয়া (১); কলকাতা; বর্ণালী, ২০১০; পৃষ্ঠা-৪৯
- ৭) দিলীপ কুমার গোস্বামী; পুরুলিয়া জেলার থানা গুলির ইতিহাস; পুরুলিয়া: ২০০৮; বঙ্গভূমি প্রকাশনী; পৃষ্ঠা -১৮৬
- ৮) সুভাষরায়; পুরুলিয়ার সরাক ও জৈন পুরাকীর্তি; পুরুলিয়া, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১১০।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মুসলিম নীতিশাস্ত্র ও বাংলা সাহিত্য

মহ আজিম আলি

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত),
গোপপ্রাঙ্গণ, মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : মুসলিম নীতিশাস্ত্রের পরিচয়, রূপ ও আদর্শ জানতে হলে কুরআন ও হাদীসের তথা ইসলামী আদর্শের সীমারেখার ভিতরে জানতে হবে। এর বাহিরে যাওয়া যাবে না। মানব সমাজ যখন ব্যাপ্তি লাভ করেছে, নানা সমস্যা ও জটিলতা এসে মানুষকে স্বার্থসচেতন করে তুলেছে, সামাজিক নিয়ম-বিধি লঙ্ঘন করে পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ প্রবণতা বেড়েছে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে, এবং সমাজ যখন মানুষের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন ধর্ম উপস্থিত সমাজকে শাসন করতে। ধর্মের বাণী নিয়ে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন অসংখ্য মহাপুরুষগণ মুসলমানগণও বিশ্বাস করেন সমাজে নীতি-ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বহু নবী ও রসুলের আবির্ভাব ঘটেছে। বস্তুতঃ যে ভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন দেখা যাবে ধর্ম মানুষকে শুধু নীতিমালার উপহার দেয়নি, নীতি অনুসরণের আবশ্যকতাও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ষোড়শ শতাব্দীর সৈয়দ সুলতান বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে এক নব চেতনার সঞ্চার করেন। শেখ ফয়জুল্লাহ *সুলতান জমজমা* কাব্যের তিনটি কাহিনী রয়েছে। এই কাহিনী গুলোর মধ্যে সুলতান জমজমার কাহিনীটিই সমধিক কৌতূহল-প্রদত্ত, ও মর্মস্পর্শী। আলাওল সপ্তদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। রচনার প্রাচুর্যে পাণ্ডিত্যের প্রাথর্যে শব্দ সম্ভারের ব্যাপকতাই এবং বিভিন্ন ভাষাঙ্গনের দক্ষতায় তাঁর তুল্য কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একান্ত বিরল। কবি আব্দুল হাকিম, ইসলামী ভাবধারা তাঁর লেখায় প্রকাশ করেন। তাঁর আটখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সূচক শব্দ: নীতিশাস্ত্র, কোরআন, হাদিস, কাব্য, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ আলাওল।

মূল আলোচনা:

বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনাকালকে বাংলায় মধ্যযুগের শুরু বলা হয়। ইতিহাসে এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ কতকগুলো যুগান্তকারী পরিবর্তন দরকার। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে বঙ্গের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের আগে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। দু-একজন সুফীদরবেশের প্রচেষ্টায় কেবল ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের পর থেকেই এদেশে মুসলমানদের সংখ্যা হুড়ু হুড়ু করে বাড়তে থাকে। আর মুসলমানদের আগমনের ফলে অনেক সুফীদরবেশ ও আলীম-ওলমাদেরও আগমন ঘটে। এদেরই আন্তরিক প্রচার তৎপরতায় ক্রমে ক্রমে বঙ্গে ইসলাম বিস্তৃত হতে থাকে। এর পর মুঘল আমলে বাংলার সঙ্গে সুদূর দিল্লী-আগ্রার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হলো, বহিরাগত

আলীম-ওলমা ও সুফী-দরবেশগণের প্রচার তৎপরতা মুঘল শাসনকালে বিস্তার লাভ করল। এইভাবে মুঘল আমলে মুসলিম সমাজ অপেক্ষাকৃত প্রসারিত হবার সুযোগ পেল, সেই সঙ্গে পূর্বজ মুসলমানদের বংশধারাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। “ষোড়শ শতাব্দির প্রারম্ভে পর্তুগীজ পর্যটক দুর্যার্ভে বারবোসা বাংলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজ-অনুগ্রহ পাইবার জন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পানীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমনকি নিষিদ্ধ ভোজ্যের গন্ধ নাকে আসিলেও হিন্দুর জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন হিন্দু নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও আত্মীয়স্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়া গণ্য হইত। এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়া হিন্দুকে মুসলমান করা হইত-আবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বৈচ্ছায় ফকীর ও দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে ধর্মাস্ত্রিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”^১

ইসলামী শাস্ত্রের পরিচয়, রূপ ও আদর্শ জানতে হলে কুরআন ও হাদীসের তথা ইসলামী আদর্শের বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে হবে। মধ্যযুগে বাংলা নীতি কাব্য গুলোর মূল ভিত্তি ছিল শাস্ত্র। হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যে সকল গ্রন্থকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ামক রূপে মান্য করা হয়ে থাকে তাকে সাধারণত শাস্ত্র বলা হয়। এটি সাধারণত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়, যেখানে শাস্ত্র হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান বা বিদ্যার সংকলন। নীতিকাব্যগুলো শাস্ত্রাবলম্বনে রচিত বলে কবিগণ শাস্ত্র এবং নীতি-শাস্ত্রের মধ্যে বড় বেশি পার্থক্য করেননি। তবে শাস্ত্রের চেয়ে নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত সীমিত। শাস্ত্রের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দীর্ঘসূত্র জটিলতা নীতিশাস্ত্রে আলোচিত হয় না। নীতিশাস্ত্র, জীবন-যাপনের শাস্ত্রভুক্ত আচার-আচরণগুলো আলোচনা করে মাত্র। অবশ্য কখনও কখনও নীতি অনুসরণের গুরুত্ব ও আবশ্যিকতা বোঝাবার জন্য নীতিশাস্ত্র ধর্মতত্ত্বের দু-একটি মৌলিক শিক্ষার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। মুসলমানদের অধিকাংশ বাংলা রচনাই শাস্ত্রমূলক; কিন্তু সেগুলিকে নির্বিচারে নীতিকাব্যের ধারভুক্ত করা যায় না। মুসলমানদের নীতিকাব্যগুলো শনাক্তিকরণের প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে *শরীয়ত*। আর *শরীয়ত* হচ্ছে ইসলাম অনুসারীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান যা তাদের সমগ্র ধর্মীয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক গার্হস্থ্য ব্যক্তিগত জীবনকে অদ্রাস্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।^২ কাজেই যেসকল রচনায় শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও *শরীয়ত* নীতি-নীতি বিশেষভাবে আলোচিত হয় না সেগুলোকে আমরা ‘নীতিশাস্ত্র’ তথা ‘নীতিকাব্য’ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। মুসলিম নীতিশাস্ত্রের মূল বিষয়বস্তু হলো নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে সাহায্য করে। মুসলিম নীতিশাস্ত্রগুলো শরীয়তভিত্তিক রচনা হলেও, তবে সকল নীতিশাস্ত্রেই শরীয়তের সকল বিষয় সমান গুরুত্ব পেয়েছে এমন নয়, আবার সকল নীতিশাস্ত্রেই শরীয়তী বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়েছে তাও নয়। সঙ্গে কিছু লোকবিশ্বাস, লোকাচার, জ্যোতিষবিদ্যা প্রভৃতিও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এগুলোকে মুসলিম কবিগণ শাস্ত্রীয় দোহাই দিয়ে বৈধ করে নেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। আবার কোনও কোনও নীতিশাস্ত্রে প্রাচীন ভারতীয় কাহিনীমালাও ঠাঁই পেয়েছে। এর ফলে নীতিশাস্ত্রগুলো বিচিত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ষোড়শ শতকে মুসলিম নীতিশাস্ত্রের ভাবধারায় যেমন সৈয়দ সুলতানকে লিখতে দেখছি *নবীবংশ* (১৬৫৪ খ্রীঃ), শেখ ফয়জুল্লাহকে লিখতে দেখি *সুলতান জমজমা*, তেমনি

সপ্তদশ শতাব্দীর সৈয়দ আলাওল কে লিখতে দেখেছি- *পদ্মাবতী, তোহফা*। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের কবিদের লেখাতেও কোন না কোন ভাবে ধর্মেরই মাহাত্ম্য বর্ণনার আভাস পাওয়া যায়। মধ্যযুগে কবি সৈয়দ সুলতানই ষোড়শ শতকে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য- সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারায় প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে এক নব চেতনার সঞ্চার করেন। তার সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ *নবীবংশ* এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বে যেসব সাহিত্য পদবাচ্য কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল সে সবার মধ্যে পুরাণ, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, রামায়ান, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, গোরক্ষবিজয় ইত্যাদি প্রধান। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব, হিন্দু দেব-দেবীর গুণকীর্তনই মুখ্য ছিল এবং বাংলার মুসলমানরা এইসব শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। হিন্দু দেব-দেবীর গুণকীর্তন শুনতে শুনতে তিনি উপলব্ধি করলেন ইসলাম ধর্ম ও মহম্মদ (সঃ) সম্পর্কে বাংলা ভাষায় লেখা অত্যন্ত আবশ্যিক। তা তাঁর *নবীবংশ* এর বর্ণনাতেই উপলব্ধি করা হয়। যেমন :

কত দেশ কত ভাষে কোরআনের কথা।
দিন মহাম্মদী বুঝি দেয়ন্ত ব্যবস্থা।।
কর্মদোষে বঙ্গিতে বাঙালী উৎপন্ন।
না বোঝে বাঙালী সবে আরবী বচন।।
আপন দ্বীনের বোল এক না বুঝিল।
পশুর চরিত্র হই সেসব রহিল।।
সদয় পড়য় রাম কৃষ্ণের যে কথা।
শুনিয়া আমার মনে লাগে অতি ব্যথা।।^৩

মুসলিম শাসনকালের প্রথমদিকে মুসলিম সমাজে বাংলা ভাষায় তথা শাস্ত্রকথা রচনার ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। সৈয়দ সুলতান বাংলা ভাষায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র রচনা করার জন্য যে বক্তব্য রাখেন তাঁর প্রভাব দেখা দেয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মুসলিম কবিগণের ইসলামী শাস্ত্র রচনার মধ্য দিয়ে।

সৈয়দ সুলতান (ষোড়শ শতক) আরাকান আভিজাত তত্ত্বের সঙ্গে সুসম্পর্কিত থেকেও মধ্যযুগীয় মুসলমানী বাংলা সাহিত্যে উদ্যোক্তা পুরুষ হিসেবে আত্মস্বাতন্ত্র্য চিন্তার সম্ভার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রমাণ *রসুল প্রশস্তি*র একটি বিশেষের নমুনা :

প্রথমে প্রভুর নাম করি এ স্মরণ
আঠার হাজার সালাম যাহার সৃজন।
দ্বিতীএ লয় মুস্তাফা পয়গম্বর
যাহার সিফত আছে রোজ মহাশর।
যতন করি ধরি এ রসুল দুই পাত্র
আখেরে এড়াইবা যদি হিসাইবার দাত্র।।

(জ্ঞানপ্রদীপ) সৈয়দ সুলতান^৪

শেখ ফয়জুল্লাহ (ষোড়শ শতক) মুসলিম নীতিশাস্ত্রের ভাবধারায় বাংলাতে *সুলতান জমজমা* কাব্যটি রচনা করেন, এতে তিনটি কাহিনী রয়েছে। সংক্ষিপ্ত হামদ ও নাত বর্ণনা করে প্রথম কাহিনী শুরু হয়েছে। ঐ কাহিনীটি উপদেশাত্মক (ধর্মীয় নীতিশিক্ষা)। দ্বিতীয় কাহিনী সামদেশের নরপতি সুলতান জমজমার ও ইসা (আঃ) কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কাহিনী বর্ণিত

হয়েছে কীভাবে ইসা (আঃ) এর প্রার্থনায় আল্লাহ সুলতান জমজমার জীবন দান করলেন। তৃতীয় কাহিনী ঠিক কাহিনী নয়; মূলত পরকালের শান্তি ও পুরস্কারের হেতু সমূহ বর্ণিত।^৫

ষোড়শ শতকে অপর একজন মুসলিম সাহিত্যিক হলেন শেখ সুলায়মান। তাঁর একটি *অসিয়তনামা* কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। *অসিয়তনামা* কাব্যটি - অমুদ্রিত, কাব্যে প্রথমে সংক্ষেপে আল্লাহ ও পীর বন্দনা আছে। এর পর কাব্যের উৎস প্রসঙ্গ এবং প্রশ্নোত্তরে নানা নীতিকথা ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্নগুলো করেছেন জৈনকা অভ্যাগতা রমণী, যখন হজরত মহম্মদ (সঃ), হজরত আলী ও অন্যান্য সাহাবীদের নিয়ে মজলিসে বসেছিলেন, জবাব দিয়েছেন হজরত মহম্মদ (সঃ), প্রশ্ন গুলো সবই ছিল নারী-পুরুষের পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে। কাব্যে বর্ণিত প্রসঙ্গ- নারীকে স্বামীর সঙ্গে সর্বদা প্রীতি রক্ষা করে চলতে পরামর্শ দিয়েছেন, হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং সম্প্রীতির অভাবে শান্তির অনিবার্যতা সম্পর্কেও সচেতন করে দিয়েছেন :

রসূলে বুলিলা নারী শুনহ বচন।

ভক্তি ভাবে থাক নারী স্বামীর চরন।।

নিজ স্বামী সঙ্গে প্রেম যে নারী নাঞ।

সেই নারী পাইব দুঃখ নরকেও যাই।^৬

উল্লেখ্য এসময় মুসলিম কবিগণের হাতে রোমান্টিক প্রনয়োপাখ্যানের পাশাপাশি *রসূল বিজয়* ও *জঙ্গনামা* শ্রেণীর কাব্য প্রণীত হতে থাকে। *জঙ্গনামা* (যুদ্ধকাহিনী), বিশেষ করে ইসলাম ধর্মপ্রচারক আদি ইমামদের ইরান বিজয় এবং আত্ম কলহ কাহিনী। কয়েকখানি জঙ্গনামার বিষয় কারবালার করুন কাহিনী। হাসান হোসেনের মৃত্যু অভিমন্যু বধের মতই শোচনীয়। বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে এই কাহিনী সমধিক আদর ছিল সবচেয়ে পুরানো বাংলা জঙ্গনামা। বোধকরি কবি মোহম্মদ খানের *মুজাল হোসেন* (১০৫৬ হিজরী, ১৬৪৬ খ্রীঃ) বংশ পরম্পরায় কবি চাটগাঁয়ের লোক।^৭ মোহম্মদ খাঁন (১৫৮০-১৬৫০ খ্রীঃ) প্রধানত দুটো কাব্যই রচনা করেছিলেন। (১) *সত্যকলি বিবাদ সংবাদ* (২) *মুজাল হোসেন*। *মুজাল হোসেন* কোনও কোনও পর্ব স্বতন্ত্র কাব্য হিসেবেও প্রচলিত ছিল, যেমন *আসহাবনামা*, *হানিফার লড়াই*, *কেয়ামতনামা* বা *দাজ্জালনামা* ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে *হানিফার লড়াই* কাব্যকে ডঃ এনামুল মুহম্মদ হক স্বতন্ত্র কাব্য বলে মনে করেন। কারণ এ কাব্যের শুরু দিকে ছন্দনাংশ আছে।^৮ প্রসঙ্গত বলা দরকার এরূপ বন্দনাংশ *কিয়ামতনামা* বা *দাজ্জালনামা* কাব্য্যাংশেও আছে। যেমন :

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।

দ্বিতীয়ে প্রণাম করি ফিরিস্তাগণ।

তৃতীয়ে প্রণাম করি নবীর চরন।

চতুর্থে প্রণাম করি আলী মহাজন।

পঞ্চমে প্রণাম করি ফাতেমী যে সতী।...^৯

কেয়ামতনামা কাব্য্যাংশের বিষয়বস্তু এইরূপঃ- প্রথমে কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ, তারপর দাজ্জালের আগমন, ঈসা (আঃ) এর পুনরাবির্ভাব, দাজ্জালের সংঘাত, মুসলমানের জয় ও সুখশান্তির বিবরণ, আবার তাদের অধঃপতন, মহাধ্বংস, পাপপুণ্যের পরিমাপ পুলসিরাত, বেহেস্তের বর্ণনা প্রভৃতি, পুলসিরাত পার হবার সময় মানুষকে সাতটি পর্যায় পার হতে হবে এবং সাতটি স্তরে সাতটি জিজ্ঞাসায় জবাব দিতে হবে। এ জিজ্ঞাসাগুলো নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কিত যেমন :

প্রথমে পুছিব জান আছেন ইমান।

দ্বিতীয়ে নামাজ রোজা পুছিব বিধান।।...^{১০}

সৈয়দ আলাওল (১৫৯৭- ১৬৭৩ খ্রীঃ) মধ্যযুগের বাঙালী মুসলিম সাহিত্যবাদের মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভা। তিনি আরবী, ফার্সি, উর্দু ও সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলে তাঁর লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায়। উন্নত জীবন বোধ নির্মাণের পরিপোষক ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানামুখী বিকাশে সৈয়দ আলাওল ছিলেন অন্যতম বিরল কবি। আলাওল আনুমানিক ১৬৪৬ সালে (মতাঃ ১৬৫১ খ্রীঃ) পদ্মাবতী কাব্য সমাপ্ত করেন। তার কাব্যের অংশ বিশেষের নমুনা :

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।

ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার।।

নিজ সখ্য মহম্মদ প্রথমে সৃজিলা।

সেই জ্যোতি মূলে ত্রিভুবনে নিরমলা।।

জন্মিয়া যে জনে না লইল তার নাম।

তাহার হইব নরকের মাঝে ধাম।।

(পদ্মাবতী - সৈয়দ আলাওল)^{১১}

আলাওল ধর্মীয় তত্ত্বমূলক গ্রন্থ *তোহফা* নামক কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যটি ফারসী তুহফ-ই-নাসাই এর বঙ্গানুবাদ মূল রচয়িতার নাম শেখ ইউসুফ। আলাওলের *তোহফা* একটি বিশিষ্ট নীতি কাব্য। কবি একাব্যের বাংলা নাম দিয়েছেন *তত্ত্বউপদেশ*। এতে মোট ৪৫ ‘বাব’ বা অধ্যায় রয়েছে। *তোহফা*তে তৌহিদের কথা, ইমানের কথা, গৌর সওয়াল, নামাজের বিবরণ, যাকাতের কথা, রোজার বয়ান, জলপানের নিয়ম প্রভৃতি উল্লেখ রয়েছে।^{১২}

কবি আব্দুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০ খ্রীঃ) নীতিশাস্ত্রের ভাবধারায় তাঁর লেখায় প্রকাশ করেন এবং তাঁর অনুগামীদের এ পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কবি আব্দুল হাকিমের মোট আটখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন-*ইউসুফ জোলেখা*, *লালমতি জয়ফুল মুলুক*, *নূরনামা (সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক কাব্য)*, *নসিয়ত নামা*, *চারি মোকাম ভেদ*, *কারবালা*। বেশির ভাগ কাব্যই ফারসি কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণে লিখিত। *দূররা মজলিশ* (এটির কয়েকটি নাম পাওয়া যায় যেমন- *শাহনামা*, *সভার মুক্তা*, *শিহাবুদ্দীননামা*), কবি আব্দুল হাকিমের *দূররা মজলিশ* কাব্যটি নীতি শিক্ষামূলক। *দূররা মজলিশের* বিষয়বস্তু-স্রস্টার পরিচয়, রমজান মাসের পুন্যকথা, রসুলের বানী, ইব্রাহীম (আঃ) কাহিনী, স্বপ্ন ব্যাখ্যা, হারুন-রসিদের সুবিচার প্রভৃতি।^{১৩}

জঙ্গনামার আর এক কবি নসরুল্লাহ খান (সপ্তদশ শতক) এর নিবাসও চাটিগাঁও। কবির মুর্শিদ ছিলেন পীর হামিদুদ্দীন। পর্বত শিখরে আল্লাহ ও মুসার সংলাপ নিয়ে লেখা মুসার সওয়াল এর (মুছার ছোয়াল) লেখক নসরুল্লাহ ইনিই কিনা বলা যায় না।^{১৪} তাঁর একটি কাব্যের অংশ বিশেষ হল -

আর এক কথ কহি আমি রঙ্গমনে।

জেই কর্ম না করিব মুমিনগণে।।

জে সকল কর্মে মোহাম্মদ অসন্তোষ।

হিসাবের কালে প্রভু করিবে রোষ।।

(হিদায়াতুল ইসলাম- নসরুল্লাহ খান)^{১৫}

বাংলা ভাষায় ধর্ম প্রকাশ করতে কবিরা নানা ভাবে কৈফিয়ত দিয়েছেন। কারণ বাংলা ভাষা তখন বেদীনা ভাষা রূপে আখ্যায়িত ছিল। সকলেই ধারণা দিল এ ভাষা সংস্কৃত জাত। তাই দেখা যায় সৈয়দ সুলতান, আলাওল, মুহম্মদ খাঁন, শেখ ফয়জুল্লাহ প্রমুখ কবি মুনাফিক (ইসলাম থেকে বহিষ্কার) ফতোয়ার ভয়ে শঙ্কিত চিত্তে বাংলায় লেখা শুরু করেছিলেন। বাংলায় ধর্ম কথা শোনানোর জন্য তাঁরা কৈফিয়তও দিয়েছেন। এ কৈফিয়ত এর ব্যাপারটি সতেরো শতকের কবি আব্দুল হাকিমের মনে স্ফোভের সঞ্চার করেছিল। তিনি আরবী, ফারসি পাশাপাশি বাংলা ভাষায় শাস্ত্রের বিধান বুঝতে আহ্বান জানান :

আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্র বিধান

কথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান।।

আরবী পড়িতে যদি পারে কদাচিত

ফারসী পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত।।

ফারসী যদি না পার কঞ্জিত

নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত।^{১৬}

পরিশেষে বলতে পারি, বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজকে পথ দেখানোর জন্য সমাজের কর্তা স্থানীয় ব্যক্তিগণ সভা-মজলিশ ও বৈঠক বসিয়ে ধর্মকথা (ইসলামী শাস্ত্র) আলোচনা করতেন। এই সকল আলোচনা ছিল মৌখিক, তাতে মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধিত হত না। তাই সমাজকে শোধিত করার জন্য মুসলিম কবিগণ বিজ্ঞজনের (আলেম, পণ্ডিত ব্যক্তি) আলোচনাকে একত্রিত করে, উর্দু, ফারসি, আরবী, ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় মুসলিম নীতি শাস্ত্র রচনা করেন। মুসলিম সমাজে অনেক পীর, ফকির, ওলী, দরবেশ নানান অশাস্ত্রীয় ও মনগড়া বিধান দ্বারা বাংলায় মুসলমানদের বিভ্রান্ত করেছিল। উপরন্তু যথোচিত শিক্ষার অভাবে মুসলিম সমাজে অনেক অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতি (কবর পূজা, পীর পূজা, মানত, মাজার পূজা প্রভৃতি) প্রবেশ করেছিল, তাই মুসলিম সমাজের বিকার বিকৃতি দূর করার জন্য ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের কবিগণ মুসলিম নীতি শাস্ত্র বাংলা ভাষায় চর্চার মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের আভাস দেন। মুসলমানদের ঐতিহ্য ও জীবনকে সর্বত ভাবে নিরাপদ রাখার জন্য নীতি শাস্ত্রমূলক কাব্যগ্রন্থ গুলি রচিত হয়েছিল। তাই পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে তোলার জন্য ইসলামী সাহিত্যিকগণ ইসলামী ভাবধারায় কাব্যগুলি বর্ণনা করেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানরা যাতে সুখ ও সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী হতে পারে, সে উদ্দেশ্যে সমাজ ও অর্থনীতি আলোচনাও মুসলিম নীতি শাস্ত্র মূল কাব্যে স্থান পেয়েছে। বস্তুত, ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক রীতিনীতির বর্ণনা দিয়ে মুসলিম সাহিত্যিকগণ সমকালীন মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও পবিত্র জীবন রক্ষার একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত শব্দ ও সংকেত সূচী (টীকা):

আঃ - *আলাইহিস সালাম* একটি আরবি বাক্য, যার অর্থ হলো তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটি মুসলমানরা নবী, রাসুল ও ফেরেশতাদের নামের সাথে ব্যবহার করে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

সঃ - *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম* অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর (হযরত মুহাম্মদ সাঃ) উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

রসুল - ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর, ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ।

কেয়ামত - *কেয়ামত* শব্দের অর্থ হলো উঠে দাঁড়ানো বা পুনরুত্থান।

সাহাবী - সাহাবী শব্দের আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, বন্ধু, অনুসারী, সহচর, এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামি পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা মুহাম্মদের (সা.) সঙ্গী-সাথীদের বুঝায়।

পুলসিরাত - *পুলসিরাত* হলো পরকালের একটি বিশেষ সেতু, যা জাহান্নামের উপর অবস্থিত এবং এটি মুমিনদের জাহান্নাতে যাওয়ার একমাত্র পথ।

হামদ - আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে যে কোন ভাষায় গাওয়া সঙ্গীত বা গজল (কথ্য)।

নাত - এক প্রকারের কবিতা যা হজরত মহম্মদের প্রশংসা করে লেখা।

তথ্যসূত্র:

- ১। শ্রী রমেশমজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড (মধ্যযুগ)*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১১৯, ধর্মতলাস্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফাল্গুন ১৩৭৩, পৃষ্ঠা- ২৬২।
<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.303596/page/n262/mode/1up>
- ২। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা- ৪০৯।
- ৩। আব্দুস সাত্তার, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব*, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদিত), বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার, ঢাকা, জুন ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২৭৫।
- ৪। মুকুল চৌধুরী, *বাংলা কবিতায় রসুল ও প্রশস্তি*, পৃষ্ঠা- ২৫২, মোঃ আব্দুল কাশেম, *পুথি সাহিত্যে মহানবী (সাঃ)*, তাওহীদ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৮।
- ৫। খন্দকার মুজাম্মিল হক, *মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলিম নীতিশাস্ত্র কথা*, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশন ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ৩১-৩২।
- ৬। অমুদ্রিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুথি নং-২০৯, পৃষ্ঠা- ৩/খ।
- ৭। সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা প্রথম প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা- ৪৫।
- ৮। ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১৮৫।
- ৯। অমুদ্রিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুথি নং- ২০৬, পৃষ্ঠা- ১/খ।
- ১০। ডঃ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫।
- ১১। মুকুল চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫২, মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা-১৮।
- ১২। আহমদ শরীফ, *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- ৪৭৪।
- ১৩। আব্দুল মুকীত চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান*, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ২৩১।
- ১৪। সুকুমার সেন, *ইসলামী বাংলা সাহিত্য*, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৭।
- ১৫। মুকুল চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫৪। মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮।
- ১৬। আব্দুল মুকীত চৌধুরী, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩১।

ইতিহাসের আলোকে ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল বঙ্গসমাজে সতীদাহ প্রথা : একটি সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান

রাতুল দে

স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ ছিল অন্যতম। উপনিবেশিক রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবা নারীদের স্বামীর চিতায় আত্মাহুতির সাথে চিংকারকে দমিয়ে রাখার জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে পৈশাচিক নৃত্য চলত যা সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। পৌরাণিক কাহিনীতে মহাভারতে ‘মৌষলপর্বে’ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁর চারজন স্ত্রীর সহমরণে উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম এ ‘সহমরণ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। অন্যদিকে পৌরাণিক মহাকাব্য ‘রামায়ণ, মহাভারতে’ সতীপ্রথার উল্লেখ পাই। মহাকবি কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’, শূদ্রকের ‘মুচ্ছকটিকম’,-এ সতীদাহের উল্লেখ আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই সামাজিক ব্যাধির উৎপত্তি থেকে অবসানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা কথা আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: সতীদাহ, সতীমাতা, বাণভট্ট, রাজা রামমোহন রায়, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক।

মূল আলোচনা:

ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দু সমাজে একটি ন্যাকারজনক সামাজিক ব্যাধি ছিল সতীদাহ প্রথা। সতীদাহ প্রথা অনুযায়ী বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতে হত, এবং সেই মর্মান্তিক চিংকার দমনের জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে পৈশাচিক নৃত্য চলত। শুধু অবিভক্ত বাংলাদেশে ছাড়া প্রাক-আধুনিক যুগে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতেও এই প্রথার অস্তিত্ব ছিল। তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সতীদাহ প্রথার উৎপত্তিকাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন ভারতে সতীদাহ প্রথার সাথে ‘সতীব্রত’, ‘সতীমাতা’ শব্দদ্বয়ের উল্লেখ রয়েছে। ‘সতীব্রত’ অর্থাৎ যেখানে নারী স্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞা করতেন, যদি তিনি আগে গত হন তবে স্ত্রী সহমরণে যাবেন। ‘সতীমাতা’ অর্থাৎ সতীদাহ প্রথা পালনকারী নারীকে সতীমাতা অভিহিত করা হয়। ইতিহাসের বাইরে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্যেও এই বর্বর প্রথার উল্লেখ আছে। মহাভারতে ‘মৌষলপর্বে’ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁর চারজন স্ত্রী দেবকী, ভদ্রা, মদ্রিরা, রোহিনীর সহমরণের উল্লেখ পাই। পুরাণে শিবের সাথে সতীর বিবাহের কথা পিতা দক্ষ স্বীকার না করলে কন্যা সতী চিতায় উঠে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন দক্ষ কন্যা ‘সতী’ থেকে ‘সতীদাহ’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

ঐতিহাসিক রোমিলা থাপাড তাঁর “The Past as Present Forging Contemporary Identities Through History” গ্রন্থে সতীদাহ প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, “It’s origin is generally traced to the subordination of women in patriarchal society. But in searching for origins, other factors might also be

considered. If a woman is purchased as a bride, the logical termination may have been the requirement of her dying together with her husband, although this is not associated with such purchase. Perhaps a more acceptable explanation may relate to societies changing their systems of kinship and inheritance. In some circumstances the wife would be an alien who would have to be debarred from claiming an inheritance. A further reason could be that it demonstrated control over female sexuality. The practice may have originated among societies in flux and become customary among those holding property such as the families of chiefs and kshatriyas. Once it became established as a custom associated with the kshatriyas it was to continue to be so among all those claiming kshatriya status. The earliest hint of a ritual that might have been similar to sati comes from the Rigveda of the late second millennium BC. But it takes a different turn. The Vedic texts on the contrary endorse the system of niyoga or levirate where a widow is permitted to marry her husband's brother if she has not borne a son to her husband. In the Rigveda the act was only a mimetic ceremony”^১

প্রাচীন ভারতে রামায়ণ ও মহাভারত এবং কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’, শূদ্রকের ‘মৃচ্ছকটিকম’, বাৎস্যায়নের ‘কামসূত্র’, ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’, সহ স্মৃতিসংহিতায় সতীপ্রথার উল্লেখ আছে।^২ ভারতে সতীদাহ প্রথার স্মারকচিহ্ন পাওয়া মধ্যপ্রদেশে ৫১০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তরাজ ভানুগুপ্তের এরন স্তম্ভলিপিতে। সেই লিপিতে এক বীর সম্রাটের মৃত্যুর সাথে তাঁর পত্নী সতী হন।^৩ অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে সতীদাহ প্রথা সমাজে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজে অন্য জাতির নারীদের সতী হওয়ার উল্লেখ নেই। প্রাচীন ভারতে একদিকে যেমন এ প্রথার সমর্থনের উল্লেখ আছে ঠিক তেমনি সেই সময়ে কিছু হিন্দু চিন্তাবিদ এর বিরোধিতা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মেধাতিথি, হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের নাম উল্লেখযোগ্য। বাণভট্ট তাঁর ‘কাদম্বরী’ গ্রন্থে অনুমরণকে পতিব্রতার লক্ষণ বলেননি। এছাড়াও চৈতন্যদেব সহ তন্ত্রেও এর বিরোধিতা করা হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলমান নরপতিরা সতীদাহ প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে না পারলেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছিলেন। মুসলিম পর্যটক আলবেরকনি বলেছেন, দিল্লির সুলতানের রাজ্যে কেউ সতী হতে চাইলে, তাকে সুলতানের অনুমতি নিতে হতো। অর্থাৎ জোর করে হিন্দু নারীদের সতী করার বিরোধিতা করা হয়েছিল। মোগল সম্রাট আকবর কাউকে জোর করে সতী করা না হয়, সেদিকে সচেতন ছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা বন্ধ করতে পারেননি। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেব সতীদাহ প্রথা নিবারণ করলেও তা বন্ধ হয়নি।

বাংলায় সতীদাহ প্রথার প্রচলিত হয় মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দীতে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে নারায়ণদেব ও কетকাদাসের “মনসামঙ্গল”, কৃত্তিবাসের “শ্রীরামপাঁচালি”, ঘনরামের “ধর্মমঙ্গল”, ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”-এ সতীদাহ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন গ্রন্থে উচ্চবর্ণের নারীদের সতী হওয়ার উল্লেখ থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সতীদাহ প্রথার ক্ষেত্রে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এখানে হিন্দু সমাজের সব বর্ণের মহিলারা সতী হতেন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ৬৩৯ সতী হয়েছিলেন, তার মধ্যে ২৫৩ জন ব্রাহ্মণ, ৮৮

কায়স্ত, বৈদ্য ৯, এবং ১৪৯ জন শূদ্র ছিলেন।^৪ এই ১৪৯ জন শূদ্র নারীদের মধ্যে *আঙুরি, বাগদি, কুমোর, তেলি, ডোম, কৈবর্ত, গোয়াল, চাষা, তাম্বুলী, তাঁতি, সোনার, কামার, চণ্ডাল, সদগোপ, নাপিত, ছুতোর, কেওরা, গন্ধবেন, মালি, ধোপা, বেনে, বারুই, যোগী, মালাকার, হাড়ি, জেলে, ময়রা, লোহার, পোদ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।^৫ জাতপাতের মতো মহিলাদের বয়সের ক্ষেত্রেও বাছবিচার ছিল না। ১৮১৫-২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সরকারি রিপোর্টে ৩৬১৩ জন মহিলা সতী হয়েছিলেন।^৬ তার মধ্যে ৪৭ জনের বয়স ১৬ বছর বা তার নীচে।^৭ শুধু ১৬ বছর বা নীচের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ ছিল না। বয়স্ক নারীদের মধ্যে সতী হবার প্রবণতা ছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ৮৩৯ জন মহিলা সতী হন।^৮ সেটা হলো নিম্নরূপ:-

নারীর সংখ্যা	বয়স
২	১০০
৮	৯০
৪৪	৮০
৬৯	৭০
১৪৯	৬০
১২৬	৫০
১৫৩	৪০
১২৭	৩০
১২২	২০
৪৯	২০-এর নীচে

সূত্র - স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপানি, ষষ্ঠ সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃ - ১০৪

অতএব ৮৩৯ জন মহিলার মধ্যে ৫৪ জনের বয়স ৮০ বা অধিক, ১৭১ জনের ৩০-এর নীচে যুবতী।^৯ ২২৫ জনকে বাদ দিয়ে ৬১৪ জন বা শতকরা ৭৩ জনের কিছু বেশি সতী প্রাপ্ত যৌবনা বা বৃদ্ধা, এদের বয়স ৩০ থেকে ৭৯-র মধ্যে।^{১০} সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই বালিকা হইতে বৃদ্ধা নারীরাও সতী হতেন।

এখানে পাঠকদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠে আসবে বাঙালি হিন্দু মহিলারা কেন সতীপ্রথা পালন করতেন? তার উত্তরে বেশকিছু কারণগুলি হল -

- ১) পরিবারের বংশমর্যাদা এবং পবিত্রতা রক্ষা, লোকচক্ষুর সামনে দেবী হওয়ার লোভ, পরজন্মে স্ত্রী হইতে পশু জন্মের আশঙ্কা।^{১১}
- ২) আত্মীয়স্বজনরা বিধবা নারীর দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং তার সম্পত্তি গ্রাস করার উদ্দেশ্যে মহিলাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সতী করতেন।^{১২}
- ৩) অনেক সময় ব্রাহ্মণরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নারীদের সতী হওয়ার প্ররোচনা দিতেন।^{১৩}
- ৪) এছাড়াও বৃদ্ধ স্বামী তরুণী স্ত্রীর কাছে মৃত্যুর পূর্বে সতী হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করতেন।^{১৪}

উপরিউক্ত চারটি কারণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ধর্মের নামে নিজেদের তথাকথিত সামাজিক বা পারিবারিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে উচ্চবর্ণের মানুষরা নারীদের সতী হওয়ার প্ররোচনা দিতেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। এবং অভাগা নারীরা নোংরা ধর্মীয় কুসংস্কারের স্বীকার হতেন। চিতায় তাদের অসহায় আতনাদ রক্ষণশীল সমাজের ধর্মীয় বেড়া জালে তলিয়ে যেতো। কিন্তু ইতিহাসের গভীরে গেলে স্বামী-স্ত্রী সহমরণের সাথে পুত্রের মৃত্যুতে মা সতী হয়েছেন বা প্রভুর মৃত্যুতে তার প্রিয় দাসের সহমরণের উল্লেখ আছে। স্বপন বসু তাঁর ‘বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পাঞ্জাব, রাজস্থানে পুত্রের মৃত্যুতে মাতারা সহমরণে গেছেন, যাঁকে ‘মা-সতী’ বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভাইয়ের মৃত্যুতে বোনের সহমরণ, মুসলিম পুরুষের মৃত্যুতে স্ত্রীর সহমরণ বা কবরে সহগমনের উল্লেখ আছে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে বৃন্দেলখন্ডের জেলে এক হিন্দু কয়েদির মৃত্যু হলে, এক মুসলিম মহিলা তার সাথে সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।^{১৫}

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিবারণে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পূর্ববর্তী প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। সতীদাহ প্রথার পক্ষে কোনো হিন্দু শাস্ত্রের বিধান নেই তা প্রমাণস্বরূপ মনুসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেন, “হিন্দু বিধবাদের পবিত্র ও সংযমী জীবন যাপন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ধ্বংসের কোনো বিধান দেওয়া হয়নি।”^{১৬} রামমোহন বিরোধী রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দু সমাজ সতীদাহ প্রথার সমর্থনে প্রচার তাঁর গতি রুদ্ধ করতে পারেনি। তিনি নারীর অধিকারের জন্য বিভিন্ন স্মৃতিকারদের কথা উল্লেখ করে বলেন, “যাঙ্গবন্ধ্য, কাত্যায়ন, নারদ, বিষ্ণু, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ নারীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারে স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।”^{১৭}

রামমোহন ১৮২২-এ প্রকাশিত তাঁর “Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu law of Inheritance”-এ বলেন, “শুধু ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের জন্যই নয়, বাঙালিসমাজে বিধবার অশেষ গঞ্জনা-লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা সবকিছু সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠে ভবিষ্যতে অনন্ত সুখভোগের আশায় জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেয়। অন্য একজন স্ত্রীলোকের মুখের কথায় অবস্থাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, বিধবা হলে আমাকে মাসে দুদিন উপোস করতে হবে, দিনান্তে একমুঠো খেতে পাব-তাও ভালোমন্দ কিছুই জুটবে না। আত্মীয়রা আমাকে তাদের বোঝা মেনে করবে, সবরকম অত্যাচারও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। সবাই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, গালমন্দ করবে। আর যদি প্রলোভনে পড়ে কখনও পদস্থলন ঘটে, তাহলে আমার ইহকাল-পরকাল দুই-ই গেল। বেঁচে থাকলে এর সবকিছুই আমাকে সহ্য করতে হবে-কিন্তু যদি আমি সতী হই, তাহলে ইহলোকে আমি সম্মানিত হব, আর পরলোকে-তো আমার জন্য অনন্ত সুখভোগের পথ খোলাই থাকবে।”^{১৮}

রামমোহনের সমর্থনে বাংলা, ইংরেজি সংবাদপত্রগুলো এগিয়ে আসে। সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান গেজেট, বেঙ্গল হুরকার, ক্যালকাটা জার্নাল প্রভৃতি সংবাদপত্র সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশ করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি যুবসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে। এই পরিস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক অভিষিক্ত হন। তিনি জানতেন সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করলে রক্ষণশীল বাঙালি হিন্দু সমাজে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। কিন্তু তিনি ধর্মীয় বিদ্বেষের পরিবর্তে মানবতা

এবং নৈতিকতার স্বার্থে এই প্রথার অবসান চেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানান **“The first objective of my heart is the benefit of the Hindus.”**^{১১} তিনি পূর্ববর্তী ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলদের মতো ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা নীতি পরিত্যাগ করেন।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বেস্টিক ১৭ নং রেগুলেশন জারি করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করলে রামমোহন তাঁকে সমর্থন জানান। অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারি ও নব্যবঙ্গীয় আন্দোলনের নেতা ডিরোজিও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা গভর্নরের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠান, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। শেষপর্যন্ত এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে মামলা লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে উঠে। রামমোহন বিলেত গিয়ে গভর্নরের রায়ের পক্ষে সেখানকার জনমত অর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল গোঁড়া হিন্দুদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। ফলে রামমোহন এবং বেস্টিকের প্রচেষ্টা সফল হয়।

রক্ষণশীল সমাজের চক্ষুশূলকে ভয় না পেয়ে রামমোহন এক দুঃসাহসীক লড়াইয়ে বিজয়ী হন। শেষ হয় হাজার বর্ষব্যাপী নারীহত্যার এক জঘন্য অধ্যায়। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধের পর সতী সম্বন্ধের ধারণা কল্পকাহিনী লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রচলিত থেকে যায়। এবং মহাকাব্য, লোকগাথা এবং লোককথার মধ্য দিয়ে সতীর ধারণার রূপান্তর ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাবে সতীপ্রথার বিলুপ্তির সাথে বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকরা নারীশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। যার ফলস্বরূপ বাংলা প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলী অন্যান্য মেয়েদের মার্গ দর্শনের ভূমিকা নেন। পরে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারীরা পিছিয়ে থাকেনি। বর্তমান সমাজে যেমন নারীরা পুরুষদের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক তেমনি সমাজে ধর্ষণের মতো নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নারীরা সতীদাহ প্রথা থেকে মুক্তি পেলেও ধর্ষণের মতো সামাজিকভাবে ব্যাধি থেকে মুক্তি পাননি। এই সামাজিক ব্যাধিকে নিকেশ করতে জাতি, বর্ণ, মত নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

সূত্র নির্দেশ:

১. রোমিলা থাপাড়া, ‘দ্যা পাস্ট অ্যাস প্রেজেন্ট ফোর্জিং কন্টেম্পোরারি আইডেন্টিটিস গ্রু হিস্টরি’, আলফ বুক কোম্পানি, নিউ দিল্লি, ২০১৪, পৃ - ২৬৮।
২. স্বপন বসু, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপানি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ আগস্ট ২০১৬, পৃ - ১০০।
৩. এ. এল. বাসাম, ‘দ্যা ওয়াডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া’, বঙ্গানুবাদ - ‘অতীতের উজ্জ্বল ভারত’, অনুবাদক - অংশুপতি দাশগুপ্ত, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০, পৃ - ২৫৭।
৪. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃ - ১০৩।
৫. তদেব, পৃ - ১০৪।
৬. তদেব।
৭. তদেব।
৮. তদেব।
৯. তদেব।
১০. তদেব।
১১. স্বপন বসু, প্রাগুক্ত, পৃ - ১০৫।
১২. তদেব।

১৩. স্বপন বসু, প্রাণ্ডজ, পৃ - ১০৬।
১৪. তদেব।
১৫. স্বপন বসু, প্রাণ্ডজ, পৃ - ১০৩।
১৬. সমর কুমার মল্লিক, *আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর (১৭০৭-১৮৫৭)*, নিউ ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, জুলাই ২০১৯-২০২০, পৃ - ৪১৪।
১৭. তদেব, পৃ - ৪১৫।
১৮. স্বপন বসু, প্রাণ্ডজ, পৃ - ১০৫।
১৯. সমর কুমার মল্লিক, প্রাণ্ডজ, পৃ - ৪১৬।

জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কলহ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (১৯২১-১৯৩৯)

শান্তনু সরকার

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনাকাল থেকেই জাতীয় কংগ্রেস ছিল প্রধান এবং মুখ্য চালিকাশক্তি। কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত সেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঙ্গিনায় নানা সময়ে ঘাতপ্রতিঘাত, মতানৈক্য ও বিবাদে সূত্র ধরে ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এমনই বিবাদে সূত্রে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে জন্ম নিয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক নামক রাজনৈতিক সংগঠনের। একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের আপোষকামী রাজনীতি, অন্যদিকে সুভাষ বসুর আপোষহীন সংগ্রাম জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল চরম বিবাদ। সেই বিবাদে সূত্র ধরেই সুভাষ বসুর সাথে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সংঘাত কি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তাঁকে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকল্পপন্থা খুঁজতে হয়েছিল? এই প্রবন্ধে মূলত দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সাথে সুভাষ বসুর সেই সংঘাতের বিষয়টিকে অনুসন্ধান করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সূচক শব্দ: কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদ, দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, ফরওয়ার্ড ব্লক।

মূল আলোচনা:

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূত্রেই এর জন্ম। সূচনাকাল থেকেই জাতীয়তাবাদের মুখ্য চালিকা শক্তির ভূমিকা পালন করে এসেছে। কংগ্রেসের সেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূত্রে দলের অভ্যন্তরে নানা সময়ে নানান পরিস্থিতির কারণে দেখা দেয় মতাদর্শগত বিতর্ক। এমনই এক বিতর্কের সূত্রে কংগ্রেসের থেকে জন্ম নেয় ফরওয়ার্ড ব্লকের। একটা কথা বাস্তব যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিতে জোয়ার এসেছিল গান্ধীজীর আবির্ভাবের ফলে। তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনকে এক গণআন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সেই অহিংস আন্দোলনে মধ্যে একটা আপোষকামী চরিত্র বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে সুভাষ বসুর কংগ্রেসে যোগদান দক্ষিণপন্থী আন্দোলনকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সাথে শুরু হয় তাঁর আদর্শগত সংঘাত, যার শেষ পরিণতি আমরা দেখতে পাই ১৯৩৯ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষ বসুকে ভাবতে হয়েছিল বিকল্প সংগ্রামী পন্থার, আর সেই পন্থার বাস্তব রূপ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক নামক সংগঠনের।

১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু সম্মানজনক সিভিল সার্ভিসের চাকুরী ত্যাগ করে দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার লক্ষ্য নিয়ে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে ঐ দিনই দেখা করেন গান্ধীজীর সঙ্গে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির স্বপ্নে কৌতূহলোদ্দীপ্ত সুভাষ বসু গান্ধীজীকে বেশ কয়েক গুচ্ছ প্রশ্ন করে বসলেন, যেমন ১৯২০ সাল থেকে তিনি যে অহিংস অসহযোগ

আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে? কখন সরকারকে সবরকম কর দেওয়া বন্ধ হবে? এই আন্দোলনের সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন যুক্ত হয়ে কীভাবে বিদেশি শাসককে ভারতের স্বাধীনতার দানের জন্য বাধ্য করা হবে? কীভাবে তিনি দেশবাসীর কাছে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন? প্রভৃতি।^১ এই সমূহ প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী কিন্তু তাঁকে খুব একটা খুশী করতে পারেননি। তবে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে বাংলার বিপ্লবী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন। এই চিত্তরঞ্জন দাশের হাত ধরেই সুভাষ বসুর কংগ্রেসি রাজনীতির পথ চলা শুরু। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন নিয়ে সুভাষ বসুর মনে প্রথম থেকে নানান দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসকেই মূলমঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

প্রথমে সুভাষ বসু দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের আঞ্চলিক কমিটিতে চার আনা দিয়ে সভাপদ লাভ করেন। এর পরে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ১৯২১ সাল নাগাদ গঠিত হয় বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটিতে সুভাষ বসুকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপন বিভাগের। পাশাপাশি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদও। এখন প্রশ্ন হল, শুরুতেই প্রথম সারির নেতা হিসেবে রাজনীতিতে তাঁর উত্থান অন্য সকল নেতৃত্ব কেমন ভাবে গ্রহণ করেছিলেন? সুভাষ বসু বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে যোগদানের সাথে সাথে বাংলার কিছু কংগ্রেস নেতা প্রকাশ্য না হলেও তাঁর বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। তবে এই চক্র খুব বেশি এগোতে পারেনি, কারণ চিত্তরঞ্জন দাশ সেই বিরোধিতার খুব একটা আমল দেননি।^২ বাংলায় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চিত্তরঞ্জন দাশের বিপক্ষে একটা গোষ্ঠীর জন্ম নিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই। এই বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ‘সার্ভেণ্ট’ পত্রিকার সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বরিশালের কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র ঘোষ ও বাংলার খাদিগোষ্ঠী নামে পরিচিত অভয় আশ্রম গ্রুপ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত ব্যক্তির। এঁদের থেকেই মূলত সুভাষ বিরোধী আওয়াজ উঠেছিল।^৩ ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। সেখানে আইনসভায় প্রবেশ নিয়ে গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে চরম মতানৈক্য দেখা দেয় এবং ঐ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। গান্ধীজী অবস্থান করেছিল তাঁর অসহযোগ নীতিতে। এই সময় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অসহযোগপন্থী গ্রুপকে বলা হয়ে থাকে No-Changer এবং অপরদিকে যারা আইন সভায় প্রবেশে আগ্রহী তাঁদের বলা হয় Pro-Changer। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের মধ্যে গঠিত হয় কংগ্রেস স্বরাজ দল। এই স্বরাজ দলই ছিল প্রোচেঞ্জারদের সংগঠন। বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ছিলেন নোচেঞ্জারদের প্রতিনিধি। অপরদিকে প্রোচেঞ্জারদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কিরন শঙ্কর রায় সুভাষ বসু প্রমুখ।^৪

এর পরের ঘটানা কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিতহন চিত্তরঞ্জন দাশ, এবং প্রধান কার্যনির্বাহী অফিসার সুভাষ বসু। সুভাষ বসুর এই পদে নির্বাচিত হওয়ার পর বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে। কারণ এই পদের দাবীদার ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। শাসমলকে কার্যনির্বাহী অফিসার নির্বাচিত না করার পিছনে কারনও ছিল, প্রথমত তিনি মফঃস্বল থেকে আগত মাহিষ্য সমাজের মানুষ, অন্যদিকে শাসমল বাংলার বিপ্লবীবাদকে একবারে সমর্থন করতে না। স্বরাজ দলের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল, এই বিপ্লবীরাই তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে সুভাষ বসুকে সমর্থন করেছিল।^৫ ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর

বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ এনে রেগুলেটিং আইনের ৩নং ধারায় স্বরাজ দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সুভাষ বসুকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাখাটা ছিল ব্রিটিশ সরকারের মোক্ষম চাল, কারণ স্বরাজ দল ও পুরসভার কাজকর্মকে ব্যাহত করতে চাইছিল। সুভাষ বসুর জেলে থাকা অবস্থাতেই চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। এই অবস্থান বাংলার রাজনীতিতে স্বরাজীদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তাঁদের রাজনৈতিক সমর্থনের একটা বড় অংশ ছিল বিপ্লবীরা। গান্ধীজী তাই বাংলার নেতৃত্বে এমন কাউকে চাইছিলেন যিনি হবেন স্বরাজীদের প্রতিনিধি, অপরদিকে তাঁর নিয়ন্ত্রক। তাঁর প্রথম পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন শাসমল যিনি স্বরাজীপন্থী হয়েও বিপ্লববাদকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু দেখা যায় বিপ্লবীদের বিরোধিতার ফলে অবশেষে গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে যথাক্রমে মেয়র পদ, প্রসদেশিক কংগ্রেসের ব্যাবস্থাপক পদ এবং স্বরাজ দলের নিয়ন্ত্রক এই ত্রিমুকুটে ভূষিত করেন।

১৯২৭ সালে সুভাষ বসু জেল থেকে মুক্তির পর বাংলার রাজনীতিতে তাঁকে নিয়ে গুরুত্ব নতুন বিতর্ক। মুক্তির পর তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে নতুন কমিটি গঠন করেছিলেন। জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি শাসমল ও সেনগুপ্ত মহাশয়ের দলাদলির বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে তিনি বিপিসিসি-র সভাপতির ভার গ্রহণ করতে চাননি। তবে মনে করা হয় বাসন্তী দেবীর অনুরোধে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।^৮ প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সমস্ত উপদলগুলির সমর্থন লাভ করেছিলেন। একই সাথে তিনি নিজেকে বাংলার রাজনীতির মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। যুক্ত হয়ে ছিলেন সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে। নেহরু কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি ১৯২৮ সাল নাগাদ তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-যুব, কৃষক-শ্রমিকদের সম্মেলনগুলিতে ভাষণ দিতে থাকেন। ১৯২৯ সালে সেনগুপ্ত মহাশয় চতুর্থ বারের জন্য মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই সুভাষ বসু ও সেনগুপ্ত মহাশয়ের সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছিল। সেনগুপ্ত মহাশয় মেয়র ও সুভাষ বসু বিপিসিসি-র সভাপতি। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ও সুভাষ বসুর জেল যাত্রার পর বাংলার রাজনীতিতে সেনগুপ্ত মহাশয়ের অভিষেক ঘটেছিল ত্রিমুকুটের সমাহারে। সুভাষ বসুর আগমনটা তিনি সঠিক ভাবে মেনে নিতে পারেননি। মেয়র পদে আসিন থেকেও তিনি বিপিসিসি-তে নিজের শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁকে সমর্থনও যুগিয়েছিল বিপ্লবীদের একাংশ, অর্থাৎ অনুশীলন গোষ্ঠী। অপর দিকে কিন্তু যুগান্তর গোষ্ঠী সুভাষ বসুর সঙ্গেই ছিল। সুভাষ বসু ও সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিরোধ প্রকাশ্যে আসে পূর্ববঙ্গে জেলা স্তরে কংগ্রেসের বিভাজনের মধ্য দিয়ে। বিপিসিসি পুনরদখলের লক্ষ্যে সেনগুপ্ত মহাশয় হয়ে উঠলেন গান্ধীবাদী, অর্থাৎ তিনি গান্ধীর শরণাপন্ন হলেন। সেই অর্থে তিনি কখনই গান্ধীবাদী ছিলেন না। অপর দিকে সুভাষ বসু হয়ে উঠলেন বাংলার যুগান্তর গ্রুপ, পঞ্চপ্রধান, সরস্বতী প্রেস ও চট্টোগ্রামের সূর্য সেনের দলের প্রতিনিধি। বাংলার রাজনীতিতে সুভাষ বসুর প্রতিপক্ষ হয়ে উঠলেন সেনগুপ্ত মহাশয় ও বাংলার খাদি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্রের দল, গৌরাঙ্গ প্রেস এবং এঁদের নেপথ্যে ইন্দ্রন যুগিয়ে ছিল বিপ্লবী অনুশীলন দল।^৯

সুভাষ বসু দ্বারা পরিচালিত বিপিসিসি-র বিরুদ্ধে সেনগুপ্ত মহাশয় প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ১৯২৯ সালে বিপিসিসি-র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল জেলা কমিটির নির্বাচনগুলিতে কারচুপি করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন। এমনকি এই ঘটনার অভিযোগ সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছেও উত্থাপিত হয়। সমস্যার মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পণ্ডিত

সিতারামাইয়াকে পাঠানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। শেষপর্যন্ত কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি মতিলাল নেহরুকে ময়দানে নামতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ভাল যে ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে বসু এবং সেনগুপ্ত মহাশয় উভয়েই স্বদলবলে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেনগুপ্ত মহাশয় গান্ধীজীর পক্ষ নিয়ে ছিলেন আর সুভাষ বসু স্বমহিমায় ধারণ করেছিলেন বিরোধী কণ্ঠ। লাহোর কংগ্রেসে সুভাষ বসুর প্রকাশ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কিন্তু তাঁর রায় সুভাষ বসুর পক্ষেই দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ছিল অনেকাংশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মূলক।^৮ ৯ই জানুয়ারি হাজরা পার্কে ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল করার অপরাধে সুভাষ বসু গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সুভাষ বসু আবার কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত তিনি মেয়র ছিলেন। যদিও ২৬-শে জানুয়ারি ঘোষিত স্বাধীনতা দিবসের দিনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৯৩১ সালে তাঁকে মোট চার বার জেলে যেতে হয়ে ছিল এবং জেলের বাইরে বাকি সময়টা কেটেছিল সেনগুপ্ত মহাশয়ের সাথে রাজনৈতিক বিবাদে।

১৯৩৮ জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জে বি কৃপালিনী ঘোষণা করলেন গুজরাটের হরিপুরাতে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন সুভাষচন্দ্র বসু। অবশ্য এটি গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে দেশবাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মঞ্চ হিসেবে দেখেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি যতটা সহজ মনে হচ্ছে বাস্তবে ততটা ছিল না, গান্ধীবাদী নেতারা তখন কংগ্রেসের উচ্চসারিতে বিরাজনাম এবং তাঁরই প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার প্রধান। দেশের ধনতান্ত্রিকরা কংগ্রেসের প্রধান আর্থিক ভরসা। তাছাড়া সুভাষ বসুকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করাটা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা সানন্দে গ্রহণ করেছিল তেমনটি একেবারে ঘটেনি।^৯ শুধুমাত্র গান্ধীজী সুভাষ বসুকে মনোনীত করেছিলেন বলেই তাই তাঁরা বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। বামপন্থী রাষ্ট্রপতি যাতে কংগ্রেসের গঠনশৈলিতে কোন পরিবর্তন করতে না পারে যে বিষয়েও তাঁরা সজাগ ছিল। গান্ধীজীর একছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এঁরা নিরলাস পরিশ্রম করে গেছেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান বামশক্তির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে গান্ধীজী নেহরু ও সুভাষ বসুকে জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু নেহরুকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গান্ধীবাদী চক্র অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষ বসুর ক্ষেত্রে সেই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। তাই সুভাষ বসুর সঙ্গে এই চক্রের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে ছিল।^{১০} হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বিষয়গুলিকে সুভাষ বসু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কার্যকারী করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা এব্যাপারে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। সুভাষ বসু রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলেছিল। ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে সুভাষ বসুর রাজনৈতিক সমীকরণটা পাল্টে যায়। ইউরোপে অবস্থান কালে তাঁর মতাদর্শগত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তন তাঁর অনুগামী যুগান্তর দলের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। সুভাষ বিরোধীরা যেমন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেমন্ত কুমার বসু, শিমালা ব্যায়াম সমিতি, আমর বসু, নানু ঘোষ, হাওড়ার হরেন ঘোষ এছারাও অনুশীলন দলের নেতা কর্মীরাও এই সময় সুভাষ বসুর দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এছাড়াও শ্রীসঙ্ঘ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার এরমত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি সুভাষ বসুর পক্ষ অবলম্বন করে ছিল।^{১১}

হরিপুরা কংগ্রেসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা হল ফেডারেশন ও আসন্ন যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়। ফেডারেশন সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে এ

বিষয়ে আপোষহীন বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়া হবে। সুভাষ বসুর সভাপতিত্বের বিরুদ্ধে গান্ধীপন্থীরা মূল অভিযোগ ছিল এখানেই। দ্বিতীয় অভিযোগ বামপন্থীদের সম্পর্কে সুভাষ বসুর নমনীয় মনোভাব। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন ও উদ্বোধন করেছিলেন সেই সম্পর্কে তৃতীয় অভিযোগটি আনা হয়েছিল। পরবর্তী অভিযোগে বলা হয় যে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র প্রদান করে অতঃপরে স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন শুরু করা।^{১২} ১৯৩৮ সালে নভেম্বর মাসে উত্তর ভারতে সফরকালে সুভাষ বসু এই পরিস্থিতি বিষয়ে এক প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সরকার কখন উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তার জন্য অপেক্ষা করা নিরর্থক। সাময়িক ভাবে ফেডারেশন ব্যবস্থা মূলতুবী হয়েছে এবং যুদ্ধ যখন আসন্ন কংগ্রেসকে এখন যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হওয়া দরকার। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা দাবি করে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র প্রদান এবং জাতীয় সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার প্রস্তাব রাখেন।^{১৩}

১৯৩৯ সালে চলে আসে কংগ্রেসের পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশন। এই অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ঠিক করেছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন। প্রথমবার সুভাষ বসু কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেই কংগ্রেসের সাবেকী নিয়ম নীতির পরিবর্তে একটা চূড়ান্ত বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করে ছিলেন, যেটি দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের স্বার্থের বিরোধী ছিল। সুভাষ বসু তাঁর ঘোষিত কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে স্পষ্ট কিছু নীতির ভিত্তিতে এবং দেশের প্রকৃত সমস্যা মোকাবিলার জন্য দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী সরাসরি সুভাষ বসুর সেই দাবীকে অস্বীকার করলেন। বরদোলি থেকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ছয় সদস্য সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রী জয়রাম দাস, শঙ্কররাও দেও, ভুলাভাই দেশাই ও আচার্য কৃপালিনী নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টিকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।^{১৪}

এই সমূহ বিতর্কের মাঝে আবুল কালাম আজাদ আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার কথা ঘোষণা করেন। দক্ষিণপন্থীদের মনোনীত পরেরে প্রার্থী হন পট্টিভী সীতারামাইয়া। সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সকল বামপন্থীরা তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল। এছাড়াও কংগ্রেসের মধ্যে থাকে একটা বড় অংশ, যারা মূলত দক্ষিণপন্থী এবং গান্ধীবাদী হিসেবেই পরিচিত তাঁরও সুভাষ বসুর এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছিল। কারন প্যাটেলের আগ্রাসীনীতি বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্যাটেল বিরোধী একটা গোষ্ঠীর জন্ম নিয়েছিল, মূলত এরাই সুভাষ বসুকে সমর্থন করে ছিল। বামপন্থীদেরও একটা বড় সমর্থন ছিল। মুসলিম সমাজের একটা বিরাট অংশ সুভাষ বসুর সমর্থক ছিলেন। সর্দার প্যাটেল হয়তো ভেবেছিলেন সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে হয়তো নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু সুভাষ বসুর জনপ্রিয়তা ও সমর্থন দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে হার মানিয়েছিল।^{১৫} অবশেষে কংগ্রেসের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিরাই নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে। নির্বাচনের ফলস্বরূপ দেখা যায় দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে সুভাষ বসুই মনোনীত হয়েছেন। তাঁর সমর্থনে মোট ভোট পড়েছে ১৫৮০টি এবং বিপক্ষে অর্থাৎ সীতারামাইয়াকে সমর্থন করেছেন ১৩৭৫জন। নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বাংলা। এখানে ৪০৪ জন সুভাষ বসুর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, বিপক্ষে ছিল ৭৯ জন। বাংলার ৭৯টি ভোট সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে পড়ায় পরেরদিন কলকাতার রাস্তায় ৭৯টি গাধা নিয়ে শোভাযাত্রা হয়েছিল।^{১৬}

এত আনন্দের মধ্যে ৩১শে জানুয়ারীর গান্ধীজীর এক বিবৃতি সমস্ত ঘটনা সুভাষ বসুর কাছে নিরাস করে তুলেছিল। গান্ধীজী ঐ বিবৃতিতে বলেন সীতারামাইয়ার পরাজয় আমার পরাজয়। সীতারামাইয়া ছিলেন গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী। তিনি প্রথম থেকেই সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে অরাজি ছিলেন। সুভাষ বসুর কর্ম পদ্ধতিকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাছাড়া ফেডারেশন সংক্রান্ত বিতর্কে দক্ষিণপন্থীদের প্রতি সুভাষ বসুর অবস্থানকে তিনি ঠিক ভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে সুভাষ বসু যখন বিজয়ী হয়েছেন তখন তাঁর উচিত তাঁর সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ক্যাবিনেট গঠন করুক।^{১৭} গান্ধীজীর এহেন প্রতিক্রিয়ায় সুভাষ বসু হতাশ হয়েছিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি এই সমস্যা সমাধানের জন্য গান্ধীজী এবং সুভাষ বসু বৈঠকেও বসেন, কিন্তু তাতেও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি। অন্যদিকে পূর্বতন ওয়াকিং কমিটির সদস্যরা তাঁর উপর অনাস্থা প্রস্তাব এনে একে একে সবাই পদত্যাগ করলেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসে অভ্যন্তরে শূন্যহল এক মহাসঙ্কট। ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরিতে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে তার আগে কোন ওয়াকিং কমিটি রইল না। এই পরিস্থিতি সুভাষ বসুকে নতুন সমস্যার মুখে ফেলেছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরিতে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। ত্রিপুরির সভাতে দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে এগিয়ে দিলেন সুভাষ বসুর বিরুদ্ধে। পন্থ তাঁর প্রস্তাবিত একটি খসড়া ঐ সভাতে পেশ করে। যেখানে বলা হয়- কংগ্রেস বিগত দুই দশক ধরে যে সমস্ত গান্ধীবাদী কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে তা ভবিষ্যতেও কার্যকারী থাকবে, ফেডারেশন নিয়ে সুভাষ বসুর অবস্থানকে নিন্দা করা হয় এবং আরও বলা হয় গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না।^{১৮} এই পন্থপ্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সুভাষ বসুকে বুঝিয়ে দিলেন বামপন্থীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীই শেষ কথা।

পন্থপ্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে এমন জটিলতা তৈরি করা হল, যা সুভাষ বসুর পক্ষে সেই জটিলতা কাটিয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে গান্ধীজীর বক্তব্য ছিল ভিন্ন, তিনি নাকি পন্থ প্রস্তাবকে মানেন না। গান্ধীজীর মতে সুভাষ বসু তাঁর নিজ খুশি মোতাবেক ওয়াকিং কমিটি গঠন করতে পারেন। এহেন পরিস্থিতিতে সুভাষ বসুর কাছে দক্ষিণপন্থীদের উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছামত ওয়াকিং কমিটি গঠন করার উপায় রইল না। অন্যদিকে যারা সুভাষ বসুর দ্বিতীয়বার সভাপতিত্বের বিষয়কে সমর্থন করে ছিলেন তাঁরাও বেঁকে বসলেন। যেমন সর্দার প্যাটেলের নিয়ন্ত্রনকে উপেক্ষা করে যারা সুভাষ বসুর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, এই সময় তাঁদের মতের পরিবর্তন ঘটে। সুভাষ বসু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন অর্থাৎ বামপন্থীদের, তাঁদের এই সময়ে অবস্থান ছিল বিচ্ছিন্ন। সোসালিষ্টরাও তাঁদের নীতির পরিবর্তন করেন। সবাই কংগ্রেসের ঐক্যকে সমর্থন জানিয়াছিলেন। সরাসরি বড় কোন ভাঙন চাননি।^{১৯} ত্রিপুরি কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষ বসু কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েও দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের চাপের মুখে কার্যত নতিস্বীকার করে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল। নতুন করে ওয়াকিং কমিটি গঠনকরা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর সভাপতির ভাষণে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে ছয় মাসের চরমপত্র দিয়ে তারপর যে আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। এহেন পরিস্থিতি সেই বক্তব্য সভাপতির ভাষণ হিসেবেই রয়ে গেলে, বাস্তবে তার কোন কার্যকারিতা থাকল না। একদিকে দক্ষিণপন্থীদের অসহযোগিতা অন্যদিকে বামপন্থীদের সেই মুহুর্তে কংগ্রেস ঐক্যকে প্রাধান্য, সব মিলিয়ে নতুন ওয়াকিং কমিটি গঠনের

বিষয়ে তাঁর কাছে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া তিনি গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ ছিলেন। এমতাবস্থায় সুভাষ বসুর কাছে একটাই রাস্তা খোলা ছিল, পদত্যাগ। সুভাষ বসুর পদত্যাগের পর তাঁর জায়গায় কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন কটুর গান্ধীবাদী নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদ। কংগ্রেস চালিত হল তার নিজস্ব ধারায় অর্থাৎ দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে। আর অন্যদিকে চিরসংগ্রামী সুভাষ বসু বেছে নিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকল্প মঞ্চ। ওরা মে ১৯৩৯ কোলকাতার এক প্রকাশ্য জনসভায় সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের কথা ঘোষণা করেন।^{২০}

তথ্যসূত্র:

- ১। বসু শ্যামাপ্রসাদ, ২০১২, সুভাষচন্দ্র বসু (কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি থেকে নেতাজী), কলকাতা, এন ই পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৪৪।
- ২। দাশগুপ্ত হেমেন্দ্রনাথ, ১৯৪৬, সুভাষচন্দ্র, কলিকাতা, জ্যোতি প্রকাশালয়, পৃষ্ঠা- ২২।
- ৩। দাশগুপ্ত হেমন্ত কুমার, ১৩৩৩ (বঙ্গাব্দ), দেসবন্ধু-স্মৃতি, কলিকাতা, গ্রন্থাকার, পৃষ্ঠা- ৬৬।
- ৪। বসু সজল, ১৯৮৬, বাঙালী জীবনে দলাদলি, কলকাতা, কল্লন, পৃষ্ঠা- ৭৩।
- ৫। পাল প্রমথনাথ, ১৩৬৮ (বঙ্গাব্দ), দেশপ্রান শাসমল, কলিকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ৯২।
- ৬। দাশ সুনীল (সম্পাদিত), ১৯৭৯, সুভাষচন্দ্র বসু- সমগ্র রচনাবলী- তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, জয়শ্রী প্রকাশন, পৃষ্ঠা- ১৫২।
- ৭। বসু সৌম্য, ২০২২, বিতর্কিত দেশনায়ক (সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতি ১০২১-১৯৪১) কলকাতা, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, পৃষ্ঠা- ১৮৩-১৮৮।
- ৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬১-১৭৫।
- ৯। বসু সুভাষচন্দ্র, ১৯৮৩, জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও বামপন্থা, কলকাতা, লোকমত প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-৬৮।
- ১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭০।
- ১১। বিতর্কিত দেশনায়ক, পৃষ্ঠা- ২৭২।
- ১২। জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ও বামপন্থা, পৃষ্ঠা- ৭০।
- ১৩। বসু সুভাষচন্দ্র, ১৯৭৮, ফরওয়ার্ড ব্লক ও তার যৌক্তিকতা, কলকাতা, লোকমত প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৮-৯।
- ১৪। Ghosh Asok (Ed), 2001, A Short History of All India Forward Bloc, Lucknow Uttar Pradesh, 14th Party Congress of All India Forward Bloc, পৃষ্ঠা- ১৩।
- ১৫। বিতর্কিত দেশনায়ক, পৃষ্ঠা- ৩১০-৩১৫।
- ১৬। বাঙালী জীবনে দলাদলি, পৃষ্ঠা- ৮১।
- ১৭। বসু সুগত, ২০১১, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের মুক্তি সংগ্রাম, কলকাতা, আনন্দ, পৃষ্ঠা- ১৫৫-৫৬।
- ১৮। Times of India, 8th March, 1939।
- ১৯। Amrita Bazaar Patrika, 8th March, 1939।
- ২০। A Short History of All India Forward Bloc, পৃষ্ঠা- ১৪।

ভবভূতির উত্তররামচরিত-এ ‘ছায়া-সীতা’র নাটকীয় তাৎপর্য

স্নেহাশিস রায়

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ

দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর

সারসংক্ষেপ: ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’-এর তৃতীয়াঙ্কে ছায়া-সীতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় উপাদান। এটি রাম ও সীতার মধ্যকার প্রেম, রাজধর্মের বাধ্যবাধকতা, সমাজের রীতি, ও ব্যক্তিগত অনুভূতির সংঘাতকে প্রকাশ করে। ভবভূতি ছায়া-সীতার মাধ্যমে নারীস্বাভাব্য, আত্মমর্যাদা ও রাজধর্মের সংকটকে সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সূচক শব্দ: উত্তররামচরিত, ছায়া-সীতা, উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্ক, ভবভূতি।

মূল আলোচনা:

ভূমিকা:

ভবভূতি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নাট্যকার। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাটক উত্তররামচরিত। সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক ইতিহাসে ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’ এক অনন্য মহাকাব্যিক নাট্যকীর্তি। এই নাটকে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঘটনাগুলিকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় রামের রাজধর্ম বনাম ব্যক্তিগত জীবনসংকট। নাটকের তৃতীয়াঙ্কে ছায়া-সীতার আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি রামের অভ্যন্তরীণ মানসিক দ্বন্দ্ব, রাজধর্মের কঠোরতা এবং পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরে। ছায়া-সীতা শুধু নাটকের নাটকীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে না, বরং চরিত্রগুলোর মানসিক গঠন ও সংকটকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে। ভবভূতি এখানে রাম ও সীতার জীবনের গভীর মানবিক সংকট, বিরহ ও পুনর্মিলনের করুণ রস ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৃতীয়াঙ্কের বিষয় সংক্ষেপ: উত্তররামচরিত ভবভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই নাটকে ভবভূতির কাব্যশিল্প সর্বোচ্চ মহিমায় উন্নীত হয়েছে। এই অঙ্কে দেখা যায়, সীতাদেবী তমসার সঙ্গে গোদাবরী তীরে গিয়েছেন। বিরহব্যথা রূপে প্রতিমূর্তি তিনি- “করুণস্য মূর্তিরিব বা শরীরিণী বিরহব্যথৈব বনমেতি জানকী।” শম্বুককে বধ করার পর রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হয়েছেন। এই বনে একদা সীতার সাথে রামচন্দ্র বহুকাল বাস করেছিলেন। সেই পূর্বস্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি সীতা-বিরহ-বিধুর রামচন্দ্র একে একে দর্শন করছেন। সীতা বিরহে কাতর তিনি, কখনও উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করছেন, কখনও আবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন। এমতাবস্থায়, ছায়ারূপিণী সীতা উপস্থিত থেকে রামচন্দ্রের প্রেমের গভীরতা অনুভব করছেন। রামচন্দ্রও সীতার স্পর্শসুখ অনুভব করতে পারছেন, কিন্তু শরীরে সীতাকে দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ, ভাগীরথীর বরে সীতা ছিলেন অদৃশ্য। তৃতীয়াঙ্কের এই দৃশ্য রামচন্দ্রের হৃদয়বেগ, প্রেমানুভূতি, বিরহার্তি ও সীতার পতিভক্তি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা করুণ রসের বিগলিত ধারা।

ছায়া সীতার পরিচয়: ‘উত্তররামচরিত’-এর তৃতীয়াঙ্কে ভবভূতি এক অভিনব উপাদান প্রবর্তন করেছেন—‘ছায়া-সীতা’। উত্তররামচরিত-এ ছায়া-সীতা হলেন মূল সীতার একটি অলৌকিক প্রতিরূপ বা বিভ্রম। রাবণের দ্বারা হরণ হওয়ার আগে অগ্নিদেবের মাধ্যমে প্রকৃত সীতাকে রক্ষা

করা হয় এবং তাঁর স্থানে একটি ছায়ামূর্তি রেখে দেওয়া হয়। এই ছায়া-সীতা মূলত সীতার প্রতিরূপ, যাকে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত সীতা থেকে পৃথক করা হয়। ভবভূতির কল্পনায় ছায়া-সীতা প্রকৃত সীতা নন, বরং রামের আদেশে অগ্নিদেবতার দ্বারা সৃষ্ট এক আধ্যাত্মিক বিভাজন। ভবভূতি এই প্রতীকী চরিত্রটি ব্যবহার করেছেন সীতার সত্যতা এবং তার প্রতি সমাজের সন্দেহমূলক মনোভাবের সমালোচনা করতে। ছায়া-সীতা বাস্তব সীতা নন, কিন্তু তাঁর উপস্থিতি রামের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং নাটকের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিকে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। এই চরিত্র সীতা-রামের দাম্পত্য জীবনের সংকট ও ট্রাজেডিকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করে।

নাটকীয় তাৎপর্য: উত্তররামচরিতের নাটকগত প্রধান উদ্দেশ্য বোধহয়, দেব-দম্পতীকল্প রাম-জানকীর অলৌকিক প্রণয় বর্ণনা। সেই অপার্থিব প্রণয়ের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করতে হলে, সেই প্রণয়রূপ পবিত্র নির্ঝর যে উৎস থেকে উৎথিত, রাম-জানকীর কেবল প্রেমপূর্ণ, সেই উৎসরূপী অনাবিল হৃদয়ের সম্যক পরিচয় প্রথমত অপেক্ষিত। সেই পরিচয়ের প্রধান অভিজ্ঞান হল ছায়া।

লাঞ্ছিত ব্যক্তির মনে স্বতই আকাজক্ষা জন্মে যে, যার চরণে সে ভূত-ভবিষ্যৎ, ইহকাল-পরকাল সমস্ত ভুলে, মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, যিনি পূর্বাপর সমস্ত একপদে বিস্মৃত হয়ে, পাষাণে বুক বেঁধে বিভীষিকাময়ী শ্রোতস্বিনীর উত্তাল তরঙ্গ সংকুল অতল গর্ভে নিক্ষেপ করেছেন, তিনি এখন সুখে-দুঃখে কিভাবে কালযাপন করছেন। লাঞ্ছিতের মনে এ আকাজক্ষা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ সীতা যার হৃদয়ের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়, যার রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান। কি রাজপ্রাসাদে, কি গহনারন্যে, ছায়ার ন্যায় যে সীতা রামের সহচরী ছিলেন। সেই সীতা প্রাণাধিক কর্তৃক বিনাদোষে নির্বাসিত। সীতার সেই রামের আজ কি দশা, তা জানতে সীতার মনে প্রবল বাসনা জন্মাবার কথা। যদি সে বাসনা না জন্মে, তবে সীতা প্রতিমার অঙ্গহানি হয়, কবি সৃষ্টিতে দোষ থেকে যায়। সীতার সেই বাসনা ও তা পূরণ – এই বিষয় সুপরিষ্কৃত রূপে প্রকাশ করার জন্যই এই ‘ছায়া’ রূপ আলোকযন্ত্রের প্রয়োজন।

তৃতীয়াঙ্কে ছায়া-সীতার উপস্থিতি রামের চরিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আনে। রাজধর্ম পালনের জন্য সীতাকে বনবাসে পাঠালেও, ছায়া-সীতার উপস্থিতি তাঁর মানসিক অশান্তি ও অনুশোচনার প্রতীক। রামের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রাজধর্ম ও ব্যক্তিগত ভালোবাসার সংঘাত ছায়া সীতার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রামের চরিত্রে এক দ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়—রাজধর্ম বনাম ব্যক্তিগত ভালোবাসা। রাজধর্ম পালনের জন্য তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁর অন্তরের কষ্ট বারবার ফুটে ওঠে। ছায়া-সীতা চরিত্রের মাধ্যমে রামের এই আত্মিক দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ বেদনার চিত্রায়ণ হয়।

অলীক লোকাপবাদে রাম তাঁর হৃদয়ের অধিদেবতারূপিণী শুদ্ধশীলা জানকীকে নির্বাসিত করেছেন সত্য, কিন্তু সীতার চরিত্রে তাঁর ক্ষণকালের জন্যও কোনরূপ সংশয় জন্মায়নি। সীতার সঙ্গে বনবাসকালে রাম যে মনোময়স্থানে কালযাপন করেছিলেন, আজ সীতাহীন সেই রাম একাকী পূর্বানুভূত সেই সকল স্থানের কথা ও তদানীন্তন সৌদামিনী সীতার কথা স্মরণ করে নিরন্তর অশ্রুপাত করে চলেছেন। সীতাকে নির্বাসন দিয়ে, অযোধ্যার রাজকার্যে নিয়ত অন্যমনস্ক থেকে রাম এতদিন কোনমতে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু, আজ কার্যান্তর নিরপেক্ষ শোক দ্বিতীয় রাম, একাকী গহনারন্যে এসে মিলনের সেই সাক্ষীরূপী নিদর্শন দেখে হয়তো একান্ত বিপন্ন হবেন। সীতার চিন্তায় রামের হৃদয় জীর্ণ, শতছিদ্র সমন্বিত। কিন্তু, লোকালয়ে তবুও কতক পরিমাণে সে হৃদয়ের বিশ্রাম ছিল। আজ নির্জন বনে, প্রতিপদে, তরলতার প্রতিপত্র

কম্পনে, বনকুসুমের প্রতিকেশের সীতার ছায়া প্রতিবিম্বিত হবে। সেই সুখের দিনের তুলনায়, এ দুঃখের দিন একান্ত দুর্বল হয়ে উঠবে। বৃত্তচ্যুত কুসুমের ন্যায়, হয়তো হৃদয় কুসুম একেবারে ভূমিসাৎ হবে। সুতরাং, এর প্রতিকারের প্রয়োজন। সীতাময় প্রাণ রামের যাতে, প্রাণের কোনরূপ অত্যয় না ঘটে, সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

ভবভূতি ছায়া-সীতার মাধ্যমে সমাজের অন্যায় ও সন্দেহপ্রবণ মনোভাবকে আঘাত করেছেন। সমাজের সন্দেহের কারণে সীতাকে বনবাসে পাঠানো হয়েছিল, অথচ তিনি ছিলেন নিষ্কলঙ্ক। ছায়া-সীতা সীতার মর্যাদা রক্ষার একটি প্রতীক, যা ভবভূতির সামাজিক সমালোচনার পরিচায়ক। সীতা কেবলমাত্র একজন স্ত্রী নয়, বরং আত্মমর্যাদাসম্পন্না নারী। ছায়া-সীতার মাধ্যমে ভবভূতি নারীর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার বিষয়টি সামনে আনেন। অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে সমাজের প্রতি তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণ হলেও, বাস্তবিক জীবনে তিনি লাঞ্চিত হন।

কালিদাসের নির্বাসিতা সীতা, তাঁর হৃদয় দেবতা রামচন্দ্রের সীতাবিহীন কষ্টময় জীবনের কাহিনী অন্যের মুখে শুনে ‘দুর্বীর পরিত্যাগ দুঃখ’ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেছিলেন। সীতা শোকাকাতর, মুহূর্মুহ মুহূর্ত, দীনাতিদ্দীন শ্রীরামের ভীষণ অবস্থা, রামেরই পার্শ্বে অবস্থান করে সচক্ষে দেখেছেন। রামেরই প্রসাদে প্রসন্না এবং রামেরই বিষাদে প্রতিনিয়ত বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাই কালিদাসের সেই সুগঠিত প্রতিমার গায়ে ভবভূতির এই ‘ছায়া’ এক দিব্য আভরণ স্বরূপ।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা রামকে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলেও ছায়া-সীতার উপস্থিতিতে তাঁর মানবিক দুর্বলতা প্রকট হয়। ভবভূতি এখানে রামকে শুধু এক আদর্শ রাজা নয়, বরং একজন সাধারণ মানুষের মতো আবেগপূর্ণ ও অপরাধবোধে উদাসীন চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ছায়া-সীতা উপস্থাপনার মাধ্যমে ভবভূতি সমাজের কঠোর রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। রামের মতো মহানায়কও সমাজের প্রবল চাপে সীতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এতে ব্যক্তিগত সুখ বনাম সামাজিক দায়িত্বের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

ছায়া-সীতা প্রকৃত সীতার আধ্যাত্মিক রূপের প্রতীক। এটি দেখায় যে, সীতা কেবল পার্থিব নারী নন, বরং দেবীপ্রতিমা। এটি রামায়ণের ঐশ্বরিক ভাবকে আরও গভীর করে তোলে। ভবভূতি তাঁর নাটকে ছায়া-সীতার মাধ্যমে রামায়ণের প্রচলিত আখ্যানকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি শুধু রামের বীরত্বের গল্প বলেননি, বরং চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা তুলে ধরেছেন, যা নাটকটিকে পৌরাণিক গাথার বাইরে এনে এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে।

কালিদাস সৌন্দর্যের উপাসক। কিন্তু ভাবের কবি ভবভূতির কল্পনার গতি অন্যপ্রকার। ভাবের সম্যক স্ফুরণের জন্য ভবভূতিকে কালিদাসের প্রতিমার অঙ্গরাগ করতে হয়েছে। সৌন্দর্য ও ভাব পৃথক পদার্থ। সৌন্দর্যের সৃষ্টি কর্তার যে উপকরণ, ভাবের স্ফুরণ যার মুখ্য ব্রত, তাঁর সেই উপকরণ নয়। তাই কালিদাসের সীতার বা শকুন্তলার, অন্যের মুখে যা শুনেই পরিতৃপ্তি, ভবভূতির সীতা তা প্রত্যক্ষ করে পরিতৃপ্তি। আর, এই ‘ছায়া’ই তার প্রধান দৃষ্টান্ত। সুতরাং, কালিদাসের অঙ্কিত মূর্তিতে এ যেন ভবভূতির বর্ণসংযোগ স্বরূপ।

ভবভূতির শৈলী ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’ নাটকে সংলাপ অত্যন্ত আবেগঘন ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে ভরপুর। ছায়া-সীতা চরিত্রের মাধ্যমে তিনি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম, বেদনা, ও আত্মত্যাগের গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। এটি রামায়ণের ঐতিহাসিক কাহিনিকে মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা প্রদান করে।

উপসংহার: ভবভূতির ‘উত্তররামচরিত’-এর তৃতীয়াঙ্কে ছায়া-সীতার আবির্ভাব শুধুমাত্র একটি নাটকীয় কৌশল নয়, বরং এটি রাম ও সীতার চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক অনাচারের সমালোচনা এবং রাজধর্ম বনাম ব্যক্তিগত আবেগের সংঘাতের জটিলতা তুলে ধরে। ভবভূতির এই উপস্থাপনা শুধু তাঁর নাট্যশৈলীর গভীরতার পরিচায়ক নয়, বরং এটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যচর্চার এক চিরন্তন দৃষ্টান্ত। এই কাহিনীটি সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং নারীর আত্মমর্যাদার বিষয়েও গভীর প্রশ্ন তোলে। ভবভূতি এই নাটকে রামায়ণ কাহিনিকে একটি নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন, যা একাধারে আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ।

তথ্যসূত্র:

- ১। গোপ যুধিষ্ঠির, জুলাই ২০০৯, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃষ্ঠা- ১৩৯।
- ২। ভট্টাচার্য শ্রী পরেশচন্দ্র, জুলাই ১৯৯৫, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা- ৯১।
- ৩। কুমার রমেশচন্দ্র, আষাঢ় ১৪০১, ভবভূতি ও তাঁর নাটকসমূহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা- ১৩৯।
- ৪। ভট্টাচার্য শিবনারায়ণ, মার্চ ১৯৯১, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ৯৯।
- ৫। চক্রবর্তী শ্রী ধ্যানেশনারায়ণ, শ্রাবণী পূর্ণিমা ১৩৮১, মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), বুক হাউস, পৃষ্ঠা- ১৪৬।

তিলোত্তমা মজুমদারের কথাসাহিত্যে অবদমিত

নারীর পদসঞ্চারণ

সীমা মণ্ডল

স্টেট এডেড কলেজ টিচার—১, বাংলা বিভাগ

উলুবেড়িয়া কলেজ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: তিলোত্তমা মজুমদারের কথাসাহিত্যে নারীর প্রতি শোষণ, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, ও অবদমনের ক্ষেত্রটিকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। সময় ও সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী, প্রগতিশীল, আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত নারীদের বহুবিধ ক্ষমতায়ন ঘটলেও নারীর প্রতি অবদমনের জট-জটিলতার শিকড় এখনও সমাজে বহুলভাবে প্রোথিত আছে। পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীলতা, বিধি-নিষেধ, আচার-বিচার, নিয়মকানুনের মাধ্যমে নারীরা প্রতিনিয়ত অবদমিত হচ্ছেন। তিলোত্তমা মজুমদারের ‘ঋ’, ‘অসম্পূর্ণা’ ‘শর’, ‘অ আ ক খ’, ‘জ্যোতির্লীনা’, প্রভৃতি গল্পে এবং ‘বসুধারা’, ‘প্রহাণ’, ‘একতারা’, ‘ঈশ্বরীর বাসা’, ‘আজও কন্যা’, ‘নির্জন সরস্বতী’, প্রভৃতি উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে অবহেলা, অসম্মান করে এসেছে। এবং সেই প্রেক্ষিতেই নারীদের সেবাদাসী, ভোগ্যবস্তু বলে মনে করেছে সমাজ। বরং আধুনিকতার নামান্তরে নারীশরীরকে কৌশলে ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ‘স্তনী’ গল্পে, ‘একতারা’ উপন্যাসে নারীশরীরকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেছে স্বামীরা। এছাড়া সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধাক্কায় যেসব মেয়েরা যৌনপেশার জটিল আবর্তে প্রবেশ করেছে, তারা কখনোই সেই আবর্ত থেকে বেরোতে পারেনি। মালবিকা, চম্পাকলি (‘শামুকখোল’) রিনা, ছাউনিদের (‘ঈশ্বরীর বাসা’) থেকে সমাজ ভদ্র জীবনযাপনের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। আসলে পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল সমাজের চোখে কখনোই মেয়েরা ‘মানুষ’ হয়ে উঠতে পারেনি। ভাগ্যনিয়ন্তা পুরুষরা মেয়েদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু তবুও একুশ শতকে আধুনিক, স্বনির্ভর মেয়েরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই রচনার প্রয়াস করেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের মানসিক সক্ষমতা তৈরি করেছে। যাবতীয় শোষণ-নিপীড়ন-অবদমন-বঞ্চনা-অত্যাচার-অপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে মেয়েরা। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই মেয়েদের অবদমন থেকে মুক্তির উপায় হতে পারে।

সূচক শব্দ: অবদমিত নারী, স্বনির্ভরতা, শোষণ, প্রতিবাদ, পুরুষতান্ত্রিকতা।

মূল আলোচনা:

নারীর প্রতি অবদমন, শোষণ, লাঞ্ছনা এক গভীর সামাজিক ব্যাধি। একুশ শতকেও এই ব্যাধি সমাজ থেকে দূরীভূত হয়নি। বহু নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন তৈরি হলেও শিকড় থেকে নারীর প্রতি অবদমনের জটকে মেরে ফেলা সম্ভব হয়নি। বরং এখনও বহু বিচিত্রভাবে নারীদের অবদমনের শিকার হতে হয়। তারই প্রতিফলন পড়ে সাহিত্যে। তিলোত্তমা মজুমদারের কথাসাহিত্যে নারীর প্রতি অবদমন, শোষণ ও লাঞ্ছনার ক্ষেত্রগুলিকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখার

প্রচেষ্টা আছে এই প্রবন্ধে। সেই সঙ্গে নারীশিক্ষা, নারীর স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে অবদমন থেকে উত্তরণের প্রয়াসও ধরার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবন্ধটিতে। তিলোত্তমা মজুমদার একবিংশ শতকের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তিলোত্তমা মজুমদারের বলিষ্ঠ হস্তে নারীজীবনের বিচিত্র সমস্যা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আধারে উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই পাওয়া যায় নারীজীবন কেন্দ্রিক পরীক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাভাব্যময়ী, প্রগতিশীল, আত্মনির্ভরশীল, ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত নারীরা যেমন আছেন, তেমনই তাদের প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ লড়াইতে শোষণ, বঞ্চনা ও অবদমনের জট-জটিলতাও আছে। সবটা নিয়েই তিলোত্তমা মজুমদারের মেয়েরা নতুন স্বপ্নের আকাজক্ষায় এগিয়ে চলেছে।

তিলোত্তমা মজুমদারের জন্ম (১৯৬৩) উত্তরবঙ্গের কালচিনির চা-বাগান ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের কোলে। পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যচর্চার মানসিকতা। মা-ঠাকুমা-দাদার সাহিত্যবোধ শিশু তিলোত্তমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সাহিত্য মনস্কতার বোধ তিনি পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন। ‘একালের রক্তাকরবী’র সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা থেকেই তাঁর প্রথম লেখা – ‘ঋ’ (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়। গল্পটি বৃহৎ হলেও, মূলত গল্পটিতে নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের অবদমন ও বঞ্চনার ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-কানুন, বিধিনিষেধ, রীতি-নীতি সমস্ত কিছুর মধ্যেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অবদমনের চোরা শ্রোতকে বইয়ে দেয়। আর নারীরা কিছুটা জেনে, কিছুটা না জেনেই সেগুলি যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে নিয়ে চলেন। কিন্তু এ গল্পের বিনতা ছোট থেকেই পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধী। নারীর প্রতি অবদমনকে সে মেনে নিতে শেখেনি, বরং প্রতিবাদী সে। তার নিরব প্রতিবাদ সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন :

সে মেয়ে মানুষ তাই বুকে শোবে না – এই বোধ তাকে আচ্ছন্ন করেছে।
সে মেয়েমানুষ তাই রাত্রি জেগে ব্রতপালন করছে – এই বোধ তাকে নিয়ে
চলেছে অন্য কোনও দুনিয়ায়।^১

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বুক ওঠার কারণে জামার পর জামা দিয়ে তাকে ঢাকার প্রয়াস ও ঋতুস্রাবের পর বিছানা ধোওয়া, জামাকাপড় কাচার আয়োজনের ঢাকঢোল বন্দোবস্ত মেনে নিতে পারে না সে। নারীজন্মটাই যেন এক বিড়ম্বনার মনে হয় বিনতার। এই মেনে না নেওয়ার দৃঢ়তা থেকেই সে প্রতিবাদী হয়েছে পিতার বহুগামী আচরণের। পিতার অসংযত কামবৃত্তির ক্ষুধা মেটানোর জন্য প্রতিরাতে জুয়ানি কিংবা তারামায়ার আগমন মেনে নিতে পারেনি বিনতা। মায়ের অপমান, আত্মক্ষয় ও প্রতিবাদকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে :

রাধারঞ্জন উঠে বসলেন দ্রুত। রাতের নারীও তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড়
সামাল দিয়ে নেমে দাঁড়াল। এবং বিনতা নামের মেয়ে, এই মধ্যরাতকে
প্রতিবাদের প্রকৃষ্ট সময় হিসেবে বেছে নিয়ে বলে ফেলল, কেন রোজ ওরা
আসবে? মা কেন রোজ কাঁদবে? আমরা এখন বড় হয়ে গেছি বাবা।
আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।^২

এই উচ্চারণে ভেঙে পড়ল পুরুষতান্ত্রিকতার সাজানো রঙিন দুর্গ। মায়ের প্রতি ঘটে চলা অবদমন, শোষণ, লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করল মেয়ে। কিন্তু নারীর প্রতি অবদমনের জাল বিস্তারিত হয়ে আছে সমাজের সর্বত্র। তাই দেখি, গর্ভবতী বিনতা নিজের সাধ-আহ্বাদ অনুযায়ী সাজ-পোশাক করলে তাকে শুনতে হয় – “বেশ্যাদের মতো এত গয়না পরেছ কেন?”^৩ আবার নিজ স্ত্রীর মাতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতেও বাধে না শেখরের। এ সমাজে তাই মাতৃত্বের দায় কেবলমাত্র মাতার একার। পুরুষ কেবল বীজ সঞ্চর করেই দায়িত্ব খালাস করতে চায়। প্রয়োজনে ঋণের পিতৃত্ব পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতেও দ্বিধা করে না।

নারীর প্রতি অবদমনের চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়েছে ‘ঋ’ গ্রন্থের ‘অসম্পূর্ণা’ গল্পে। সমাজকে শিক্ষিত করার ব্রত নিয়ে আসা স্কুল শিক্ষিকারা কেউই পারেনি গণিকার সন্তানকে জীবনের আলোর দিশা দেখাতে। সমাজ থেকে পঙ্কিলতার অন্ধকার দূর করতে পারেনি এরিকা দিদিমণিরা। খুব আকুলভাবে মণিমা মুক্তি চেয়েছিল এরিকা দিদিমণির কাছে। উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল। তার মাও চায়নি মণিমা গণিকাবৃত্তির পঙ্কিল-পিচ্ছিল পথে নামুক। তাই মেয়েকে পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিলেন:

মা তো চায়নি আমিও মার মতো লাইনে নামি, মানে, মার মতো হই, তাই ঘরে লোক নেওয়া ছেড়ে দিল মা। এখন বাইরে যায়। মাঝে মাঝে মদ খেয়েও ফেরে, জানেন। আর সেসব দিন আমাকে যা-তা বলে মা। বলে, পেটের শক্ত! মরে গেলি না কেন! তোর জন্য আমার যত শান্তি!^৪

এমন পরিবেশের মধ্যে থেকেও মণিমা এরিকা দিদিমণির কাছে মুক্তির বার্তা চেয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ যৌনকর্মীর সন্তানকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তৎপরতা দেখালেন না। ব্যক্তিগত জীবনে কোনোরকম অশান্তির আঁচ লাগতে দিলেন না এরিকা দিদিমণি। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পাশাপাশি একটি ছাত্রীর আবেগকেও মূল্য দিলেন না শিক্ষিত এরিকা দিদিমণি। অথচ তারাই নাকি সমাজ গড়ার কারিগর! এখানে একটি শ্রেণির প্রতি বিরূপ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণির নিম্নবিত্ত যৌনকর্মীদের প্রতি ঘৃণা, অবহেলা ও অসম্মান প্রদর্শন করেছে। শিক্ষার আলো সমাজের কোনো স্তরেই যে পৌঁছায়নি, তার স্পষ্ট নিদর্শন ‘অসম্পূর্ণা’ গল্পটি।

‘অঞ্জলিকাকিমার উপসংহার’ গল্পে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বনির্ভর হতে চাওয়া নারী অঞ্জলি সমাজের ধনবান ব্যক্তিদের দ্বারা অবদমিত, বঞ্চিত, অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছে। সমাজের ধনবান বাবুদের লোভের শিকারে পরিণত হয়েছিল অঞ্জলি। পুরুষশাসিত সমাজ বিধবা নারীর নিরাপত্তাজনিত অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে বারবার উতাজ করে। সুকান্ত, সুধাময়ের মতো বাবুরা কখনো মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে, কখনো অধিক সহানুভূতি দেখিয়ে অঞ্জলিকে সাহায্য করতে চেয়েছে। আসলে তার পিছনে সক্রিয় ছিল কামবহি। কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বে অঞ্জলি আদিবাসী দুখিয়া মুমুকে বিবাহ করে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মুখোশ খুলে দিয়ে তার গালে চপেটাঘাত করেছে। আর আদিবাসীকে বিবাহ করার কারণেই অঞ্জলি ভদ্র সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। দেবীর আরাধনার সুযোগও কেড়ে নিয়েছে ভদ্র সমাজ।

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘মানুষশাবকের কথা’ (২০০১) উপন্যাসে দ্বারভাঙার জমিদারের নারীলোলুপতায় যোগিয়াড়া গ্রামের মেয়ে-বউরা নিজেদের লুকিয়ে রাখে। স্বাধীনভাবে চলাফেরা

করতে না পারার অসহায়তা তাদের গ্রাস করে। কারণ জমিদারের লোকেরা সুন্দরী, অক্ষতযোনি মেয়েদের দেখতে পেলেই খবর যাবে জমিদারের কাছে। তখন রাতপালকি এসে তাকে নিয়ে যাবে জমিদারের বাগান-বাড়িতে। সাতদিন সাতরাত জমিদারের দেহসেবা করে প্রচুর গয়নাগাটি আর অসম্মান ও মৃত্যুসম যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে এলে পরিবারের বাবা-দাদারা তার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়। এ প্রথা বহুকালের। অথচ গ্রামের পুরুষরাও জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। তাই প্রতিদিন গ্রামের নিতানূতন মেয়েরা জমিদারের ভোগের শিকারে পরিণত হয়। নারী যেন জমিদারের কাছে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখ পরিতৃপ্তির যন্ত্রমাত্র। এই গ্রামে নারীর প্রতি অবদমনের শেকড় গভীরে প্রোথিত। কারও সাধ্য নেই সেই শেকড় উপড়ে ফেলার। কিন্তু অসম সাহসিকতার সঙ্গে জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেখা যায় চম্পাবতীকে। জমিদার চম্পাবতীকে ভোগ করতে এলে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে চম্পাবতী বশব্দদ দুধগোখরো, কালকেউটে কোমরে, গলায় জড়িয়ে নিয়েছে। যোগিয়াড়া গ্রামে চম্পাবতী এতদিনের রীতি-নীতি ভেঙে এই প্রথম রাত না ফুরোতেই ফিরে আসে। চম্পাবতীর নিজের উপর হওয়া অসম্মান ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে নিজস্ব ভাষায়।

‘বসুধারা’ (২০০২) উপন্যাসটিতেও নারীর প্রতি অবদমনের নানা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা নীলিমা স্বামীর মৃত্যুর পর প্রচলিত বৈধব্যের নিয়ম-কানুন না মানলে তাকে সমালোচিত হতে হয়। তাকে শুনতে হয়:

“ছি ছি। তোমাকে দেখে ঘেঁষায় আমার গা কেমন করছে। হিন্দু বিধবায় মাংস খায় এ আমি ভাবতেও পারি না।”^৫

শুধু মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে নয়, মুসলমানকে ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া নিয়েও তুমুল ঝড় উঠেছিল সমাজে। নীলিমার মাছ মাংস খাওয়া, চাকরি করতে বাইরে বেরোনো, মুসলমানের সঙ্গে ওঠা-বসা এসব সমাজ না মানলেও নীলিমার প্রখর যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্বের কাছে সব বাধাই তুচ্ছ হয়ে গেছে। নীলিমা বৈধব্যের মিথ্যা ধ্বজা ধরে বিধি-বিধান পালন করতে চায়নি কারণ বেঁচে থাকতেই সমরেশ-নীলিমার দাম্পত্য সম্পর্কে প্রেম মরে গিয়েছিল। তাই আজীবন তার শোকপালন নীলিমার কাছে অর্থহীন। সমাজ সবসময়ই নারীদের বিশেষ বিশেষ খাঁচার মধ্যে বিধি-নিষেধের শিকল পরিয়ে বন্দী রাখতে চায়। নীলিমার নিজের বোনেরাই হয়ে উঠেছিল তার প্রতিস্পর্ধী। কিন্তু নীলিমা নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। অবদমনের যাঁতাকল থেকে মুক্তির উপায় তিনি নিজেই সন্ধান করে নিয়েছেন। তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে উত্তরণের ডাক শোনা যায়। তিনি বলেছেন :

.....আসলে ভোগ্যবস্তু ছাড়া আর কোনওভাবে তো দেখা হয়নি মেয়েদের। তোমার বর মরে গেছে মানে-তোমার স্বামী মরে গেছে মানে-তোমার জমি এখন ধু-ধু নিষ্ফল্য পড়ে থাকবে। আর কেউ এসে সে-জমি দখল নিলে অন্যায় হয়ে যাবে। মালিক একজনই। বিক্রি না-করা পর্যন্ত তো মালিক বদলায় না। সম্ভানের জন্যও তাই কোনও শোকচিহ্ন নেই। কারণ স্বামী থাকলে আবার সম্ভান উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু স্বামী না থাকলে আর একজন স্বামী – তওবা তওবা। হিন্দু বিধবাদের মতো নির্ধারিত অবহেলিত ও দলিত জাত পৃথিবীর আর কোথাও নেই।^৬

মৃত্যুর পরেও স্বামীরা তাদের ক্ষমতার কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। অবদমিত করে রাখতে চায় নারীকে। তাই মৃত্যুর পরেও নারীর স্বাধীন সেক্স-এ দখল চাই পুরুষের। বিধবা নারীর জন্য বৈধব্য স্বীকার সংশয়ের। তার ব্যতিক্রম হলেই তা অনৈতিক, সমাজের চোখে ঘৃণ্য। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে পুরুষের জন্য কোনো নিয়ম-কানুন নেই। নীলিমা বিধবা নারীর এই নিয়মের বিরুদ্ধতা করেছে উচ্চকিত কণ্ঠে।

এই উপন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল নীলোফা। মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে নীলোফাকে অবদমনের শিকার হতে হয়। পড়াশুনার আগ্রহ-থাকা সত্ত্বেও তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি; শুধুমাত্র নারী বলে। শৈশব ঢেকে গেছে পর্দার আড়ালে। বিদ্যালয়ে সেরা রেজাল্ট করেও নাজনীন, নীলোফারা মুসলমান সমাজের অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে পারেনি। শিক্ষা নয়, কেবল সেবা ও প্রজননের মধ্যেই মেয়েদের জীবন সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছে সেই সমাজ। মণিরুলের বক্তব্যের মধ্যেই নারী শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন :

“মেয়েরা পড়াশুনা শিখে করবেই বা কী! সেই তো বাচ্চা পয়দা করবে আর বিরিয়ানি রাঁধবে!”^৭

তাই মণিরুল তার পরিবারের মেয়েদের পড়াশুনা করতে দেয়নি। কারণ এই না দেওয়ার মধ্যেও যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে সে সম্পর্কে আমিনা বলেছেন :

মাইয়া মাইনষেরে পায়ের তলায় না রাখলে, বন্ধ না করলে ওদের প্রভুত্ব কার ওপর জারি থাকবে! সবাই রাজত্ব চায়। দেশ না হোক, শহর না হোক, গ্রাম না হোক অন্তত নিজের ঘরে, নিজের পরিবারে!^৮

অবদমনের এই নির্মম ও কঠোর সত্য ফুটে উঠেছে আমিনার বক্তব্যে। স্বশিক্ষায় শিক্ষিত আমিনার এমন স্বচ্ছ মানসিকতা পেয়েছিলেন নীলোফা। নীলোফা উদার মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিল। পারিবারিক সর্পিলা প্রথার শিকল ছিড়ে বেরোতে চেয়েছে সে। কারণ :

এই বাড়ি, এই পরিবার তার অধিকারের জায়গা। এখানে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠার জন্য সে মাথা নিচু করতে চায় না। সেখানে তার দারুণ অপমান, কারণ সে-অপমানে অভিমান আছে!^৯

তীব্র আত্মসম্মানবোধে নীলোফা আপন গৃহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে অস্বীকার করেছে।

রাধিকা স্বামী ‘কার্তিকের অবহেলা ও অপমান থেকে সম্মান সংগ্রহ করে সম্মান নিয়ে বাঁচতে চায়’!^{১০} গর্ভবতী রাধিকাকে একা ফেলে অন্য জায়গায় গিয়ে সংসার পাতে কার্তিক। আবার অর্থের ভাড়ারে টান পড়লে রাধিকার কাছেই ফিরে আসে। রাধিকাকে সে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ বলে মনে করে। কিন্তু গর্ভবতী রাধিকাকে ভোগ করতে পারে না বলেই কার্তিক রাধিকার সঙ্গে থাকে না। এই ঘটনা একজন নারীর পক্ষে কতখানি লজ্জার তা বোঝে না কার্তিকের মতো মেদ-মাংস-নারী লোভী কতিপয় পুরুষরা।

এ উপন্যাসের জিনি মেনে আর মানিয়ে নিতে নিতেই শ্বশুরগৃহে অবদমনের শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। স্বামী, শাশুড়ির তার চরিত্র সম্পর্কে অবিশ্বাস, সন্দেহ তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। অন্তরে পবিত্র জেনে নিজেকে প্রমাণ করার কোনো তাগিদও সে অনুভব

করেনি। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতেও যায়নি সে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার নীরবে সয়ে চলা মেয়েটি নীরবেই জীবন থেকে খসে পড়েছে। স্বামী-শাশুড়ি-শ্বশুর বধূহত্যার কলঙ্কের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই সমাজে জিনির মতো কত বধূ পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বধূদের কোনো দোষ খুঁজে না পাওয়া গেলে সমাজ তাকে অনায়াসেই পাগল বানিয়ে দেয়। আর সমাজের নির্মম অত্যাচারে সুস্থ মানুষ সত্যি সত্যিই একদিন পাগল হয়ে যায়। লক্ষ্মী জিনিকে সেই ভাবেই পাগল করে তুলেছে। কিন্তু মরে গিয়ে জিনি পুত্রবধূদের প্রতি অন্যায়, অবদমন ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করে গেল।

‘প্রহাণ’ (২০০৪) উপন্যাসেও মেয়েদের প্রতি পারিবারিক ক্ষেত্রে অবদমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসে পারিবারিক শাসন, পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীলতার শিকার হয়েছে দিব্যাঙ্গনা নামের একটি নিষ্পাপ সরল শিল্পী মেয়ে। দিব্যাঙ্গনার ছবি আঁকার অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তার শ্বশুরবাড়ি চায় নি সে ছবি আঁকুক। **বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ি আঁকা সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে একে কেউ বড়লোক হয়নি এবং আঁকা একটি ব্যয়বহুল বিলাসিতা।**” সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দিব্যাঙ্গনা আঁকা সংযত করেছে। নিম্নরুচি ও অর্থলোলুপ পরিবারের শাসনে-শোষণে-অবদমনে দিব্যাঙ্গনার শিল্পীপ্রতিভা অপ্রকাশের আকাজক্ষায় ঝুঁকছিল। শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীর অনুমতি ছাড়া অঙ্কনকে পেশা করার স্বাধীনতা পায়নি দিব্যাঙ্গনা। এভাবেই শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে গৃহবধূদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওঠা-নামা করে। তার ব্যতিক্রম হলেই ধৈর্যে আসে গঞ্জনা। শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূ দিব্যাঙ্গনার কোনো পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে খোলামেলা বসে কথা বলার অনুমতি যেমন ছিল না, তেমনই সর্বদা ফোনে কথা বলার স্বাধীনতাটুকুও রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেড়ে নেয়। দিব্যাঙ্গনা শ্বশুরবাড়িতে গলায় চেন বাঁধা কুকুরের মতো পরাধীন ও অবদমিত অবস্থানে ছিল। কিন্তু প্রতিনিয়ত মরে যেতে যেতে শেষবার সে উপলব্ধি করেছিল যাবতীয় আত্ম-অসম্মান, রক্ষণশীল পরিবারের বিধিনিষেধ, পুরুষতান্ত্রিকতার অবদমনের অসম্মান থেকে কেবলমাত্র স্বনির্ভরতার শক্তিই তাকে বাঁচাতে পারে। আর্থিক স্বনির্ভরতাই দিব্যাঙ্গনাকে জীবন সম্পর্কে আশাবাদী করেছে। পারিবারিক বাধাকে অতিক্রম করে সে অঙ্কনকেই পেশা হিসাবে নির্বাচন করেছে এবং সাফল্যও অর্জন করেছে দক্ষতার সঙ্গে।

‘শামুকখোল’ (২০০৫) উপন্যাসেও শ্রেণি বৈষম্যের পাশাপাশি অবদমনের চিত্র দেখা যায়। যৌনকর্মীদের প্রতি তথাকথিত ভদ্র সমাজের ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কোনো নারী তো বেশ্যা হয়ে জন্মায় না; সমাজই তাকে বেশ্যা হতে বাধ্য করে। মালবিকা কলেজের এক বান্ধবীর প্ররোচনায় মধুচক্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ক্রমশ সে উপলব্ধি করেছে তার বেশ্যাবৃত্তির উপার্জিত অর্থই আপন পরিবারের মানুষগুলিকে সে বাঁচাতে পেরেছে। মায়ের পঙ্গুত্ব, বাবার মানসিক রোগগ্রস্ততা, ভাই-এর অসহায় শৈশব যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত মালবিকা পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তার দেহ বিক্রীত অর্থ ঢেলে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সে পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তার উপার্জিত অর্থ অশুচি হয়নি কিন্তু মালবিকা আপনজনদের কাছেই অশুচি, অস্পৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। অথচ পারিবারিক অভাব-অনটনের তাড়নাতেই সে বেশ্যাবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সামাজিক বৈষম্য, পারিবারিক বৈষম্য, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদের জন্য বিভিন্ন আইন কানুন প্রণীত হলেও আজও তারা সমাজের কাছে অপাত্তেয়, অস্পৃশ্য। কোনো ভদ্র পাড়ায় তাদের ঠাই হয় না। ভদ্রপল্লিতে

তাদের গৃহ তৈরি হয় না, কোনো ভালো স্কুলে তাদের ছেলে মেয়েরা ভর্তি হতে পারে না। অথচ একুশ শতকে শ্রমিকের স্বীকৃতি নিয়ে যৌনকর্মীদের প্রবল আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু মালবিকা জানে শ্রমিকের স্বীকৃতি দিলেই যৌনকর্মীদের অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। বরং অবদমনের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে। তাই গোড়া থেকেই এই পেশার অবলুপ্তি দরকার। না হলে সমাজ থেকে কোনদিনই নারীর প্রতি শোষণ, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, অবদমনের মানসিকতা দূরীকরণ করা সম্ভব নয়।

শিশু চম্পাকলি অহেতুক ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে সমাজেরই পেতে রাখা ফাঁদে আটকে পড়ে। তার অভিভাবকত্বহীনতার সুযোগ নিয়ে এক পুরুষ তাকে নিষিদ্ধ নরকের মধ্যে এনে ফেলে। শৈশবের অপরিশ্রুত স্তন ও যৌনিক বিবিধ ও নিষ্ঠুর উপায়ের মাধ্যমে পরিণত করে তাকে দিয়ে উপার্জন করানোর আয়োজন চলে বেশ্যাপল্লিতে। ভবিষ্যতে চম্পাকলিও পারেনি এই নিষিদ্ধ নরক থেকে বের হতে। কারণ এই জগতে কেবল ঢোকার রাস্তাই খোলা থাকে। বেরোনোর কোনো রাস্তা থাকে না।

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘ঈশ্বরের বাসা’ (২০১৪) উপন্যাসেও গণিকা রূপে দেখা যায় রিনাকে, ছাউনিকে। রিনা লোরাণ্ডা স্কুলে পড়া মেয়ে, কিন্তু এক অবসরপ্রাপ্ত পতিতপরায়নী তাকে স্কুল ছাড়িয়ে এই পেশায় নামিয়েছে। রিনাও এখন অর্থলোভী। আর ছাউনি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে গেছে যে :

মেয়েদের ভদ্র হতে গেলে ভদ্র বাড়ি, ভদ্র মা-বাবা এসব লাগে। না হলে বেশ্যার মেয়ে বেশ্যাই হয়।^{১২}

সামাজিক বঞ্চনা ও অর্থনৈতিক অভাবের কারণে মেয়েরা গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলত ব্যাপকভাবে অবদমনের জাল বিস্তারিত হয়। যেখান থেকে রক্ষা পায় না শিশুরাও।

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘একতারা’ (২০০৬), ‘আজও কন্যা’ (২০১০), ‘ঝুমরা’ (২০১৮), ‘নির্জন সরস্বতী’ (২০১৯) প্রভৃতি উপন্যাসে নারীর প্রতি পারিবারিক অবদমনের জাল বিস্তারিত হতে দেখা যায়। ‘একতারা’ (২০০৬) উপন্যাসের দেবারতিকে যেমন শ্বশুরবাড়িতে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল তেমনি কর্মক্ষেত্রেও সে যৌন হেনস্থা ও কুপ্রস্তাবের শিকার হয়েছিল। প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত দেবারতিকে উর্ধ্বতন অফিসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন :

মাইনে বাড়িয়ে দেবে তিনগুণ। চমৎকার ফ্ল্যাট দেবে থাকতে। সোনা ভরিয়ে দেবে গা।^{১৩}

দেবারতির অসম্মতি আরও বিপদ ডেকে আনে। চোখ দিয়ে ধর্ষণ করে একটি পুরুষ। সম্মানহানি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে সে। নিজেকে পণ্য রূপে বিক্রি করতে চায় না বলেই প্রবল আত্মসম্মানের সঙ্গে দেবারতি কর্মক্ষেত্রে রেজিগনেশন লেটার জমা দেয়। কিন্তু নারীশরীর কোথাও স্বস্তি পায় না। সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের এক ব্যক্তি তার উপন্যাস ছাপিয়ে দেওয়ার অছিলায় বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে। এই সমাজে ঘরে-বাইরে প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হতে হয় মেয়েদের। কারণ

এ সমাজের চোখে প্রতিটি মেয়েই শেষ পর্যন্ত বেশ্যা ছাড়া কিছু নয়।^{১৪}

কিন্তু পরিবারেও দেবারতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। সম্মান ভুলুপ্তি হয়েছে। স্বামী নীল অর্থের বিনিময়ে নিজ স্ত্রীকে অন্য পুরুষের কাছে বিক্রি করেছে। এই সমাজই মেয়েদের বেশ্যা বানায়।

চরম অপমান-অসম্মানে গৃহত্যাগ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করে একাকী পথ চলার স্বপ্নে এগিয়ে চলেছে দেবারতি।

‘আজও কন্যা’ (২০১০) উপন্যাসে দেখা যায় কন্যা কোনোদিন ছেলের আসন পায়নি। লিঙ্গবৈষম্যের চূড়ান্ত রূপ দেখা গেছে উপন্যাসটিতে। মায়ের চোখে কন্যা ও পুত্রের সমান স্থান থাকার কথা। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠিত কন্যা নিজ উপার্জনে মা-ভাইয়ের সব দায়িত্ব পালন করেও সহানুভূতি পায়নি। মায়ের সব ব্যাঙ্ক ব্যালাঙ্গ তাই ছেলের নামে। ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা সবটাই ছেলের জন্য নির্ধারিত। পুত্রসন্তানের প্রতি এই অধিক পক্ষপাতিত্ব অজন্তার সামনেও গোপন করার চেষ্টা করেন না মা। আবার অজন্তার প্রেমিক প্রেম ভেঙে যাবার পরে অজন্তার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। সমাজে মেয়েরা এভাবেই অবহেলিত, বঞ্চিত, অবদমিত হয়েছে। তাই আজও একজন নারীকে তার যোগ্যতামানের পরিচয় দিতে হয় পুরুষের মানদণ্ডে। অথচ সেবায়, দায়িত্বে, কর্তব্যে অজন্তা পুরুষের প্রতিস্পর্ধী বলেই হয়তো তাকে মেনে নিতে সমাজের এত অস্বস্তি! সমাজের কোথাও কোথাও লিঙ্গবৈষম্যের জাল পাতা থাকলেও আজ মেয়েরা সকল বাধাকে অতিক্রম করে শক্তি ও সাহসকে পাথেয় করে এগিয়ে চলেছে সেই দিনের অপেক্ষায় :

সে-দিন সুদূর নয় -

যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গািহিবে নারীরও জয়া!^{৫৫}

সেদিন অবহেলা আর অসম্মানের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না ‘নির্জন সরস্বতী’র দেবাদৃতাদের। মেয়েদের মেধা কম, অঙ্কে কাঁচা বলে যোগ্যতা প্রমাণের আগেই তাদের বাদের খাতায় ফেলে দেওয়া হবে না। মেয়েরা এখন বারবার অকৃতকার্য হয়েও একজন সফল চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার চ্যালেঞ্জ নিতে পারে দেবাদৃতার মতো।

তিলোত্তমা মজুমদারের গল্পের জগতেও নারীর প্রতি বঞ্চনার, অবদমনের ছবি দেখা যায়। ‘পঞ্চাশটি গল্প’ (২০১২) গ্রন্থের অন্তর্গত ‘স্তনী’ গল্পে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের তাগিদে স্বামী তার স্ত্রীকে ন্যূন মডেলে পরিণত করেছে। ‘জ্যোতিলীনা’ গল্পে নৃত্যশিল্পী কমলজ্যোতি শ্বশুরবাড়ির নানারকম বিধিনিষেধের চাপে পড়ে নাচ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ‘অ আ ক খ’ গল্পে দেখা যায় শুধুমাত্র বিবাহ নামক তকমা গায়ে পড়ে যাবার কারণে কনকাজলি তার সারাজীবনের অর্জিত শিক্ষা ও আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে রাজি নয়। বরং পাত্রপক্ষের সামনেই শাগিত যুক্তি খাড়া করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে মেয়েরা শুধুমাত্র হেঁশেল ঠেলার জন্য জন্মায় না। নারীর প্রতি অবদমনের মানসিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে দেখা যায় কনকাজলিকে। সে বলেছে :

আত্মনির্ভরশীলতা বলে একটা কথা আছে। স্বোপার্জন আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে রাখে। তা ছাড়া তৃপ্তিও তো বড় কথা। এত পড়াশুনা করলাম কোনো কাজে লাগাব না? পাত্রের পিতা বললেন, ও! নারীবাদী? আজকাল মেয়েরা এসব শিখেছে। সংসার সুপরিচালনাও একটা কাজ। অঞ্জলি বলেছে আমি তো শুধু মেয়েদের কথা বলিনি। আচ্ছা! উল্টোটাও তো হতে পারে। আমি চাকরি করলাম আর আপনাদের ছেলে চাকরি ছেড়ে ঘরে থাকল। ঘুরল ফিরল।^{৫৬}

ঘরের বউয়ের চাকরি করার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নিতে চাইলে মেয়েদের এমনভাবেই প্রতিবাদ করতে হয়। সমাজে ও সংসারে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বিপুল অবদমনের মানসিকতা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করেছে মেয়েরা। স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়ন মেয়েদের শুধুমাত্র মানসিক শক্তি নয়, অর্থনৈতিক শক্তিও জুগিয়েছে। কিন্তু স্বনির্ভর হয়েও মেয়েরা সবরকম অসাম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি। ‘শর’ গল্পের যামিনী কর্মসূত্রে বাইরে রাত্রিবাস করলে তাই তার দিকে ধেয়ে আসে সন্দেহ, কটুজি, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গবাণ। একজন পুরুষ বাইরে রাত কাটালে কখনো তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু একজন নারীর বাইরে রাত কাটানো মানেই সমাজ তার সতীত্ব নিয়ে অনায়াসেই প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু পুরুষের সতীত্ব নিয়ে কখনো প্রশ্ন ওঠে না কেন?

এভাবেই তিলোত্তমা মজুমদারের একুশ শতকের মেয়েরা ঘর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতার সঙ্গে জীবনের সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে শিখে গেছে। অবদমনের বহু জটিল জালে আবর্তিত হয়েও হেরে যায়নি। পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা। মেয়েদের স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়ন যাবতীয় অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহযোগিতা করেছে। স্বনির্ভরতা মেয়েদের অনেকখানি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নয়নে সহায়তা করেছে। তিলোত্তমা মজুমদারের কথাসাহিত্যে নারীর প্রতি অবদমনের চিত্র যেমন আছে, তেমনি উত্তরণের ইঙ্গিতও আছে। তাঁর কথাসাহিত্যে শোনা যায় লড়াকু নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। এর পিছনে কাজ করেছে লেখিকার নারীবাদী মানসিকতা। তাই লিঙ্গরাজনীতি, শোষণ, ধর্ষণ, যৌনতা, কর্মক্ষেত্রে নারীর হেনস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলি অনায়াসেই তার কথাসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। তাই তিলোত্তমা মজুমদারের নারীরা একুশ শতকের একেবারে জীবন্ত চরিত্র। সময় বদলালেও সমাজ মানসিকতার বদল যে খুব সহজে হয় না, তিলোত্তমা তা দেখিয়েছেন। একুশ শতকে মেয়েরা যেমন স্বচ্ছন্দে কিরণ বেদীর মতো পুলিশের চাকরি করতে পারে, বাসের অথবা পাইলটের আসনে বসতে পারে তেমনি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরেও নারীরা দ্বিতীয় লিঙ্গের তকমা ঘোচাতে পারে না। সরকারি উন্নয়ন ও আধুনিক মানসিকতার অন্তরালেও সক্রিয় থাকে নারীর প্রতি অবদমনের চোরা স্রোত। তিলোত্তমা মজুমদার এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই নারীদের শিক্ষা ও সচেতনতার বোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এখানেই তিলোত্তমার নারীদের জয়জয়কার।

তথ্যসূত্র:

- ১। তিলোত্তমা মজুমদার, ‘ঋ’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃ.২৫
- ২। তদেব, পৃ.৩৯
- ৩। তদেব, পৃ.৪৫
- ৪। তদেব, পৃ.১৭৩
- ৫। তিলোত্তমা মজুমদার ‘বসুধারা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ডিসেম্বর ২০০২, পৃ.১৪৪
- ৬। তদেব, পৃ.১৩৯
- ৭। তদেব, পৃ.৫০
- ৮। তদেব, পৃ.৫১
- ৯। তদেব, পৃ.৬৩

১০। তদেব, পৃ.১২৪

১১। তিলোত্তমা মজুমদার, ‘প্রহাণ’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০০৪, পৃ.১৩

১২। তিলোত্তমা মজুমদার, ‘ঈশ্বরের বাসা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০১৪, পৃ.১৫৭

১৩। তিলোত্তমা মজুমদার, ‘একতারা’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০০৬, পৃ.১৭৯

১৪। তদেব, পৃ.২১৯

১৫। নজরুল ইসলাম, ‘সঞ্চিতা’, ডি. এম লাইব্রেরী, মাঘ ১৪০৮, কলকাতা-০৬, পৃ.৮০

১৬। তিলোত্তমা মজুমদার, ‘পঞ্চাশটি গল্প’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ২০১২, পৃ.২৯৬।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে সমাজবিযুক্ত যুবসমাজের চিত্র (নির্বাচিত উপন্যাস অবলম্বনে)

বৈশালী ঘোষ চৌধুরী

স্বাধীন গবেষক

সারসংক্ষেপ: বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই পৃথিবীজুড়ে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধ্যানধারণা, ন্যায়নীতি ও পুরনো মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম রূপ নেয়। তিক্ত স্বার্থপরতা ও বোধের সংকটে জড়িয়ে মানুষ ক্রমশ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক জটিল নিঃসঙ্গতায় জারিত হতে থাকে। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে মানুষ ক্রমশ শুভচৈতন্যের ওপর থেকে আস্থা হারাতে থাকে। ক্রমে তারা সময় ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায় ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’, ‘আত্মপ্রকাশ’, ‘ঘুণপোকা’ প্রভৃতি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে। এরা সময়ের দংশনে ক্ষতবিক্ষত, একাকীত্বে কোণঠাসা এবং পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্পর্কে আত্মহীন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও নায়কোচিত গুণাবলী এদের মধ্যে সেভাবে নেই। হৃদয়ের অস্থির অবস্থাপনাকে আঁকড়ে ধরে তারা পুরনো মূল্যবোধগুলিকে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে চেয়েছে। হৃদয়ের গহীন গোপন কোণে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, শুদ্ধতর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা তাদের তড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু কিছুতেই তারা স্থিত হতে পারেনি। এই গবেষণাপত্রটিতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসের তেমনই কিছু সমাজবিযুক্ত চরিত্রের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাদের অস্তিত্বের গোপন আবরণটিকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: স্বাধীনতা, সমাজবিযুক্তি, বিবর, প্রজাপতি, আত্মপ্রকাশ, ঘুণপোকা, যদুবংশ।

মূল আলোচনা :

সাহিত্যের আলোচনায় সামাজিক বিযুক্তির ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। বিংশ শতকের আধুনিক জটিলতর সামাজিক জীবন, বিশ্বব্যাপী ডামাডোল, পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের করালছায়া ও মৃত্যুশ্রোত পৃথিবীজুড়েই যুবসমাজের হতাশা ও মোহভঙ্গের কারণ হয়েছিল। আপাত স্থিতিশীল ও গতে বাঁধা সামাজিক জীবনকে অস্বীকার করার প্রবণতাও এই সময় থেকেই যুবসমাজের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। সমকালীন সময় বা সমাজ থেকে বিযুক্তি বা ‘Alienation’ এর ধারণাটিকে ‘Stanford Encyclopedia of Philosophy’ অনুসারে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে- “The concept of alienation identifies a distinct kind of psychological or social ill; namely, one involving a problematic separation between a self and other that belong together.” অর্থাৎ একধরনের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা, যার দ্বারা আক্রান্ত মানুষ ক্রমে নিজেকে অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সমাজের ভালো-খারাপ, লাভ-ক্ষতির কোন হিসেবই আর তাকে সেভাবে স্পর্শ করে না। সমাজবিচ্ছিন্ন হলেও এরা কিন্তু সমাজবহির্ভূত নয়, সমাজের ভিতরেই অবস্থান করেও এরা কিছুতেই সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে স্বীকার করতে পারে না, ফলে বাকিদের থেকে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বে এরা অবস্থান করে। ‘স্ব’ এবং ‘অপর’ নামক যুগ্মধান দুইপক্ষের অবতারণা ঘটে এখানেই, আর এর ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও বিরোধ থেকে যে ক্ষয় তা ক্রমে তাকে ভিতর থেকে শূন্য ও রিক্ত

করে তোলে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে এমন কিছু সমাজবিযুক্ত চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের নিয়ে আলোচনার পূর্বে এহেন চরিত্র নির্মাণের পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী জনমত আরও তীব্র হয়ে ওঠে। যুদ্ধবিশ্বস্ত অর্থনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশের ভার আর বহন করতে রাজি ছিল না। একে একে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে তারা উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজশক্তি তার সুচারু কৌশলে তত দিনে দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশে। স্বাধীনতার শর্ত নিয়ে যখন তৎকালীন শাসক ও ভাবী শাসকের মধ্যে দর কষাকষি চলছে, দেশ তখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দুর্ভিক্ষে। এরই মধ্যে আসে দেশভাগের প্রস্তাব। ক্ষমতাধরের অঙ্গুলিহেলনে রাতারাতি বিভক্ত হল ভারত, বদলে গেল উপমহাদেশের মানচিত্র। জন্ম হল কতকগুলো তাৎক্ষণিক ও চিরস্থায়ী সমস্যার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমনই আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল যে দলে দলে মানুষ ছিন্নমূল হয়ে স্থায়ী বাসস্থান লাভের আশায় সীমানা পেরোতে লাগলেন। এদেশে তাদের নামকরণ করা হল উদ্বাস্তু। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাপনের চিত্র বদলে গেল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে। ভয়ানক উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্জাবের প্রতি যতটা সহমর্মী ছিল বাংলার প্রতি ততটা ছিল না। ওপার বাংলা (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আগত উদ্বাস্তুস্রোত চলতেই থাকে। এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যার চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হল। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬২ তে ভারত-চীন যুদ্ধ, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ক্রমে রাজ্যের পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তোলে। ১৯৬৭ সাল থেকে কমিউনিস্ট দলের সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী একটি শাখা নিজেদের পৃথক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে, এরা নকশালপন্থী নামে পরিচিত। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বৈপ্লবিক তত্ত্বে আস্থা রেখে দলে দলে তরুণ যুবকেরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। তাদের চোখে ছিল সমাজ বদলের স্বপ্ন, কিন্তু সংগঠনের দুর্বলতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দূরদর্শিতার অভাবে এই আন্দোলন ক্রমে শক্তি হারাতে থাকে। অচিরেই রাষ্ট্রীয় দমননীতি তাদের কোণঠাসা করে ফেলে। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে বহু মেধাবী তরুণ যুবক প্রাণ দেয়। কলকাতা শহর যেন এক মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে। এই হিংস্রতা, নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বাংলার সমাজজীবনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতা পরবর্তী তিন দশক বাংলার যুবসমাজের মোহভঙ্গের কাল। স্বাধীন দেশকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন ও আশাবাদের বৃদ্ধি তাদের মনে গড়ে উঠেছিল তা এই সময়ে এসে নষ্ট হয়ে গেছে। এই যুবসমাজের একটি অংশ ক্রমে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যুবসমাজের অপর অংশটিকে কেন্দ্র করে। এরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়াতে আগ্রহী ছিল না, আবার প্রথাগত নিরুপদ্রব জীবনযাপনকেও মনে প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেনি। যুবসমাজের এই অংশটি সম্পর্কে দীপেন্দু চক্রবর্তীর অভিমত-

"পঞ্চাশের দশক থেকেই কলকাতায় শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ দেশপ্রেম, বিপ্লব, পেশাগত সাফল্য ইত্যাদিতে আস্থা হারিয়ে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ভেসে চলা জীবনের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। ওরা সংঘবদ্ধ বিদ্রোহে আগ্রহী ছিলনা, এদের আগ্রহ

ছিল নিতান্তই ব্যক্তিক খেলায় মধ্যবিত্তের যত্নে লালিত respectability-র জীবনদর্শনকে আঘাত করা। শুধু কথায় নয়, জীবনযাপনেও।”^২

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের বহু দিকপাল লেখকের বিভিন্ন উপন্যাসে এই যুবসমাজের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই চরিত্রদের প্রত্যেকের মনেই দেশভাগের স্মৃতি টাটকা, উদ্বাস্তু ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মৃত্যুমিছিল এরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে কলকাতা শহরে। এই মহানগরের যান্ত্রিক, মানবিক আবেগবর্জিত আধুনিক জীবনের ছাঁচে নিজেদের ঢালাই করে নিতে গিয়ে সমাজ আদৃত মূল্যবোধের প্রতি অনাস্থা এদের মনে দৃঢ়মূল হয়েছে। হৃদয়ের অস্থির অবস্থাপনাকে আঁকড়ে ধরে তারা পুরনো মূল্যবোধগুলিকে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে চেয়েছে। সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন-

“সমাজ-সংসার-ব্যক্তি - সবক্ষেত্রেই সংকটমোচন যখন হয় দুরূহতম, তখনই তৈরী হয় এক শূন্য গহ্বর। মানুষ আত্মিক সংকটে নিমজ্জিত মুখ হয়ে পড়ে। ব্যক্তির সংকট ব্যক্তিত্বের আন্তিক্য ও নাস্তিক্য ব্যাখ্যার মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আভিজাত্য খর্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিপার্শ্ব থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে শামুক-স্বভাবে স্থির, নিরেট হয়ে যায়।”^৩

এই আন্তিকতা থেকে সরে আসা ও সমাজের অন্য উপাদানগুলির সঙ্গে অস্থিরের চেষ্টা ও ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠেছে সেই সময়ের লেখকদের হাতে রচিত একাধিক উপন্যাসে। এর মধ্যে কয়েকটি উপন্যাস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, সেগুলি ক্রমে আলোচনা করা হল।

প্রথমটি অবশ্যই সমরেশ বসু রচিত ‘বিবর’ (১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ), যা বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা ও অস্তিত্ববাদী দর্শনের এক নতুন রূপের প্রকাশে অনন্য হয়ে রয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক উশ্জ্বল জীবনযাপনে অভ্যস্ত, পরিবারের বন্ধন তার শিথিল, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের প্রতি সে বিশ্বাসহীন। স্নেহ, প্রেম, ভদ্রতা, প্রচলিত মূল্যবোধ সবকিছুর প্রতিই তার প্রবল বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসে কাহিনিবৃত্ত সে অর্থে নেই, কাহিনির শুরুতেই শয়্যাসঙ্গিনী নীতাকে সে খুন করেছে। এই একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে নায়কের জীবনিত্যে কাহিনি এগিয়ে চলে। চেতনাপ্রবাহের ধারায় একে একে উন্মোচিত হয় যুবকটির প্রাক-ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন স্তর। আশেপাশের জগত ও মানুষকে সে যেভাবে দেখে তা এতদিনের পরিচিত সাহিত্যের ঘরানায় বেশ আলাদা। নিষ্পৃহ দৃষ্টিতে একের পর এক ঘটনা সে বর্ণনা করে যায়, সেই সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে তার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু অঙ্গীল মন্তব্য প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্ত বাঙালীর বিবর-বিলাসী জীবনকে লেখক এই উপন্যাসে বিদ্রূপ করেছেন, ভীর্ণতাকে আক্রমণ করেছেন। বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ এই উপন্যাসের নায়ক ওই বিবর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়, অস্তিত্বের পূর্ণতর রূপকে লাভ করতে সে আগ্রহী। নীতা চরিত্রটি হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যবিত্ত বিবরে সাময়িক সুখের প্রতীকস্বরূপ। উপন্যাসের নায়ক মাঝেমধ্যে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে শারীরিক সুখের চরিতার্থতায়, কিন্তু মানসিক শান্তি আসেনি। নীতার একাধিক প্রেম সম্পর্কের খবরে সে হতাশ হয়েছে, আবার নীতার আকর্ষণকেও সে অস্বীকার করতে পারেনি। অতঃপর নায়ক এই আপোষের সুখকে চিরতরে নষ্ট করে বেরিয়ে এসেছে। নায়ক যতদিন নিজেকে এর মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, ততদিন তার উন্নতি কোথাও বাঁধাপ্রাপ্ত হয়নি। একসময়ে ক্লান্ত নায়ক মধ্যবিত্তের আপোষ মানসিকতাকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে এবং তার চাকরির নিশ্চয়তাকে প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হয়েছে। কোনরকম উন্নতি বা উৎকোচের বিনিময়ে সে মিথ্যে রিপোর্ট জমা করতে সম্মত হয়নি, ফলে সমাজের ওপরতলার

সুবিধাভোগী মানুষদের আঁতে ঘা লেগেছে। এ যেন বিবরবিলাসী পতঙ্গের আত্মঅর্জিত স্বাধীনতার দিকে ছুটে যাওয়া। সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

“এরই মধ্যে কোনো কোনো মানুষের মনে জেগে উঠতে থাকে স্বাধীনতা বোধ, জীবনের গতি তার কাছে মনে হতে থাকে এক শৃঙ্খলিত কারাকক্ষে দিন কাটানোর মতো, জীবন মনে হতে থাকে এক নীরঞ্জ বিবর, অস্থানীয় কুৎসিতে ভরা। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে বিচিত্র, অভাবনীয় এবং প্রায়শই বিকৃত চেহারার প্রতিবাদ। ‘বিকৃত’ কারণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবনের নিয়ন্ত্রণহীনতার পরিস্থিতিটাই তার কাছে রোগগ্রস্ত।”^৪

উপন্যাসের শেষে নায়ককে দেখা যায় নীতার ফ্ল্যাটে পুণরায় ফিরে যেতে, যেখান থেকে একদা তার বন্ধনমুক্তির শুরু। সেখানে মিশে আছে নীতার স্মৃতি, গন্ধ। ভগামি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচারের দাসত্ব ছিন্ন করে বেরিয়ে নায়ক শুনতে চায় নীতার প্রিয় গান - ‘ক্যাকটাসের বুকে রোদ পড়েছে’, মনে জেগে ওঠে কোন কালে ফেলে আসা উশ্রী জলপ্রপাতের ধ্বনি। সেখান থেকেই তার আত্মশুদ্ধির পথে যাত্রা শুরু, অথবা প্রায়শ্চিত্তের পথে।

পরবর্তী যে উপন্যাসটি উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটিও সমরেশ বসু রচিত, নাম ‘প্রজাপতি’ (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সুখেন গুপ্তার পারিবারিক ইতিহাসেও রয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা, অর্থলোলুপ পিতা ও দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক দাদাদের পারস্পরিক দলাদলি, লাম্পট্য। নীতিবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের আখের গোছাবার প্রবণতা সুখেনকে ক্রমে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। গুরুজনেরা তার সামনে কোন সুন্দর জীবনের উদাহরণ তুলে ধরতে পারেননি, সমাজ তাকে গুপ্তা হবার পথে ঠেলে দিয়েছে। একমাত্র দীর্ঘদিনের পারিবারিক ভূতা শুলাদা ছাড়া কারুর প্রতি বিন্দুমাত্র টান তার নেই। অশ্লীলতা ও নোংরামি ভরা এই সমাজ থেকে, বিভিন্ন নীতিহীন মানুষের সংস্পর্শে তার মানসিক বিকার জন্মায়। চারদিকে দুর্নীতি, মিথ্যাচার থেকে জাত একপ্রকার দিশাহীন নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা তাকে সমাজ বহির্ভূত হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। মানুষের চোখে নিজের প্রতি ভয়ের ছাপ তাই তার ঠুনকো আত্মসন্মানকে প্রীত করে, কিন্তু মনের গভীরে একটুখানি শান্তি, স্নেহ ও ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা তাকে স্থির থাকতে দেয় না। শিখার সংস্পর্শে এসে সুখেন ভালো হতে চেয়েছিল, সুস্থ জীবন বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। সমস্ত ব্যর্থতা, হতাশা সঙ্গে নিয়ে ক্লান্ত সুখেন উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। উপন্যাসের শুরুতেই সুখেনের দ্বারা একটি প্রজাপতির মৃত্যু হয়েছে। প্রজাপতি সৌন্দর্যের প্রতীক। যে সময়ে দাঁড়িয়ে এই উপন্যাসটি রচিত সেইসময়ে যাবতীয় সুস্থ চিন্তা, সৌন্দর্য ভাবনা, আশাবাদের মৃত্যু ঘটেছিল আর তা স্বচ্ছক্ষে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন যুবসমাজ। যে সুস্থ জীবন তাদের প্রাপ্য ছিল রাষ্ট্র তা দিতে অপারগ। সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার অধঃপতন দেখা এবং একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলাই ছিল এই যুবসমাজের নিয়তি। সুখেনের মৃত্যু তাই যাবতীয় আশাবাদের শেষ প্রহর ঘোষণা করেছে, নিঃসঙ্গ নিঃস্ব মানুষ মানবিকতাবোধ হারিয়েছে এবং অবেলায় নিয়তি দ্বারা নির্দিষ্ট অন্তিম ক্ষণের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

অতঃপর এই ধারার তৃতীয় উপন্যাসটি হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘আত্মপ্রকাশ’ (১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ)। এই উপন্যাস সুনীল ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠীর তৎকালীন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনা অবলম্বনে রচিত। এর নায়কের নামও সুনীল। তাদের উশৃঙ্খল জীবনযাপন, নেশাসক্তি, জুয়ার টাকা নিয়ে চিনেপাড়ার মদের দোকানে হাতাহাতি, পতিতগৃহে গিয়ে বেলেপ্লাপনা সবই এই উপন্যাসে অবিকৃতভাবে উঠে এসেছে। নায়ক সুনীলের পারিবারিক বন্ধন

শিথিল, পিতার সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তাকে সমস্ত সামাজিক বৃত্ত থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। একদা পূর্ববঙ্গে ছেলেবেলা কাটানো নায়ক একাকী, নিঃসঙ্গ হয়ে কলকাতা শহরের সঙ্গেই যেন কোন এক বোঝাপড়ায় নেমেছে। জীবন সম্পর্কে কোন সুস্থির বিশ্বাস, স্নেহ-মায়ার টান সে বোধ করে না। চাকরিক্ষেত্রে গুরুজনস্থানীয় অধঃস্তনকে ধমকে পৈশাচিক সুখ অনুভব করে। বন্ধুর বোন মনীষাকে তার ভালো লেগেছিল, কিন্তু মনীষার নিস্পৃহতা তার জীবন ও জগত সম্পর্কে বিরাগ বৃদ্ধি করে। অপরদিকে সরস্বতীর শরীরসর্বস্ব আহ্বান তাকে নারীর বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রতি আস্থাহীন করে তোলে। জলের স্রোতে ভেসে চলা শ্যাওলার মতো সে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়, কখনও সোচ্চার স্পর্ধায়, কখনও বা আপোষের মাধ্যমে। কিন্তু মনের গহীনে ভালো হতে চাওয়ার বাসনা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, পবিত্রতার খোঁজ তাকে এনে দাঁড় করায় যমুনার সামনে। বয়সে অনেক ছোট এই মেয়েটির সারল্য, মায়া ও চারিত্রিক শুভ্রতা নায়কের অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে তোলে। যমুনার একটু সান্নিধ্য লাভের জন্য, সেই পবিত্রতার সংস্পর্শে আসার জন্য নায়কের সমস্ত চেতনা উন্মুখ হয়ে থাকে। ‘আত্মপ্রকাশ’ উপন্যাস প্রসঙ্গে শমীক ঘোষ লিখেছেন-

“লোকে ভাবছে সুনীল তাঁর বন্ধুদের কথা লিখছেন। লিখছেন কৃতিবাসীদের উদ্দাম জীবনযাপনের গল্প। কিন্তু আসলে সুনীল তাঁর সমকালকে ধরে ফেলেছেন। সেই সমকাল যে ভালো হতে চায়। কিন্তু ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ সেই অর্থে তার কাছে নেই। সেই সমকাল যার অভিমান আছে। যা খুশি করে ফেলবার বাসনা আছে। অথচ সেই সমকাল যে তখন অতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারের বাইরে অন্য কোথাও জীবনের কথা শিখে ফেলতে পারেনি। যে শুধুই স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে দিয়ে সমাজকে আক্রমণ করতে চায়। স্থবিরতাকে জলাঞ্জলি দিতে চায়। বিদঘুটে মারপিট করতে চায়। কিন্তু কোথাও সে ভালোই হতে চায়। সুনীল আসলে নভেলাইজ করছেন ওই দশকটাকেই।”^৫

যুবসমাজের আদর্শহীনতা, লক্ষ্যের অভাব, নিজস্ব সুখের খোঁজে মশগুল হয়ে পারিপার্শ্বিক জগত থেকে দূরত্ব রচনা করবার প্রবণতা তৎকালীন সমাজের ক্ষেত্রে সত্য। এই যুবকদের মনের গভীরে জীবনকে শুধরে নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পারিপার্শ্বিক সমাজের চাপে তারা তা প্রকাশ করে উঠতে পারে না, কখনও বা তাদের চেতনাগত দুর্বলতার ফলে এই আত্মশুদ্ধির বাসনাকে দুর্বলতা জ্ঞান করে নিজেই তা হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং নিজেদের হাতেই মৃত্যুফাঁদ বিছিয়ে অকালেই ঝরে যায়। রচনাভঙ্গির নতুনত্ব, বাহ্যবর্জিত বিষয়নির্বাচন ও সহজ প্রকাশভঙ্গির দ্বারা এটি সমাজবিচ্ছিন্ন বোহেমিয়ান যুবসমাজের নিজস্ব আখ্যান হয়ে উঠেছে।

আরও একটি উপন্যাস এই ধারায় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘ঘুগপোকা’ (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যাম, বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত এক যুবক। বুদ্ধিমত্তা ও কর্মযোগ্যতায় অল্প বয়সেই সে চাকরিক্ষেত্রে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছিল। হঠাৎ একটি ঘটনায় তার মোহভঙ্গ ঘটে। কতৃপক্ষের একজন তাকে উদ্দেশ্য করে একদিন একটি গালি দিলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সে চেষ্টা করে কোনক্রমে তা ভুলে যেতে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হয় এবং শেষপর্যন্ত সবাইকে অবাক করে চাকরিটা সে ছেড়েও দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সে লাভ করে স্বাধীনতার স্বাদ। সেই নেশা এতটাই তাকে পেয়ে বসে যে আর কোন সংস্থায় কাজে প্রবেশ করতে তার তীব্র অনীহা জন্মায়। একইসঙ্গে রাষ্ট্রনির্ধারিত উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজনির্দেশিত ভোগসর্বস্বতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে এক স্বেচ্ছাচালিত নতুন

জীবনযাপনকে বেছে নেয়। কথায় কথায় জানা যায় পূর্ববঙ্গে তার পরিবারের কথা, তাদের প্রতিও তেমন টান সে অনুভব করে না। শিকড় ছেঁড়া বৃক্ষের ন্যায় সে বাড়বপ্লয় আহত হয় এবং নিজেকে আড়াল করার ন্যূনতম চেষ্টাটাও তার মধ্যে দেখা যায় না। প্রেম, স্নেহ, মায়ী, বাৎসল্য সহ যাবতীয় মধ্যবিন্দু আকর্ষণকে সে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। নারীর দেহসর্বস্বতা ও আদিম রিপূর আকর্ষণও এখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। মনে জেগে থাকে কেবল এক সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ, পবিত্র শুভ্রতার প্রতি আস্থা। রাস্তায় লীলাকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় শ্যাম, কিন্তু কিছুতেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। এতকাল যে শ্যাম নারীদের চিত্তহরণ করতে অদ্বিতীয় ছিল, লীলার শুচিতার সামনে পড়ে আজন্মলালিত এক কুষ্ঠা তার কষ্টরোধ করে। **‘বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ’**^৬ গ্রন্থে উর্মি রায়চৌধুরী নিঃসঙ্গ শ্যামের সমাজ ও সময় থেকে বিচ্ছিন্নতা বোঝাতে ইংরেজ সাহিত্যিক টমাস মানের ‘টোনিও ক্রোগার’ গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে টোনিওর বিভক্ততা-বোধ বোঝাতে লেখক সুনিপুণভাবে একটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন। একটি হলঘরে নাচের দৃশ্য টোনিওর চিন্তায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে আর বিষম টোনিও কাঁচের দরজার বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে, কিন্তু কিছুতেই সে ভিতরে ঢুকে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে না। একইভাবে শ্যাম ‘ঘুণপোকা’-তে একটা কাঁচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রিসেপশনিস্ট লীলাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু কিছুতেই দ্বিধা কাটিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে পারে না। সমাজবিচ্ছিন্ন শ্যামের অস্তিত্বের সংকট যেন তাকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশ্ব ইতিহাসের তাবড় সব ঔপন্যাসিকের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের সঙ্গে একই সারিতে ফেলে দেয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যাবতীয় বিশ্বাস, আস্থা, আশাবাদকে অদেখা এক ঘুণপোকা একটু করে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, বাইরে কেবল আন্তরণটা পড়ে আছে, তাতে শাঁস নেই, জীবনীশক্তি নেই।

সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন যুবসমাজ সম্পর্কে লিখেছেন-

“দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যারা যুবক হয়েছে, দেশবিভাগের পরে যারা কৈশোর ডিঙিয়েছে, স্বাধীনতার পরে যারা জন্মেছে, তারা কেউই পূর্বতন বাংলা উপন্যাসের নায়কচরিত্র অধিগত করতে পারে না। স্বপ্ন রচনা করার ক্ষমতা তাদের নেই, স্বপ্ন উপভোগ করার সময় তাদের নেই। তারা জন্মেছে ভাঙা স্বপ্নের হাটে, তাদের চারপাশে বহু ভগ্নমূর্তির জঞ্জাল।”^৭

উপরোক্ত প্রতিটি উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থিত চরিত্ররা প্রত্যেকেই এই ভগ্ন কালপর্বের ফসল। তাদের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ, আত্মহীনতা, নৈতিকতার বোধহীন এক ফাঁপা জীবনকে তারা বয়ে নিয়ে চলতে বাধ্য হয়। তা থেকে উত্তরণের সাধ থাকলেও সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে এক অন্ধকার চক্রবৃত্তে ঘুরে ঘুরে অবধারিত মৃত্যুর আগমনে দিন গোনা ছাড়া তাদের আর করণীয় কিছুই থাকে না। এই একই পথে হেঁটে গেছে বিমল করের ‘যদুবংশ’ (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসের সূর্য-অভয়-বুললি-কৃপাময়রা। সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে আঘাত করতে এরা তৎপর, সবকিছু ভেঙেচুড়ে তছনছ করে ফেলতেই এদের আনন্দ। নতুন কিছু গড়তে এরা উৎসাহী নয়, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা থাকলেও তা অর্জন করতে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে তারা রাজি নয়। এই উপন্যাসের নামকরণ তাই প্রতীকি হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠেছিল তাদের নিজেদের ভিতরকার দ্বন্দ্ব, যা সেই শক্তিশালী রাজবংশের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। এই যুবকদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার দ্বারা একে অন্যকে বা পক্ষান্তরে নিজেদের ক্ষতিবিক্ষত করার মধ্যে দিয়ে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে যুবসমাজকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদের বিষয়বৈচিত্র্য নানাপ্রকার হলেও কিছু সাদৃশ্য এই চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ‘কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭’^১ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে এই জাতীয় উপন্যাসগুলিতে আত্মসমীক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে এবং চরিত্রগুলির মধ্যে স্বীকারোক্তি ও অশ্বেষণের দ্বারা গভীরতর সত্য উপলব্ধিতে পৌঁছাবার এক চেষ্টা অনুভব করা যায়। পাপবোধ, শাস্তি ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির এই ধারাটিকে প্রথম সাহিত্যে এনেছিলেন রুশ উপন্যাসিক দস্তয়েভস্কি, তাঁর ‘Crime and Punishment’ (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসে। অন্যদিকে জীবনসত্যের অশ্বেষণ বা ডিটেকশ্যনের ধারাটি মূলত সাহিত্যে এনেছিলেন আলবেরার কামু, তাঁর ‘The Outsider’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। বস্তুত পঞ্চাশের দশকের পরবর্তী লেখকদের হাতে এই দুটি ধারাই সমান প্রাধান্য পেয়েছে। আসলে এই পর্যায়ে লেখকেরা বহির্মুখীনতা ত্যাগ করে ক্রমে অন্তর্মুখীন হতে চেয়েছেন। তাঁদের রচনায় আত্মজৈবনিক উপাদানের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী তির্যকভাবে উঠে এসেছে। এছাড়াও ফরাসী উপন্যাসের নতুন আন্দোলন বা ‘Nouveau Roman’ এর মধ্যে উপন্যাসের নায়কের যে সব সাধারণ মানসিক গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন রব গ্রীয়ে তাঁর আলোচনাগ্রন্থে (‘Pour Un Nouveau Roman’, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) তার সঙ্গেও এই জাতীয় উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের বেশ মিল খুঁজে পেয়েছেন সমালোচক, যেমন-

১। নায়কের নির্দিষ্ট নামের বাধ্যবাধকতা নেই, থাকলেও হয় বা না থাকলেও হয়। নাম বদলে দিলেও তেমন কোন সমস্যা নেই। মূলত সর্বনামের দ্বারা তাদের ডাকা হয়।

২। এইসব চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন গতি রয়েছে, তারা কখনও স্বেচ্ছায় বা কখনও আত্ম বিস্মৃত হয়ে একই বৃত্তে ঘুরে মরছে।

৩। এই উপন্যাসের চলন অনেকটা রহস্য উপন্যাসের মতো, কারণ তাদের বিশ্বাস এর মাধ্যমেই আত্মোপলব্ধি সম্ভব।

৪। এই লেখাগুলি নায়কের মতো পাঠককেও একটি অদৃশ্য আয়নার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়।

বস্তুত, এইসকল বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রত্যেকটাই এই সময়ের উপন্যাসের যুবসমাজের মধ্যে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই যুবসমাজ আপাতভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার দায় অনেক চেষ্টা করেও এড়িয়ে যেতে পারেনি, নিজেও হয়ে ওঠে ওই ভেজাল যুগের অংশীদার। চতুর্দিকে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির শব্দাত্মক এই যুবসমাজ প্রত্যক্ষ করেছে, আত্মশুদ্ধি ও প্রেমের পবিত্র রূপের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে মরেছে। ক্রমে সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন একাকী হতে চেয়েছে, কিন্তু পরে ওঠেনি। এরা সরাসরি সমাজবিপ্লবের লেলিহান শিখায় আত্মবিসর্জন দিতে পারেনি, আবার সেই আগুনের তাপ থেকে বাঁচতেও পারেনি। ফলে সমাজবিযুক্ত হয়েছে তারা হয়ে উঠেছে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তারা এই সত্যকে উচ্চারণ করেছে এবং জীবন দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করেছে।

তথ্যসূত্র:

১। সূত্র - <https://plato.stanford.edu/entries/alienation/>

২। চক্রবর্তী, দীপেন্দ্র। ১৯৯৮। “সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মবিকাশ”। ‘পঞ্চাশের দশকের কথাকার’ (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত)। কলকাতা : পুস্তকবিপণি। পৃষ্ঠা: ১৬৭।

- ৩। দত্ত, বীরেন্দ্র। ১৯৯৮। ‘বাংলা কথাসাহিত্যের একাল (১৯৪৫-১৯৯৮)’। কলকাতা : পুস্তকবিপণি। পৃ : ৩৭৫।
- ৪। চক্রবর্তী, সুমিতা। জানুয়ারি ২০০৩। “বিবরের আলো”। ‘উপন্যাসের বর্ণমালা’ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। কলকাতা : পুস্তকবিপণি, পৃ : ১০৮।
- ৫। রায়চৌধুরী, উর্মি। ২০০১। ‘বাংলা উপন্যাসে যুবসমাজ’। কলকাতা : পুস্তকবিপণি। পৃ : ২৫৪।
- ৬। ঘোষ, শমীক। “ম্যাজিকওয়ালা”। কৃতিবাস, জুলাই- সেপ্টেম্বর(২০১৭) : ১৬৬।
- ৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। “সময়ের দাগ ও বিদীর্ণ দর্পণ”। ‘দেশ’। ৪ এপ্রিল ১৯৮৭। পৃ : ৬৫।
- ৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। নভেম্বর ২০২২। ‘কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পাঁচাত্তর বছর : ১৯২৩ - ১৯৯৭’ (ষষ্ঠ সংস্করণ)। কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং। পৃ : ২৬০।

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস, সাম্যবাদী ভাবাদর্শ ও মুক্তির লড়াই

সঙ্গীতা পাঁজা

গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: সাবিত্রী রায় চল্লিশের দশকের একজন ঔপন্যাসিক। বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসাবে। কবিতা দিয়ে তিনি সাহিত্য জীবন শুরু করেন। ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসের জগতে নিজস্ব একটা জায়গা গড়ে তুলেছেন। চার দশক মিলিয়ে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা মোট নয়টি। একজন রাজনৈতিক কথাকার হলেও ঘরে-বাইরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যক্তি ও ব্যক্তির অবস্থানরূপী গ্রাম ও নগরজীবনের প্রসঙ্গ এনেছেন। লেখিকা উপন্যাসের কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে ভিত খুঁড়েছেন বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ব্রিটিশ রাজ শক্তির অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে চলে দেশবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনে কংগ্রেসি কার্যকলাপ সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে শোষণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফল স্বরূপ দেশভাগ সদ্য বিভাজিত দেশবাসীর কাছে প্রীতিকর হয় না, তা যে শুধু মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েছিল তা বোঝা যায়। আমরা দেখব কংগ্রেসি আন্দোলন স্বাধীনতা নিয়ে এলেও সেই স্বাধীনতার সুখ সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায় না। স্বাধীনতা এলেও পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পায় না সাধারণ মানুষ। শোষণের অভিমুখ বদলে যায় কেবল শ্রমজীবী শ্রেণির দিকে। তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসে নবউত্থিত বাম রাজনীতির কমিউনিস্টপন্থী সাম্যবাদী ভাবাদর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ। স্বাধীনতার পূর্বে দেখা যায় বিদেশি রাজশক্তির রক্তচক্ষু, আর পরবর্তীতে দেখতে পাবো দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ভয়াল রূপ। ফলত মুক্তির জন্য মানুষের সংগ্রাম নিরন্তর চলতেই থাকে।

সূচক শব্দ: স্বাধীনতা, আন্দোলন, মতাদর্শ, লড়াই, মুক্তি।

মূল আলোচনা:

সময় ও সমাজকে কোন লেখক উপেক্ষা করতে পারেন না, তাই সাহিত্য হয়ে যায় সমসময় ও যুগসৃষ্ট ফসল। চল্লিশের কথাসাহিত্যিক সাবিত্রী রায়ের রচনাও সময় ও সমাজের সত্য দৃশ্যাবলী গ্রহণ করেছে। পাঁচের দশক থেকে আটের দশক পর্যন্ত মোটামুটি চার দশক মিলিয়ে সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস পাওয়া যায় প্রায় নয়টি। তাঁর উপন্যাস রচনার সময়কাল ধরা হয় ১৯৪৫ থেকে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ। উপন্যাসগুলোতে লেখিকার মন-মানসিকতার প্রতিফলনে ও এক বিস্তৃত সময়পর্বের পটভূমিকায় যুগ-মানসিকতার ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। তাঁর রচনায় নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক রাজনীতির বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিস্বরূপ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাংলার রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের চেহারার অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

লেখিকা সাবিত্রী রায় উপন্যাসের আখ্যানভাগের বীজ বুনেছেন বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়পর্ব থেকে। বিশ শতকের প্রথম দিকের ইতিহাস রাজনীতিতে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস কার্যকলাপ লক্ষ করা যায়। ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে তারা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ক্রমশ কংগ্রেসি কার্যধারা প্রধানত নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামক দুটি মতাদর্শ অনুযায়ী চলতে থাকে। তবে গান্ধীজীর যোগদানে ও কার্য-পরিকল্পনায় কংগ্রেস দুই দলভুক্ত হয়ে গেলে, গান্ধীজীর নরমপন্থী অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন নীতিতে চলতে থাকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। পাশাপাশি স্বাধীনতার নিরিখে সংগ্রামী মনোভাব বজায় রাখে চরমপন্থী আন্দোলন। অন্যদিকে এই সময়পর্বে ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল সন্তাসবাদী কার্যকলাপ, যা মুষ্টিমেয় কিছু জায়গায় যেমন বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান জুড়ে সীমাবদ্ধ ছিল, বিশেষভাবে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। যার সঙ্গে বাংলার বৃহত্তর জনসাধারণের কোনো যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। প্রাথমিক বয়সের যুবকরাই দিশাহীন হয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসগুলিতেও দেখা যায় বিশ্বজিৎ ('সৃজন'), সুকল্যাণ ('ত্রিশ্রোতা'), কৃপান ('মেঘনা পদ্মা') প্রমুখেরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য গোপনীয়ভাবে বৈপ্লবিক মনোভাবে সংগ্রাম চালানোর জন্য এই সন্তাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করে জেলে যায়। কিন্তু সমগ্র দেশে বিপ্লবীদের কোন প্রকৃত ঐতিহ্যও আদর্শের ভিত ছিল না। একসময়পর্বে দাঁড়িয়ে তারা বোঝে যে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে সন্তাস বা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। তখন তারা এপথ ত্যাগ করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে গণ আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। কিন্তু সন্তাসী নেতাদের আত্মোৎসর্গের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা সমসাময়িক ও পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা জোগায় এবং ভারতের ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণিকে তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে। আবার বিদেশি শক্তির সহায়তায় যে দেশের স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া যায় তাও এই আন্দোলন দেখিয়ে দেয়। যে পথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন ও সেকার্যে অগ্রসর হন।

সন্তাসবাদী কার্যকলাপ দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তাদের আদর্শ মরে যায়নি। তারা প্রমাণ করে যে ভারতবাসী মোটেই দুর্বল নয়। ব্রিটিশশক্তি ভারতীয় শক্তিকে ভীরা ও দুর্বল ভাবলে সন্তাসবাদীরা তাভ্রান্ত প্রমাণ করে দেয়। এমন তেজ ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি সমিতির কার্যকলাপ। আমরা দেখব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও রাজনীতির দলীয় পর্যায়ে কংগ্রেসি কার্যধারার প্রভাব রয়েছে বিস্তৃত সময়ের পরিসর জুড়ে। এই দলীয় স্তরে প্রাচীন ও নবীন বা নবাগত আদর্শকে ঘিরে নানা সংঘাত হতে থাকে। 'সৃজন' উপন্যাসে বিশ্বজিৎের বন্দী জীবনের প্রসঙ্গে একই দলপর্যায়ে পুরাতন ও নতুনের দলগত আদর্শের প্রতি নানা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয় দেখা যায়। পুরাতন ঐতিহ্যকে মানবে নাকি তাকে অস্বীকার করে নতুন আদর্শে বাঁচবে। জেল জীবনের প্রায় ছয় বছরে বিশ্বজিৎ লক্ষ্য করে সেখানে নতুন-পুরাতন এর মতভেদ তৈরি হয় কর্মীদের মধ্যে।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্বকার কংগ্রেস কর্মী আর জেল ফেরত বহু কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত মিল থাকেনা। অর্থাৎ যারা কংগ্রেসি করে কারাবরণ করে, তারা ফিরে এসে আর সেখানে যোগদান করে না। আমরা লক্ষ্য করি প্রায় তিরিশের দশক থেকেই আন্তর্জাতিক বিশ্ব রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে সাম্যবাদের নবধারা, যা এদেশীয় কমিউনিস্টদের মানসিকতায় প্রভাব ফেলে। সেসময়ে পৃথিবী ব্যাপী বুর্জোয়া পুঁজিবাদী শোষকশ্রেণির তরফ থেকে

চলতে থাকে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন, যার প্রতিক্রিয়া পড়েছিল সমকালীন ভারতীয় কমিউনিস্টদের ওপরে। আন্তর্জাতিক বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে দেখা যায় চীনের চিয়াংকাইশেক সরকার প্রায় তিনশো কমিউনিস্ট ছাত্র-ছাত্রীদের গুলিতে হত্যা করে।

জার্মানিতে সোসাল ডিমোক্র্যাটদেরও ব্যবহার অনুরূপ। ইংল্যান্ড ও ভারতের ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রজাতন্ত্র আইন সমর্থন করে না। এখানে কমিউনিস্টদের দমন নীতিমূলক মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে কংগ্রেসি আন্দোলন সোচ্চার হয় না। তাই জেল ফেরত বন্দিরা আর পুনরায় কংগ্রেসে ফিরে যায় না। উক্ত দলীয় পার্টি জাতীয় আন্দোলন থেকে ক্রমশ তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধীরে ধীরে তারা সমাজের বিশেষত নিম্নস্তরের প্রান্তিক-শোষণ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। তারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যায়, যেখানে তাদের লক্ষ্য ছিল শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করার। যেখানে থাকবে না কোনোরূপ শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন। তাদের সাম্যবাদের লড়াইয়ে প্রেরণাস্বরূপ আন্তর্জাতিক বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে লক্ষ্যণীয় হয় আমেরিকার ফরাসি বিপ্লব, রোমের স্পারটাকাস বিদ্রোহ, ইংল্যান্ড, জার্মানির চাষি ও রিপাবলিকান বিপ্লব, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রভৃতি।

ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন পেরিয়ে আমরা পাচ্ছি ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাকে ঘিরে নানান সমস্যার ছবি লক্ষ্যণীয় হয়, ভারতে চাষিদের জমি দখল, কালোবাজারির কারণে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকট, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও ছিন্নমূলের জীবন যন্ত্রণা, জমিদারি শোষণ ও তার পাশবিক অত্যাচার, প্রভৃতি। যুদ্ধের কালে রেলকোম্পানি চাষিদের কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তাদের জমি কেড়ে নিতে থাকে। খাদ্য সমস্যায় বা জৈবিক ক্ষুধার জ্বালায় তারা ধান বা শস্য বেচতে বাধ্য হয়, মহাজনরূপী কালোবাজারিদের কাছে। এই মর্মদায়ী ছবি ‘সৃজন’, ‘পাকাধানের গান’ প্রভৃতি উপন্যাসে দেখা যায়। ‘সৃজন’ উপন্যাসের সাম্যবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী বিশ্বজিতির চাষি ভাইদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে জোরদার করার মনোভাব ভাষায় ধরা পড়ে এভাবে-

“...বাঁচব, আবার আমরা বেঁচে উঠবো। বাংলার চাষী মরতে পারে না।”

‘পাকাধানের গান’ উপন্যাসেও অনুরূপ শোষণ ও প্রতিবাদের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে যখন কংগ্রেসি কর্মীরা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায়, তখন বামপন্থী কমিউনিস্টরা যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর শিকারগ্ৰস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ায় ও দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। সাম্যবাদীরা শোষিত নিপীড়িত সমাজের সহায়তা করে তাদের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। পাশাপাশি স্বদেশি কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতায় মাউন্টব্যাটেনি স্বাধীনতা বরণ ও দেশভাগ কমিউনিস্টদের মনঃপুত ছিল না। এখানে উভয় ভাবধারায় দ্বন্দ্ব তৈরি হতে থাকে। ‘ত্রিশ্রোতা’ উপন্যাসে দেখা যায় স্বাধীনতার আনন্দকে ছাপিয়ে যায় দেশভাগ পীড়িত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জীবনযন্ত্রণাময় হাহাকারের ছবি। অন্যদিকে বাংলার জনজীবনে ঘটে চলে ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রধানত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই দাঙ্গা পাকিস্তানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও এ দেশভাগে কংগ্রেস খুশি হয়। তাই ‘ত্রিশ্রোতা’ উপন্যাসে নগেন্দ্রশেখরের ভাবনায় লেখিকা বলেছেন এভাবে-

“ভারতবর্ষ শিবাজী, নানক, টিপু সুলতান, লালা লাজপতের ভারতবর্ষ আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানে ভাগ হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার উৎসব করিতে

বলা হইয়াছে কংগ্রেস হইতে ঘরে ঘরে। কিন্তু উৎসবের সে সাড়া জাগে কই মনে”।

হিন্দু মুসলিম দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সমকালীন শ্রমিক আন্দোলনগুলি, তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। সামাজিকভাবে চলতে থাকে সাম্প্রদায়িক ধর্মাস্তকরণ। হিন্দুদের সম্পত্তি মুসলিমরা কিনে নেয় সস্তা দরে। এভাবে তারা ‘বাবু’ হয়ে ওঠে।

“এতকাল হিন্দুরা রাজত্ব করছে, দোকানপাট ব্যবসা-বাণিজ্য সবই ছিল হিন্দুদের হাতে। এইবার তাহাদের দিন আসিতেছে। বাবু হইয়া উঠিবার রঙিন স্বপ্ন কৃষক-প্রধানের চোখে।”

কিন্তু একসময় তারা বোঝে যে তাদের শত্রু হিন্দুরা নয়, আসলে হিন্দু মুসলিম যে কোন সমাজ শোষিত হতে থাকে পুঁজিবাদী ধনতন্ত্রের শোষণে, সেখানে হিন্দু মুসলিম বলে কিছু নেই। তাই ইউনুসের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এমন -

“শত্রু আমাগো হিন্দুরা না, শত্রু বড়লোকেরা। না হইলে এখন তো হিন্দুগো খেদানো হইছে, তাও ক্যান এই দশা আমাগো।”

অর্থাৎ একথাই স্পষ্ট হয় যে স্বাধীনতার পূর্বে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষু আর পরবর্তীতে দেখা যায় দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতা, যা ‘ত্রিশ্রোতা’ উপন্যাসে বিশ্বরূপের ভাবনায় বুঝতে পারি। তাই সে বলেছে -

“...এতদিন স্ট্রাইক হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি। এখন স্ট্রাইক হচ্ছে দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।”

সাম্যবাদীরা দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। তেলেঙ্গানায় শ্রমজীবী চাষী ভাইদের পাশে দাঁড়ায় ন্যায্য অধিকারের দাবিতে। যা ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসে আরো ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছে। এখানে শ্রমজীবী কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করতে পূর্ববর্তী তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের ছবি উঠে আসে। সাম্যবাদের বিকাশ ধারায় দেখা যায় গান্ধীজীর আরদ্ধ অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তার সফলতা মেলে একমাত্র সাম্যবাদের পথে, যেখানে সত্যের সন্ধান কমিউনিস্টরা পেয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তাই ধীরে ধীরে সরে আসে গান্ধীবাদ থেকে সাম্যবাদের পথে। আবার গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে তাঁর নাম নিয়ে কংগ্রেসি লোকজন স্বৈরাচারী শাসন চালায়। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করে কায়মি স্বার্থ বজায় রাখতে চায় স্বার্থান্বেষীরা। তাই সুমিত্রার ভাবনায় লেখিকা বলেন-

“কিন্তু একমাত্র গান্ধির নামের সুযোগ নিয়েই তো সক্ষম হয়েছে এরা এত বড়ো স্বৈরাচার চালাতে। এই তেরঙ্গা পতাকার আড়ালেই তো। এই খন্দরের মোহ দিয়ে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করেছে স্বার্থান্বেষীরা। খন্দরের ভন্ডামি।”

এরা নানা দিকে ফ্যাসিস্টরূপে অত্যাচার চালায় ছাত্রদের উপর, কারখানায় শ্রমিক বিরোধী দমনপীড়ন, দেশ সেবায় ভন্ডামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে সাম্যবাদী কমরেড গোষ্ঠী, যাদের লক্ষ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানো। তাই সুদিনের আশায় ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসে পৃথ্বী শ্লোগান তৈরি করে এভাবে - “ফ্যাসিস্ট সরকারকে খতম করো।”

যে সমাজ বিপ্লববাদের পথে মিলতে পারে বাস্তবহারাদের সমস্যা ভুক্ত সর্বহারাদের সমস্যার সমাধান। আর এই সর্বহারাদের অবস্থান সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন মাতঙ্গীর মুখে-

“শাসকের হাতে লাঞ্চিত শোষিতের এ আত্ননাদ বয়ে চলেছে পৃথিবীর বুকে প্রাচীন যুগ হতে। যুগ যুগ ধরে ধনিত হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী নিরস্ত্রের এ ক্ষুধিত চিৎকার। তবু আশা রাখে পৃথিবীর মানুষ; এ অত্যাচারের শেষ আসবেই একদিন।”

এই উদ্দেশ্যেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শঙ্খধ্বনি উচ্চারিত হয় ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসে এভাবে ভাষা দিয়ে-

“দুনিয়াকে মজদুর এক হো। মেহনতিজনতা এক হো।”

‘স্বরলিপি’ পেরিয়ে ‘পাকাধানের গান’ উপন্যাসে দেখতে পাবো উক্ত মেহনতি শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণির প্রকৃত অবস্থা যার প্রেক্ষাপটে পাই বিশ্ব রাজনীতির শোষণের গল্প। ঔপনিবেশিকতার আমল পেরিয়ে উত্তর ঔপনিবেশিকতায় রচিত এই উপন্যাসে বিশেষত দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণের কাহিনি স্পষ্ট হয় দেশীয় শস্যস্বরূপ ‘ধান’কে কেন্দ্র করে। যা পার্থর ভাবনায় ভাষারূপে ধরা পড়েছে -

“এবছরে সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। কর বৃদ্ধি, বেগার প্রথা, বেআইনি আদায়, জমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি বহুমুখী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা আজ সংগ্রাম চালাচ্ছেন।...নিষ্ঠুর সামন্ততন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসেবেই প্রাণপণ লড়াই করতে হবে কৃষকদের।”

তৎকালীন ময়মনসিংহ ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের হাজং সম্প্রদায়ের কৃষক বিদ্রোহের রূপ প্রত্যক্ষ হয়। মার্কসবাদী আদর্শে সাম্যবাদী কমিউনিস্টরাও বৃহত্তর কৃষক শ্রেণিকে সমর্থন জানিয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। এরই মাঝে পাই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রমজীবী বিপ্লব যেমন ইংল্যান্ড ও জার্মানির চাষী বিপ্লব প্রভৃতি। তবে এই বিপ্লবের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকাও লক্ষণীয় হয়। ‘পাকাধানের গান’ উপন্যাসে দেখা যায় পার্থ সারথিদের সঙ্গে সরস্বতী, ভদ্রা প্রমুখেরা যোগ দেয় দেশীয় উপনিবেশিক শোষণ থেকে ন্যায়্য অধিকারের দাবিতে ও মুক্তির লক্ষ্যে।

উপন্যাসে উপনিবেশ ও উত্তর উপনিবেশ পর্বে মুক্তির লড়াই ও সাম্যবাদী ভাবাদর্শকে যেন একসূত্রে গাথা রয়েছে। কংগ্রেসের গান্ধিবাদ থেকে সরে এসে সাম্যবাদ শ্রেণীহীন-সাম্যের কথা বলে, যেখানে থাকবে না বর্ণবর্জিতের কোন প্রকার শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন। স্বাধীন সরকার পূর্ববর্তী ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে পুনরায় কাজে লাগাতে চেয়েছে কৃষক বিদ্রোহ দমনে ও সাম্যবাদী আদর্শকে ভঙ্গুর করে দিতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। যতদিন শোষণ সমাজ থাকবে ততদিন শোষিত শ্রেণির ভাষা বিদ্রোহের রূপ নিতে থাকবে। সাম্যবাদের জন্ম, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা গান্ধীজীর কংগ্রেসি কার্যকলাপকে অস্বীকার করে হতে থাকলেও তা সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথাই বলে।

সময়ের জল তরঙ্গে বয়ে চলে সাহিত্যের খাতে, সাহিত্যকে তাই বলা যায় সময়ের অভিজ্ঞান স্বরূপ। আমরা দেখব লেখিকা সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস-সাহিত্যেও সমসময় সমাজ ও স্বদেশের বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত লক্ষণীয় হয়। লেখিক তাঁর রচনার বিষয়বস্তুতে ও চরিত্রদের জীবন গল্পের সঙ্গে জুড়ে দেন সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিকতার বহুবিধ প্রসঙ্গকে। সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে রয়েছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী নানা কংগ্রেসি আন্দোলন ও গান্ধীজী পরিচালিত আইন অমান্য, অসহযোগ, ভারতছাড়ো প্রভৃতি, এছাড়া রয়েছে গুপ্ত

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বিদেশি শক্তির সাহায্যে নেতাজির ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আর্থসামাজিক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সমাজ সমস্যা ধরা পড়ে- অন্ন তথা খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কালোবাজারি প্রভৃতি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে দেশীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাজন, জমিদার, ধনিকতন্ত্রের শোষণে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক সমাজ ন্যায় অধিকারের দাবিতে মুক্তির লড়াইয়ে নামে, যাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সাম্যবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বামপন্থী কমিউনিস্ট ব্যক্তিবর্গ। যাদের লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিয়ে শ্রেণিবিভেদহীন নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ।

স্বাধীনতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি মানুষের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দেয়। লেখিকার ‘ত্রিশ্রোতা’, ‘স্বরলিপি’, ‘মেঘনাপদ্মা’ প্রভৃতি উপন্যাসে দেশভাগ ও দাঙ্গা পীড়িত জীবন যন্ত্রণার ছবি পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শক্তি তাদের স্বার্থ কায়মে রাখতে যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ব্যবহার করে তেমনি দেশীয় স্বৈরাচারী শাসকবর্গ তাদের স্বার্থে শ্রমিক বিদ্রোহ মূলক আন্দোলন দমন করতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কাজে লাগায়। এর মাধ্যমে তারা কমিউনিস্টদের সাম্যবাদী চিন্তাধারাকে সমূলে উৎখাত করতে চায়, সরকার কর্তৃক তাদের পার্টি বেআইনি বলে ঘোষিত করে দেয়।

সমাজের সকল স্তরের মানুষ উক্ত এসব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় শোষিত শ্রমজীবী সমাজ অধিক ভুক্তভোগী হয়েছিল। দেশি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের পীড়নে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। তবে রাজনৈতিকভাবে তারা বামপন্থী দলের কমরেড ব্যক্তিবর্গের সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছিল ফলে তারা বুঝিয়ে দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পরিমাণ যতই তীব্র হোক না কেন, সেইসঙ্গে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের ভাষাও তেমনি শক্তিশালী ও ধারালো হয়ে উঠবে।

লেখিকা সাবিত্রী রায় তাঁর জীবন সত্যের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যের সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন তাঁর রচনায়। তাঁর রচনায় বিশ্ব রাজনীতি, কলকাতা মহানগরীর ছবি যেমন উদ্ভাসিত তেমনি ভারতবর্ষ তথা বাংলার গ্রাম ও সমাজ জীবনের পরিচয় নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। একজন রাজনৈতিক ঔপন্যাসিক হিসাবে বাহ্যজগতের রাজনীতির খবরাখবর পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরমহলবর্তী আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা রাজনীতির চিত্রও এঁকেছেন নিপুণ শিল্পীর মত। সর্বশেষে বলা যায় তৎকালীন সময়, সমাজ ও স্বদেশের সত্যকে ধারণ করে তাঁর উপন্যাস সাহিত্য হয়ে ওঠে সমকালীন বঙ্গসমাজের দলিল স্বরূপ।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সাবিত্রী. “সৃজন”. *সাবিত্রী রায় রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড)*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা. ১৬৩।
২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৮৩।
৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৮৮।
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯০।
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯৭।

৬. রায়, সাবিদ্রী. “পাকাধানের গান”. *সাবিদ্রী রায় রচনাসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা. ৩৫৫।
৭. রায়, সাবিদ্রী. “মেঘনা-পদ্মা”. *সাবিদ্রী রায় রচনাসমগ্র (তৃতীয় খণ্ড)*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ২০১০, পৃষ্ঠা. ৯২।
৮. রায়, সাবিদ্রী. *সাবিদ্রী রায় রচনা সংকলন*. গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ৮।
৯. রায়, সাবিদ্রী. *সাবিদ্রী রায় রচনা সংকলন*. গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ১৪।
১০. রায়, সাবিদ্রী. ‘ব্যক্তিমানুষ সাবিদ্রী রায়’. *সাবিদ্রী রায় রচনা সংকলন*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা. ১৬।

একশো দিনের কাজে নিয়োজিত সাগরদ্বীপের মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ

সৈকত জানা

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
মেটিয়াক্রজ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত সুন্দরবনের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হল সাগর দ্বীপ। সারা ভারত বর্ষ ব্যাপি যেমন ১০০ দিনের প্রকল্প চালু আছে তেমনি সাগর দীপও ব্যতিক্রম নয়। এখানকার মানুষরা শিক্ষার পাশাপাশি কর্ম ক্ষেত্রেও সমানভাবে মনোনিবেশ করেন। তাই একশো দিনের প্রকল্পে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারও সমান অংশগ্রহণ করেছে। সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী যখন ৪০ শতাংশ মহিলাদের অংশগ্রহণ ঘটেছে, তেমনি সাগরদ্বীপেও সমানভাবে ৪০ শতাংশ অংশগ্রহণ ঘটেছে মূলত এই একশো দিনের কাজের মাধ্যমে। মূলত ২০০৫ সালে ২৫-শে আগস্ট তৎকালীন ইউ পি এ ওয়ান সরকার থাকাকালীন ‘MGNREGA’ প্রকল্প চালু করেন। মূলত এই আইনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, প্রত্যেক আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় মিনিস্ট্রি অফ রুলার ডেভেলপমেন্ট (MRD) -এর তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিককে একশো দিনের কাজ প্রদান করবে। যেখানে বলা হয় যে, মহিলাদের মোট কাজের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩.৩ শতাংশ অংশগ্রহণ থাকবে। সাগরদ্বীপের অন্যতম গ্রাম পঞ্চায়েত রুদ্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তথ্য অনুযায়ী এখানে ৪০ শতাংশ অংশ গ্রহণের পাশাপাশি মহিলারা রাস্তার দুপাশে আগাছা পরিষ্কার, বাঁধ নির্মাণ, পুকুর কাটা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, গাছ লাগানো প্রকৃতি কাজে নিয়োজিত হয়ে আছেন। শুধু তাই নয় অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহিলারা আর্থিক দিক থেকে নিজস্ব সাবলম্বী, সামাজিক দিক থেকে হিন্দু মুসলমান, জাতপাত বিভেদ বিসর্জন, এমনকি ভাষা ও খাদ্যের মাধ্যমে সংমিশ্রনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই ১০০ দিনের প্রকল্প পরবর্তীকালে আরো যত বেশি বৃদ্ধি পাবে ততই সাগরদ্বীপের মহিলারা আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় শালী হবে।

সূচক শব্দ: একশো দিনের কাজ, মাতৃতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক, MGNREGA, সুন্দরবন, সাগরদ্বীপ, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, লোপা জাতি।

মূল আলোচনা:

একশো দিনের কাজ বিশেষত সাগরদ্বীপের মহিলাদের নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। তারই বিভিন্ন ইতিহাস, তারই বিভিন্ন আলোচনা বিষয়গুলো সাধারণ ভাষায় আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যক্ত করা যাক। ভারত বর্ষ আজ আটাত্তর তম স্বাধীনতা লাভ করলেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো আমরা বিশেষ করে মাতৃ সমাজের অবহেলা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনুসারে মান্যতা দিয়ে আসছে। যেখানে মাতৃসমাজকে পারিবারিক ক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে সেখানে একশো দিনের কাজের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক নতুন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পরিচয় পাচ্ছি। তবে এই একশো দিনের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াটা আলোচনার

বিষয়বস্তু হলেও সেখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো কি এবং সেখানে মহিলা সমাজকে কিভাবে, কি নজরে দেখা হয় সেটা অবশ্যই জানা প্রয়োজন।

নারীবাদ আধুনিক যুগে পুরুষের তুলনায় সর্বোচ্চ নারীর সমতা ও স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করেন। নারীবাদ সমাজে নারীর সমতা অর্জন, বিশেষ করে পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। নারীবাদ মনে করেন নারী, পুরুষের তুলনায় একদিকে সক্ষম অন্যদিকে সামাজিক অবদানের দিক দিয়ে পুরুষ অপেক্ষা বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিকতার ইংরেজি অর্থ কি? এর নানান ধরনের বাংলা করা হয়ে থাকে, তাই পিতৃতন্ত্র, পুরুষবাদ বা পুরুষতন্ত্র। আমরা আমাদের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য সব শব্দগুলোই বিভিন্ন সময় ব্যবহার করে থাকি। নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় patriarchy বা পুরুষবাদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। নারীবাদীদের দৃষ্টিতে ব্যাপকতার গভীরতর লাভ করেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে নারীবাদ ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হল এক পুরুষবাদ-এর সমালোচনা। সমাজবিদ্যায় পিতৃতন্ত্র হলো একটি সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পুরুষেরা প্রাথমিক ক্ষমতা ভোগ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক সুবিধা ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন করে, পরিবারের ক্ষেত্রে পিতা ও পিতৃতুল্য গন নারী ও শিশুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করে যার অর্থ হল এইসব সমাজের সম্পত্তি ও পদবী পুরুষের মাধ্যমে বাহিত হয়।

পুরুষতন্ত্র হলো এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি যা পারিবারিক পরিসরের ও সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশুদের উপর পুরুষদের প্রাধান্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে এবং মহিলাদের সমস্ত ক্ষমতার জায়গা বা আসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। পুরুষতন্ত্র এক ধরনের ‘জৈবিক নির্ধারণবাদ’ -এ বিশ্বাস করে যেখানে বলা হয় ‘Anatomy is destiny’। নারীবাদ এই ধরনের উপেক্ষা করে। নারীবাদীরা মনে করেন যে সমাজের লিঙ্গবৈষম্যের বীজ লুকিয়ে আছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে। সেখানে একটা অসম ক্ষমতার বন্টন, অব দমন ও বৈষম্য বাসা বেঁধে আছে -পরবর্তীকালে সেখান থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যকারী আচার-আচরণ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশাকাঙ্ক্ষার মধ্যে কাজ করে চলেছে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার কাঠামো। যদিও আমরা আলোচনার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিকতা এবং নারীদের ওপর যে শোষণ, বঞ্চনার প্রতিরোধ যে অধিকার নিয়ে যে আমরা আলোচনা করলাম তবে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো যে একশো দিনের কাজ নিয়ে, সেই একশো দিনের কাজের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের এবার আলোচনা করা দরকার। মূলত ২০০৫ সালে ২৫-শে আগস্ট তৎকালীন ইউ পি এ ওয়ান সরকার থাকাকালীন ‘MGNREGA’ (The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee act) প্রকল্প চালু করেন। মূলত এই আইনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, প্রত্যেক আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট (MRD) -এর তত্ত্বাবধানে রাজ্য সরকার নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক একশো দিনের কাজ প্রদান করবে।

যেখানে বলা হয় যে, মহিলাদের মোট কাজের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩.৩ শতাংশ অংশগ্রহণ থাকবে। যদিও বর্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশ মহিলারা আজ অংশগ্রহণ করেছে। মূলত প্রাত্যহিক মজুরির ভিত্তিতে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ১৫ দিনের মধ্যে মজুরির অর্থ রাজ্য সরকার প্রদান করবে এই অর্থে আইন প্রণয়ন করা হয়। শুরুদিকে নারীদের অংশগ্রহণ কম

হলেও বর্তমানে অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে কোভিড ১৯ পেনডামিক অবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ বিশেষ মাত্রা ছিল। ২০১৩ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (WB) ১০০ দিনের প্রকল্পকে অন্যতম গ্রামীণ উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুন্দরবনের সব মোট ১০২ টি বদ্বীপ রয়েছে এবং তার মধ্যে ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে রয়েছে। বসবাসযোগ্য ব-দ্বীপের সংখ্যা হল ৫৪টি। সাগরদ্বীপ হল সুন্দরবনের সবথেকে বৃহত্তম বদ্বীপ। সাগরদ্বীপের মোট দূরত্ব হলো ২৮২.১১ স্কোয়ার ফুট কিলোমিটার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে সাগরদ্বীপের মোট জনসংখ্যা হল ২ লক্ষ ১২ হাজার ৩৭ জন। পুরুষ জনসংখ্যা হল ১লক্ষ ৯ হাজার ৪৬৮ জন (৫২ শতাংশ) এবং মহিলা জনসংখ্যা হল ১লক্ষ ২ হাজার ৫৬৯ জন (৪৮ শতাংশ)। সাগরদ্বীপে সর্বমোট ৪২টি গ্রাম রয়েছে এবং ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে।

মূলত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা বিশেষ করে বাঁধ নির্মাণ, পুকুর কাটা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, গাছ লাগানো, রাস্তার দুই পাশে আগাছা পরিষ্কার প্রকৃতি কাজে নিয়োজিত হয়ে থাকেন। ২০২১ থেকে ২০২২ আর্থিক বছর অনুসারে মহিলাদের এখানে প্রায় ৪০ শতাংশ অংশগ্রহণ ঘটেছে। যদিও এই তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে সাগরদ্বীপের এক বিশেষ গ্রাম পঞ্চায়েত, রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে।

মূলত এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু- মুসলিম এবং অন্যান্য যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক মানুষ রয়েছেন এবং সাম্প্রদায়িক নারীরা রয়েছেন তাদের ব্যাপক পরিমাণে অংশগ্রহণ করছেন। হিন্দু বলতে কেবলমাত্র সনাতনী হিন্দুরা নন, সাঁওতালি বিশেষ করে লোধা সাম্প্রদায়িক সাঁওতালি মহিলাদেরও বিশেষ অংশগ্রহণ ঘটেছে। এতদিন ধরে মহিলারা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু উনারে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে এখানে অংশগ্রহণ করছেন। শুধু তাই নয় আর্থিক দিক থেকে মহিলারা যেখানে পিতৃতান্ত্রিকতা ছিল সেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা নিজস্ব স্বাবলম্বী এবং স্বচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করছে বলে আমরা লক্ষ্য নজর করতে পারছি। শুধু তাই নয় সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখলেও এখানে এক নতুন মাত্রা পরিবর্তন লক্ষ্য করে যাচ্ছে, মূলত এই একশো দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও এখানে মহিলাদের ভাষা, খাদ্য ও ধর্মীয় অংশগ্রহণ করছে। এখানে মূলত সাগরদ্বীপে লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ মেদিনীপুরের বিশেষ করে নন্দীগ্রাম, খেজুরি, কাঁথি, দীঘা,রামনগর অঞ্চল থেকে আসা। মেদিনীপুরের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা সংমিশ্রণের এখানে লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যের দিক থেকেও সাঁওতালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংমিশ্রণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেখানে হিন্দুদের দুর্গাপূজা এবং মুসলিমদের ঈদ, মহরম নানাবিধ ধর্মীয় ও আচার অনুষ্ঠানে নির্বিশেষে অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এগুলি অর্থাৎ এই সমস্ত অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে মূলত এই একশো দিনের কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে। যদিও একশো দিনের কাজ বর্তমানে একটি বিতর্কিত বিষয়, কারণ একশো দিনের কাজ যারা করে বা করছেন তারা কিন্তু এখনো প্রায় দুই থেকে তিন বছর মজুরির অর্থ তারা নির্দিষ্টভাবে পায়নি। এই নিয়ে আমরা নানাভাবে নানা রাজনৈতিক সংঘাত আমরা লক্ষ্য করি। কেবলমাত্র সাগরদ্বীপ নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে এই যে সমস্যা বিশেষ করে, একশো দিনের কাজের অংশগ্রহণের অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না বলে নানাভাবে সমস্যা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে সাগরদ্বীপের মহিলাদের অংশ গ্রহণের মাত্রা

সেটা অবশ্যই রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে তা আশা করা যায়।

তথ্যসূত্র:

- ১। মৈত্র, শেফালী, নৈতিকতা ও নারীবাদ।
- ২। Chakraborty, Basabi (ed.), women's Studies: Various Aspects.
- ৩। MGNREGA WEBSITE
- ৪। SAGAR ISLAND - WIKIPEDIA
- ৫। রত্ননগর গ্রাম পঞ্চায়েত (সাগরদ্বীপ)।

উচ্চশিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিক অবস্থা ও বাস্তব চিত্র

অজিত কুমার সিংহ

সহকারী অধ্যাপক, বি. এড. বিভাগ
বক্রেস্বর কলেজ অফ এডুকেশন

সারসংক্ষেপ: এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের উচ্চশিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা কেমন তা তুলে ধরা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারদের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে তাদের গুরুত্ব ও আগ্রহ কেমন তা উপস্থাপিত হয়েছে এই। ট্রান্সজেন্ডারদের উচ্চশিক্ষার পরে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ কিরূপ। এবং তাদের শিক্ষাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কি ধরনের তা এই প্রবন্ধে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন।

সূচক শব্দ: ট্রান্সজেন্ডার, নন-বাইনারি, আক্সেল্লা সেক্স, হোমোসেক্সুয়াল, গে, লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল, এসেক্সুয়াল, ইন্টেরসেক্স, সিস-জেন্ডার।

মূল আলোচনা:

প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরুষ ও নারীর মতন আর একটি লিঙ্গ ছিল তার প্রমাণ আমরা পাই মহাভারতের দ্রুপদ রাজার একমাত্র সন্তান শিখন্ডি চরিত্রের মাধ্যমে। যে শিখন্ডি চরিত্রটি ছেলেও নয়, মেয়েও নয়। বর্তমানে এইরকম লিঙ্গকে বলা হয় তৃতীয় লিঙ্গ। আবার আধুনিক যুগে এর নবনির্বিত নাম হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার। এই ট্রান্সজেন্ডারদের কখনো তৃতীয় পক্ষ বা নপুংসক বা জাগতীমাতা নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনস্তত্ত্ববিদ Dr. J. F. Oliven প্রথম এর নামকরণ করেন ‘Transgender’। বর্তমানে এই ট্রান্সজেন্ডারদের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এই প্রকারভেদগুলি হল Umbrella Sex, Non-Binari, Cross-Dres, Lesbian, Homosexual, Gay and Intersex। বর্তমান পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মত ট্রান্সজেন্ডার ও একটি লিঙ্গের মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন কানুন তৈরি করেছে ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার আইন প্রয়োগ করেছে। ২০১১ সালের জনগণনা তথ্য আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট ট্রান্সজেন্ডার রয়েছে ৩০৩৪৯ জন। এর মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শিশুর সংখ্যা ২৩৭৬, ট্রান্সজেন্ডার (SC) এর সংখ্যা ৬৪৭৪, ট্রান্সজেন্ডার (ST) এর সংখ্যা ১৪৭৪ এবং ট্রান্সজেন্ডারদের সাক্ষরতার হার ৫৮.৮৩%। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ট্রান্সজেন্ডার গোষ্ঠীর মানুষজন রাস্তাঘাটে, ট্রেনে-বাসে ভিক্ষাবৃত্তি করে পেট চালান। কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ উচ্চ শিক্ষিত ও সমাজের উচ্চ প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক কর্তা, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কর্মে দক্ষতার সাথে কর্ম করে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের উচ্চ শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও কর্ম ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ ও সুবিধা কি রূপ রয়েছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করাই মূল উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

সমাজে অবস্থিত যে সকল মানুষ পুরুষ ও নারী কোনোটাই নয় মূলত তাদেরই বলা হয় ট্রান্সজেন্ডার। এই ট্রান্সজেন্ডারদেরই আবার কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় Cross-Gender। ১৯৯২ সালে International Conference and Law তে প্রথমবার Umbrella Sex শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যারা জন্মগতভাবে পুরুষ কিংবা নারী, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের ইচ্ছে ও পছন্দ অনুযায়ী সার্জারির মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করেন অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গে স্থানান্তর হন তাদেরও অধিকাংশ সময় Umbrella Sex বলা হয়। আবার যারা লিঙ্গগতভাবে পুরুষরূপে জন্মে পরবর্তী কালে মেয়েদের মতন পোষাক পরিচ্ছদ ও জীবনযাপন করতে পছন্দ করে তাদের Cross-Gender বলা হয়। জন্মগতভাবে পুরুষ হয়েও যদি পুরুষদের প্রতি যৌনতা ও ইত্যাদি বিষয়ে আকর্ষিত হয় তাদের Gay বলা হয়। আবার জন্মগতভাবে মেয়ে হয়েও মেয়েদের প্রতি যৌনতা ও ইত্যাদি বিষয়ে যদি আকর্ষিত হয় তাদেরকে তখন Lesbian বলে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন পুরুষ, পুরুষ ও নারীর উভয়ের প্রতি আকর্ষিত কিংবা নারী হয়েও পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি আকর্ষিত তখন তাদেরকে Bi-sexual বলা হয়। আবার যদি কেউ কোন লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত না হয় তাদেরকে asexual বলা হয়। কিছু ক্ষেত্রে জন্মসূত্রে পুরুষ কিন্তু সার্জারির মাধ্যমে নারীতে পরিণত হয়েও আবার পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত হন তখন তাদের Hetrosexusl বলা হয়। সর্বোপরি বর্তমানে চারটি শব্দ ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে খুবই পরিচিত তা হল LGBT (Lesbian, Gay, Bi-Sexual, Transgender)।

আইনসমূহ:

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি কার্যকরী হওয়া ভারতীয় সংবিধানে এই তৃতীয় লিঙ্গ তথা ট্রান্সজেন্ডারদের সম্পর্কে তাদের জন্য আলাদা করে কোন আইন কিংবা ধারা, উপধারার উল্লেখ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভারতবর্ষের যারা পুরুষও নয়, নারীও নয় তাদের অধিকারের জন্য ২০১৪ সালে গৌরি সাওয়াস্ত সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন ভারতবর্ষের ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার ও তাদের একটি লিঙ্গের মর্যাদা দানের জন্য। সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘদিন পরে ২০১৯ সালে ট্রান্সজেন্ডারদের তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদার অধিকার প্রদান করে ও সমাজের প্রতিটি কর্মে, শিক্ষায় তৃতীয় লিঙ্গের জন্য আলাদা সুযোগ সুবিধা প্রদানের কথা বলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া ট্রান্সজেন্ডারদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদেরকে সমাজের অন্য দুটি লিঙ্গের মতন সমমর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পরই ২০১৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের Ministry of Law and Justice the Transgender Persons Act (Protection of Rights) পাস করে। পরবর্তীকালে আবার National Council for Transgender Persons গঠিত হয়। বর্তমান ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যে ট্রান্সজেন্ডারদের স্বাস্থ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে সম অধিকার ও সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন তৈরি হয়েছে এবং তা বাস্তবে কার্যকরী।

পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের উচ্চশিক্ষার অবস্থা:

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট ট্রান্সজেন্ডার জনসংখ্যা ৩০৩৪৯ জন এবং এর মধ্যে শিক্ষিত ৫৮.৮৩%। তথা ২০১১ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের ৪১.১৭% অশিক্ষিত। বিভিন্ন বেসরকারি সমীক্ষা থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের যে সকল ট্রান্সজেন্ডাররা শিক্ষিত তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫-১০%। যদিও এই সংক্রান্ত সরকারি কোন হিসাব

নেই। বেসরকারি সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী শিক্ষিতদের মধ্যে ৫০% ও তার কাছাকাছি Graduation, ৩০% এর কাছাকাছি Post Graduation এবং ২০% এর কাছাকাছি গবেষণার কাজে নিযুক্ত। যদিও আমরা বেসরকারি হিসাব কে মান্যতা দিতে পারি না। কিন্তু এই হিসেব থেকে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের খুব কম সংখ্যক ট্রান্সজেন্ডার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। অধিকাংশই স্বাক্ষর করতেই সক্ষম। যারাই আবার এই উচ্চশিক্ষার গণ্ডি পার করেছেন তারা সকলেই যে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন তা বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের Transgender Community Organization এর বর্তমান চেয়ারম্যান বলেন যে, ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের কর্মসংস্থানে সবথেকে বেশি হেনস্তার হতে হয়। কারণ সকলের একটি প্রশ্ন তুমি পুরুষ ও নয় নারী নয়। তুমি কিভাবে এক পুরুষ বা নারীকে সামলাবে। এরূপ বিভিন্ন অবাস্তবিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তার ফলস্বরূপ অনেক তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ উচ্চ শিক্ষিত হয়েও কর্মসংস্থানের দিকে যাওয়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। লেখিকা ও অভিনেত্রী ট্রান্সজেন্ডার তিস্তা দাস, Trans-Women মডেল নীলিমা বিশ্বাস ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিতরা বলেন যে, সত্যিই তাই। ট্রান্সজেন্ডাররা উচ্চশিক্ষিত হলেও কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ কিন্তু বরাবরই কম পায়। এদের অভিজ্ঞতার পুঁজি থেকে বলা যায় যে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে উভয় ক্ষেত্রেই ট্রান্সজেন্ডারদের অবস্থা খুবই সংকটজনক। যদিও এই বিষয়ে সরকার পক্ষের কারোর মন্তব্য পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষায় ট্রান্সজেন্ডারদের যদি সত্যিকারের শিক্ষিত করে তুলতে হয় তাহলে যারা শিক্ষিত তাদের কর্মসংস্থানের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করতে হবে। তবেই কিন্তু ওদেরকে দেখে অন্যান্যরা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবেন এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের কর্মসংস্থান:

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তথা উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দিল্লী, হরিয়ানা এই রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী ট্রান্সজেন্ডারদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে অনেক কম। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের সরকার ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে উন্নতি করতে সক্ষম হয়। এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালাতে না হয় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিত্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিগত ১০-১৫ বছরে শুধুমাত্র কয়েকজন ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া ছাড়া কোনরূপ শিক্ষাক্ষেত্র অতিক্রম করা ট্রান্সজেন্ডারদের কর্মসংস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই আলাদা সংস্থা করে তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা দান করা হয়নি। সমাজকর্মী কাকলি সুব্রহ্মন্যায় তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রান্সজেন্ডারদের কোনোরকম সূচি ও স্কিম আমরা দেখতে পাই না। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করলেও এই বিষয়ে অনেকবার ভারতবর্ষের Transgender Organization প্রতিবাদ করে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। কিন্তু কোনরূপ নতুন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তা সত্ত্বেও যারা নিজের প্রচেষ্টায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তারাই যেটুকু চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন NGO চেষ্টা করে। এই রূপ কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা ট্রান্সজেন্ডার মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, আমরা যদি এগিয়ে না যাই এবং সমাজের প্রতিটি মানুষ ও সরকার যদি

ট্রান্সজেন্ডারদের সমান চোখে না দেখে ও সময় সুযোগ প্রদান না করে তাহলে ট্রান্সজেন্ডারদের দীর্ঘদিনের যে পেশা ভিক্ষাবৃত্তি তা দিনে দিনে আরো ভয়ঙ্কর রূপ নেবে।

কিছুক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যেমন কল সেন্টার এছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন সংস্থা ও কলকারখানাগুলোতে কর্মরত ট্রান্সজেন্ডাররা। এবং এদের মধ্যে অনেকেই নিজ দক্ষতা ও বিশ্বাসের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কর্ম করে চলেছেন। কিন্তু এই সংখ্যাটা খুবই কম।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মক্ষেত্রে তথা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পুলিশ ও ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেকে সুযোগ পেয়েছেন এবং তারা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কর্ম করছেন। কিন্তু এই সংখ্যাটা যত উচ্চশিক্ষিত ট্রান্সজেন্ডার রয়েছে তার তুলনায় অনেক কম।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান ছাড়াও অন্যান্য কর্মসংস্থান যেমন বিউটিসিয়ান, মেকাপ আর্টিস্ট, ইউটিউবার, ব্লগার হিসেবেও কাজ করে। এবং তাদের মধ্যে অনেকে এই নিজ কর্মে যথেষ্ট সফল। আবার অনেকে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা ব্যর্থ হয়েছেন তাদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি ও পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেসব পদক্ষেপ পরবর্তীকালে ব্যর্থ ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের জীবনে সফলতার মোড় এনে দিতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ট্রান্সজেন্ডারদের বিবিধ সমস্যা:

পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকাংশই জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয় ভিক্ষাবৃত্তি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচ ও গানের দ্বারা এবং যারা গ্রামাঞ্চলে রয়েছে তাদের কৃষিকর্মের দ্বারা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার ও অত্যাচারের শিকার হন বলে ট্রান্সজেন্ডাররা দাবি করেন। আমরা এই প্রবন্ধটি লেখার জন্য এইরূপ কয়েকজনের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজনের মত অনুযায়ী, শিক্ষিত হোক ও উচ্চশিক্ষিত হোক ট্রান্সজেন্ডার মানে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কিংবা আজ সর্বক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকের কাছে অন্য চোখে অন্য নজরে থাকি। অনেকে শিশুদেরকে আমাদের কাছে আসতে দেয় না, তাদের ভয় হয়, আমরা এই শিশু চুরি করব কিংবা শিশু চুরি করে বিক্রি করব। কিন্তু কেউ ট্রান্সজেন্ডারদের ইতিহাস একবার খেঁটে দেখে না যে ট্রান্সজেন্ডাররা মায়ের জাত। প্রত্যেকটি সন্তানকে সম্মেহে বড় করে তোলা যাদের রক্তে রয়েছে তারাই এই কাজ কিভাবে করবে। তথা এই রূপ বিভিন্ন ভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঞ্চনা ও কুনজরের শিকার হতে হয়।

সামাজিকভাবে ট্রান্সজেন্ডাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিছিয়ে। সমাজের বিভিন্ন কর্মে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রবেশ অবাধ থাকলেও সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণে তাদের প্রবেশ নিষেধ।

পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকাংশই যেহেতু অল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর তাই এদের আর্থিক উপার্জন খুবই কম। এবং সেই আর্থিক উপার্জনের উপর নির্ভর করে তাদের সংসার তথা জীবন যাপন করা খুবই কঠিন। অনেকেই গৃহত্যাগ করেছেন, অনেকে আবার একসাথে মিলেমিশে থাকেন। কিন্তু আর্থিকভাবে এদের অধিকাংশই BPL তালিকাভুক্ত বলে ঘোষিত। যদি এদেরকে শিক্ষিত ও দক্ষ না করা হয় তাহলে এদেরই আর্থিক অবস্থা ও দৈন্যতা দিনে দিনে আরও বেশি প্রকট হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে পঞ্চায়েত থেকে পৌরসভার ভোটে এই ট্রান্সজেন্ডারদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয় যাতে মানুষ করুণা বশবর্তী হয়ে ভোট দেন এবং ট্রান্সজেন্ডাররাও দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভোট পরবর্তী পর্ব মিটে গেলে এদের আর প্রতিশ্রুতি কখনো পূরণ হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে এদেরকে রাজনীতির আগুিনায় নিয়ে আসা হয় শুধুমাত্র স্বার্থপূরণের জন্য। স্বার্থপূরণ হয়ে গেলে, কিংবা যারা রাজনীতিতে আসে তারা নিজের আখের গুছিয়ে নেয়।

শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ট্রান্সজেন্ডারদের মনের কথা বলতে গেলে অধিকাংশই যারা অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু চাহিদা, আগ্রহ ও প্রয়োজন কোনটাই পূরণ হয় না। প্রতিমুহূর্তে তাদের মানসিক হীনমন্যতা ও দ্বন্দ্বিক ক্ষতবিক্ষত অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয়। অর্থাৎ শারীরিক দিক থেকে যেমন তারা পুরুষও নয় নারীও নয়। মানসিক দিক থেকেও তারা কিন্তু সমাজের আভ্যন্তরীণভাবেও অন্তর্ভুক্ত নয়। এক দোলাচল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের জীবনযাপন ও জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই সমস্যাগুলো যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সচেতন অবস্থায় দ্রুত সমাধান না করেন তাহলে ভবিষ্যতে ট্রান্সজেন্ডারদের অবস্থা আরো দীন থেকে দীন হবে। তার ফলস্বরূপ হয়তো আগামী দিনে ট্রান্সজেন্ডারদের অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে।

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ট্রান্সজেন্ডারদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও আইনসমূহ থাকলেও অনেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বাধা পেরিয়ে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম নন। তাই সরকারি ও বেসরকারি ভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যদি কাটানো যায় এবং সমস্যা অতিক্রম করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ট্রান্সজেন্ডার মানুষ সকল প্রকার শ্রেণী বৈষম্য ও সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে অন্যান্য লিঙ্গের মতন তারাও নিজের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

তথ্যসূত্র:

1. CENSUS, 2011
2. <https://blog.ipleaders.in/legal-rights-of-transgender-india/>
3. <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/06/healthcare-distant-india-transgenders201461882414495902.html>
4. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Supreme-Court-recognizes-transgenders-as-thirdgender/articleshow/33767900.cms>
5. <http://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180>
6. <http://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-recognises-transgenders-as-thirdgender/article5914572.ece>
7. file:///C:/TransGender_Others%20-%20Census%202011%20India.html

8. <https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/transgender>
9. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/First-count-of-third-gender-in-census-4->
10. <https://www.cdc.gov/tobacco/disparities/lgbt/index.htm>
11. D. Singh, S, C and Kumar, A. (2024). A Socio-Economic Conditions and Social acceptance of Transgender Community: An Empirical Study. International Journal of Advance Research, Journal volume 12(03), Issue 120-124, ISSM 2320-5407, AD:10.21474/IJAT 01/18372, pp 120-124.
12. Atif, Raza, Ashraf, Idress, Anjum, Javed, et.al. (2024). Exploring the Socio-economic Problems Faced by Transgender: A Qualitative Study. Remittances Review, volume:9, ISSN: 2059 - 6596, pp 1683-1695.
13. Karen, I, F, Goldsen, Romanelli, Charles, P. H, Ellis, H, Jung. (2023). Health, economy and social dispartic among transgender women, transgender man and transgender non binary adults. results from a population-based study. HHS Public Access, 156, 2023 March 01, University of Washington and University of Utah School of Social Work, 4101.
14. Kaur, P. (2020). Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community: A Socio-Legal Study. Faculty of Law Panjab University, Chandigarh.
15. Sethi. S and Barwa, M. (2018). Transgender Health and Their Rights in India. International Journal of Research in Social Science, Journal volume8, Issue 10(1), October 2018, ISSN.2249-2496, pp279-288.
16. Sawant, N.(2017). Transgender: Status in India. [https://www.researchgate.net/publication/322012741.Indian Psychiatry 2017; 1:59-6.](https://www.researchgate.net/publication/322012741.Indian_Psychiatry_2017;1:59-6.)
17. Galupo, P, M. (2017). Researching While Cis-Gender: Identity Considerations for Transgender Research. International Journal of Transgenderism, 18:3, 241-242, ISSN 1434-4599, volume 18, NO.3, 241-242, pp 240-242.
18. Sawning, S. et. al. (2017). A first step in addressing medical education curriculum gaps in Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender related content: The University of Louisville, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender health certificate program. University of Louisville, KY 40202, USA. Education for Health (2017), volume:30, Issue 2 (May-August 2017), pp 108-114.
19. Leelavathy, K. (2014). Socio-Economic Problems of Transgender in Workplace. International Journal of Scientific Research, Journal volume:3, Issue:4, Special Apr Issue 2014, ISSN 2277-8179, pp.1-2.

The Role of Peace Education in Shaping Young Minds

Dola Sarkar

Assistant Professor, Dept. of Education
Plassey College

Abstract: Peace education is a critical component of education that aims to promote peace, understanding, and tolerance among individuals and communities. This article explores the role of peace education in shaping young minds, highlighting its importance, benefits, and challenges. We discuss the concept of peace education, its history, and its various approaches, including conflict resolution, human rights, and sustainable development. We also examine the impact of peace education on young people, including its effects on their attitudes, behaviors, and academic performance. Furthermore, we identify the challenges and limitations of peace education, including the lack of resources, trained teachers, and institutional support. Finally, we provide recommendations for promoting peace education in schools and communities, highlighting the need for a comprehensive and inclusive approach that involves all stakeholders.

Keywords: Peace Education, Inclusive Approach, Communities, Stakeholders.

Introduction: Peace education is an essential component of education that aims to promote peace, understanding, and tolerance among individuals and communities. It is a holistic approach that encompasses various disciplines, including social sciences, humanities, and natural sciences. Peace education is critical in today's world, where conflicts, violence, and inequality are prevalent. It is essential for shaping young minds and promoting a culture of peace, tolerance, and understanding.

History of Peace Education

Peace education has a long history that dates back to the early 20th century. It emerged as a response to the devastating effects of World War I and the need to promote international understanding and cooperation. The League of Nations and the United Nations played a significant role in promoting peace education globally. In the 1960s and 1970s, peace education gained momentum, with the establishment of various organizations and institutions dedicated to promoting peace and disarmament.

Approaches to Peace Education

There are various approaches to peace education, including:

1. Conflict Resolution: This approach focuses on teaching students how to resolve conflicts peacefully and manage disputes effectively.
2. Human Rights: This approach emphasizes the importance of human rights and the need to promote and protect them.
3. Sustainable Development: This approach focuses on promoting sustainable development and environmental education.
4. Global Citizenship: This approach emphasizes the importance of global citizenship and the need to promote international understanding and cooperation.

Benefits of Peace Education

Peace education has numerous benefits, including:

1. Promoting Tolerance and Understanding: Peace education promotes tolerance and understanding among individuals and communities.
2. Reducing Violence and Conflict: Peace education reduces violence and conflict by teaching students how to resolve disputes peacefully.
3. Improving Academic Performance: Peace education improves academic performance by promoting a positive and supportive learning environment.
4. Fostering Global Citizenship: Peace education fosters global citizenship by promoting international understanding and cooperation.

Challenges and Limitations

Despite its benefits, peace education faces several challenges and limitations, including:

1. Lack of Resources: Peace education requires significant resources, including trained teachers, curriculum materials, and institutional support.
2. Limited Institutional Support: Peace education often lacks institutional support, making it difficult to implement and sustain.
3. Cultural and Social Barriers: Peace education must overcome cultural and social barriers, including stereotypes, prejudices, and biases.
4. Evaluating Effectiveness: Evaluating the effectiveness of peace education is challenging due to the complexity of the issues involved.

Conclusion:

Peace education is a critical component of education that aims to promote peace, understanding, and tolerance among individuals and communities. It is essential for shaping young minds and promoting a culture of peace, tolerance, and understanding. Despite its benefits, peace education faces several challenges and limitations. To overcome these challenges, we must develop comprehensive curriculum, provide teacher training, foster community engagement, and evaluate effectiveness regularly. By working together, we can promote peace education and create a more peaceful and harmonious world.

References:

1. Higgins, J. P., & Green, S. (Eds.). (2008). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions.
2. Lowe, M. X. (2021). Types of Contact: A field experiment on collaborative and adversarial caste integration. *The American Economic Review*, 111(6), 1807–1844. <https://doi.org/10.1257/aer.20191780>
3. Mbogo, E. W. (2016). Factors influencing implementation of peace education programme in primary schools: a case of Tharaka North District. <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-Influencing-Implementation-of-Peace-in-A-of-MbogoNdiritu/f30e92b708d29d52646a5a5ac17f00212c858a00>
4. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *BMJ*, 339 (jul21 1), b2535. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2535>
5. Nagasubramaniyan, G., & Joseph, A. R. (2022). Income inequality and violent crime: evidence from Indian states. *International Journal of Happiness and Development*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.1504/ijhd.2022.124907>
6. Nanda, P. K. (2021b, October 5). India's school system faces acute shortage of teachers, says Unesco report | Mint. Mint. <https://www.livemint.com/education/news/indias-school-system-faces-acute-shortage-of-teachers-says-unesco-report11633465243149.html>
11. Nation Council Framework, 2023 <https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/NCF2023.pdf>
12. Pajankar, V. D. (2019). NAS 2017 National Achievement Survey Class 3, 5 and 8: National Report to Inform Policy, Practice and. . . ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/344781429_NAS_2017_National_Achievement_Survey_Class_3_5_and_8_National_Report_to_Inform_Policy_Practice_and_Teaching_Learning

Implementation of Vedic Philosophy in Indian Education System

Prasenjit Das

Assistant professor, Dept. of B.Ed.

Debnarayan Shiksha Sansthan College (B.Ed. & D.El.Ed.)

Abstract: The Vedic education system, which developed around 1500–500 BCE, emphasized spiritual, moral, and intellectual development. It was characterized by personalized learning through the gurukul system, where students lived with their teachers and were involved in a curriculum that included subjects such as grammar, mathematics, philosophy, and the arts. The system aimed not only to acquire skills but also to encourage the balanced development of mind, body, and soul. The paper explores the “Implementation of Vedic philosophy in Indian Education system”. Its aim is to elucidate how can achieve Vedic education emphasises practical knowledge and vocational learning, preparing students for their future roles in society. The research draws on primary sources, including the role of Vedic philosophy on Indian Education System and its proposing practical implementation strategies in the current Indian educational landscape.

Key words: Vedic philosophy, Indian Education System, Implementation, Gurukul system.

Introduction: The integration of Vedic philosophy into the Indian education system is becoming increasingly popular, especially since the introduction of the New Education Policy (NEP) in 2020. The policy aims to modernize education by promoting a holistic and multifaceted approach consistent with the principles of Vedic education.

The word ‘VEDA’ means ‘Knowledge’. The development of one's physical, moral, and intellectual capacities in order to attain salvation was the focus of Vedic education which could be achieved by attention, concentration, and Yoga which was taught in this Vedic Period.

‘Education’ was derived from the Latin word ‘educere, educare and educatum’ which means ‘To Learn, To Know and To Lead out’. Education reveals a person's or child's latent inner talent. Since the Vedas constitute the foundation of Indian philosophy of life, they are the wellspring of ancient Indian Education. (Lal.K,2024).

Throughout the Vedic era, education was provided at no cost, and students followed an exemplary lifestyle as part of their education. India's rich tradition and culture were largely derived from Vedic education, which was greatly valued by the international community. (Kumari.P, 2017)

"The Vedic education system included the anxious care of the child, the skillful upbringing of the child, the delicate training of puberty and the gradual development of values in the little thoughts of daily life. His domestic and social duties were so arranged as to develop a life of constant social service and spiritual practice, which eventually led to the surrender of the soul realized through communion with God. If education was contiguous, it was also co-extensive with life." (Das, 1930: 27)

The aim of Vedic education was not merely to impart knowledge or develop good qualities in students, but rather its purpose was to develop and prepare the individual for the highest quality of life in all circumstances. (Mokracek. P, Mohammed. L, 2021)

Objectives of the Study

The aim and objective of Vedic education was to encourage simultaneous and harmonious development. Man being a social being, Vedic education not only emphasized social obligations but also encouraged individual fulfillment. Since it is not knowledge but employment that has established the link between education and society today.

O1. To study about the relevance of Vedic Education system and Indian Education System.

O2. To study explores the principles features of Vedic educational thought and modern knowledge systems in India.

O3. To Analyze the key aspects of Vedic Educational Philosophy.

O4. This research study explores Vedic philosophy and education purpose is to develop and prepare the individual for the highest quality of life in all circumstances.

Methodology

This study employs a qualitative research methodology to explore Implementation of Vedic philosophy in Indian Education system. The research draws from primary and secondary sources, including the role of Vedic education and philosophy on Indian Education System and Its Implementation.

Methodology of Vedic Education System

Vedic education was imparted in three ways

I) Sravana

II) Manana

III) Nididhyasana

I) Sravana:In this method, Students listen carefully the text which is spoken by their teacher (Guru) and ensuring that knowledge is reserved and transmitted to the upcoming generation.

II) Manana:In this approach, the students internalize or assimilate what was given by their teacher (Guru).Therefore, this process is known for deliberation and reflection on the topic.

III) Nididhyasana:In this approach, the students realized truth and attended what was given by their teacher. It has to be considered indispensable for the realization of supreme reality.

Vedic Education and Philosophy

In Vedic education, the teacher (guru or acharya) held a respected position, acting as a spiritual and intellectual guide, responsible for the overall development of the students, including their moral character and practical skills, and was seen as a father figure.

Here is a more detailed discussion of the role of the teacher in Vedic education:

Main Roles, Responsibilities, Spiritual and Moral Guide:

Teachers were not only teachers but also spiritual mentors, responsible for shaping the character and values of their students.

Intellectual Mentor:

They imparted knowledge, especially about the Vedas, philosophy, languages and various skills.

Parental character:

The teacher-student relationship was seen as familial, where the teacher acted as a father figure, responsible for the welfare and guidance of the student. (Mokracek. P, Mohammed.L, 2021)

All-round Development:

The teacher focused on the overall development of the student, encompassing intellectual, moral and practical aspects.

Personalized Education:

Education was often personalized, with teachers understanding the strengths and weaknesses of each student and tailoring their methods accordingly.

High Social Status:

Teachers had high social status, respected and honored for their knowledge and character.

Emphasis on Practical Knowledge:

Vedic education emphasized practical skills and vocational education, which prepared students for their future roles in society.

Residential Gurukul:

Students lived with their teachers in residential schools (gurukuls), which fostered close and supportive teacher-student relationships.

Oral Tradition:

Education was primarily transmitted orally, with great emphasis placed on correct pronunciation and recitation of Vedic scriptures.

Characteristics of Modern Education

Modern education retains the fundamental aspects of traditional education, such as a structured classroom environment. However, it also redirects attention to fostering holistic development, critical thinking, and meaningful student participation. Here are the key characteristics of modern education:

Learner-centered Approach:

Modern education focuses on the needs, preferences, and potential of the learner, encouraging active participation and self-paced learning. It emphasizes the development of collaboration, critical analysis, and problem-solving abilities, enabling students to take charge of their learning journey. Shifting from rote memorization to personalized learning, it fosters creativity and adaptability in a dynamic world.

Activity-based learning:

Experiential and interactive learning forms the foundation of modern education. Teachers incorporate activities, simulations, discussions, and collaborative projects to reflect the needs of the industry, ensuring that students develop confidence, creativity, and critical thinking skills.

Integrated and Multidisciplinary:

Modern education bridges traditional silos, blending disciplines to address real-world complexities. For example, modern management master's programs integrate elements of marketing, technology, and data-driven decision-making, equipping students to excel in cross-functional roles such as digital brand management.

Life Skills Development:

In addition to technical knowledge, modern education focuses on building life skills such as adaptability, decision-making, and critical thinking, which are essential for succeeding in leadership roles and meeting growing challenges. By engaging in activities such as simulations and strategic initiatives, students develop skills that ensure long-term career success in a fast-paced, digital-first world.

Key Adaptation Strategies with Vedic Education and Modern Knowledge Systems in India

Adapting the Vedic education system to the modern educational framework requires integrating its core principles with contemporary educational practices and technological advancements. Here are a few strategies for this adaptation:

1. Blended learning Model

Combining tradition and technology: Use digital platforms alongside traditional teaching methods to enhance the learning experience. These include virtual classrooms, online resources, and interactive tools that preserve the spiritual essence of Vedic education and make them accessible to a wider audience.

2. Interdisciplinary approach

Integrating modern science: Combining Vedic knowledge with STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) disciplines. For example, Vedic mathematics can be applied to data science, and Ayurveda can be integrated with modern health sciences.

3. Competency-based learning

Focus on skills: Emphasize practical skills alongside theoretical knowledge. This includes integrating soft skills (such as communication and teamwork) and technical skills relevant to today's job market, ensuring that students are prepared for employment.

4. Personalized Learning

AI-Driven Customization: Implement AI and big data analytics to create personalized learning pathways for students, providing educational experiences that cater to individual strengths and weaknesses.

5. Experiential Learning

Hands-on Experience: Encourage learning through real-world application and experiences, such as field trips, project-based learning, and collaborative activities that enhance critical thinking and problem-solving skills.

6. Moral and ethical education

Strengthening values: Incorporate moral education based on Vedic principles to address behavioral issues in students. This includes teaching respect, compassion, and social responsibility as core components of the curriculum.

Conclusion:

The implementation of Vedic philosophy in the Indian education system is visible in recent reforms, which prioritize holistic development, moral foundation, and cultural preservation, aiming to create well-rounded, creative, and morally responsible citizens. (Mokracek.P, Mohammed.L, 2021)

If Vedic education can be adapted to contemporary modern knowledge, providing a balanced, future-ready education that preserves its core values.

Modern education can learn from the Vedic tradition, fostering respect for teachers, elders, and knowledge, creating a more orderly and ethical environment. Vedic education emphasizes balanced development - intellectual, moral, mental and physical - by fostering qualities such as compassion, self-discipline and honesty, creating a well-rounded personality. (Das, 1930: 27)

Reference:

1. Mokracek.P, Mohammed.L, 2021, Student – Teacher Relationship In Vedic Educational System, 2021.
2. Das, S.K. (1930) – The Educational System of Ancient Hindus. Calcutta, India.
3. Lal. K, 2024, Vedic Period of Education, 8th August 2024.
4. Kumari. P, 2017, EDUCATION SYSTEM IN VEDIC PERIOD, September 2017
5. Talageri Shrikant G. (1962) The Rigveda: A Historical Analysis Aditya Prakashan, New Delhi.

From Arakan to Exile : A Historical Analysis of Rohingya Migration Patterns from the 19th Century to the Present

Samina Khatun

Post Graduate, Dept. of History

Jadavpur University, Kolkata

&

Taslima Aktar

Associate Professor, Department of Political Science

University of Chittagong, Bangladesh

Abstract: The Rohingya people, an ethnic minority predominantly Muslim, have a long and complex history of migration and displacement, primarily within the region surrounding the Bay of Bengal. This article traces the migration patterns of the Rohingya people from the 19th century to the present, focusing on the key events that have shaped their displacement. Starting from the colonial era under British rule in Burma, the study delves into the impacts of post-independence national policies, military regimes, ethnic tensions, and more recent refugee crises. This analysis underscores the role of regional geopolitics, religious identity, and state policies in the continuous movement and suffering of the Rohingya. It further explores the socio-political, economic, and human rights challenges faced by the Rohingya as they sought refuge in neighboring countries, particularly Bangladesh, and their precarious existence as stateless individuals. By examining these patterns, the paper provides insights into the ongoing plight of the Rohingya and emphasizes the need for a durable solution to their statelessness and migration-related challenges.

Keywords: Rohingya, Migration, Statelessness, Myanmar, Bangladesh, British Colonialism, Refugee Crisis, Ethnic Displacement, Human Rights, Geopolitics.

Introduction:

The Rohingya people, an ethnoreligious minority group, have faced systemic persecution, forced displacement, and a protracted refugee crisis spanning over a century. Originating from the Arakan region (now Rakhine State in Myanmar), the Rohingya have historically been marginalized and discriminated against by the Burmese state. Over the last two centuries, various socio-political factors, including colonialism, post-independence nationalism, ethnic conflict, and

human rights abuses, have forced them to migrate or flee their homeland, often facing further persecution in neighboring countries.

This paper aims to analyze the migration patterns of the Rohingya from the 19th century to the present, identifying the critical events that have shaped their displacement and statelessness. The article will examine the colonial period, the post-independence era, the impact of military rule in Myanmar, the role of regional geopolitics, and the recent refugee crises that have garnered international attention.

1. The Colonial Era: 19th Century to 1948

The migration patterns of the Rohingya can be traced back to the British colonial period, which began in 1824 when Burma was annexed into the British Empire following the First Anglo-Burmese War. Under British rule, Burma was transformed into a key part of British India. The British administration implemented policies that reshaped the demographic makeup of Burma, particularly in the coastal region of Arakan (Rakhine).

During the colonial period, the British encouraged the migration of Muslim workers from Bengal (modern-day Bangladesh) to the region of Arakan. This migration was partly driven by the British desire to develop the agricultural economy of Burma, particularly the rice industry. The Rohingya, primarily Muslims who lived in the northern part of Arakan, were among the migrants who benefited from these policies. They were used as cheap labor for the British colonial infrastructure projects and agricultural work, which led to the growth of a Muslim population in Arakan.

However, the migration also sowed the seeds of ethnic tension, as local Buddhists began to view the growing Muslim population with suspicion and resentment. These tensions continued to grow throughout the colonial period, exacerbated by economic inequalities, competition for resources, and cultural differences. While the British initially promoted a policy of relative tolerance, the ethno-religious divides in Arakan became more pronounced.

The British also implemented policies that favored Muslims in employment and governance, which exacerbated animosity among the Rakhine Buddhists, who were predominantly working-class. This growing tension set the stage for the political unrest and ethnic violence that would follow after Burma's independence. The end of British rule in 1948 left unresolved ethnic tensions, with the Rohingya seen by some as outsiders, despite their long history in the region.

2. Post-Independence and the Rise of Nationalism: 1948-1962

In 1948, Burma gained independence from Britain, and the newly formed state sought to define its national identity. The Rohingya, along with other ethnic

minorities in the country, found themselves increasingly marginalized in the context of rising Burmese nationalism. The Burman-majority government, led by the newly elected leadership, viewed the Rohingya as foreign migrants, despite their long history in the region.

In the early years of independence, the Rohingya attempted to assert their rights and demand recognition as an indigenous ethnic group in Burma. However, the central government, under Prime Minister U Nu, chose to prioritize the Burman majority and suppress minority rights. The government's refusal to recognize the Rohingya as one of the country's official ethnic groups led to tensions and violent clashes between the Rohingya and Rakhine Buddhists, further exacerbating their marginalization.

The situation worsened in the early 1950s when the Burmese government began a policy of forced relocation and population transfers in Arakan. The Rohingya were targeted for displacement, with many fleeing to neighboring East Pakistan (now Bangladesh). These early migration patterns were primarily driven by the economic hardships, ethnic violence, and political marginalization faced by the Rohingya.

This period of displacement and marginalization laid the foundation for later waves of migration. The absence of international recognition for the Rohingya's status further compounded their suffering, and as ethnic tensions simmered, it became clear that the political future for the Rohingya in Burma was fraught with uncertainty.

3. Military Rule and the Escalation of Persecution: 1962-1988

The situation for the Rohingya worsened significantly after the military coup in 1962, which brought General Ne Win to power. Under the military regime, the government adopted a more stringent nationalistic agenda, which involved the denial of the Rohingya's ethnic and religious identity. The military government implemented discriminatory policies, such as the 1982 Citizenship Law, which effectively rendered the Rohingya stateless by excluding them from the list of recognized ethnic groups eligible for citizenship. This law made it virtually impossible for the Rohingya to obtain legal status in Myanmar.

During this period, the military regime's policies of ethnic cleansing intensified, with the Rohingya subjected to forced labor, land confiscation, and arbitrary arrests. These measures triggered a large-scale exodus of the Rohingya to neighboring countries, primarily Bangladesh. The 1978 Operation Nagamin, a military crackdown on the Rohingya in Rakhine State, led to over 200,000 refugees fleeing to Bangladesh. This marked the first significant refugee crisis involving the Rohingya, which laid the foundation for the ongoing displacement of the community.

In the 1980s, another large-scale migration occurred in response to the military's violent suppression of dissent, including widespread ethnic violence. The Rohingya continued to flee to Bangladesh, and the Bangladesh government, under pressure from Myanmar, attempted to send many refugees back, despite the unsafe conditions they faced. Many of the refugees who returned were met with further persecution, setting a pattern for future migrations.

4. The 1990s and 2000s: A Continuous Exodus

Throughout the 1990s and 2000s, the Rohingya continued to face discrimination, violence, and displacement. The military regime in Myanmar became more oppressive, and the Rohingya were subjected to severe human rights abuses. In 1991-1992, another wave of refugees fled to Bangladesh following widespread military crackdowns, resulting in the creation of refugee camps along the Bangladesh-Myanmar border.

While some refugees were allowed to return to Myanmar under the 1992 repatriation agreement between Bangladesh and Myanmar, many found conditions in Myanmar intolerable and unsafe, prompting a continued cycle of migration and displacement. The refugees who returned faced the same discriminatory practices, forced labor, and land confiscation. During this period, international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) began to take an interest in the Rohingya refugee situation, but their efforts to resolve the crisis were largely ineffective.

Human rights violations, including arbitrary detention, torture, and denial of basic services, were rampant throughout the 1990s and 2000s. Despite these challenges, the Rohingya continued to resist marginalization, and many sought refuge in other countries. Regional geopolitics further complicated their plight, with Bangladesh struggling to manage the growing refugee population while Myanmar continued to deny any responsibility for their plight.

5. The 2010s: Escalating Violence and the 2017 Exodus

The early 21st century saw an intensification of the Rohingya crisis, particularly in 2017, when the military launched a brutal crackdown in response to attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), a militant group. The violence that ensued led to what the United Nations described as “ethnic cleansing.” Over 700,000 Rohingya fled to neighboring Bangladesh in what became one of the largest refugee crises of the 21st century.

The 2017 exodus was marked by widespread atrocities, including killings, rapes, and the burning of villages. The refugee camps in Bangladesh, especially in Cox's Bazar, became home to the largest concentration of Rohingya refugees in the world. The international community, including the United Nations and human rights organizations, condemned Myanmar's actions,

but the situation remained unresolved. Myanmar's military junta, which continued to control the country after a coup in 2021, has shown little interest in addressing the Rohingya issue.

The international community's response, while vocal in condemnation, has been inadequate in resolving the crisis. Meanwhile, the plight of the Rohingya in Bangladesh remains dire, with overcrowded refugee camps, limited access to education and healthcare, and a lack of employment opportunities. The Rohingya people continue to live in a state of legal limbo, without citizenship or the rights associated with it.

6. The Current Situation and Prospects for the Future

As of 2025, the Rohingya remain one of the most persecuted and displaced ethnic groups in the world. The refugee camps in Bangladesh are overcrowded, with limited access to education, healthcare, and employment opportunities. Despite efforts by the international community to provide aid, the Rohingya face a precarious existence as stateless individuals without legal protection or recognition in Myanmar.

The Myanmar government, under the military junta, has shown no willingness to grant the Rohingya citizenship or recognize their rights, while the international community has failed to find a lasting solution. The question of whether the Rohingya will ever return to Myanmar remains uncertain, as the political situation in the country remains volatile.

In addition to their precarious conditions in refugee camps, the Rohingya face risks of exploitation, trafficking, and further marginalization. Regional tensions continue to fuel the crisis, with Myanmar's neighboring countries increasingly reluctant to offer refuge to the displaced population. Without a comprehensive and multilateral approach to resolving the issue, the plight of the Rohingya will likely continue for the foreseeable future.

Conclusion:

The migration patterns of the Rohingya people from the 19th century to the present are shaped by a complex history of colonialism, nationalism, ethnic conflict, military rule, and human rights abuses. From their initial migration under British colonial policies to their contemporary plight as refugees, the Rohingya have faced systemic discrimination, forced displacement, and statelessness. Despite numerous efforts by international organizations, the crisis remains unresolved, with millions of Rohingya living in precarious conditions in refugee camps in Bangladesh and other neighboring countries.

It is crucial that the international community continues to advocate for the rights of the Rohingya people, pressuring Myanmar to grant them citizenship

and protect their basic human rights. Without a long-term resolution, the Rohingya will remain a stateless people, their future uncertain.

References:

1. Aktar, T. (2024, December). Political Dynamics of Pre-Colonial Myanmar/Burma: The Context for Colonisation, *Indian Historical Review Journal*, 51(2), Sage, 222-237.
2. Aktar, T. (2023, January-December). Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh: Post-COVID Socio-Economic Impact on Host Community, *Journal of Indian Research*, 11, (1-4), 14-26.
3. Aktar, T. (2025, May). "Myanmar's Recent Political Crisis: Its Effects on the Rohingya Refugees in Bangladesh" edited by Nasir Uddin, *Reshaping Rohingya Futures: Coping Strategies and Emerging Agencies*, Palgrave Macmillan (Springer Nature), Singapore.
4. Dunn, S. (2019). The future of the Rohingya: A global crisis of statelessness and displacement. *The International Journal of Human Rights*, 23(6), 1072–1091.
5. Green, D. (2019). Rohingya statelessness and Myanmar's political impasse. *Journal of International Migration and Integration*, 20(2), 453–472.
6. Hlaing, K. (2015). Rohingya migration and humanitarian crisis in Bangladesh. *Journal of Refugee Studies*, 28(3), 387–412.
7. Human Rights Watch. (2017). *Myanmar: 'Ethnic cleansing' of Rohingya*. <https://www.hrw.org/news/2017/09/12/myanmar-ethnic-cleansing-rohingya>
8. International Crisis Group. (2018). *Myanmar: The politics of Rakhine State*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/298-myanmar-politics-rakhine-state>
9. Kaman, N. (2016). The impact of forced migration on Rohingya women and children. *International Migration Review*, 50(2), 238–257.
10. Kohl, R. (2020). The stateless Rohingya: International law, sovereignty, and human rights. *International Journal of Refugee Law*, 32(4), 657–678.
11. Lee, M. (2019). Statelessness, persecution, and migration: The plight of the Rohingya people. *International Migration Review*, 53(2), 199–224.
12. Lyon, A. (2017). The impact of Myanmar's ethnic policies on Rohingya migration. *Asian Studies Review*, 41(1), 10–31.
13. Shin, H. (2017). The Rohingya refugee crisis: Myanmar's military and the plight of statelessness. *Asia Pacific Journal of Human Rights*, 34(2), 115–138.
14. Suykens, F. (2013). The Rohingya refugees: Bangladesh's response and international policy. *Global Governance Review*, 8(4), 219–234.
15. United Nations. (2017). *Myanmar: UN probes evidence of genocide against Rohingya*. <https://www.un.org/en/genocideprevention/rohingya.shtml>
16. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). *The Rohingya refugee crisis: Challenges and responses*.
17. Waldman, T. (2018). The Rohingya refugee crisis: A growing regional threat. *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 354–377.
18. Zaw, A. (2016). Rohingya in Myanmar: A history of persecution and displacement. *Journal of South East Asian History*, 44(1), 27–42.

Pseudo-Secularism : A Hindu Nationalist Perspective on the Indian National Congress

Sanjay Biswas

Assistant Professor, Dept. of Political Science
Sundarban Mahavidyalaya, Kakdwip
South 24 Parganas, West Bengal

Abstract: The word 'secular' was not there in the original Constitution of India. The word 'secular' was adopted in the Constitution by the 42nd Amendment in 1976. The meaning of Secular is not defined in the Constitution. There are many articles which are inserted as a fundamental right in the part-III of the Constitution characterized as secular in nature. The articles give equality and liberty of all faith, believers or non- believers, theist or atheist. The freedom of religion of all faith irrespective of religion, race, caste, creed, class, sex or place of birth are guaranteed in the Constitution as the fundamental right. India has set an example in front of the world by its positive secularism where the state has no religion and it promotes every religion, it prohibits discrimination against members of a particular religion, race, caste, creed, class or place of birth. India therefore does not have an official state religion; every person has the right to profess, practice and propagate any religion. The government must not promote any religion or discriminate against it and must treat all religions in equal respect. The Indian Constitution highlighted the characteristics of its secularism by different Articles in Part III. Secularism demonstrates equality and is based on equal treatment of all religions as Sarva Dharma Sambhava, but unfortunately in recent times questions are being raised about Indian secularism. The practice of Indian secularism is now increasingly under threat. The Indian Congress party in the last few decades made policies and choices that compromised the secular credentials of India. These choices and policies of Congress enabled the BJP to gain political mileage in the Indian electoral arena. The erstwhile banned Hindu nationalists political outfit became the majoritarian party. The party often accuses the Indian National Congress for favoring minorities, especially Muslim and Christian. In their views Congress party do appease minorities for electoral gains. The paper will focus on appeasement policy undertaken by the so-called secular party of India, the Indian National Congress. The charges were often against the Indian National Congress by Hindu Nationalist parties. The pseudo-secularism is the same as favoring or giving due advantages to minorities for electoral gains.

Key Words: Secularism, Hindu Nationalism, Appeasement, Sarva Dharma Sambhava, Indian National Congress, BJP.

Introduction: In the Indian Constitution the word ‘secular’ was adopted by the 42nd Constitution amendment in 1976. Though the secular nature of the state is one of the principles of our democracy. According to the preamble to the Constitution of India, India is a secular state. It is a secular state because it is found to have the following characteristics. Indian state itself has no religion. Indian state bears no bias for any particular religion, it views all religions equally. According to Amal Kumar Mukhopadhyay, the preamble of the constitution of India says that India is a secular state as India state itself has no religion and bears no bias for any particular religion and treat all religions in equal eyes and state is strictly neutral in matters connected to religion. The right to freedom of religion, that is, the state is strictly neutral in matters relating to religion; and the Indian Constitution bestows the right to religious freedom to all, irrespective of whether they are citizens or non-citizens as written in Articles 25-28 of Part III of the Constitution (Mukhopadhyay, 2017a). All sections of citizens have the right to conserve the culture, language or script and the state can’t discriminate while giving aid to any educational institutions and the state cannot deny admission to any educational institutions run from the aid from the state fund (Mukhopadhyay, 2017b). The secular credentials are challenged many times in the Constitutional history of India. Actually secularism is a weapon for equal treatment of all but the idea of its philosophies are losing ground due to electoral gains. Sumit Ganguly (2014) opined that Hindu National parties are in possession of anti-secular weapons of secularists (Ganguly, 2014). The insertion of secular words in the preamble of the Constitution, the Saho Bano controversy, the Satanic Verses, the Hindu Code bill etc. are anti-secular steps taken by Congress party perceived as a minority appeasement. The article will analyze the appeasement policy and choices of the Indian Nationalists party as perceived by Hindu Nationalists party. The pacification or pampering of minorities as charged by BJP for giving undue advantage is termed the congress as pseudo-secularism. The article delves into the criticism of the secular idea of Indian National Congress by Hindu Nationalist party.

Pseudo-Secularism

It is a matter of surprise that the party which declares its secularism from house tops and is the first to berate communalism not only compromises with communal elements for political ends but unashamedly supports minority demands in the guise of protecting minority interests. If the country is to be saved from the tragedy of communalism, all parties must pledge to cleanse their

minds of all communal viruses (Vajpayee, 2007a). Secularism as perceived by Hindu nationalists is not preached by the Congress party. They criticize the Congress party as pampering the minorities and they follow the true secular principle. The bias and discriminatory attitude in favor of minorities especially Muslim are exposed at different points of time of Indian constitutional history. The Hindu Nationalist party denounced the Congress party as pseudo-secular because of its bias in favor of religious minorities. As early as the 1950s the Sangh Parivar criticized the Hindu Code Bill which reformed Hindu customs of marriage, adoption, and inheritance, whereas the shariat and the personal laws of other religious minorities remained untouched. This issue resurfaced in the 1980s during what is known as the Shah Bano affair, when the Congress was accused of pampering its Muslim vote bank by reaffirming the status of the shariat in regulating the private sphere of this minority (Vajpayee, 2007b). On the other hand Hindu nationalists opined that recognition of Muslims as minority community is a pseudo-secularism which they say is an endless appeasement and pandering of Muslims. The reservation of seats in civil and educational institutions and Shah Bano are evidence of pseudo-secularism government jobs for minorities. The religion-based reservations in civil and educational institutions are also seen as evidence of pseudo-secularism and are criticized to undermine merit (Tejani, 2008).

Pseudo-secularism is a weapon for gaining religious sentiments arising out of it. The Ayodhya controversy was another occasion when Hindutva party put in their manifesto the agenda of building Ram Mandir in place of erstwhile Babri Masjid built by Babar, the Mughal emperor.

There are many Laws of Hindu Community which are reformed, like Hindu Succession Act (1956), Hindu Marriage Act (1955), Hindu Adoption and Maintenance Act (1956) etc., while Muslim Personal Laws remain largely uncoded or unreformed. Rajiv Gandhi government overturned the Supreme Court ruling in 1985 by making Law in parliament in Shah Bano Case. “After Shah Bano case to the Congress, the people said contemptuously, secularism meant endless appeasement by the Hindus of never yielding Muslim fanaticism (Thakur, 1993a)”.

Role of Political Party in Shaping Secular Policies in India

The reformist idea of Hindu religion as discriminatory was argued in the 1950s by the socially conservative sections of Hindu opinion, and by political parties like the Hindu Mahasabha who were opposed to the idea of reform itself. But the fact that the use of state legislation to bring about reform in only the religion of the majority was creating a serious anomaly in the very notion of equal

citizenship was pointed out by only a few lone voices within the progressive section. One such belonged to J.B. Kripalani, the socialist leader, who argued:

‘If we are a democratic state, I submit we must make laws not for one community alone.....It also not the Mahasabhites who alone are communal: It is the government also that is communal, whatever it may say. Here Donald E. Smith also echoed the same. If they [the Members of Parliament] single out the Hindu community for their reforming zeal, they can not escape the charge of being communist in the sense that they favor the Hindu community and are indifferent to the good of the Muslim community or the Catholic community....Whether the marriage bill favors the Hindu community or places it at a disadvantage, both ways, it becomes a communal measure (Chatterjee, 1998).

BJP leveled charges against the Indian judiciary and Congress party for diverting from secular principles which are supposed to be positive Secularism. The protection of minorities and their rights and giving due advantages to minorities by making or amendment of constitution is vehemently protested at different points of time. R. Sunder Rajan and A. D. Needham, the policies that were designed specifically to protect minorities and their rights (Rajan & Needham, 2007).

We can here refer to the statement of a state chief minister who has said that, “The word secular is the biggest lie since independence. Those that have given birth to this lie and those that use it should apologize to the people of this country. No system can be secular. Political systems can be sect-neutral. If someone were to say that the government has to be run by one way of prayer, that is not possible. In UP, I have to look at 22 crore people and I am answerable for their security and their feelings. But I am not sitting here to ruin one community either. You can be sect-neutral but not secular (The Wire, 2017)”.

This position ends by giving a theoretical foundation to the charges of virulent Hindutva: the state needs a religious foundation and this can only be provided by Hinduism, the majority religion (or "true religion") of the Indian people. Hinduism is tolerant, Islam is not; the Congress and Left who proclaim secularism are ignoring the cultural and historical realities of India and so are "pseudo-secularists." Unless these theses can be dealt with at a theoretical and ideological level, it seems to me to be very difficult to deal practically with the Hindutva ideological challenge (Gail, 2003).

The Hindu Nationalist parties blamed the Congress party for favoring the minority communities, the reform of Hindu personal laws, the temple entry laws, the entry of untouchables in the Hindu temples etc. are discrimination against Hindu community. The Shah Bano case of 1985 when Supreme Court

gave judgment in favor for maintenance against the Muslim Personal Law Board. Rajiv Gandhi went to parliament and persuaded the Indian Parliament to pass a statute entitled Muslim women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986, to reverse the judgment to appease Muslim orthodoxy and gain Muslim vote banks. After the act the Hindu Nationalists party voiced against the act and protested vigorously (Tambia, 2008). The next nail in the coffin of secularism in India was the banning of the ‘Satanic Verses’ written by the Indian born Muslim Salman Rushdie. The book was banned to satisfy Muslim sentiment in India. The ban was a serious blow to the secular ideal of our nation, the right to freedom of expression is undermined.

According to Ramesh Thakur (1993), after the appeasement policy of Congress in Shah Bano and Salaman Rushdie case, Hindu communities were very angry. To suppress the anger and hatred Rajiv Gandhi open the door of Babri Masjid for worship at Ram Shrine in 1986, and in 1989 Rajiv permitted the performance of Shilanyas (laying foundation stone). Indeed he performed Shilanyas himself near Ayodhya at the start of 1989 election campaign. The Janata Dal government elected that year seemed to believe that it could forge an electoral alliance of backward caste and Muslim by expanding the affirmative action program further and encouraging fundamentalism among the latter. A former cabinet minister commented, a solution to the Ayodhya problem will remain elusive as long as the government is seen to be appeasing the minority fundamentalism. Majority fundamentalism can’t be contained by pampering minority fundamentalism (Thakur, 1993b)”.

Special laws for Muslims, such as those allowing triple talaq (now banned) and polygamy, are also considered as pseudo-secular and supporters of Hindu Nationalists demand an equal legal code for all communities including Muslims that is called Uniform Civil Code. In 2006, Manmohan Singh, then Prime Minister of India said that "We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. These must have the first claim on resources." during his speech at the 52nd meeting of the National Development Council. According to the critics, this later part of the statement goes against the idea of secularism which might state that each and every citizen of this nation must have an equal share in the resources of this country. BJP and RSS accused the Prime Minister of 'Muslim Appeasement (Times of India, 2006)”.

Hindu Temples are managed by the state government. Religious places of minority religions like Islam, Christianity and Sikhism are managed by their followers. India is a secular country but this secularism doesn't apply to all, here congress party from Nehru to the present government used the term to suit their

vote bank politics. When Karnataka Chief minister Basavaraj Bommai took the decision to liberate Hindu temples from state control and management, the furore arises. The Congress party had the credentials of playing an ambiguous role in secularism in India. From Nehruvian time the Hindu temples were under the state control through various means of laws and by-law's and regulations that is contradictory to the basic secular tenets of the Constitution. In other words, the Nehru government continued the British policy of controlling temples and dipping into their funds. This is considered as an example of Muslims, Christians, Sikhs and people from other religions utilizing constitutional guarantees and managing their own institutions. Why do Hindus not have this freedom? (Prakash, 2022).

Conclusion:

In Indian context, the term pseudo-secularism is used to pejoratively describe policies considered to involve minority appeasement. Majority of Hindus believe that those who seem to be acting secular and tolerant are actually not so, but are anti Hindu or pro-minority. On the other hand so called Hindu nationalist are called communal to counter blame for their critics. Pseudo-secularism policies taken by congress political managers may not be denied out rightly. There are numerous instances like special rights to Muslims in matters of personal law, Shah Bano case, triple talaq and polygamy are considered as pseudo-secular. Mandal Commission is another example of appeasement policy of V.P Singh to gain OBC vote bank. Indian secularism is under threat. These challenges come not only from hardcore nationalist but also from religion base, caste base, language base, regional base politics. It should be borne in mind that India has more serious challenges than the Mandir-Masjid issue. Poverty, unemployment, domestic violence, drug trafficking are serious challenges in Indian society. To win elections politicians are busy to outsmart their adversary and are engaged in vote bank politics. They are following a short cut method instead of a longterm enduring development plan in mind, because development does not bring enough votes in elections. So endless appeasement policies were undertaken since independence of the Indian nation without any suggestion as to how to convince or pressure the state to do so, this remains a pious hope.

References:

- Chatterjee, P. (1998). Secularism and Tolerance. In Rajeev Bhargava, (Ed.), *Secularism and its Critics*, OUP, p.361
- Gail, Omvedt. (2003, January 20). Pseudo Secularism I. *The Hindu*.
- Ganguly, S. (2014). The Crisis of Indian Secularism. *Journal of Democracy*, John Hopkins University Press, Vol. 14 (4),11-25. DOI. 10.1353/jod.2003.0076.

- <https://www.thehindu.com/2003/01/20/stories/2003012000481000.htm>
(Retrieved on 07.02.2019)
- Mukhopadhyay, A.K. (2017a). A Journey Across the Indian Constitution. *Sreedhar Publishers*, Kolkata, p.85
- Mukhopadhyay, A.K. (2017b). A Journey Across the Indian Constitution. *Sreedhar Publishers*, Kolkata, p.88
- Prakash, Surya. (2022, January 14). Why should the government run Hindu temple? *The Indian Express*.<https://www.newindianexpress.com/opinions/2022/jan/14/why-should-the-government-run-hindu-temples-2406605.html>
- PTI. (2006, December 9). Muslims must have first claim on resources, *Times of India*.
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/muslims-must-have-first-claim-on-resources-pm/articleshow/754937.cms> (Accessed on 4th October, 2022)
- R. Sunder Rajan and A. D. Needham,T (2007). *The Crisis of Secularism in India*, Duke University Press, p.16
- Tambia, Stanley J, (1998). The Crisis of Secularism in India. In Rajeev Bhargava, (Ed.), *Secularism and its Critics*, OUP, pp.430-32
- Tejani, S. (2008). *Indian Secularism: A Social and Intellectual History*, 1890-1950, Indiana University Press.pp.8-9
- Thakur, Ramesh (1993a). Ayodhya and the Politics of India's Secularism. *Asian Survey*, Vol. 33, No.7, South Asia, July, p.650
- Thakur, Ramesh (1993b). Ayodhya and the Politics of India's Secularism. *Asian Survey*, Vol. 33, No.7, *South Asia*, July, pp.655-56
- The Wire Staff, (2017 November 14). Secularism is the biggest Lie Being Told in India. *The Wire*. <https://thewire.in/196767/adityanath-bjp-secularism-lie-uttar-pradesh>
(Retrieved on 07.2.19)
- Vajpayee, A. B. (2007a). The Bane of Pseudo Secularism. In Christophe Jaffrelot, (Ed.), *Hindu Nationalism: A READER*, Princeton University Press. p.318
- Vajpayee, A. B. (2007b). The Bane of Pseudo Secularism. In Christophe Jaffrelot, (Ed.), *Hindu Nationalism: A READER*, Princeton University Press.p.313.

National Education Policy : School Education Structure

Sk. Ruby Akhter

Assistant professor, Dept. of D.El.Ed.
Madhyamgram B.Ed. College, Kolkata

Abstract: There is a need for a specific policy in the Indian education business emerged much later, we got independence in 1947, then in 1964, the Kothari Commission was formed with 17 members, according to their recommendations, the National Education Policy came first in 1968. Then after a long 18 years, in 1986, there was some change, and then after a long 34 years, our country got a new National Education Policy. In this policy, the HRD Ministry changed to the Education Ministry, then it was named the Education Ministry. Among the various policies of the education system, a new education policy announced by the Government of India is this NEP-Twenty Twenty. The awareness that there is a need for a specific policy in the Indian education business emerged much later, we got independence in 1947, then in 1964, the Kothari Commission was formed with 17 members, according to their recommendations, the National Education Policy came first in 1968. Then after a long 18 years, in 1986, there was some change, and then after a long 34 years, our country got a new National Education Policy. In this policy, the HRD Ministry changed to the Education Ministry, then it was named the Education Ministry. Among the various policies of the education system, a new education policy announced by the Government of India is this NEP-2020.

Key word: Children, Education, NEP, Policy, Recommendation, Student.

Introduction: NEP 2020 brings a great education policy for the students of India which is the key to a successful education system and a bright future for the students. The education frame work states that three years of preschool and the current 10+2 system to be replaced by a new 5+3+3+4 curriculum. The Ministry of Human Resource Development (MHRD) was announced on 2nd July 2020. NEP 2020 is based on the principles of access, equity, quality, affordability and accountability.

The NEP 2020 policy states that every school will have education in regional languages and mother tongue up to class five. Which is recommended up to class eight. According to the policy, many educationists support education through mother tongue, such as Baker in his statement 2011 supports education

through mother tongue. Kamiz in his third statement 2001 said that education through mother tongue nurtures cultural heritage in students. Benson in his statement said that the student can learn any subject well through this language by loving his own mother tongue. NEP 2020 Education Policy says that Vocational Education to Start for Class 6.

This education policy also states that there will be no separate divisions called Science, Commerce, Arts. UG education can be off 3 or 4 years with multiple exceed options and appropriate certification within this period.

- If students later stop for any reason, they can start again from there.
- Graduation will be a certificate course for one year, a diploma for the second year and a graduation degree for the third year. Later, they will be able to graduate, there will be a specific time in between.
- Students will play a role in creating their own report cards. Now, students do it. According to the new rules, there will be three stages for evaluation. First, they will evaluate themselves, second, their classmates will evaluate, and third, the professors will evaluate.
- Flexibility in the Curriculum: Students can choose the subjects they like.
- Those who have a four-year degree in M.A. and M.Sc. will be able to do MA and M.Sc. in one year. It will be like an integrated degree. There will be many benefits for the students.
- Students will have the opportunity to do PhD but there will be no MPhil.

Discussion:

Early Childhood Care and Child Education at the Early Stage

1. Foundational stage:

A child's brain development is mostly completed by the age of five. During this time, the child needs proper nutrition and care because through his growth and development, he starts learning various subjects. Therefore, the Government of India decided to revamp the plan in NAP 2020 to educate children at the right age through the right education. The Government of India talks about 5+3+3+4 in the new education system. The first five years can be divided into three parts - Ages 3-6 There are three years of preschool at this time. There is no pressure on children. They start learning to paint, play, and do recreational activities.

2. Preparatory stage:

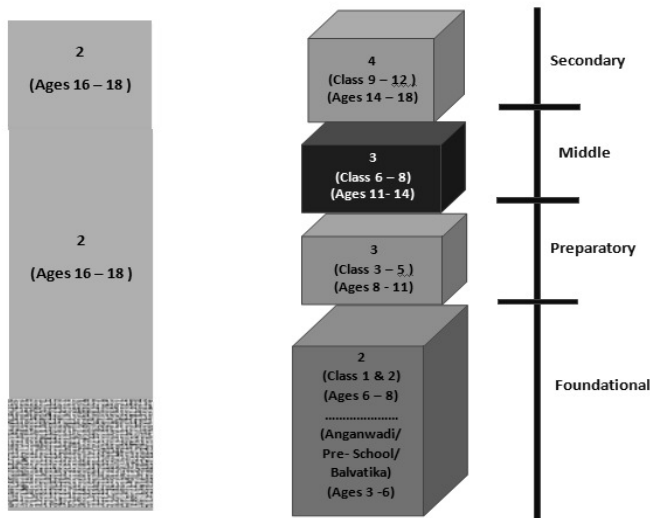
The Indian government has said that the exams will start in this stage from class 3 to 5 and at this time the students will be taught in the regional language, so if a student wants, they can study in English medium.

3. Middle Stage:

class 6 to 8 This is the three-year period of this stage. At this time, students will have to study an Indian language, in addition to computer education, vocational education, math science. The education of students will be child-centered, the infrastructure will be consistent and the teachers will be cooperative, compassionate and patient. Here, various types of school activities have been mentioned so that the students do not feel any kind of mental pressure.

4. Secondary Stage:

class 9 to 12 At this time, the education system has been changed from annual to semester system. There will be no restrictions in the secondary stage, those who want to choose a subject, for example, one from science to another, in this way, the student can develop himself in the way he likes through the subject. Earlier, all nine and ten studied the same subject, but now there are no restrictions in the different parts of science and commerce.



After surveying five nearby primary schools and five secondary schools, I found that the education system infrastructure is facing many challenges as per the recommendations made in NEP 2020. Financial assistance is a big problem and

there is a shortage of adequate number of teachers and lack of awareness among the parents. If the work is completed according to the NEP 2020 policy, India will become a new educated and bright country through the students.

Literature Review:

1. A. Kumar-University of South Florida (USF) M3 Publishing 2021 digitalcommons.usf.edu : NEP 2020 is the first major attempt to raise awareness about India.
2. R. Govinda – 2020- journals.sagepub.com :In the case of India, all the proposals that were made in some areas are highlighted again in NEP 2020.
3. A. Saxena - MULTIDISCIPLINARY RESEARCH VOLUME-2 2021researchgate.net. : This study is presented to the reader in various aspects to change the map of education in populous India.
4. P. Kalyani Journal of Management Engineering and Information.... The new National Education Policy 2020 gives a statement on the various implications of this policy.
5. International Journal of Manti Disciplinary..., 2021 academia.edu Gives his statement on the bright future path of students in higher education and suggests for further improvement.
6. S. Smitha international Journal of Management (IJM), 2020-academiaedu - The statement is in line with the recent call of the Prime Minister. He said that India should improve this law.
7. NEP, 2020...S. Khatak, Hwadhwa, R. Kumar-International Journal of ..., 2022-researchgate.net: It shows the depth and spread of the policy among the people of India. This survey questionnaire was administered uniformly to 101 people.

Education Planning:

The main goal of education planning is to provide all-round development of students and equal opportunities, flexibility, etc. for all, so the curriculum will be such that it is a blessing for the students.

Teaching Learning and Assessment:

In NEP 2020, special emphasis is given to the overall and skill-based assessment of students, and special attention is paid to keeping rote learning away.

Administration and Management:

The Indian government has talked about a more flexible holistic child - centred education system and has talked about keeping in mind the special needs of backward children.

NEP 2020 not only provides literacy to students but also develops moral, social and mental abilities and cognitive and physical abilities, the

government says. This education policy should be at the centre of fundamental reforms. The teacher will be the craftsman. This new education policy will definitely help re-establish teachers as responsible and indispensable members of society because teachers play an important role in educating the students of our society. This education system has been said to educate and provide facilities to backward groups and disabled children equally. One of the main objectives of this policy is to develop craftsmen who are capable of working, rational thinking and possess empathy and compassion, courage and scientific temperament to build a good society.

Research on the reasons why school dropouts occur and the curriculum, school mid-day meals, etc. play an important role in making them educationally oriented, so the authorities are advised to keep an eye on these aspects. According to NEP 2020, who have dropped out of school, arrangements for their return and special emphasis on the socio-economically disadvantaged population, the scope of school education will be further expanded to include multiple learning paths associated with the education system for the benefit of successful students.

Conclusion:

This new infrastructure by the Indian government in the school education system can bring huge positive changes, but during the data collection, it was observed that many aspects of this new policy are still facing challenges in schools. Which can be achieved with the efforts of the government, teachers, students, parents and all the people of the society. The NEP 2020 Act proposed by the Government of India is a big step towards lighting a bright island of progress in the education system in our populous India, that is, to build the quality of education. The completion of the tasks of this policy is a big goal and to make arrangements so that students and education improve in the education system. This policy of the government does not only talk about textbook knowledge to the students, but also focuses on upskilling the students' new skills, creativity, etc. This policy also focuses on technical education. The objective of this study is to increase the quality and relevance of education at all levels. If the path shown by the Government of India is implemented correctly, by 2030, the education system of India will undergo a positive change and a beautiful society will be built.

References:

1. R. Govinda- 2020 journals.Sagepub.com.
2. www.youtube.com/@LetsLEARN2016.
3. R. Govinda- 2020 journals.sagepub.com.

4. A. Kumar University of South Florida (USF) M3 publishing 2021 digitalcommons.usf.edu.
5. P. Kalyani Journal of Management Engineering and hformation... 2020 resrarchgate.net.
6. <https://youtu.be/ie-8iU-K7Tg?Si=EuzcjSxZdSd00XSOhttps://youtu.be/ie-8iU-K7Tg?si=EuzciSxZdSd00XSO>.
7. A. Saxena - MULTIDISCIPLINARY RESEARCH VOLUME-2 2021 researchgare.net.
8. S. Smitha-International Journal of Management (IJM), 2020-academia.edu.
9. N. Khatak, Hwadhwa, R. Kumar-International Journal of...,2022 researchgate.net.

Navigating the Fog of Reason : Kant's Search for Certainty

Souvik Dutta

State Aided College Teacher, Department of Philosophy
Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah

Abstract: Immanuel Kant (1724–1804), a pivotal German philosopher, devoted his life to exploring various branches of philosophy, leaving a profound impact on the field. His notable work, *Critique of Pure Reason* (1781 and 1787), introduced a revolutionary epistemological approach, emphasizing the systematization of knowledge. In the wake of the Enlightenment, the pursuit of certainty became both a philosophical imperative and a source of anxiety. His *Critique of Pure Reason* stands as a monumental response to this quest, seeking to chart a course through what he himself called the “fog” that envelops metaphysics. This paper explores Kant’s endeavour to secure the foundations of knowledge by critically examining the limits and capacities of reason. The metaphor of navigating fog serves as a conceptual lens to illuminate Kant’s dual ambition: to rescue metaphysics from scepticism while preventing it from drifting into speculative excess. By critically engaging with Kant’s epistemological framework, this paper underscores the enduring relevance of his project in an age still grappling with uncertainty and the limits of human understanding.

Keywords: Fog, Rationalism, Empiricism, Epistemological, Speculation.

I

Immanuel Kant published his first *Critique, Critique of Pure Reason* (CPR-I) in two editions – one in 1781 and others in 1787. The gravity as well as quantity of his work were very deep rooted and extensive. Due to this, people often find that writings of Kant are very difficult to penetrate. His philosophical works follows a system. According to him, a system means the unity of manifold modes of knowledge. In his whole life, his philosophical works follow this system very judiciously. In his two editions of First *Critique*, we find some modifications but the central purpose of writing this one was same. In this *Critique*, we find an epistemological turn that opens a new horizon in the field of philosophy.

It was the middle of the eighteenth-century philosophy when we find a situation that is very much hostile. And if we follow the philosophical career of Kant, we will find that he started his career by following Christian Wolff (1679 –

1754), a German rationalist philosopher of the Enlightenment. Though his chief interest was mathematics, yet he acquainted with both Lutheran and Calvinist dogmatic theology. And the traditional follower of Aristotle also left important traces on it. It is very much true that Wolff was not an original philosopher, nearly all of his ideas were derived from his predecessors but as a system-builder his achievement was enormous. His work provided a systematic frame to other thinkers also. According to Wolff all principles and facts derive from two universal principles - the principle of identity and the principle of sufficient reason. Actually, he wants to say that the study of philosophy tinged with essences. But now the question will come in our mind how will we deal with finite beings. His answers that the existence of finite beings is nothing but the completion of possibility. These are not an object of science, but of history or observation, because existence depends on the free choice of God.

In 1770's Europe we find some systematic philosophers like J.H. Lambert (1728 – 1777) and Kant. Kant felt very firmly that there were inadequacies in the thought of Wolff though he started his philosophical career as a rationalist by following Wolffian school. Kant himself had been trained in the rationalistic metaphysical tradition of Gottfried Leibniz (1646-1716) and his disciple, Wolff. But when he was thwarted by the thought of Wolff, he turns his concentration towards external world. It was very much clear to Kant that like spiders we cannot weave out fancies and regard them to be valid of the real world. He recovers himself from the trance of rationalism that proclaims that all *a priori* truth must, at least in principle, be truths of reason. Knowledge may derive from experience but this outcome of cognition is not certain. It is very much vacillating. But here Kant felt a doubt. And due to this reason, he turns towards external world. Here whom he acknowledges in his thought, was none but David Hume (1711-76). Kant gives credit only Hume who woken him from his dogmatic slumbers, because the writings of Hume open a new path in his career.

David Hume in his writing, *Enquiry Concerning Human Understanding* describes that this thought is acceptable that *a priori* truths must be derivable from logic. In Kant's philosophy, these are called analytic. But logic, according to Hume, deals with relations of ideas. If we take a simple subject predicate judgement, Kant says, the relation between subject and predicate may be thought of in one or two ways. Either the predicate is (covertly or overtly) contained in the concept of the subject, or the predicate stands outside the subject-concept. If we take the first one, the judgement will be analytic but the later one is synthetic. When we say "All men are men", this judgement according to Kant is tautologous. And according to Kant these are useless.

We know that main aim of Kant's philosophy is to analyse the human knowledge and its conditions that is keenly related to his epistemological thought. Getting a blow from the rationalism, he gets some oxygen from Hume. But at the same time, it is very much true that our concepts that are derived from experience have no such power to transcend experience as it belongs to a particular spatio-temporal domain.

Kant here also gets the second blow from David Hume. Hume in his philosophy has made a mental geography. Here he made an accurate scrutiny into the powers and faculties of human nature. And it is worth mentioning here that 'mental geography', this nomenclature of Hume was transformed by Gilbert Ryle into the notion of a "logical geography".¹

Kant's critical mind is like a *Sherpa* who is dissecting everything in the path of knowledge like Hume. According to some critiques like Jacobi, Hume had performed an important service regarding the pretension of natural theology. From the standpoint of Hume God is an affair of heart, not of reason. And in the same way, according to him the field of knowledge is restricted to objects of possible experience. Till this point Kant follows Hume, but after this Hume's inherent defects were highlighted by him.

Now if we follow classical empiricism, what we are getting. If we follow Hume and make an argument that reason is subordinate to feeling and it has only an instrumental value, then how the discrete and passing manifold of sense-impressions will be ordered. Without this order, there could be no knowledge. Kant from very outset kept it in his mind that knowledge means certain knowledge because it was clear to him that mathematics and physics give us certain knowledge. Here he was highly influenced by a natural scientist, Isaac Newton because scepticism of Hume (denial of knowledge) seemed to him equally dogmatic, and utterly implausible as rationalists.

The quantum mechanics shows that there are some mistakes in Newtonian or classical mechanics. Yet it is true that Newtonian physics was founded on some axioms or laws. Within a certain limitation, Newtonian physics is still valid. Roger Boscovich (1711-87) gave a new version of Newtonian mechanics. According to him, all forces – even those by which one body repels another on contact (impenetrability) – were reduced to attractive and repulsive forces acting at a distance. However, explanations in terms of action at a distance became respectable and even preferred in the eighteenth century.

Here we find a chord that is tinged with Kant. Natural did action at a distance fall a light on Kant. By getting this clue he started to open a new dimension in the arena of epistemology, which is known in western philosophical world as Copernican Revolution. His investigation is probably the

most through going and deepest analysis of the nature of knowledge. According to him there are certain fundamental concepts and these are the building blocks of knowledge. Kant's demands are that knowledge always requires the application of concepts to the sensible intuitions that are related to direct experience. The two chapters "Transcendental Aesthetic" and "Transcendental Analytic" of CPR – I establishes the general claim that knowledge is a confluence of two things – one is intuitions and concepts and in addition to that we find in these two chapters that there are two pure forms of intuitions – space and time. These are the pure forms of all sensible intuitions. On the other hand, categories are the pure forms for all concepts of objects. Thus, according to Kant, the pure forms of intuition and the categories, and the principles are necessary a priori conditions for all determinate knowledge of objects.

Kant in his First *Critique* raises the point how synthetic *a priori* judgement is possible. And it is one of the main objectives of first *Critique*. It is also called the central problem of CPR– I. In the Preface to the second edition of the *Critique of Pure Reason*, Kant writes that the "general" and "real" problem of pure reason is contained in the question: How are synthetic Judgements *a priori* possible? And keeping this central problem in his mind Kant in his first *Critique* raised some parallel questions likehow are synthetic judgments *a priori* possible in mathematics, physics and metaphysics?

In order to answer all these questions, Kant was very much aware that we should know our limitations. We cannot transcend our experience. The concepts we use in thinking about what may lie beyond nature, beyond our understanding, are called by Kant rational ideas or ideas of reason. Reason here no longer means our cognitive power as a whole, as it does in the title of the first *Critique*, but is used in a narrower sense. Now it is very much clear from our above discussion that Kant has used a methodology that is very keen. By following this methodology, he is showing where is the problem of his previous thinkers' especially classical rationalists and empiricists. And after that he is showing that dogmatism and scepticism are the two toxins for which the previous philosophers fail to build a concrete castle of knowledge. He was agreed with Hume that dogmatic rationalism fails to establish knowledge but at the same time he was little bit confused about Hume as Hume also dogmatic according to Kant. Here Kant is very much liberal, one side he is focusing the negative side of his predecessors and at the same time he is not reluctant to show the positive side. According to him CPR – I is like a tribunal where reason will make a rightful claim as well as it will diminish all baseless pretensions. It is a critique of reason itself. It is very much true that our knowledge, according to him, is strictly relevant to this sensible world. And it is very clearly and

distinctly referred in his CPR - I. But at the same time, it has been clarified that our representation of *things-in-themselves* (God, Immortality of soul, and our freedom) proclaim a prominent role in our lives. According to him, we can think of it but we cannot know them. In this juncture, we will now proceed to another vital section of CPR-I.

II

In the last chapter of Kant's First *Critique*, Kant discussed 'The Transcendental Doctrine of Method'. One of the sections of this chapter is 'The *Canon* of Pure Reason'. Now the question - what is *Canon*? A *Canon* is the *apriori* principles of certain faculty of knowledge. The Transcendental Analytic can be identified as a canon of the pure understanding. Hence it treats the categories and the systematic *apriori* principles derived from the understanding and shows that their valid use consists in making experience possible. That means, if there is no correct use of a faculty of knowledge than there is no *canon* for it. In the Dialectic of CPR-I, we have seen the same picture. The theoretical use of pure reason is unjustified and as a result we cannot have a canon of it in its theoretical employment. If we want to have a canon of pure reason, then it must be concerned with its practical employment. And Kant in this section has explained the practical use of pure reason. We may say that this section contains the only positive contribution of pure reason. If we completely dissect the canon of pure reason, we will find that it consists a list of the supreme moral laws. In essence, we can say that it is a condensed theory of his morality that has been clarified very vividly in his second *Critique*, *Critique of Practical Reason* (CPR-II).

Kant says Human reason, though initially disheartening in its pure application, undergoes a humbling realization that it requires disciplined regulation to curb its excesses and shield itself from resulting deceptions. Paradoxically, this discipline offers reassurance and boosts self-confidence to reason. It discovers that it has the capacity and necessity to apply this self-discipline, free from external censorship. Furthermore, the imposed limits on its speculative pursuits not only rein in its own exaggerated claims but also serve as a check against the pseudo-rational assertions of its adversaries. In essence, the primary and perhaps singular utility of pure reason in philosophy is fundamentally negative. It functions not as an instrument for expanding knowledge but as a regulatory framework that restrains pure reason, modestly excelling in preventing errors rather than uncovering absolute truths. He says, "There must, however, be same source of positive modes of knowledge which belong to the domain of pure reason, and which, it may be, give occasion to error solely owing to misunderstanding, while yet in actual fact they form the goal towards which reason is directing its efforts. How else can we account for our

inextinguishable desire to find firm footing somewhere beyond the limits of experience? Reason has a presentiment of objects which possess a great interest for it. But when it flowers the path of pure speculation, in order to approach them, they fly before it. Presumably it may look for better fortune in the only other path which still remains open to it, that of its *practical* employment”.²

Kant discussed the practical use of pure reason, because the *Canon* will not deal speculative but with the practical employment of reason. That is now going to be considered. He also says the ultimate aim of speculative reason is the solution of the questions concerning God, freedom and immortality. These are the postulates of morality or we can say these three are the cardinal propositions that are not at all necessary to us for knowledge. Theoretically we are not capable to deal with all these three. For our ideas of these things are regulative ideals. ‘God exists or the soul is free or immortal’ these types of propositions does not represent any theoretical knowledge. Here Kant is restricting knowledge and giving the way to faith, rather we can say Kant here opens up a new vista that is a room for faith. These questions are very much important in our practical life. Kant says that the ultimate goal toward which speculative reason, in its transcendental application, is oriented revolves around three presuppositions: the freedom of the will, the immortality of the soul, and the existence of God. Concerning all three, the speculative interest of reason is minimal, and solely for its sake, we would scarcely embark on the arduous task of transcendental investigation. This endeavour involves grappling endlessly with insurmountable difficulties. Even if discoveries were made regarding these matters, they would be of little practical use in the study of nature. Should these will indeed be free; its relevance would be limited to the intelligible cause of our volition. As for the outward expressions of our actions, we must explain them, following a fundamental maxim inherent in reason, applicable to all natural phenomena – conforming to unchangeable laws. If insight into the spiritual nature of the soul and its immortality were obtained, such understanding could not be applied to explaining either the occurrences of our present life or the specific nature of the future state. Our concept of an incorporeal nature is essentially negative, adding little to our knowledge and providing insufficient material for legitimate inferences, leading only to fictitious conclusions unsanctioned by philosophy.

Furthermore, if the existence of supreme intelligence were proven, it might make the purposive aspects of the world's constitution and order generally comprehensible. Yet, this would not justify deriving any particular arrangement or disposition from it without direct perception. A necessary rule in the speculative use of reason is to not bypass natural causes. We must not abandon

the realm in which experience can instruct us, deducing something we know from something that transcends all our possible knowledge.

In essence, these three propositions are always transcendent for speculative reason and do not permit immanent application – that is, application concerning objects of experience that would genuinely serve us. Despite the considerable intellectual burdens they impose, they remain inherently unproductive. According to Kant, our whole endeavour of reason in this regard goes into futility and we do not have any interest to bargain on it.

Now the point will arise if these three cardinal propositions have no such contribution to knowledge, then there must be some other importance. And this importance is keenly practical. Kant says, “By ‘the practical’ I mean everything that is possible through freedom. When, however, the conditions of the exercise of our free will are empirical, reason can have no other than a regulative employment in regard to it, and can serve only to effect unity in its empirical laws. Thus, for instance, in the precepts of prudence, the whole business of reason consists in uniting all the ends which are prescribed to us by our desires in the one single end, *happiness*, and in coordinating the means for attaining it. In this field, therefore, reason can supply none but *pragmatic* laws of free action, for the attainment of those ends which are commended to us by the senses; it cannot yield us laws that are pure and determined completely *apriori*. Laws of this later type, pure practical laws, whose end is given through reason completely *apriori*, and which are prescribed to us not in empirically conditioned but in an absolute manner, would be products of pure reason. Such are the *moral* laws; and these alone therefore, belong the practical employment of reason, and allow of a canon”.³

Section – II of Canon, ‘The Ideal of the Highest Good, as a Determining Ground of the Ultimate End of Pure Reason’, in this section, Kant raises three questions -these are, what can we know? what ought we to do? what may we hope? Kant says that these three questions are structured in a blended mode if the first one is merely speculative then the other two questions are fundamentally practical. Kant’s own observation regarding first one is like this - “The first question is merely speculative. We have, as I flatter myself, exhausted all the possible answers to it, and at last have found the answer with which reason must perforce content itself, and with which, so long as it takes no account of the practical, it has also good cause to be satisfied. But from the two great ends to which the whole endeavour of pure reason was really directed, we have remained just as far removed as if through love of ease we had declined this labour of equality at the very outset. So far, then, as knowledge is concerned, this much, at

least, is concerned and definitively established that in respect of these two latter problems, knowledge is unattainable by us”.⁴

Now, let us address the second question, which is entirely practical. While this question falls within the scope of pure reason, it is not transcendental but moral in nature.

The third question, on the other hand, is both practical and theoretical. Here, the practical aspect serves as a guiding clue that helps us arrive at an answer to the theoretical question. Moreover, the theoretical question surpasses the speculative one. Kant explains that "all hoping directed to happiness" is closely linked to the practical and moral law, just as knowledge and the laws of nature relate to the theoretical understanding of things. Ultimately, the practical question leads to a final conclusion: hope, at its core, determines an ultimate possible purpose—the belief that something higher exists.

It is well established that hope is tied to happiness, which can be understood as the fulfilment of all our inclinations. The popular Indian Kant scholar, prof. *Rasvihary Das* says, “Besides the practical law of prudence there is the moral law which says, not how happiness is to be attained, but how we shall behave in order to be worthy of happiness”.⁵

Happiness, in this context, is associated with pragmatic laws or rules of prudence that are grounded in experience, fulfilling natural conditions. However, experience is not connected to the moral law, as the moral law is not derived from experience but is dictated by pure reason. This moral law presupposes the possibility of a moral world. Pure reason or moral law commands us categorically, and through this command, our motives are directed toward happiness. If we obey the moral law with the intention of attaining happiness, our actions cease to be moral, as they are driven by external considerations. True morality arises when we act in a way that makes us worthy of happiness. In such cases, we align ourselves with an ideal state—a moral world in which happiness flows naturally. This demand for happiness can only be satisfied under the governance of supreme reason, representing the ideal of the highest good. The supreme good links virtue and happiness, asserting that virtue should be rewarded with happiness. This moral demand forms the foundation for the belief in the existence of God. However, speculative theology encounters obscurities in addressing this conviction, as sufficient logical evidence regarding the existence of God remains inaccessible

The answer of these three questions is that we can hope to reap the reward of our virtuous conduct in a future world under the wise rule of an omniscient, omnipotent, eternal being that we call God. The idea of God is considered as the replica of moral law. But we do not assume that moral laws might as well be

deduced from the idea of God, because at the time of moral consideration, we have no concept of God. Firstly, frame the concept of laws. Then we should not suppose that the moral law is like a binding on us because it is God's command. We should rather regard it as being the command of God, because we felt ourselves inwardly bound by it. Moral theology mere continues to give us a theoretical knowledge of transcendent reality like God. It uses only practical. In this context we are adapting ourselves to the idea of moral world and its requirements. This requirement is fulfilled in Kantian system. That means reason associates the practical consideration of God.

Kant says, "Accordingly we find, the history of human reason, that until the moral concepts were sufficiently purified and determined, and until the systematic unity of their end was understood in accordance with these concepts and from necessary principle, the knowledge of nature, and even a quiet considerable development of reason in many other sciences, could give rise only to crude and incoherent concepts of the Deity, or sometimes happened resulted in astonishing indifference in regard to all such matters. A greater preoccupation with moral ideas, which was rendered necessary by the extraordinary pure moral law of our religion, made reason more acutely aware of its objects, through the interest which it was compelled to take in it. And this come about, independently of any influence exercised by more extended views of nature or by correct and reliable transcendental insight (for that has always been lacking). It was the moral ideas that gave rise to that concept – and we so regard it not because speculative reason convinces us of its correctness, but because it completely harmonious with the moral principles of reason. Thus, it is always only to pure reason, through only its practical employment, that we must finally ascribe the merit of having concerned with our highest interest a knowledge which reason can think only, and cannot established, and of having thereby shown it to be, not indeed a demonstrated dogma, but a postulate which is absolutely necessary in view of what are reason's own most essential ends".⁶

From the depths of public morality, Kant's universal and benevolent historical consciousness has emerged, intertwined with political acceptance. The essay claiming discussion in this case is titled 'Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View'. Built upon the foundation of the total notes of the paper, this cosmopolitan historical thinking is constructed, and within them, the eighth paper articulates clearly in language conducive to the complete development of human society. A heartfelt call is made in this paper for establishing cordial relations among various states. According to him, this development will be accomplished according to nature's secret plan. Nature - history - within humans will emerge a harmonious triangular relationship. They

also say the trajectory of human history unfolds as the revelation of nature's covert blueprint, aimed at establishing an ideally structured society conducive to the fullest development of human potential. Simultaneously, it seeks to foster a harmonious interplay among states, precisely tailored to facilitate this overarching objective.

So it is proved that, Kant's *Critique of Pure Reason* stands as a monumental inquiry into the conditions and limits of human knowledge, marking a profound shift from traditional metaphysics to a critical epistemology. His methodological rigor, reflected in the transcendental approach, exposes the inadequacies of both rationalist dogmatism and empiricist scepticism, while striving to secure the possibility of synthetic a priori judgments. Engaging with predecessors like Wolff and Hume, Kant does not merely critique but reconstructs the philosophical landscape, establishing reason not only as a cognitive faculty but as a moral compass that points toward the highest good. The practical application of pure reason, particularly in its moral and theological dimensions, allows Kant to reconcile the speculative limits of knowledge with the rational grounds for hope, virtue, and moral law. Thus, through his critical philosophy, Kant paves the way for a unified vision of reason—one that binds the empirical, the rational, and the moral into a coherent and purposeful whole, ultimately serving the progress of humanity both intellectually and ethically.

References:

- 1) Hume David, Intro. J. N. Mohanty, 1990, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, Calcutta Progressive Pub, pp. 16
- 2) Smith K. Norman (Trans.), 1964, *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*, London, Macmillan & Co LTD., pp. – 629
- 3) Ibid, pp. – 632
- 4) Ibid, pp. – 635
- 5) Das Rasvihary, 2013, *A Handbook to Kant's Critique of Pure Reason*, Calcutta, Progressive Pub, pp. – 218
- 6) Smith K. Norman (Trans.), 1964, *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*, London, Macmillan & Co LTD., pp. – 643.

Impact of flood hazards on fruits and flowers cultivation in Nadia district

Ujjal Roy

Assistant Professor, Dept. of Geography
Sundarban Mahavidyalaya
Kakdwip, South 24 Parganas

Abstract: The price of fruits is very high in the market. So the farmer can easily earn too much money by the production of fruits. But floodwater damages very quickly the plants of fruits and flowers. So, the person related to agriculture faces heavy losses during the flood and the price of those commodities hike very fast in the market. Farmer reduces the land for flower cultivations according to the volume of floods. Mainly area for cultivations of flowers highly depends on the floods in Nadia district. State and district Disaster Management Plans have been prepared & regularly updated towards strengthening response of disaster management.

Key words: Fruits, flowers, cultivation, market, floods, management.

Discussion:

1. Introduction

Fruits are the means by which angiosperms disseminate seeds. Edible fruits, in particular, have propagated with the movements of humans and animals in a symbiotic relationship as a means for seed dispersal and nutrition; in fact, humans and many animals have become dependent on fruits as a source of food.¹ Fruits and vegetables also are very important agricultural commodities. However, in botany, a fruit is the ripened ovary or carpel that contains seeds, a nut is a type of fruit and not a seed, and a seed is a ripened ovule.² Different types of fruits are produced here like guava, papaya, coconut, etc. The price of fruits is very high in the market. So the farmer can easily earn too much money by the production of fruits. Nadia district is also famous for vegetable productions like pumpkin, long beans, cauliflower, cabbage, drum sticks, etc. Vegetable cultivations are also good for a regular income to the farmers. But floodwater damages very quickly the plants of fruits and vegetables. So, the person related to agriculture faces heavy losses during the flood and the price of those commodities hike very fast in the market. So, to explain the impact of flood hazard on the agrarian economy it is a good way to analyse the condition of fruits & vegetable production in the time of the flood.

2. Regional location

The study area that has been selected is the district of Nadia in west Bengal bounded between latitudes, $22^{\circ}53' N$ and $24^{\circ}11' N$ and longitude from $88^{\circ}09' E$ to $88^{\circ}48' E$, covering an area of 3,927 square km, which is located at the lower deltaic plain and surrounded by Murshidabad on the north & north-west, on the east by Republic of Bangladesh-length of common international border is 265 KM., On the south & south-east North 24 Parganas and on the west by East Burdwan and south-west by Hooghly.

LOCATION MAP OF STUDY AREA

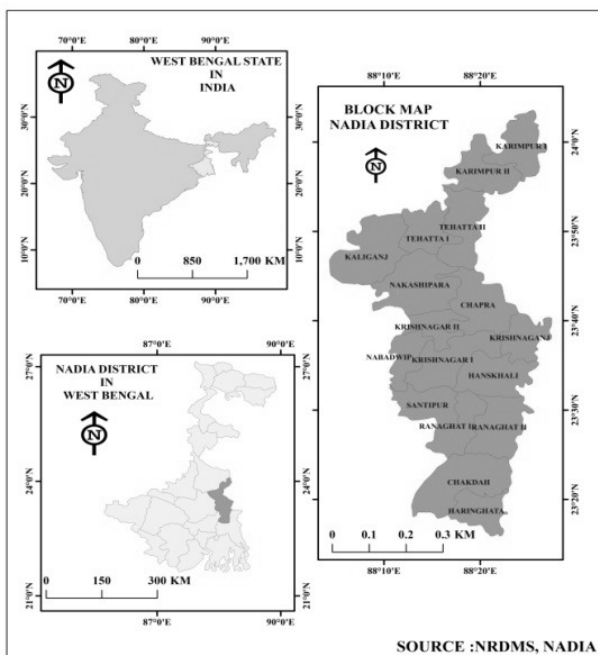


Fig.1.1

3. Area of fruits and vegetables cultivation in Nadia district

Many “vegetables” in culinary parlance are botanical fruits, including bell pepper, cucumber, green bean, okra, pumpkin, squash, tomato, and zucchini.³ Olive fruit is pressed for olive oil. Spices like allspice, black pepper, paprika, and vanilla are derived from berries.⁴

Table1.1 Nadia district: area for cultivations of fruits & vegetables

YEARS	AREA FOR FRUITS	AREA OF VEGETABLES
2009-10	21.11	82.46
2010-11	21.23	90.34
2011-12	21.6	84.12
2012-13	21.79	84.43
2013-14	22.23	85.12

Unit: Thousand hectares

Source: Directorate of Food Processing Industries and Horticulture, Govt. of W.B.

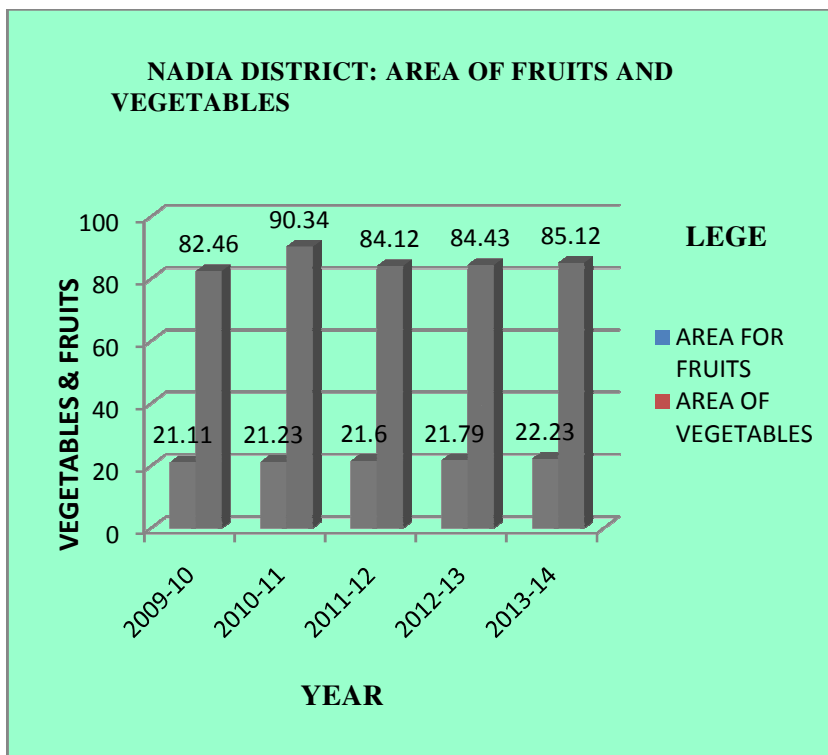


Fig.1.2

In 2009-10 area for fruits production was 21.11 thousand hectares and it increased 0.12 thousand hectares in 2010-11 financial years were; it increased 0.37 thousand hectares again in 2011-12. In 2012-13 area under fruits production

is 21.79 thousand hectares which increase 0.19 thousand hectares than previous financial years 2011-12 when it was 21.6 thousand hectares. In the 2013-14 area under fruits cultivation is 22.23 thousand hectares and it is 0.44 thousand hectares more than previous financial years. Fruits production is a profitable business because of the demands and prices of fruit very high throughout the year. So area for fruit production gradually increases although the floods in 2008, 2009 & 2010 when a large area of Chakdah, Ranaghat, Nabadwip, Nagashipara and Krishnanagar under the flood water in Nadia district. Further, some hectares of land newly use for fruit production in place of another type of crop produced in the study area. Fewer incidents of floods in 2012, 2013 and 2014 in Nadia district are increases the hectares of land for fruit productions very much in this period.

In 2009-10 area for vegetable production was 82.46 thousand hectares and it increased 7.88 thousand hectares in 2010-11 financial years; although it decreased 6.22 thousand hectares in 2011-12. In 2012-13 area under vegetable production is 84.43 thousand hectares which increased 0.31 thousand hectares than previous financial years 2011-12 when it was 84.12 thousand hectares. In 2013-14 area under vegetable cultivation was 85.12 thousand hectares and it was 0.69 thousand hectares more than previous financial years. Obviously floods of 2008, 2009 & 2010 impacted the hectares of area under the production of vegetables in Nadia.

4. Amount of fruits & vegetables productions in Nadia district

Flower cultivation is a very sophisticated agrarian crops production for farmers. Because they can earn are too much money in a very short period through this. In Hindu culture adherents commonly bring flowers as a gift to temples.⁵ Some edible flowers are nasturtium, chrysanthemum, carnation, cattail, chicory, cornflower, canna and sunflower.⁶ Edible flowers such as daisy, rose, and violet are sometimes candied.⁷

Table 1.2 Nadia district: productions of fruits & vegetables

YEARS	FRUITS	VEGETABLES
2009-10	516.25	1250.91
2010-11	524.67	1279.34
2011-12	527.4	1301.87
2012-13	530.72	1311.35
2013-14	511.03	1332.57

Unit: Thousand tonnes.

Source: Directorate of Food Processing Industries and Horticulture, Govt. of W.B

In 2009-10 production of fruits was 516.25 thousand tonnes which increased 8.42 thousand tonnes in the next financial years. In the 2011-12 financial year's production of fruits increases 2.73 thousand tonnes than 2010-11 where it was increased again 3.32 thousand tonnes in 2012-13. Finally, production of fruits decreased 19.69 thousand tonnes in 2013-14 than 2012-13 financial years. Actually, fruit productions touch the highest quantity of 530.72 thousand tonnes in 2012-13 among those five financial years according to the report. Floods of 2009, 2010 & 2011 in Chakdah, Ranaghat, Shantipur, Nabadwip & Nakashipara are responsible for less production of fruit in 2009-10 & 2010-11 financial years where fewer incidents of floods in 2012 & 2013 are main reasons of better productions of fruits in 2011-12 & 2012-13 financial years. Again, the fruit productions decrease in 2013-14 financial years for floods in 2014 under the area of Nadia district.

In 2009-10 production of vegetables were 1250.91 thousand tonnes which increased 28.43 thousand tonnes in the next financial years. In 2011-12 financial years' production of vegetables increased 22.53 thousand tonnes than 2010-11 where it increases again 9.48 thousand tonnes in 2012-13. Finally, the production of vegetables increased 21.22 thousand tonnes in 2013-14 than 2012-13 financial years. Actually, vegetable productions touch the highest quantity of 1332.57 thousand tonnes in 2013-14 among those five financial years according to the report. Floods of 2009, 2010 & 2011 in Chakdah, Ranaghat, Shantipur, Nabadwip & Nakashipara are responsible for less production of vegetables in 2009-10 & 2010-11 financial years where fewer incidents of floods in 2012 & 2013 were main reasons of better productions of vegetables in 2011-12, 2012-13 & 2013-14 financial years under the study area.

5. Flower cultivation

Flowers such as chrysanthemum, rose, jasmine, Japanese honeysuckle, and chamomile, chosen for their fragrance and medicinal properties, are used as tisanes, either mixed with tea or on their own.⁸ But those plants are very sensitive and easily damaged by flood hazard. So, farmers related to flood hazard face too much problem in the time of the flood. An agricultural economy based on flower cultivations in the area like Shantipur, Ranaghat really faces trouble by the flood.

Table 1.3 Nadia district: flower cultivations

years	rose	chrysant hemum	gladiolus	tuberose	marigold	seasonal flower	misc. flower
2009-10	0.302	0.026	0.29	1.62	1.6	1.165	0.975
2010-11	0.322	0.026	0.34	1.975	1.75	1.168	0.977

2011-12	0.321	0.026	0.34	2	1.8	1.168	0.978
2012-13	0.319	0.025	0.342	2.045	1.82	1.17	0.98
2013-14	0.31	0.035	0.345	2.088	1.831	1.169	0.985

Unit: Thousand hectares.

Source: Directorate of Food Processing Industries and Horticulture, Govt. of W.B.

In 2009-10 area of 0.302 thousand hectares used for Rose cultivation which was increased to 0.02 thousand hectares in 2010-11. In 2011-12 area of 0.001 thousand hectares decrease than the previous year for Rose cultivation. In 2012-13 area of 0.002 thousand hectares decrease than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.009 thousand hectares decrease than 2012-13 financial year for the cultivation of Rose. In 2009-10 area of 0.026 thousand hectares used for Chrysanthemum cultivation which is the same in 2010-11 as well as same in 2011-12 also. In 2012-13 area of 0.001 thousand hectares decrease than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.01 thousand hectares decrease than 2012-13 financial year for the cultivation of Chrysanthemum. In 2009-10 area of 0.29 thousand hectares used for Gladiolus cultivation which is increased by 0.05 thousand hectares in 2010-11. In 2011-12 area is the same as 2010-11 for Gladiolus cultivation. In 2012-13 area of 0.002 thousand hectares increase than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.003 thousand hectares increased than 2012-13 financial year for the cultivation of Gladiolus. In 2009-10 area of 1.620 thousand hectares use for Tuberose cultivation which increases 0.355 thousand hectares in 2010-11. In 2011-12 area of 0.025 thousand hectares increased than the previous year for Tuberose cultivation. In 2012-13 area of 0.045 thousand hectares increase than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.043 thousand hectares increased than 2012-13 financial year for the cultivation of Tuberose. In 2009-10 area of 1.600 thousand hectares use for Marigold cultivation which increases 0.15 thousand hectares in 2010-11. In 2011-12 area of 0.05 thousand hectares increased than the previous year for Marigold cultivation. In 2012-13 area of 0.02 thousand hectares increase than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.011 thousand hectares increase than 2012-13 financial year for the cultivation of Marigold. In 2009-10 area of 1.165 thousand hectares use for Seasonal Flower cultivation which increases 0.003 thousand hectares in 2010-11. In 2011-12 area for Seasonal Flower cultivations are the same as 2010-11 financial years. In the 2012-13 area of 0.002 thousand hectares increase than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.001 thousand hectares decrease

than 2012-13 financial year for the cultivation of Seasonal flower. In the 2009-10 area of 0.975 thousand hectares use for Misc. Flower cultivation which increases 0.002 thousand hectares in 2010-11. In 2011-12 area of 0.001 thousand hectares increase than the previous year for Misc. Flower cultivation. In the 2012-13 area of 0.002 thousand hectares increase than 2011-12 and in 2013-14 area of 0.005 thousand hectares increase than 2012-13 financial year for the cultivation of Misc. Flower. Floods of 2009, 2010 and 2013 are responsible for decreases in the area uses for various types of flower cultivations. The presence of excessive waters is extremely harmful to flower plants and heavy rain damages flowers in a very early stage. So farmer reduces the land for flower cultivations according to the volume of floods especially in the area like Ranaghat, Nabadwip, Shantipur, and Chakdahetc where flower cultivations are an important part of the economy. Mainly area for cultivations of flowers like Rose, Marigold and some of the seasonal flowers highly depends on the floods in Nadia district.

Table 1.4 Productions of some flowers in Nadia district

YEARS	ROSE	CHRYSANTH-EMUM	GLADIOLUS	TUBERROSE
2009-10	10.5	0.718	3.51	42.4
2010-11	11.2	0.718	4.34	51.69
2011-12	11.1	0.718	4.345	54
2012-13	11	0.7	4.4	55.4
2013-14	10.6	1.01	4.6	56.56

Unit: Crore Cut Flower.

Source: Directorate of Food Processing Industries and Horticulture, Govt. of W.B.

In 2009-10 production of Rose 10.5 Crore Cut Flower which increased 0.7 Crore Cut Flower in next year which was 11.2 Crore Cut Flower in 2010-11 financial years. In 2011-12 it decreased 0.1 Crore Cut Flower and decrease again 0.1 Crore Cut Flower in 2012-13. Then finally it decreased again 0.4 Crore Cut Flower in 2013-14 financial years when productions of Rose 10.6 Crore Cut Flower. That means production of Rose is highest in 2010-11 financial years. In 2009-10 productions of Chrysanthemum 0.718 Crore Cut Flower which was same as 0.718 Crore Cut Flower in 2010-11 financial years. In 2011-12 it same as previous two financial years as 0.718 Crore Cut Flower and from here

decreased 0.018 Crore Cut Flower in 2012-13 financial years when production was 0.700 Crore Cut Flower. Then finally it increased 0.31 Crore Cut Flower in 2013-14 financial years when production of Chrysanthemum 1.010 Crore Cut Flower. That means production of Chrysanthemum was highest in 2013-14 financial years. In 2009-10 production of Gladiolus 3.510 Crore Cut Flower which increased 0.83 Crore Cut Flower in next year which is 4.340 Crore Cut Flower in 2010-11 financial years. In 2011-12 it increases 0.005 Crore Cut Flower and increase again 0.055 Crore Cut Flower in 2012-13. Then finally it increased again 0.2 Crore Cut Flower in 2013-14 financial years when production of Gladiolus 4.600 Crore Cut Flower. That means production of Gladiolus is highest in 2013-14 financial years. In 2009-10 production of Tuberose 42.400 Crore Cut Flower which increase 9.29 Crore Cut Flower in next year which is 51.690 Crore Cut Flower in 2010-11 financial years. In 2011-12 it increased 2.31 Crore Cut Flower and increased again 1.4 Crore Cut Flower in 2012-13. Then finally it increases again 1.16 Crore Cut Flower in 2013-14 financial years when production of Tuberose 56.56 Crore Cut Flower. That means production of Tuberose is highest in 2013-14 financial years. Less incidents of floods in 2012, 2013 & 2014 are the main reasons of hike in flowers production under the study area.

Table 1.5 Productions of many other flowers in Nadia district

YEARS	MARIGOLD	SEASONAL FLOWER	MISC. FLOWER
2009-10	14.05	1.992	1.189
2010-11	15.4	2.007	1.195
2011-12	15.9	2.007	1.195
2012-13	16.1	2.015	1.2
2013-14	16.25	2.016	1.2

Unit: Thousand M.T.

Source: Directorate of Food Processing Industries and Horticulture, Govt. of W.B.

In 2009-10 production of Marigold was 14.05 Thousand M.T. which increases 1.35 Thousand M.T. that means production is 15.40 Thousand M.T. in 2010-11 financial years. It was increased to 0.5 Thousand M.T. than previous financial years in 2011-12 when it was 15.90 Thousand M.T. In 2012-13

production of Marigold increased 0.2 Thousand M.T. than 2011-12 financial years and increase 0.15 Thousand M.T. in 2013-14 when Marigold produce by farmers 16.25 Thousand M.T. No doubt the production of Marigold is highest in 2013-14 financial years according to the chart. In 2009-10 production of Seasonal Flower was 1.992 Thousand M.T. which increases by 0.015 Thousand M.T. that means production is 2.007 Thousand M.T. in 2010-11 financial years. It is the same as previous financial years in 2011-12 when it was 2.007 Thousand M.T. again. In 2012-13 production of Seasonal Flower increased 0.008 Thousand M.T. than 2011-12 financial years when production was 2.015 Thousand M.T. and increased 0.001 Thousand M.T. in 2013-14 when Seasonal Flower produce by farmers 2.016 Thousand M.T. Naturally production of Seasonal Flower is highest in 2013-14 financial years according to the chart. In 2009-10 production of Misc. the flower is 1.189 Thousand M.T. which increases 0.006 Thousand M.T. that means production is 1.195 Thousand M.T. in 2010-11 financial years. It is 1.195 Thousand M.T. again like previous financial years in 2011-12. In 2012-13 production of Misc. Flower increased 0.005 Thousand M.T. than 2011-12 financial years and it remains the same in 2013-14 when Misc. Flower produce by farmers 1.200 Thousand M.T. again. That means productions of Misc. The flower is highest in 2012-13 financial years and 2013-14 financial years consecutively according to the report. Fewer incidents of floods in 2012, 2013 & 2014 are the main reasons for the hike in flower production under the study area.

6. Conclusion

A State level consultative meeting use to held before monsoon period in order to strengthen institutionalize DM preparedness and response under chairmanship of Chief Secretary in presence of heads of the line departments working on disaster management, all District Magistrates, IMD, defence, Para-military forces, Indian Railways, etc. Update of inclusion of all Line Departmental contingency Plans in the State Disaster Management Plan, reiterate the role of each Department, flood early warning to the fisherman, relief materials stock etc. are discussed in the meeting. Followed by State level meeting, all the districts & Block Disaster Management Committee members would seat together at their respective level to review their preparedness and response plan.

Most of the emergency service providers particularly Police, Fire and Health have their own crisis management plan by which they manage emergency. Fire & Civil Defence Department are being revamped for the past three years. Both the departments of Fire & Emergency Services and Civil defence have their respective training Institute in the State and they regularly conduct capacity building programs for own staff members and volunteers, so

that they can fight any emergency situation. The Fire & Emergency Services Department have purchased many modern types of equipment, including a sky lift, trauma care ambulance and are extending their number of support services to set up new stations. Seven platoons each were established to act as State Disaster Response Force by West Bengal Police. Kolkata Police also did the same. Both are functioning in tandem with National Disaster Response Force (NDRF). These forces are also equipped with modern equipment and are trained by the NDRF. Department of Health & Family Welfare have a strong contingency plan for flood/cyclone management up to block level having make-shift infrastructure facilities, stock of essential medicines, a tentative week-wise roster of doctors, nurses and MPHWS etc.

The State Emergency Operation Centre (EOC) is functioning at Nabanna fitted with moderate state of the art communication equipment. All districts have established district EOC having communication equipment with a little renovation of the existing district administrative buildings. Thirteen more EOCs have been constructed at the Sub-Divisional level in different districts under GOI- UNDP Disaster Risk Reduction Programme.

An emergency toll free number 1077 at district level & 1070 at State level have been activated. The State EOC is operational on 24 X 7 hrs. Department of Disaster Management with the help of IT Department has developed SMS based Early Warning System to alert all the mobile users of the state of the advent of any natural calamity. This is being frequently used for other purposes too.

Recently Quick response team (QRT) comprising trained civil defence volunteers and vehicles fitted with necessary equipment have been kept as standalone force at District & Sub-divisional level to combat any sort of natural/ manmade calamity.

Further, State Disaster Management Plan has been developed and updated regularly for effective response at the time of crisis. District Disaster Management Plans of all the districts have been prepared & regularly updated towards strengthening response of disaster management. These are being revised to incorporate disaster risk reduction including mitigation aspects of disaster management.

References:

1. Lewis, Robert A. *CRC Dictionary of Agricultural Sciences*. CRC Press. 2002. ISBN 978-0-8493-2327-0.
2. McGee, Harold. *On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen*. Simon & Schuster. 2004. pp. 247-248. ISBN 978-0-684-80001-1.

3. McGee. *On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen*. Simon & Schuster. 2004. Chapter 6. pp. 247-248. ISBN 978-0-684-80001-1.
4. Farrell, Kenneth T. *Spices, Condiments and Seasonings*. Springer. 1999. pp. 17-19. ISBN 978-0-8342-1337-1.
5. "VISITING A HINDU TEMPLE; A BEGINNER'S GUIDE". *Hinduism Today*. April 1991.
6. Wood, Zoe. "Blooming tasty -edible flowers are summer's hottest food trend". *The Guardian*. June 30, 2017.
7. Bradely, Sue. "How to crystallise flowers like the Victorians". *The Telegraph*. May 08, 2015.
8. Wong, James. "Grow your own herbal teas". *The Guardian*. May 07, 2017.

A Study on Student Teachers Attitude Towards ICT in the Teacher Education Programme

Lipika Das

Independent Researcher

&

Ripa Mazumder

Assistant Professor, Dept. of B.Ed.

Satyapriya Roy College of Education, Kolkata

Abstract: The integration of Information and Communication Technology (ICT) in teacher Education Programme is crucial in today's digital age. It has remarkable potential in improving the quality of teacher education. ICT equips teachers with the skills to use modern tools like smartboards, learning management systems and multimedia content, enhancing the teaching- learning process. It enables educators to design interactive and engaging lesson plans, catering to diverse learning styles. Thus, the student teacher differential attitudes towards ICT have important implication for field of education system. The present study highlights the attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education Programmes and to find out the significant difference between the variables viz, Gender, Locality and Stream. The sample consisted of 100 student teachers from Teacher Education institutions in south 24 parganas district by using stratified random sampling technique The data were collected and analysed by using descriptive research design and t-test, ANOVA Statistics. The findings of the study revealed that the attitude of urban student teacher is more positive towards ICT than the rural respondent. It was also found that female student teacher possesses more positive attitude and also science student teachers showed more positive attitude towards ICT. This paper concludes that integration of ICT is more effective into the Teacher Education programme Thus, the teacher education institution should give importance to the practices as well as application of ICT. Through ICT teacher can stay updated with the latest educational trends and technologies, fostering continuous professional growth.

Key Words: Student Teachers, Attitude, ICT, Digital Literacy, Teacher Education Programme.

Introduction: ICT (Information and Communication Technology) is the top-level need of the present age, because if you want to make trot with current age, knowledge of technology is a must. If we observe, we will see that the

Information Technology or IT sector has spread widely across the world today. This IT is an ICT synonym, that is Information Technology and Information communication Technology are used in the same sense. On one side we can be seen printed media. Radio, Television, phone etc. On the other side Can be seen computer, Internet etc. ICT is a system consisting of single link system of communication system and Telecommunication computer network and Audio-video system etc. With the help of which a person can easily perform data acquisition, Storage and classification. That is basically its function is to store, Communicate and process information, but in a broad sense its scope is vast in the sea. If nations were to stay in a world, it must be known ICT. A world of society can be interconnected technologically as well as education field. Thus, it is importance for a society to be aware of advances in ICT knowledge to be the whole population of Teacher Education Programme. Then, the true meaning of education for all can be realised which is the goal of the world's community.

ICT has become an integral part of Teaching-Learning Process in Teacher Education Programme. The Teacher Education programmed of various types and level such as D.El.Ed, B.Ed, and M.ED. The present study is concerned about attitude of B.Ed Student Teachers towards ICT. The use of ICT in Teacher Education will change the role of the student teachers (Both pre-service and in-service), enabling to exert more choice over how they approach study. The Role of Teacher Educators in ICT Based education will be as a guide, facilitator rather than a director. That time Teacher Educators in a new role will encourage critical thinking skills, promote information literacy and nurture the cooperative learning to foster creativity among Student-Teachers in Teacher Education Programme.

Now, the present days, Teacher Education Programme demands the integration of ICT into the teaching and learning process. Use of Audio-visual materials, curriculum transaction, data collection and preservation, Communication, research etc. ICT continues to play of Role. The positive or Negative trends of student teachers are an important motivational component. If the attitude is positive then it will help the progress Teaching-Learning Process and Negative attitude it will exclude it. Student Teachers positive attitude helps us the create an environment of educational technology in world. So, every individual person is need to the basic knowledge of all the present devices of technology of modern age. The need for ICT integration into the idea of teaching and learning represents the necessary component. Therefore, in a Teacher Education Programme, proper strategies have to be analysed in order to teachers with the right knowledge and skills of ICT. The production of a efficient teacher must be prioritized in a nation.

OBJECTIVES OF THE STUDY:

The present study has been conducted to achieve the following objectives: -

- To find out the attitude of Student Teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their gender.
- To know the attitude of Student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their locality.
- To know the attitude of Student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their Discipline/Stream.

HYPOTHESES OF THE STUDY:

The following Hypotheses were framed by the investigator: -

- There is no significant difference in the attitude of Student Teachers towards ICT in Teacher Education Programme with respect to their gender.
- There is no significant difference in the attitude of Student Teachers towards ICT in Teacher Education Programme with respect to their locality.
- There is no significant difference in the attitude of Student Teachers towards ICT in Teacher Education Programme with respect to their Discipline/Stream.

METHODOLOGY:

The study was conducted using Quantitative research method. Quantitative method is collection and analysis of numerical data to describe, predict or control phenomena.

Variables:

Dependent variables: Attitude of student Teachers, Teacher Education Programme towards ICT.

Independent variable: Gender (Male and Female), Locality (Rural and Urban), Stream (Science, Language and Social Science).

Population and Sample:

In this study, all the student teachers of Teacher Education Programmes of South 24 Parganas district will be considered as Population. The sample for the present study considered 100 Student Teachers from the Teacher Education Institution of South 24 Parganas district, west Bengal. Stratified random sampling technique was used for selection of sample. 100 participants were in the survey.

The Table showing detailed break up of samples.

Sl. No	Variables		No of Sample	Total No of Sample
1	Locality	Rural	56	100
		Urban	44	
2	Gender	Male	35	100

		Female	65	
3	Stream	Science	26	100
		Language	28	
		Social Science	46	

Tools:

The questionnaire was developed by the researcher on the basis of in-depth study of the selected research area and on consultation with the supervisor. The questionnaire consists of 25 items. Content validity was done by the subject Expert.

DISCUSSION:

Result actually help to the fulfil the purpose of the research work successfully. Data analysis was done by using suitable statistical method.

Testing of Null Hypothesis (H₀):

H₀1: There is no significance difference in the attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their gender (Male and Female)

Table1: The table showing the results of t-test for attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their gender (Male and Female).

Sl. No.	Gender	Number of Sample	Total Score	Mean	S.D	T-Vlaue	df	Levelof Significance At 0.01
1	Male	35	3462	98.91	92.49	2.66	98	Significant
2	Female	65	6708	103.2	41.57			

Table 1 found that the critical value of 't' with 98 degrees of freedom (df) at 1% level of significance is 2.63. the computed 't' value is 2.656 which is quite bigger than the critical value of 't' and hence is significant. Therefore, the null hypothesis (H₀1) is can be rejected. Therefore, it can be calculated that there is significant difference the male and female student teachers towards ICT in teacher education programme.

Figure1: The figure showing that mean difference of attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their gender (Male and Female).

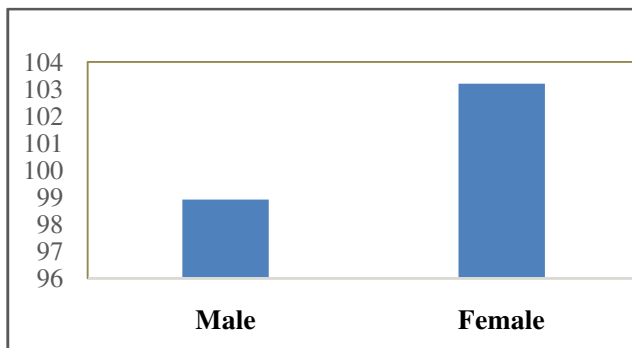


Figure 1, Shown that mean score of male group (98.91) in attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme is lower than that of female group (103.2) but the difference is significant. So, H_01 is rejected.

H_02 : There is no significance difference in the attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their locality (Rural and Urban)

Table2: The table showing the results of t-test for attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their locality (Urban and Rural)

Sl. No.	Locality	Number of Sample	Total Score	Mean	S.D	T-Value	df	Level of Significance At 0.01
1	Urban	44	4521	102.75	61.96	1.18	98	Not Significant
2	Rural	56	5649	103.2	63.13			

Table 2, Found that the critical value of 't' with 98 degrees of freedom (df) at 1% level of significance is 2.63. the computed 't' value is 1.176 which is quite smaller than the critical value of 't' and hence is not significant. Therefore, the null hypothesis (H_02) is can be accepted. Therefore, it can be calculated that

there is no significant difference the urban and rural student teachers towards ICT in teacher education programme.

Figure 2: The figure showing that mean difference of attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their locality (Urban and Rural)

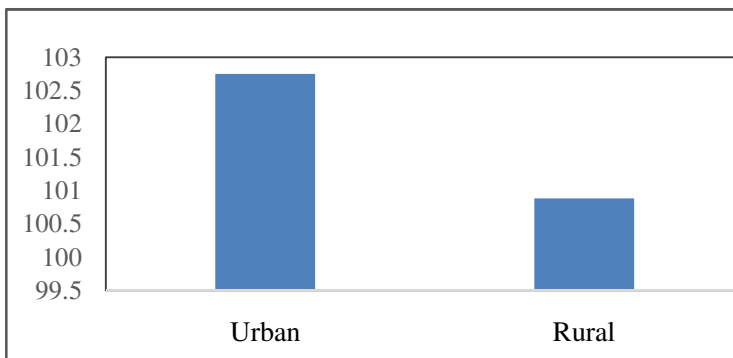


Figure 2, Shown that mean score of Urban group (102.75) in attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme is higher than that of Rural group (100.88) but the difference is not significant. So, H_0 is accepted.

H_0 3: There is no significance difference in the attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their discipline or stream (Language, Science and Social Science)

Table 3: The table showing the results of f-test (ANOVA) for attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their educational streams (Language, Science and Social Science)

Source of Variation	Sum of Squares	df	Mean Square variance	F- value	Significant at 0.01 level
Between group	90.4015	2	45.20075	0.713716	Not Significant
Within group	6143.159	97	63.33153		

Table 3, Found that critical value of 'f' with 2 and 97 degrees of freedom (df) of greater and smaller mean square variance respectively at 1% level of significance is 4.82%. The calculated 'f' value is 0.714 which is quite smaller than the critical value of f-table and hence is not significant. So, the null hypothesis (H_0 3) is accepted. Therefore, it can be calculated that there is no significant difference of the student teachers' attitude towards ICT in teacher education programme on the basis of their educational stream.

Figure3: The figure showing that mean difference of attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme with respect to their educational streams (Language, Science and Social Science)

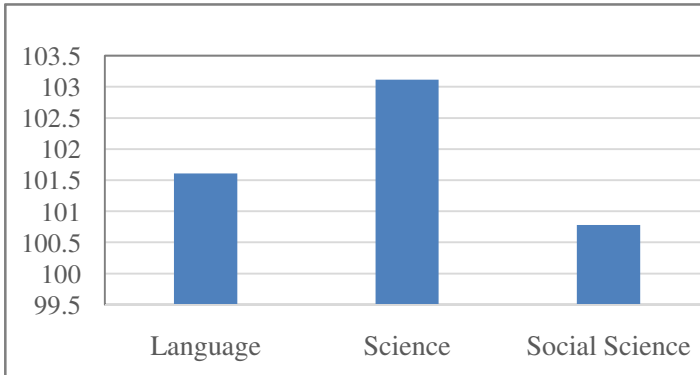


Figure 3, Shown that mean score of science group (103.12) in attitude of student teachers towards ICT in Teacher Education programme is higher than that of language group (101.61) and social science group (100.78) but the difference is not significant. So, H_03 is accepted.

FINDINGS:

The result section should state the findings of research arranged in a logical sequence without biasness and interpretation.

- It was found that the attitude of female student Teachers is better than the male student Teachers.
- It was also found that the attitude of urban Student Teachers is more positive than the rural Student Teachers.
- It was also found that the science student teachers are much aware and having positive attitude than the social science and language student Teachers.
- It was also found that the language Student Teachers Possess more positive attitude than the social science.

RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS:

Recommendations are given based on the research as given below:

- Attitudes of individuals can be enhanced through awareness programmes on ICT such as orientations, workshop, crash course etc. Where in, the various benefit and its impact to the society as well as field of teacher education programme.
- Given those student teachers have an average level of ICT knowledge, they can be motivated to increase their ICT knowledge level and its usage in

teaching and learning by enforcing more classes in theory as well as a practical.

- Every student teacher's irrespective of gender, locality, educational stream need to have at least on average level of ICT knowledge and ICT skills.
- It is necessity to acquire the right attitude from student teachers, teacher educators and other educational personnel for the successful implementation of ICT in Teacher Education Programme.

Conclusion:

ICT in Teacher Education to expand access to technology application important appreciable. Undoubtedly it has greatly improved learning outcomes and plays on important role in developing Teacher Education Programme. The current study opens up opportunities for student teachers, Teacher educators, ICT educators and ICT specialists. As well as educational planners, policy makers and researchers are get help in the field of Teacher Education Programme. However, important considerations can be drawn from this study that may lead to better adoption of ICT in Teacher Education. In the current context of the digital world, the benefits of ICT are increasing day by day. Many organizations at the international national and state levels are working to integrate ICT into Teacher Education programme. So, it can be said that ICT is an important element that will make the Teacher Education Programme more better and better.

References:

- Anal, R.L. & Amareswaran, N. (2022). Attitude of B.Ed. Student Teachers Towards ICT in the Teacher Education Programme in Manipur. *SSRN Electronic Journal*, 01-11.
- Alam, K., & Halder, U. (2017). Attitude towards the Use of ICT in Classroom among Trainee-Teachers. *Journal of Education and Development*, 7, 253 – 261.
- Arthi S, D. T. (2016). A study of the attitude towards ICT among B.Ed. student teachers in Namakkal District. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(8), 81-84.
- Aslan, A., & Zhu, C. (2015). Pre-Service Teachers' Perceptions of ICT Integration in Teacher Education in Turkey. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 14(3), 97-110.
- Dixit, D., & Kaur, M. (2015). Attitude of Teachers Trainees towards ICT Teaching. *International Journal of Pure and Applied Researches*, 1, 169-174.
- Giri1, S., & Mandal, A. (2022). An investigation on awareness of B.Ed. trainees to use. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME)*, 12(1), 24-32.

- Sanchez, A.B., Mena Marcos, J.J., & Gonzalez, M. (2012). In Service Teachers' Attitudes towards the Use of ICT in the Classroom. *Procedia - Social and Behavioural Sciences*, 46, 1358-1368.
- Sekar, J.N., & Lawrence, Arul, A.S. (2015). Attitude of B.Ed. students towards information and communication technology (ICT). *International Journal of Applied Research*, 1(8), 785-787.
- Yusuf, M.O., & Balogun, M. (2011). Student-Teachers' Competence and Attitude towards Information and Communication Technology: A Case Study in a Nigerian University. *International Journal of Contemporary Educational Technology*, 2 (1).

Environmental ethics and cosmology in Ancient Indian Literature

Monalisa Dutta

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Mrinalini Datta Mahavidyapith, Birati, Kolkata

Abstract: The Ancient Indian Literatures are very close to Nature. It asks to see God in every object in the Universe and worship the God in air, water, fire, sun, moon, stars, river, earth and many more. The *Vedas*, *Purāṇas*, *Smṛti-sastras*, the epics and related literatures contain the messages for preservation of environment and ecological balance. Infact the Nature and Vedic Gods and Goddesses, the incarnations are interrelated to each other. Every element of nature was revered and given the greatest significance. The present study is based on three pillars: the environmental conservation as presented in the Ancient Indian literature, the significance of nature described in the Vedas and to discuss the reality as well as environmental perspective through the Incarnations of Lord Viṣṇu.

Keywords: AthV - *Atharvaveda*, MUp. - Muṇḍakopaniṣad, ṚV - Ṛgveda.

Discussion:

1.0. Introduction:

Hinduism has always been an environmentally sensitive philosophy. The *Vedas*, *Purāṇas*, *Smṛti-sastras*, the epics and related literatures contain the messages for preservation of environment and ecological balance. Our tradition is very much close to nature. It asks everybody to see God in every object in this Universe. Hence, the Nature and Vedic Gods and Goddesses, the incarnations are interrelated to each other. They represent the forces of nature and symbolized the creative energy, exalted and magical power. *Pañca-mahābhūta* (five gross elements) are responsible for the life substance in the cosmic creation. They are: water or *āpah*, air or *vāyu*, fire or *agni*, earth or *bhūmi* and sky. Those five elements are worshiped as deities in different *sūkta*-s.

2.0. Vedic Gods and nature:

In the Veda the trinity of principles namely God (*Īśvara*), man (*Jīva*) and nature (*Prakṛti*) are pronounced at various levels, but all the three entities are delineated in such an interconnected and intertwined manner that none of these can be stated to exist exclusively. The most referred Gods in ṚV are *Indra*, *Agni* and

Soma, *Savitṛ*, *Viṣṇu*, *Rudra* (epithet of Lord *Śiva*), and *Prajāpati* (later *Brahmā*) are the others, who worshiped in Veda. The Vedas describes a lot of significant Goddesses most related with environment, not only by the nature but their name also. Such as *Ūṣā* (dawn), *Prṥthvī* (the earth), *Aditi* (cosmic moral order), *Sarasvatī* (the river and knowledge), *Vāk* (the sound), *Nirṛti* (destruction), *Rātri* (the night), *Aranyānī* (the forest) and many more Goddesses appears in ṚV. The Hindu mythology explains that the deities rule over the cosmic body as well as in human body. The Sun is the eyes, the *Vāyu* is nose, the *Prajāpati* is the sexual organs, the *Lokapālas* are the ears, *Candra* is mind, *Mitra* is the inner breath, *Varuṇa* is the outer breath, *Indra* is arms, *Brhaspati* is the speech and so on.

The Vedic Gods are belonging to different departments. Thus While into the conception of the fire-god further enters his aspect as lightning in the atmosphere. The assimilation is increased by such gods fen being invoked in pairs. Agni comes to be called *Soma*-driker, *Vṛtra*-slayer, winner of cows and waters, sun and dawn, attributes all primarily belonging to *Indra*.

2.1. *Agni*:

Agni is the God of terrestrial fire, dispels the demons of darkness with the light. In the classical cosmology fire is one of the element of *Pañcabhūta*, along with sky (*Ākāśa*), Water (*Āpa*), Air (*Vāyu*) and Earth (*Prṥthvī*). Agni is light, air and the mouth of the world. Agni is an essential cosmic element, symbolizing the universal force that sustains and enlivens creation. The word Agni is derived from three verbs. They are going, shining or burning and leading. Those are reflected as the primordial powers to consume, transform and convey.

Agni is an important part of *Āyurveda*. It was viewed as the life force of a healthy body, the power to digest foods and innate in food. Agni is the fiery metabolic energy of digestion, allows assimilation of food while ridding the body of waste and toxins and transforms dense physical matter into subtle forms of energy the body needs. *Jaṭharāgni* determines the production of hydrochloric acid in the stomach, *Bhūtāgni* determines the production of bile in the liver, *Kloma-agni* determines the production of sugar-digesting pancreatic enzymes and so forth. Agni is also known as *Vaiśvānara*. Agni is also known as *Pāvaka*, *Havyavāhana*, *Saptajihvi*, *Vahni*, *Anala*, *Hutāśana*, *Citrabhānu*, *Saptajihvi*, *Vahni*, *Anala*, *Hutāśana*, *Chitrabhānu*, *Jvalana*, *Vaiśvānara*, *Vibhāvasu*, *Dhumaketu* etc.

2.1.1. Importance of *Jajña*:

In simple word, it signify the theory of give and take. It has three aspect, *dravya* (material), *devatā* (deity) and *dāna* (sacrifice). This *Jajña* is going on in the universe since beginning of the creation. Even the creation of universe is

explained as *Yajña* in the *Puruṣa-sukta*. Thus, the concept of *Jajña* seems to be a major principle of ancient environmental science.

Jajña is basically a healing process. It kills the germs of certain diseases. By burning several types of woods and ghee and the herbs or fresh grains are performed to purify the atmosphere and the environment. It creates a pure, hygienic, and nutritional and healing atmosphere heal the life cycle of all human, animal and plants. It renews the brain cells, revitalizes the skin, purifies blood, and prevents growth of pathogenic organisms.

2.2. *Indra*:

Indra, the aerial God of the thunderstorm, slay them with his lightning. He is most powerful god, kills *Vṛtra*; symbol of cloud without rain. *Vṛtra* means who covers the cosmic order. Cosmic order is established in a plane which is connected to both our inner mind and external world of nature. *Indra* represents the dynamic aspect of the cosmic order. Hence, he is described many times in the Vedas as the cultivator of the earth. *Indra* is also pictured as the one who takes care of the agricultural cattle.

2.3. *Varuṇa*:

Varuṇa is depicted as the Lord of *Ṛta*, the universal natural order. Hardly a dozen hymns dedicated to him exclusively. He has a face, an eye, arms, hand and feet. He is sovereign god, great king, law maker and ruler of cosmos and even of the gods. Basically, he is regarded as the lord of water and ocean but chiefly he controls and keeps the world in order. Thus, the concept of *Varuṇa* represents the consciousness of Vedic seers in respect to controlling and balancing the natural forces in environment.

2.4. *Marut*:

Marut is a deities in the RV. Thirty three hymns being dedicated to him alone, seven at last to them conjointly with *Indra* and one each to them with *Agni* and *Pūṣān*. He has golden, sun-like brightness and particularly associated with lightning; called *vidyut*. The noise which he make is called thunder. One of the main functions of the Maruts is to shed rain. The streams resound with the fellies of the Marut, he raise the voice of the cloud and water come, called *marutvatī*.

2.5. *Uṣā*:

Goddesses occupy a very subordinate position in Vedic belief and worship. They play hardly any part as rulers of the world. She constantly identified with dawn, revealing herself with the daily coming of light to the world, driving away oppressive darkness, chasing away evil demons, rousing all life. She is the life of all living creatures.

2.6. Aditi :

The Goddesses *Aditi* is not the subject of any separate hymn, but is often incidentally celebrated in the R̥V. Her name was occurring nearly eighty times. Very rarely she mentioned alone; she is constantly invoked with her sons, the *Āditya*-s. She has no definite physical features. She is invoked at morning, noon and sunset.

2.7. Nādī:

Besides the divine water, the rivers occupy a important position in the R̥V. The whole hymn celebrates the *Sindhu* or Indus, *Vipās* and *Śutudrī*. The *Sarasvatī* is more greatly celebrated than any other river. *Sarasvatī*, *Sarayu* and *Sindhu* are invoked as great streams and elsewhere *Gaṅgā*, *Yamunā*, *Sarasvatī*, *śutudrī*, *Paruṣṇī* and others known and unknown, altogether twenty-one rivers are addressed. Peoples are living on the banks of the *Sarasvatī*. She herself is a purifier, the bestower of wealth, progeny and immortality. We find her identity in the *Brāhmanas* with *Vāc*, and in post Vedic mythology she has become goddess of eloquence and wisdom, invoked as a muse and regarded as the wife of *Brahmā*.

2.8. Pṛthvī:

Mother Earth, may whatever I dig from you grow back again quickly, and may we not injure you by our labour. – there are not any object in the world . Hence trees and grasses, river, bird, animals all worshiped as divine power. The Earth itself is seen as goddess and mother who is compassionate, fertile, dependable and full of sanctity. Human needs to preserve this relationship with the mother earth for his survival. The earth with the oceans, rivers, land to grow grains, fruits, milk and other is nourished humanity. The river *Gaṅgā* represents as mother river. The river is a moral purifier and the source of good life. Indeed all rivers are sacred because they nourish and purify not only body and mind but the inner being.

3.0.Incarnations and environment:

The Vedic cosmology describes the Universe with three vertical levels: heaven, atmosphere and earth¹.The basic thought of our tradition is the awareness of unity and mutual interrelation of all living and non-living entity. MUp. says, ‘He on whom the sky, the earth and the atmosphere are woven and the wind, together with all life-breaths, Him alone know as the one Soul’(2.2.5).

Incarnations	Gross element symbol	Subtle element symbol	Direction	Nature symbol	Body symbol
Matsya	Water	Taste	North	Origin of life in water	Blood
Kurma	Air	Touch	East	Life in water and	Breath

				land	
Varāha	Earth	Smell	West	Life of forest and land	Proper substance
Nṛsimha	Fire	Form	South	Phase of cooling earth	Warmth
Vāmana	Sky	Sound	Upward	Origin of primitive man	Mind

The incarnations of *Viṣṇu* symbolize the creation and evolution process that interconnects man and nature interconnectedness. The first incarnation, Fish, symbolizes the origin of life in water, in this form he saved organic life-seeds from the great cosmic flood. The Tortoise equally enjoys water and land. The third one, the Boar, symbolizes the life in forest and land; helped to save the earth from submergence in the cosmic flood. The forth one refers to the phase of cooling earth, through whom human power was established over demons. The fifth form was a symbol of primitive man. According to geological time scale about 405 million years ago when land rose and small seas evolved and many kind of fishes developed; that time closely fit into the incarnation theory of creation. Rest of the incarnations of lord Viṣṇu present the growth of victory over the world (*Paraśurāma*), ideal ruler (*Rāma*), the figure of karma (*Śrīkṛṣṇa*), message of peace and synthesis (*Buddha*) and *Kalki*.

4.0. Conclusion:

In Vedic era people venerated all of natural elements and being by meticulously protecting them; that is really amazing. They believed in nature and the ecosystem holistically. Don't damage the water; the earth, the water, the forest are our mother! Don't harm the ecosystem, the soil, the harvests and flora. The nature worshippers were deeply concerned to maintain nature and very much encouraged cultivation. The AthV places a strong emphasis on water cleanliness and the earliest poignant environmental prayer is without a doubt the Vedic song, the *sūkta*-s. The early Indian perspective the nature was a social and intellectual thought only. But it is most important to educate the new generation about the importance our heritage and thoughts to survive the environment. The hymns of the Veda are prayers for peace for the Earth, Heaven, Mountains, Rivers, Sun, Moon and Stars, for the entire universe. The tradition says *om shantiśāntiśānti*; before and after prayer. The first *śānti* means peace with nature, the second means peace with society and the third *śānti* means peace within oneself. They are ecological, social and spiritual peace.

Bibliography:

- Krihna.N. *Hinduism and Nature*. Haryana: Penguin Random House India. 2017. internet.
- Macdonell.A.A. *The Vedic Mythology*. Varanasi: Indological Book House. 1963. Print.
- Swami Prabhavananda. *Vedic Religion and Philosophy*. Madras: Sri Ramakrishna Math. 2009. Print.

Internet sources:

<https://www.templepurohit.com>

<https://en.m.wikipedia.org>

<https://www.researchgate.net>

<https://en.wikipedia.org>

ⁱRgveda 10.90.11-14.

The Role of Early Christian Monasticism on the Establishment of Indian Christian Ashrams

Ajoy Ghosh

Assistant Professor, Dept. of History
Govt. General Degree College, Chapra

Abstract: Christianity is one of the great and well known religions in world history. Its rise and spread has had and continues to have its impact on the entire world. The concept of ashrams and asceticism, though often viewed as an Eastern brainchild and practice, and is more identified with religions like Hinduism, Buddhism, Jainism and other religions of India, is not an entirely foreign idea to Christianity. It cannot be argued with certainty that these Jewish monasteries or forms of ashrams were the origins of the later Christian ashrams in India, it is significant to observe that they formed a basis upon which Christians built their philosophy and theology of monasteries. Christian ashrams constitute Group Movements, Fellowships of a close-knit groups bound by the presence of the Holy Spirit with no boundaries of class, race, age, sex. An ashram is both an outcome of life just as it is also a source of life.

Key Words: Christianity, Ashram, Hinduism, Buddhism, Jainism, Group Movements.

Discussion: Christianity is one of the great and well known religions in world history. Its rise and spread has had and continues to have its impact on the entire world. Due to its simple teachings, on the one hand, and the missionary spirit of its followers, on the other hand, Christianity quickly became a world religion and got support in many countries of the world. Today Christianity is one of the most popularly accepted world religions and there is hardly any country in the world where Christians are not represented.¹

The concept of ashrams and asceticism, though often viewed as an Eastern brainchild and practice, and is more identified with religions like Hinduism, Buddhism, Jainism and other religions of India, is not an entirely foreign idea to Christianity.² This could not be surprising considering that Christianity emerged out of Judaism which history indicates also practiced similar concepts as Hinduism and the other Eastern religions.³ Whether this was due to the influence of these other religions on Judaism or Judaism's own initiative remains a debatable point.⁴ However, what is significant for this discussion is the fact that some sects in Judaism practice something close to the Hindu or Buddhist ashram.

Though it cannot be argued with certainty that these Jewish monasteries or forms of ashrams were the origins of the later Christian ashrams in India, it is

significant to observe that they formed a basis upon which Christians built their philosophy and theology of monasteries. Historically, Christian monasticism emerged in Egypt in the last decades of the third century, though, as noted, the forces that combined to produce monasticism are ancient and universal. The practice of religious self-denial was common to several religious and philosophical sects in antiquity – for example, the Pythagoreans and the Stoics – who were well known among the Jews in the time of Christ, as the Essenes show. Widespread opinion held that if one could conquer the desires of the body, one could unite with those beings who were grater and purer than a humanity encumbered by its lusts for food, drink, knowledge, sex, and adventure.

These traditions were in the person of Anthony. In Egypt he was a man who, at about age 20, gave away all his possessions and took up in the Egyptian desert a life of prayer and renunciation. In the desert, Anthony sought to imitate the life of Christ. His spiritual quest became famous, and many disciple flocked to him. Finally, he decided to organize them into a very loose community. Anthony's form of monasticism is called eremitic, from the Greek heremos for 'desert'. The name eremitic, signifying extreme asceticism and individualism, gives us the word hermit.⁵

Pachomius (290-346) created a second form of monastic life. He was a Roman soldier who left the service in 313, was baptized a Christian, and retired to the Egyptian desert, where he studied which a hermit. Eventually Pachomius founded a community of ascetics, and before long his community, and dozens like it, had thousands of members. Literally thousands of people were living alone but together in veritable cities out in the desert. Pathon, just wrote the first Rule, or code for daily living, for a monastic community. He organized most aspects of the life of his community by designing a common life based on routines of private prayer, group worship, and work. Pachomius's pattern of monasticism is called coenobitic, from the Greek for 'common life'. The persons living this common life were called monks, and the place where they lived this life was called a monastery. The head of the community was designated abbot, a word meaning 'father'.

From Egypt, monasticism spread to other parts of the world by means of texts such as the Life of Anthony, collections of the wise sayings of famous desert abbots, and books written by persons who went to Egypt seeking a more perfect life – among who were several prominent women, such as Melania. The appeal of monasticism grew greater after Christianity gained official status. Those who were attracted to monasticism saw it is a purer form of Christian life, uncorrupted by the wealth, power, and controversy of the hierarchical church. The ascetic life was popular with women for personal reasons and because offices in the church hierarchy were denied to women. Positions in monasteries, including that of abbess, provided outlets for female talent.

As monasticism spread from Egypt, it adopted the two basic patterns. To the East, the eremitic pattern was prominent in Palestine and Syria and eventually throughout the Greek-speaking world. Eastern monasticism produced a great legislator in Basil (330-379), who wrote the most influential Rule in the Orthodox Church. Generally, these monks assembled only for weekly worship and otherwise ate, prayed, and worked alone.

Eremitic monasticism arrived in the West in the person of Martin of Tours (336-397). Like Pachomius, Martin was a pagan Roman soldier who, after his military service ended, embraced both Christianity and asceticism. Even though he was elected bishop of Tours, Martin kept to his rigid life of denial. An admiring biography kept Martin's memory alive for centuries, but in the West the coenobitic pattern proved more successful than the eremitic. The first great center from which coenobitic monasticism spread was Lerins in the south of Gaul, where a community was founded in 410. The fame of Lerins spread rapidly throughout the Western Roman Empire, and men came to it from all over. Lerins attracted many aristocrats, some of whom went on to become bishops and promoters of monasticism.

The most famous monastic founder in the West was Benedict of Nursia (480-545), a middle class Roman who abandoned legal studies and a potential government career to pursue a life of prayer. Benedict's fame grew so great that he attracted a crowd of followers, and in about 520, at Monte Cassino – 80 miles south of Rome, he drew up a Rule. This Rule was marked by shrewd insights into the human personality. It emphasizes the bond of mutual love among the monks and obedience to the abbot.⁶

Growing amidst such environments, Christianity thus drew much of its theologies of monasteries and ascetism from these pagan and Jewish forerunners though its fundamental inspiration remains and has been its Holy Scriptures, the Bible. As Anatole G Mazour and John M. Peoples write 'monks and nuns believed that one of the best ways to live a perfect Christian life was to withdraw from the world and its temptations and serve God through prayer, fasting, and self denial'.⁷ Initially 'each monk lived alone' however later these monks began to live together in one place called a 'monastery' while nuns lived in 'convents'.⁸ Thus, as pointed out, it is from these forerunners that Christianity got its inspiration from on the development of Christian ashrams.

As the Christian church grew and became established with a well defined hierarchy which attracted the finest intellectuals into its ranks, a desire to universalize its traditions and practices arose. It was widely recognized that until a standard set of Christian sources was defined, there could be no hope of uniformity of Christian belief. This process was not completed until the middle of the fifth century.

However, this quest for uniformity in practice was not received favorably with new converts in other parts of Christendom especially India where the newly converted Indian Christians felt the need to preserve their cultural heritage and traditions and practice Christianity in their own traditions which would include their own Indian way of worship and doing other things. It is partly the resultant conflict between the Indian Christians and the European Christian missionaries coupled with the already existing resistance of prospective converts among Hindus and Buddhists that began to sow seeds of the need for Christian ashrams as Christian missionaries began to search for means of lifting the barrier they faced in reaching out to the people of India.

Christian ashrams constitute Group Movements, Fellowships of a close-knit groups bound by the presence of the Holy Spirit with no boundaries of class, race, age, sex. A churchashram in India is a place where liturgy (a form of community worship usually related to the church) is closely related to the Indian cultural tradition and a theology lived and pondered in the context of the Indian Spiritual Tradition.⁹

An ashram is both an outcome of life just as it is also a source of life. Religion is not a part of life but a life itself and for this reason it is possible in the ashram to adapt oneself wholly to all circumstances because it is as supple as life itself. Hence, in a classical sense, ashrams may not be considered as just religious institutes for monarchs have learned there to love their people and were schooled in diplomacy. Thus, ashrams are ‘spiritual power-houses’ for the experiments of life.¹⁰

References:

1. Majumdar. R. K., (1981), *‘History of World Civilization’*, Delhi, Surjeet Book Depot, p. 156
2. Toole. Michael O, (1983), *‘Christian Ashram Communities in India’*, Pune, Ishvani Kendra, p. 127
3. Wilson Bryan R., (1975), *‘The Noble Savages: The Primitive Origins of Christian and its Contemporary Survival’*, Berkeley, University of California Press, p. 11
4. Lillie Arthur, (1983), *‘The Influence of Buddhism on Primitive Christianity’*, London, Swan Sonnenschein & Co., p. 9
5. Mazour Anatole G., (1968), *‘World History, People and Nations’*, Chicago, Harcourt Brace Jovanovich In Company, p. 233
6. Ibid., p. 234
7. Ibid., p. 235
8. Ibid., p. 235
9. Moraes George Mark, (1964), *‘A History of Christianity in India’*, Bombay, P. C Manaktala and Sons Pvt. Ltd, p. 10
10. Bergen Van, ‘Contemporary Christian Experiments in Ashram Life’, *Journal of Dharma*, 174, (January-March, 1978).

The Universal Moral Values and the Teachings of *Bhagavadgita*

Debasree Sadhu

Assistant Professor, Dept of Sanskrit

Mrinalini Datta Mahavidyapith

Abstract: Those universal moral, which are must for every human society for its welfare such as truthfulness, nonviolence, cleanliness of mind and behaviour and austerity. These are four fundamental universal morals as declared by Lord Krishna in *Srimad Bhagavad Gita*. These moral principles cannot be forced into conscience of any individual, they naturally develop in person who takes up to the process of Krishna consciousness, which means God's consciousness. Thus, by following the process of Krishna consciousness, if any individual or society develops these four moral values/principles then it is sure that peace, happiness, and prosperity will emerge in such an individual or society. In this paper, I would like to explain that how these four moral values, which are in *Gita*, being very much, effective for our daily life to make peaceful happy society.

Key Words: Values, *Srimad Bhagavad Gita*, Krishna Consciousness.

Discussion: The universal moral which are must for every human society for its welfare are truthfulness, nonviolence, cleanliness of mind and behaviour and austerity. These are four fundamental universal morals as declared by Lord Krishna in *Srimad Bhagavad Gita*.

These moral principles cannot be forced into conscience of any individual, they naturally develop in person who takes up to the process of Krishna consciousness, which means God's consciousness. Thus, by following the process of Krishna consciousness, if any individual or society develops these four moral values/principles then it is sure that peace, happiness and prosperity will emerge in such an individual or society. The lessons on morality gathered from *Srimadbhagavad Gita* focuses on the conversation between Sri Krishna and Arjuna. The main themes that contribute to understand morality are detachment, self-control and performing one's prescribed duties.

In this paper, I explain how these four moral values, which are very much, effective for our daily life to make peaceful happy society. Morality means principles that distinguish right from wrong or good from bad behaviour. Yet even those morals may vary from person to person, religion to religion and culture to culture. Many have been found to be universal, following which can make the world better. What are those universal morals, which are most for every human society for its welfare? Truthfulness, nonviolence, cleanliness, and

austerity are four fundamental universal morals as declares by Lord Krishna in Gita. Here, In *Srimadbhagavad Gita*, Chapter-16, verse 1-3, Sri Krishna describes twenty-six virtues of a saintly nature.

“*abhayamsattva-saṁśuddhirjñāna-yoga-vyavasthitiḥ
dānaṁdamaśḥ cha yajñaśḥ cha svādhyāyas tapa ārjavam*” (16/1)

“*ahinsāsatyamakrodhastyāgaḥśhāntirapaiśhunam
dayābhūteṣhvaloluptvaṁmārdavamhrīrachāpalam*” (16/2)

“*tejaḥkṣhamādhritiḥśhauchamadrohonāti-mānitā
bhavantisampadamdaivīm abhijātasya bhārata*”(16/3)

The Supreme Divine Personality said: “O scion of Bharat, these are the saintly virtues of those endowed with a divine nature—fearlessness, purity of mind, steadfastness in spiritual knowledge, charity, control of the senses, sacrifice, study of the sacred books, austerity, and straightforwardness; non-violence, truthfulness, absence of anger, renunciation, peacefulness, restraint from fault-finding, compassion toward all living beings, absence of covetousness, gentleness, modesty, and lack of fickleness; vigour, forgiveness, fortitude, cleanliness, bearing enmity toward none, and absence of vanity.”

These should be cultivated as the part of our spiritual practice for elevating ourselves to the supreme goal.

Truthfulness: *Satyam*, truthfulness means that facts should be presented as they are, for the benefit of others. Facts should not be misrepresented according to social conventions. It is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. But that is not truth. The truth should be spoken in a straightforward way. So that others will understand actually what the facts are. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth.

Nonviolence: *Ahimsa*, nonviolence, means not arresting the progressive life of any living entity. Lord Krishna declares in Gita that all living entities are his part and parcel and He is their seed giving father in this material world. One should not think that only humans are cognizant and have right to live and other living entities like animal, insects, trees etc. In situation of danger from other living entity, if there are no means of protection but violence then such violence is not immortal. This is called ahimsa.

Cleanliness: *Saccham*, cleanliness, is of two kinds- external and internal. External cleanliness means taking a bath, keeping the surrounds clean and organized. Internal cleanliness means to keep the mind pure, i.e, free from the lust, greed, anger, whimsical thoughts and envy. The process of internal cleansing is thinking of Krishna always and chanting.

Austerity: *Tapas*, austerity, means voluntarily retraining from immortal acts and acting in good ways even if it is painful. One must restrain himself from

indulging in bad habits like intoxication, gambling etc. One should practice austerity in every day – in body, mind, personal behaviour and dealings with others.

Fearlessness: It is the state of freedom from concern for present and future miseries. Inordinate attachment of any kind causes fear. Attachment to wealth leads to dread of impoverishment, attachment to social prestige causes fear of infamy, attachment to vice leads to anxiety about the consequences of sin, attachment to bodily comfort causes the fear of ill-health, and so on. Detachment and surrender to God vanquish all fear from the heart.

Purity of mind: This is the state of inner cleanliness. The mind generates and harbors thoughts, sentiments, feelings, emotions, etc. When these are ethical, wholesome, positive, and uplifting, the mind is considered pure, and when they are unethical and degrading, the mind is considered impure. Attachment to objects in the modes of passion and ignorance contaminate the mind, while attachment to God purifies it.

Steadfastness in spiritual knowledge: It is said: *tattva vismaraṇātbhekivat* [v1] “When human beings forget what is right and what is wrong, they become like animals.” Thus, the path of virtue is forged by remaining steadfast in the awareness of spiritual principles.

Charity: It refers to the giving away of one’s possessions for a good cause or to needy persons. True charity is that which is done, not with a feeling of superiority, but with a sense of gratefulness to God for the opportunity to help. Material charity, done for the welfare of the body, helps others temporarily. Spiritual charity, done at the platform of the soul, helps eliminate the cause of all suffering, which is separation from God. Consequently, it is considered higher than material charity.

Control of the senses: The senses are notorious in their ability to drag the mind deeper into material illusion. They tempt the living being to seek immediate gratification. However, walking the path of virtue requires forsaking the lower sensual pleasures for achieving the higher goal. Thus, restraint of the senses is an essential virtue for treading the path to God.

Sacrifice: It means executing one’s Vedic duties and social obligations, even though they may not be enjoyable. Sacrifice is considered perfect when it is done for the pleasure of God.

Study of the sacred books: An important aspect of cultivating the divine nature is to feed the intellect with uplifting knowledge from the scriptures. When the intellect is illumined with proper knowledge, one’s actions naturally become sublime.

Straightforwardness: Simplicity in speech and conduct unclutters the mind and engenders the sprouting of noble thoughts. The English phrase “simple living, high thinking” aptly expresses the benefits of the virtue of straightforwardness.

Non-violence: It means not impeding the progressive life of other living beings through thought, word, or deed.

Truthfulness: It means restraining oneself from distorting facts to suit one’s purpose. God is the Absolute Truth, and hence the practice of truthfulness takes us toward him; on the other hand, falsehood, while convenient, takes us away from God.

Absence of anger: The manifestation of anger is a defect of the material mind. It takes place when the desires for happiness are obstructed and things do not turn out how one envisaged. By developing detachment and surrender to the will of God, one overcomes anger.

Renunciation: The entire material energy belongs to God and it is meant for his pleasure. Hence, the opulence of the world is not for one’s enjoyment, but for being utilized in the service of God. To be fixed in this understanding is renunciation.

Peacefulness: The cultivation of virtue requires mental poise. Peacefulness is the ability to retain inner equilibrium despite disturbing external situations.

Restraint from fault-finding: The whole world and everything in it is a mixture of good and bad qualities. Focusing upon defects in others dirties our mind, while focusing upon their virtues purifies it. The nature of a saintly person is to see his or her own defects and observe the virtues of others.

Compassion toward all living beings: As individuals evolve spiritually, they naturally rise above self-centeredness and develop empathy for all living beings. Compassion is the deep sympathy that arises upon seeing the sufferings of others.

Absence of covetousness: Greed is the desire to accumulate more than what one legitimately need for the maintenance of the body. Under its sway, people acquire huge amounts of wealth and possessions, though they know, that at the time of death, everything will be left behind. Freedom from such covetousness leads to contentment and inner peace.

Gentleness: The disposition of behaving roughly with others arises from insensitivity to their feelings. But as one grows in spiritual stature, one naturally sheds crudeness in behavior. Gentleness is a sign of spiritual refinement.

Modesty: *Hṛīḥ* means “sense of guilt in performing actions contrary to the injunctions of scriptures and society.” The saintly nature is imbued with a ruthless inner conscience that gives one a sense of guilt in committing sinful acts.

Lack of fickleness: We may begin with good intentions, but if we get distracted by temptations and hardships, we cannot complete the journey. Success on the

path of virtue comes by unwaveringly pursuing the goal despite all diversions that come on the way.

Vigor: From purity of mind comes a deep inner drive to act according to one's values and beliefs. Hence, saintly personalities bring immense power and vigor to the tasks they pursue.

Forgiveness or forbearance: This is the ability to tolerate the offences of others, without feeling the need to retaliate. Through forgiveness, one heals the emotional wounds caused by others that would otherwise fester and disturb the mind.

Fortitude: It is the inner strength and determination in pursuing the goal, even when the mind and senses are wearied due to unfavorable circumstances. Most of the important things in the world have been accomplished by people who kept on trying when there seemed to be no hope at all. Sri Aurobindo put this very eloquently: "You have to be more persistent than the difficulty; there is no other way."

Bearing enmity toward none: Bearing enmity toward others poisons our own mind, and this becomes an impediment in the path of spiritual progress. The quality of freedom from hatred toward others is developed by realizing that they are also like us, and God resides in all.

Absence of vanity: Self-praise, boastfulness, ostentation, etc. all stem from pride. Saintly personalities see nothing in themselves to be proud about, but instead, feel gratitude to God for the good qualities they possess. Thus, they refrain from self-aggrandizement.

Thus, the Bhagavad Gita emphasizes several moral values crucial for spiritual and ethical living. These include selfless duty (*nishkama karma*), compassion, equanimity, detachment from results, and the importance of knowledge and self-realization. It also stresses the importance of controlling one's mind and emotions, embracing change and living in the present moment.

References:

1. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (Ed.), Bhagavad-gita As It Is, The Bhaktivedanta Book Trust, Mumbai, June, 2018 (2nd edition).
2. Gavin Flood (Ed.), Translated by Gavin Flood & Charles Martin, The Bhagavad Gita, Oxford University, W.W. Norton & company. New York. London, 2015.
3. Radhakrishnan (Ed.), The Bhagavadgita, Harper Collins Publishers, India, 1998.

Natural Disasters and Colonial Response : Scientific Interventions in Floods and Famines in Medinipur

Dipankar Das

Assistant Teacher, Department of History
Ramkrishna Shiksha Niketan

Abstract: Natural disasters, particularly floods and famines, shaped the socio-economic landscape of Medinipur (Midnapore) during British colonial rule. The colonial administration's response to these calamities was largely dictated by economic considerations, with the introduction of "scientific" interventions aimed at mitigating the impact of these disasters. These interventions, while modern in approach, were also marked by underlying imperialist motives, prioritizing resource extraction and revenue generation over the welfare of the local population. This article explores the role of colonial science and technology in responding to floods and famines in Medinipur, examining how these interventions both alleviated and exacerbated local conditions. The article also highlights the long-term environmental and socio-political consequences of these colonial policies.

Keywords: Colonial Medinipur, natural disasters, floods, famines, scientific interventions, environmental management.

Introduction: Medinipur, a district in the southwestern part of Bengal, experienced frequent natural disasters during British colonial rule. Floods and famines were recurrent, driven by the region's climatic variability and the fragility of its agrarian economy. These disasters had a profound impact on the lives of the local population, shaping their relationship with the land, their economic structures, and their social hierarchies. The British colonial administration, in its attempt to manage these disasters, adopted a range of "scientific" interventions, including irrigation projects, flood control measures, and famine relief programs.

While these interventions were presented as efforts to modernize the region and protect its inhabitants from the vagaries of nature, they were often designed to serve colonial interests. The introduction of railways, canals, and other infrastructure aimed to safeguard agricultural production and maintain revenue flows rather than to provide long-term relief for the people. This article examines the colonial response to floods and famines in Medinipur, focusing on

the role of science and technology in managing these disasters. It also explores the broader environmental and social implications of these interventions, arguing that while they brought short-term relief, they also contributed to long-term environmental degradation and socio-economic inequalities.

Floods in Colonial Medinipur:

Medinipur's geographic location, with its numerous rivers and low-lying areas, made it highly vulnerable to seasonal flooding. The district is traversed by major rivers like the Subarnarekha, Kangsabati, and Rupnarayan, which overflowed their banks during the monsoon season, inundating vast tracts of agricultural land. These floods often destroyed crops, leading to food shortages and economic losses for the rural population. The colonial administration recognized the importance of controlling floods to ensure the stability of the agrarian economy, which was a major source of revenue for the British Empire.

The British response to flooding in Medinipur involved a range of engineering solutions. The colonial government undertook extensive river management projects, including the construction of embankments and the dredging of riverbeds. These measures were intended to prevent rivers from overflowing and to protect agricultural lands from inundation. The embankments, while providing short-term relief, often exacerbated the problem in the long run. By confining rivers within narrow channels, the embankments increased the velocity of water flow, leading to more severe flooding downstream.

Moreover, the construction of embankments frequently disrupted traditional flood management practices that local communities had relied on for centuries. These practices, such as the seasonal flooding of rice fields, allowed for the replenishment of soil nutrients and supported agricultural productivity. The colonial flood control measures, by contrast, prioritized immediate revenue extraction over sustainable environmental management. The focus on protecting large landholdings and estates, particularly those owned by British planters and local elites, further marginalized small farmers and landless laborers, who were often the most affected by floods.

The flood control projects in Medinipur had mixed results. While they succeeded in protecting some areas from flooding, they also led to unintended consequences. The embankments and other infrastructure disrupted the natural hydrology of the region, altering the flow of rivers and increasing the likelihood of waterlogging in certain areas. These changes in water management had a direct impact on agricultural productivity, leading to soil degradation and reduced yields over time.

In addition, the colonial emphasis on engineering solutions to flood management often ignored the underlying social and economic causes of vulnerability. The poorest sections of the population, who lived in the most flood-prone areas, were often excluded from the benefits of flood control projects. Instead, they were left to bear the brunt of the environmental changes brought about by colonial interventions. This further deepened social inequalities in Medinipur, as wealthier landowners and British planters were able to protect their properties while poorer farmers saw their livelihoods destroyed.

Famines in Medinipur:

Famines were another recurring disaster in colonial Medinipur, driven by a combination of natural factors (such as droughts) and colonial economic policies. The agrarian economy of Medinipur was highly vulnerable to fluctuations in rainfall, with even small variations in the monsoon having a significant impact on crop yields. The colonial emphasis on cash crops, particularly indigo, jute, and opium, further exacerbated the region's vulnerability to famine, as the focus on commercial agriculture reduced the production of food crops.

The Bengal Famine of 1770, one of the earliest famines during British rule, devastated Medinipur, leading to widespread starvation and death. The colonial administration's response to this disaster was marked by a focus on maintaining revenue flows, with little attention paid to the needs of the affected population. This pattern would be repeated in subsequent famines, including the catastrophic Bengal Famine of 1943, which affected Medinipur along with other parts of Bengal.

The British response to famines in Medinipur involved a range of relief measures, including the establishment of relief camps, the distribution of food aid, and the creation of public works programs. These interventions were often guided by the principles of "scientific" famine relief, which emphasized the importance of maintaining agricultural productivity and preventing mass migration.

One of the key famine relief measures introduced by the British was the construction of irrigation canals. The colonial administration believed that by providing a reliable source of water for agriculture, they could reduce the region's dependence on the monsoon and prevent future famines. The construction of the Midnapore Canal, which was completed in the late 19th century, was part of this broader strategy. The canal system was intended to irrigate large tracts of agricultural land, ensuring that farmers could continue to grow crops even in times of drought.

However, the benefits of these irrigation projects were unevenly distributed. Large landholders and British planters, who controlled the most

fertile lands, were the primary beneficiaries of the canal system. Small farmers and landless labourers, by contrast, often lacked access to the new irrigation infrastructure and continued to rely on rain-fed agriculture. This further deepened social inequalities in the region, as wealthier landowners were able to protect themselves from famine while poorer farmers remained vulnerable.

The British colonial government also introduced new methods of managing famine relief, based on the principles of scientific management. The Famine Codes, introduced in the late 19th century, were designed to provide a systematic approach to famine relief. These codes set out guidelines for when and how the government should intervene in times of food scarcity, based on indicators such as crop failure, food prices, and mortality rates.

While the Famine Codes represented a more structured approach to disaster management, they were also shaped by colonial economic interests. The British were often reluctant to provide extensive relief, fearing that it would encourage dependence on the state and reduce the incentive for agricultural production. As a result, the relief measures introduced under the Famine Codes were often inadequate, particularly for the poorest sections of the population.

The emphasis on maintaining agricultural productivity during famines also led to the forced labor of rural populations. Public works programs, such as road and canal construction, were established as part of famine relief efforts, with the aim of providing employment to those affected by famine. However, these programs were often poorly managed, with laborers subjected to harsh working conditions and inadequate wages. The focus on maintaining revenue flows and agricultural output meant that the relief measures were more concerned with preserving the colonial economy than with addressing the underlying causes of famine vulnerability.

Colonial Science and Environmental Impact:

As part of their response to natural disasters, the British introduced "scientific" agricultural practices in Medinipur, aimed at increasing agricultural productivity and reducing vulnerability to floods and famines. These practices included the introduction of new crop varieties, the use of chemical fertilizers, and the promotion of commercial crops such as jute and indigo. While these interventions did lead to short-term increases in agricultural output, they also had significant environmental consequences. The focus on commercial crops reduced the diversity of crops grown in the region, leading to a decline in soil fertility and increased vulnerability to pests and diseases. The use of chemical fertilizers and pesticides also contributed to environmental degradation, polluting rivers and groundwater and disrupting local ecosystems.

The colonial emphasis on engineering solutions to natural disasters, such as the construction of embankments and canals, had long-term environmental consequences for Medinipur. The alteration of the region's hydrology, combined with the introduction of monoculture and chemical farming, led to soil erosion, waterlogging, and a decline in agricultural productivity over time. These environmental changes, while not immediately apparent, had a profound impact on the livelihoods of rural communities in Medinipur. The loss of soil fertility and the degradation of the natural environment made small-scale farming increasingly difficult, contributing to a cycle of poverty and landlessness among the region's rural population. Moreover, the environmental degradation caused by colonial interventions increased the vulnerability of Medinipur to future natural disasters, particularly floods and famines.

The Role of Railways and Colonial Infrastructure:

An important aspect of the colonial response to natural disasters in Medinipur was the construction of railways and other transportation infrastructure. Railways were introduced to facilitate the movement of goods, particularly agricultural products, between Medinipur and major urban centers like Calcutta. From the colonial perspective, this infrastructure was vital in ensuring that crops, even in times of scarcity or disaster, could reach the markets and maintain colonial revenues. During famines, the colonial administration relied heavily on the railway network to transport food supplies to affected areas. The idea was that by improving transportation, food shortages could be alleviated more efficiently. However, while the railways did make the movement of grain faster and easier, this often failed to translate into effective relief for the local population. Food aid was frequently misallocated or arrived too late, while merchants took advantage of the situation by hoarding grain and increasing prices. In the Bengal Famine of 1943, for example, despite increased grain production and access to transportation, starvation and mass death were rampant in Medinipur and other parts of Bengal.

The construction of railways and other colonial infrastructure also had significant environmental impacts. Large-scale deforestation took place to clear land for railways, embankments, and canal construction. This deforestation exacerbated the flooding problem by reducing the natural capacity of the land to absorb rainwater. In addition, railway embankments and other infrastructure often disrupted the natural drainage systems of the region, leading to waterlogging and salinization of soils. The combination of deforestation and infrastructure development thus made Medinipur more vulnerable to both floods and droughts, contributing to the cycles of environmental degradation and

natural disaster vulnerability that plagued the region throughout the colonial period.

Colonial Science and the Limits of "Modernization":

Despite the introduction of what the British termed "scientific" interventions, their approach to disaster management in Medinipur often failed to address the root causes of vulnerability. Colonial policies tended to prioritize immediate economic concerns, particularly the protection of revenue flows and agricultural productivity, over the long-term sustainability of the environment and the welfare of the local population.

One of the major "scientific" solutions promoted by the colonial government was irrigation. In addition to the Midnapore Canal, a number of smaller irrigation projects were implemented across the district. These projects aimed to provide a reliable source of water for agriculture, thereby reducing dependency on the monsoon and minimizing the impact of droughts. However, these irrigation schemes were often poorly planned and executed. In some cases, the construction of canals and other water infrastructure led to unintended environmental consequences, such as waterlogging and the salinization of soils, which reduced agricultural productivity over time. Additionally, the benefits of these projects were typically skewed in favor of large landowners, who were able to use the irrigation systems to increase their profits, while small farmers and landless laborers continued to suffer from food insecurity.

The introduction of the Famine Codes in the late 19th century marked another attempt by the British colonial administration to apply "scientific" principles to disaster management. These codes established guidelines for identifying famine conditions and determining when and how the government should intervene with relief measures. They also set out rules for the distribution of food aid, the establishment of relief camps, and the implementation of public works programs.

While the Famine Codes represented a more systematic approach to famine relief, they were often undermined by the colonial administration's reluctance to fully implement them. Concerns about the cost of relief programs and the potential for creating a "dependency" on the state often led to inadequate responses to famine conditions. In addition, the Famine Codes were designed with the assumption that the causes of famine were primarily environmental, ignoring the social and economic factors that contributed to food insecurity, such as land tenure patterns, colonial agricultural policies, and the marginalization of small farmers.

The public works programs implemented as part of famine relief efforts were also problematic. While these programs provided some employment

opportunities for those affected by famine, they often involved hard physical labor under harsh conditions, with inadequate wages and food rations. Moreover, the focus of these programs was frequently on infrastructure projects that benefited the colonial economy, such as road and canal construction, rather than projects that would directly alleviate the suffering of the local population.

Conclusion: The colonial response to natural disasters in Medinipur was shaped by a combination of "scientific" interventions and imperial economic priorities. While the British introduced a range of modern technologies and infrastructure projects, such as irrigation systems, railways, and flood control measures, these interventions were often designed to protect colonial revenue flows rather than to address the underlying causes of vulnerability to floods and famines. The environmental impact of these interventions was profound, with deforestation, waterlogging, soil degradation, and disruption of traditional agricultural practices contributing to the long-term vulnerability of the region. At the same time, the social consequences of colonial disaster management policies were equally significant, with the benefits of "modernization" disproportionately accruing to large landholders and British planters, while small farmers and landless laborers continued to suffer from food insecurity and environmental degradation.

In the end, the colonial emphasis on "scientific modernization" in Medinipur failed to deliver on its promises of increased agricultural productivity and disaster resilience. Instead, it deepened social inequalities, exacerbated environmental degradation, and left the region more vulnerable to natural disasters. The legacy of these colonial interventions continues to shape the environmental and socio-economic landscape of Medinipur today, underscoring the need for a more sustainable and equitable approach to disaster management and environmental governance.

References:

1. Arnold, David. *Science, Technology, and Medicine in Colonial India*. Cambridge University Press, 2000.
2. Bhattacharya, D.K. *The Bengal Famine: A Study in Economic Causes*. Oxford University Press, 1945.
3. Bandopadhyay, D. *Irrigation in British India: Systems and Structures*. Taylor & Francis, 1988.
4. Bose, Sugata. *Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics*. Cambridge University Press, 1986.
5. Chakrabarti, Pratik. *Western Science in Modern India: Metropolitan Methods, Colonial Practices*. Routledge, 2004.
6. Guha, Ramachandra. *The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya*. Oxford University Press, 1999.

7. Thorner, Daniel. The Shaping of Modern India: Colonialism, Development, and the Railways. Transaction Publishers, 2000.
8. Peers, Douglas M. India Under Colonial Rule: 1700-1947. Pearson, 2006.
9. Sen, Amartya. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford University Press, 1981.
10. Rangarajan, Mahesh. Fencing the Forest: Conservation and Ecological Change in India's Central Provinces 1860-1914. Oxford University Press, 1996.

Upaniṣadic Influence in the Modern Indian Society

Ram Pada Roy

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit

Fakir Chand College

Abstract: The *Upaniṣads*, ancient Indian texts that form the philosophical core of Vedic literature, have had a profound and enduring impact on modern Indian society. Their teachings, which emphasize self-realization, spiritual unity and the nature of ultimate reality (Brahman), have shaped India's cultural, philosophical and spiritual landscape across centuries. In the modern era, the *Upaniṣads* continue to influence various aspects of Indian society; particularly in the realms of religion, education and social thought. The Upaniṣadic emphasis on inner experience and the search for truth has also contributed to the growth of diverse spiritual movements and a more personal, introspective approach to religion in contemporary India. Moreover, the *Upaniṣads*' teachings on non-duality and the interconnectedness of all life resonate with modern global discourses on ecology, humanity and holistic well-being. This paper aims to explore how the *Upaniṣads* have influenced modern Indian thought, societal norms and cultural expressions, illustrating their continued relevance in shaping the ethical and spiritual framework of contemporary India.

Keywords: *Upaniṣads*, Indian Society, Values, Youth, Education.

Introduction: The traditional understanding is clearly reflected in Śaṃkarāchārya's explanation of the word 'Upaniṣad'. The term means knowledge received by the student 'sitting close to' the teacher. The *Upaniṣads* form the *Jñānakāṇḍa* (knowledge section) of the *Vedas*. This pre-Buddhist mass of thoughts called *Brahmavidyā* (i.e., knowledge of Brahman) was realized and taught by a succession of Seers. The *Upaniṣads* are free from cumbersome ritualism and speak of the reality in a highly symbolic and mystical language. They are also called *Āraṇyaka* (forest philosophy) and *Rahasya* (secret). The *Kena Upaniṣad* (4.7) speaks of *Upaniṣad* as 'secret knowledge'¹; the *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad* as 'truth of truths' (2.1.20)². The word *Upaniṣad* implies - 'The knowledge of the knowable entity (Brahman) presented in the scriptures. The significance of this knowledge is that it destroys, splits up, the seeds of worldly existence, such as ignorance'. The perception of separateness, diversity and individuality in the world is explained in *Advaita* through the

concept of *ajñāna*, which translates to ‘illusion’ or ‘cosmic power’— “अज्ञानं तु सदसद्ভ্যাম্ অনির্বচনীযং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যত্কিञ্চিত্ ইতি”³ It also connotes the humility with which the student should approach the teacher. The *Upaniṣads* form the basis of almost all later philosophical schools and religions in India and, in their various forms, have been influencing world philosophical thought. So, *Upaniṣads* means Self-knowledge. Many aspects of modern life have Upanishadic influence. Among them I will try to highlight some special areas.

Youth and the *Upaniṣads*: In the present scenario, youth is a period of change. A child becomes an adult. This phase is the time when a person’s thoughts play a major role in shaping his or her personality and life. As the youth emerges from his dream world, he has to face many unpleasant facts about life. He has to encounter the hard facts of selfishness and cruelty, violence and hypocrisy, negative and narrow ideologies. He has to face all this; he has to face himself. Cultivating faith in oneself is the best way to overcome emotional problems that many youth face. Whether in school, in college or in professional life, we seem to lose this faith in ourselves. One should not run away from life but rather learn to face it with courage and heroism. The *Kaṭha Upaniṣad* rouses this inner potential by its well-known statement —“उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्त्ववयो वदन्ति॥” (1.3.14)⁴. This timeless message encourages the youth to rise above fear, seek higher knowledge and walk the challenging path of truth and self-realization with determination and clarity.

The *Upaniṣads* and Indian Value Systems: Let us begin by referring to the well-known first *mantra* from the *Iśa Upaniṣad* — “ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥” (1)⁵. This *mantra* captures the essence of the Vedāntic vision of the divine in all things. Behind the world of changing names and forms lies an all-pervading spiritual reality. From this insight springs the entire foundation of Indian cultural and ethical values. This idea leads to treating everyone with a sense of respect. This idea explains the Hindu’s respectful attitude toward all life forms, including plants and animals. This is recognition of the divine spark hidden in everyone. Not only this respect for life but also all the values that have shaped the Hindu worldview, like *ahimsā* (non-violence), *satya* (truthfulness), *asteya* (non-stealing), *brahmacarya* (self-restraint) and *aparigraha* (non-possessiveness), can be seen to originate from this vision. These five values, known as the *yamas* are beautifully summarized in the *Pātañjala Yogadarśana* — “अहिंसा सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापग्रहा यमाः॥” (*Sādhana-pāda*, 30)⁶. Thus, the *Upaniṣadic* vision not only offers a spiritual perspective on life but also lays the ethical foundation for a harmonious and respectful society.

The *Upaniṣads* and Indian Science: Let us now consider how the *Upaniṣads* have shaped the Indian approach to scientific temper and inquiry. Here are two insightful *mantras* from the *Kena Upaniṣad* that exemplify this spirit – “केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति।। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद् वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।।” (1.1-2)⁷. These *mantras* beautifully illustrate the deeply rooted spirit of inquiry that has shaped Indian thought from the earliest times. The *Upaniṣads* are not merely spiritual texts but profound explorations into the nature of consciousness, perception and existence; questions at the heart of both philosophy and science. The seers whose inquisitive minds set out to know the unknowable were able to break the secrets of matter. While science is an unending quest for knowledge, the Vedic mind searched for the ultimate source of all matter and energy. Many of the modern day scientists have found several parallels between the Upaniṣadic truths and the scientific discoveries. Thus, the *Upaniṣads* offer not only spiritual wisdom but also a scientific mindset that encourages deep inquiry, exploration and the pursuit of ultimate truths.

The *Upaniṣads* and Indian Education: The *Upaniṣads* are mostly a record of teacher-student dialogue. The following prayer from the *Upaniṣads* sums up the excellent relationship that existed between them. The *Upaniṣads* laid the foundation for the loving and respectful relationship between the teachers and students, which prevailed in India till the modern education system ruined it with money, competition, hatred and disharmony. The *Upaniṣads* contain touching stories of exemplary students like Uddālaka, Upamanyu, Satyakāma Jābāli, Śvetaketu and Naciketas and also great teachers like Yājñavalkya. While the modern system emphasizes mainly developing one’s intellectual capacities, the *Upaniṣads* emphasized the development of character as the most important part of education. The Upaniṣadic teachers themselves led ideal lives and hence inspired their students to live lofty lives and the Upaniṣadic method of living together with ideal teachers as the best form of education.

The *Upaniṣads* and Present Indian Society: Scientists, psychologists, neurologists and philosophers believe that they are storming the last citadel of mystery, viz., consciousness but what they refer to is just a shoreline of a vast ocean of consciousness (i.e., *Cit*) – “... भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम्” (*Vivekacūḍāmaṇi*, 152)⁸. This vast ocean was charted and plumbed minutely by the brave Seers. Knowing that human nature is the result of many metaphysical forces, the Upaniṣadic society was geared to inexorably raise even its lowest member of society to spiritual freedom. Today, people acknowledge that the neglect and blindness about the spiritual dimension of the personality has well-

nigh destroyed humanity. As a result, many thoughtful individuals are increasingly turning toward the wisdom of the *Upaniṣads*. In this shift, the insights of the Seers and the teachings of the *Upaniṣads* are being vindicated.

The *Upaniṣads* and Indian Culture: Without understanding the *Upaniṣads*, it is impossible to get an insight into Indian history and culture. Every subsequent development in Indian philosophy and religion has been deeply influenced by the *Upaniṣads*. The paths of *Bhakti* (devotion to a personal God), *Karman* (detached action) and the synthesis of various spiritual paths into a unified spirituality, as expounded in the *Bhagavadgītā*, all find their roots in the *Upaniṣads*. In the words of Bloomfield – ‘There is no important form of Hindu thought, heterodox Buddhism included, which is not rooted in the Upanishads’⁹.

The Power of the *Upaniṣads*: Can you find peace if you are separate from everything? There is a beautiful *mantra* in the *Bṛhadāranyaka Upaniṣad* – “ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, ... ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা” (2.4.6)¹⁰. The real meaning of the *mantra* went into the heart of the person and he lost the idea that he was separate from this one and from that one; he became all alive. This is an experience that sometimes happens to people. If you are afraid of the world, if the world has limited you, circumscribed you, if you feel bound by the world or anything in this world, then consciously try to think that everything is Brahman, everything is divine, that nothing is outside you and nothing can affect you; you also are Brahman, you also are divine – “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মা” (*Chāndogya Upaniṣad*, 3.14.1)¹¹. Keep that consciousness and you will find you have become a changed person. That is what you have to practice.

Conclusion: The *Upaniṣads*, as the philosophical heart of Indian spirituality, continue to profoundly influence modern Indian society. Their timeless teachings on inner self-realization, unity of existence and the pursuit of truth have shaped not only India’s spiritual outlook but also its ethical, educational and cultural frameworks. In an age of rapid material growth and digital transformation, the Upaniṣadic emphasis on introspection, detachment and universal harmony offers a moral compass and a path to inner peace. Whether through the teachings of modern spiritual leaders, the integration of yoga and meditation in daily life or the resurgence of interest in ancient wisdom, the Upaniṣadic ideals remain deeply relevant, inspiring individuals and communities to seek higher knowledge and live in harmony with themselves and the world. In this regard Swami Vivekananda says that – “You must remember that what the Bible is to the

Christians, what the Koran is to the Mohammedans, what the Tripitaka is to the Buddhist, what the Zend Avesta is to the Parsees, these *Upaniṣads* is to us”¹².

References:

1. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. (2019). *Isha-Kena-Katha Upanishad*. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd. p.72.
2. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. (2011). *Brhadāranyakopaniṣad*. Vol. II. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd. p.516.
3. Medhachaitanya, Brahmachari. (2010). *Vedāntasāra*. Kolkata: Adyapith. p.50.
4. Medhachaitanya, Brahmachari. *Kāthakopaniṣad*. Kolkata: Adyapith. p.129.
5. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. (2019). *Isha-Kena-Katha Upanishad*. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd. p.5.
6. Swami Bhargananda. (2017). *Pātañjala Yogadarśana*. Kolkata: Udbodhan Karyalay. p.145.
7. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. (2019). *Op. cit.*, pp.7-11.
8. Swami Vedantananda. (2014). *Vivekacūḍāmaṇi*. Kolkata: Udbodhan Karyalay. p.103.
9. Bloomfield, Maurice. (1908). *The Religion of the Veda*. New York: The Knickerbocker Press. p.51.
10. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. (2011). *Brhadāranyakopaniṣad*. Vol. II. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd. p.621.
11. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. (2014). *Chāndogyopaniṣad*. Vol. I. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd. p.320.
12. *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Vol. III). (1958). Calcutta (now Kolkata): Advaita Ashrama. p. 332.

Select Bibliography:

1. Bloomfield, Maurice. *The Religion of the Veda*. New York: The Knickerbocker Press, 1908.
2. *Brhadāranyakopaniṣad*. With comm. of Śaṅkarācārya. Vol. I & II. Ed. and Beng. Trans. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd., 2011 (5th ed.).
3. *Chāndogyopaniṣad*. With comm. by Śaṅkarācārya. Vol. I & II. Ed. and Beng. Trans. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd., 2014.
4. *Isha-Kena-Katha Upanishad*. With comm. by Śaṅkarācārya. Ed. and Beng. Trans. Durgacharan-Sankhyavedantatirtha. Kolkata: Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd., 2019 (rpt. of 10th ed.).
5. Sadānandayogīndrasarasvatī. *Vedāntasāra*. With *Subodhinī* comm. of Nṛsiṃhasarasvatī, *Bālābodhinī* comm. of Āpodeva and *Vidvanmanoranjanī* of Rāmātirtha. Ed. and Beng. Trans. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Adyapith, 2010 (5th ed.).

6. Śaṅkarāchārya. *Vivekacūḍāmaṇi*. Beng. Trans. Swami Vedantananda. Kolkata: Udbodhan Karyalay, 2014 (14th rpt. of 1st ed., 1968).
7. Swami Bhargananda. *Pātañjala Yogadarśana*. Kolkata: Udbodhan Karyalay. 2017 (4th rpt. of 1st ed., 2004).
8. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol. III. Calcutta (now Kolkata): Advaita Ashrama, 1958 (13th rpt.).

The British Army Diet in Colonial India : Nutritional Policies for Soldiers and Their Effects

Sanchari Chaulya

Research Scholar, Dept. of History & Archaeology
Fakir Mohan University, Balasore, Odisha

&

Rinky Behera

Assistant professor, Dept. of History
K.K.S. Women's College, Balasore, Odisha

Abstract: The role of diet and nutrition in sustaining the British Army during colonial rule in India was of paramount importance, both for the maintenance of military strength and the broader imperial agenda. This article delves into the historical trajectory of the British Army's dietary policies in India from the late eighteenth to the early twentieth centuries, highlighting how food was strategically used to manage health, discipline, and morale among soldiers stationed in an alien and often challenging environment. Early military dietary practices were often based on trial and error, reflecting European culinary habits transplanted into the Indian context with little consideration for local climatic conditions. However, over time, influenced by the growing fields of tropical medicine and nutrition science, more structured and scientific approaches to army diets began to emerge. The British authorities developed detailed ration systems for both British and Indian soldiers, with significant differences reflecting racial theories prevalent in colonial governance. This article analyzes the composition of daily rations, the inclusion of local food items such as rice, dal, and ghee for Indian troops, and the continued reliance on meat, bread, and beer for British soldiers. Special attention is given to the nutritional imbalances that resulted from these policies, including outbreaks of scurvy, dysentery, and other diet-related illnesses. Moreover, the article examines how army diets were modified during critical periods such as the Indian Rebellion of 1857 and the World Wars, when logistical challenges forced further innovation in food supply chains. The study also explores the broader implications of these dietary practices, including their influence on the development of modern military nutrition standards and the ways in which colonial dietary experiments informed civilian public health policies in both India and Britain.

Keyword: British Army, Colonial India, Military diet, Nutritional policies, Army rations, Soldier health, Tropical medicine.

Introduction: The maintenance of a healthy and effective army has always been fundamental to the success of imperial ventures. In the context of British colonial rule in India, this necessity assumed an even greater significance. Thousands of miles away from home, the British Army found itself stationed in a vastly different environment, confronted by unfamiliar climates, endemic diseases, and new logistical challenges. Among the many factors that determined the army's operational effectiveness, diet and nutrition emerged as critical concerns. It was widely acknowledged within colonial administrative circles that the physical condition of soldiers — their strength, endurance, and resilience against disease — was intimately tied to the food they consumed. The British authorities, drawing lessons from early military failures and the high mortality rates among troops, gradually evolved a more systematic approach to managing army nutrition. However, their efforts were not simply driven by humanitarian concern; rather, they were deeply enmeshed in broader imperial strategies of control, discipline, and racial governance. Food was not merely a source of sustenance; it was a tool for maintaining military discipline, asserting cultural superiority, and managing the colonial "other." Distinct ration policies for British and Indian soldiers reflected the racialized assumptions of the time, with dietary prescriptions often reinforcing colonial stereotypes about strength, stamina, and moral character. Initially, attempts to replicate the European dietary model in India proved disastrous. Soldiers accustomed to the temperate climates of Britain struggled with heavy meat-and-alcohol-based diets that were ill-suited to India's hot and humid conditions. High incidences of diseases such as dysentery, cholera, and scurvy among troops highlighted the urgent need for dietary reform. The gradual emergence of nutritional science in the nineteenth century, combined with advances in tropical medicine, led to a more nuanced understanding of the relationship between diet, environment, and health. Efforts to adapt rations to local conditions — incorporating Indian staples like rice and lentils while retaining British dietary preferences — marked a significant shift in policy.

This article aims to explore the evolution of the British Army's dietary policies in colonial India, investigating how these policies were formulated, implemented, and adjusted over time. It also examines the broader medical, cultural, and political factors that shaped these developments. By analyzing the composition of army rations, the debates around nutrition, and the health outcomes among soldiers, this study seeks to understand how food became a

crucial yet often overlooked element of colonial military strategy. Furthermore, it explores the long-term impacts of these nutritional experiments, both on military practice and on the development of public health policies in the colonial and postcolonial worlds.

Nutritional Ideologies and the British Army:

The formulation of dietary regimes in the British Army during colonial rule in India was not merely an administrative or medical concern; it was deeply informed by the prevailing **nutritional ideologies** of the 19th and early 20th centuries. These ideologies were shaped by emerging theories in nutrition science, the development of tropical medicine, and the racial and cultural assumptions underpinning imperial governance. The convergence of these factors created a uniquely colonial discourse around food, health, and soldiering — one that reflected both scientific aspirations and imperial anxieties.

At the heart of these nutritional ideologies was a firm belief in **caloric sufficiency and macronutrient balance** — particularly protein and carbohydrate intake — as essential to building and sustaining military strength. British medical officers, influenced by contemporary European theories of metabolism and work energy, argued that a physically active soldier in tropical climates required a higher caloric intake, especially in the form of digestible proteins and starches. This belief was tied to the broader European notion of the body as a machine: food functioned as fuel, and its quality and quantity directly impacted military efficiency.

However, nutritional ideology in the colonial context was not just physiological — it was profoundly **racialized**. British officials believed that European soldiers needed heavier, meat-based diets to maintain their "superior" physical and moral constitution, while Indian troops were presumed to thrive on simpler, grain-based vegetarian diets. These assumptions were rarely tested scientifically and instead relied on stereotypes that aligned diet with character. For instance, meat consumption was equated with martial vigor, while vegetarianism (often practiced among Indian soldiers due to caste or religious beliefs) was viewed as passive or effeminate. Thus, dietary distinctions became a method of reinforcing racial hierarchies within the army.

Moreover, **climatic determinism** — the belief that tropical climates had a degenerative effect on European bodies — played a critical role in shaping these ideologies. Army physicians often recommended modifications to diet based on climate, suggesting lighter, more easily digestible meals during the hot season and more substantial rations during the winter. Yet, efforts to adapt food to the environment were often undermined by the stubborn insistence on European norms, such as the consumption of beef, bread, and alcohol, regardless

of local conditions. This resulted in widespread **digestive ailments**, dehydration, and vitamin deficiencies like scurvy and beriberi — especially during military campaigns.

An additional dimension to these ideologies was the **medicalization of food**. With the rise of bacteriology and the study of vitamins in the late 19th century, military physicians began to monitor food quality, storage, and preparation more rigorously. Cleanliness in kitchens, the avoidance of spoiled rations, and the introduction of condiments like lime juice to prevent scurvy became part of the nutritional doctrine. Food was no longer seen just as sustenance but as a form of preventive medicine — vital to troop readiness and public health.

Importantly, the British also used **dietary control as a disciplinary mechanism**. Punishments for insubordination often involved denial of rations or substitution with less palatable options. Likewise, rewards could include extra alcohol, meat, or sweets. In this way, nutritional ideology extended into the sphere of moral regulation and psychological control, subtly linking loyalty to the empire with bodily satisfaction.

The evolution of these ideologies was not static. By the early 20th century, global developments in nutritional science — such as the discovery of vitamins and the classification of essential nutrients — prompted some reform in military rations. Field studies during World War I and II led to new attention on balanced diets, especially under conditions of food scarcity. Yet, even these changes often retained colonial assumptions, preserving the divide between what was deemed appropriate nutrition for British soldiers and for Indian sepoys.

In essence, **nutritional ideologies in the British Army in India** reflected the intersection of scientific theory, racial policy, environmental adaptation, and imperial power. They were a manifestation of how the British sought to understand and control the colonial body — both their own and those of the colonized — through the management of something as basic and essential as food. This ideological framework laid the foundation for institutionalized military nutrition not only in colonial India but also in later British and postcolonial military practices worldwide.

Composition of the British Soldier's Diet:

The daily diet of British soldiers stationed in colonial India was a product of evolving military regulations, logistical pragmatism, nutritional beliefs, and imperial ideologies. While the primary aim was to maintain the physical endurance and combat readiness of the troops, the composition of their meals also reflected broader cultural assumptions about food, race, and health. The British military authorities, particularly the Commissariat Department and the

Army Medical Services, sought to develop a standardized dietary regimen for soldiers, one that would sustain them in an unfamiliar tropical climate while also preserving traditional British culinary preferences.

Basic Components of the Diet:

The standard British soldier's diet in colonial India typically consisted of the following components:

- **Meat:** Beef and mutton were the staple sources of animal protein. On average, a soldier received between 1 to 1.5 pounds of meat per day. Pork was occasionally included, but beef remained the primary meat due to both tradition and availability. The meat was usually boiled or stewed, with some variations allowed in barrack kitchens.
- **Bread and Biscuits:** Soldiers received daily rations of bread (about 1 pound), baked either on-site in military bakeries or sourced from local European-run suppliers. In field conditions, hard biscuits or "hardtack" often substituted fresh bread, though these were tough and nutritionally limited.
- **Grain and Rice:** While less prominent in the British soldier's diet than in that of Indian sepoy, rice and other local grains were sometimes included, particularly when wheat supplies were low. Rice was used more frequently in cantonment diets, especially in the hot seasons when it was considered easier to digest.
- **Pulses and Vegetables:** Dal (lentils) and locally available vegetables were provided occasionally, though in far smaller portions than grains and meat. Root vegetables like potatoes, onions, and carrots were common, while green leafy vegetables were often lacking, leading to deficiencies in micronutrients.
- **Fat:** Soldiers were allocated small portions of butter, ghee (less frequently), or suet. Fat was considered essential not only for energy but also for "keeping the body warm" in colder frontier regions.
- **Sugar and Salt:** Sugar was issued regularly (typically 2–4 ounces per day), not just for taste but also as a quick source of energy. Salt was an indispensable ration item, particularly due to the heavy sweating caused by the Indian climate.
- **Tea and Alcohol:** Tea became a vital morale booster and was issued almost daily. It was typically consumed with sugar and milk, when available. Rum and beer were also distributed under controlled conditions. Alcohol served both as a recreational relief and as a perceived protection against illness, though its excessive use often contributed to liver and digestive problems.

- **Condiments and Lime Juice:** Lime or lemon juice became an essential part of the diet after scurvy outbreaks in the 18th and 19th centuries. By the late 19th century, the British military had institutionalized the provision of lime juice as a preventive measure against vitamin C deficiency.

Caloric and Nutritional Value:

Military estimates in the late 19th century suggested that a British soldier in India required between **3,500 and 4,000 calories per day**, depending on activity levels and climate. This intake was largely met through heavy consumption of meat, starch (from bread, potatoes, and rice), and sugar. However, **the micronutrient composition was often poor**, with insufficient quantities of vitamins A, C, and D, as well as essential minerals like iron and calcium.

The protein content was typically high, often exceeding modern nutritional recommendations. Still, the lack of balance in the source of protein (predominantly from red meat) contributed to **digestive issues, uric acid buildup, and gout** among the troops. The overreliance on preserved and salted foods in field conditions further compromised digestive health.

Health Implications:

The composition of the British soldier's diet had direct implications for health outcomes:

- **Nutritional Deficiencies:** The lack of fresh fruits and vegetables led to vitamin deficiencies, especially vitamin C (scurvy), vitamin A (night blindness), and B-complex deficiencies (beriberi and pellagra).
- **Gastrointestinal Illnesses:** Rich, greasy meat diets combined with poor water quality resulted in frequent cases of dysentery, diarrhea, and typhoid fever.
- **Chronic Conditions:** The high intake of red meat and alcohol led to long-term issues such as liver problems, gout, and cardiovascular complaints — even among relatively young soldiers.
- **Mortality Rates:** Until nutritional reforms in the late 19th century, poor diet contributed significantly to non-combat deaths. Military medical reports in the 1860s and 1870s showed that disease, often diet-related, killed more soldiers than battle wounds.

The Indian Sepoy's Diet:

The dietary regimen of Indian sepoys during the British colonial era was shaped by a complex interplay of military regulations, religious customs, regional dietary traditions, caste norms, and colonial perceptions of racial difference. Unlike the diet of British soldiers, which emphasized uniformity and standardization, the Indian sepoy's diet was diverse and often negotiated

between the demands of military efficiency and the need to respect deep-seated cultural identities. The British administration, wary of igniting discontent among native troops, made significant concessions to accommodate religious and caste-based dietary restrictions. This careful balance, however, was not free from ideological motives or practical limitations.

Religious and Caste Influences:

At the core of the Indian sepoy's diet were religious and caste considerations. The army was composed of Hindus, Muslims, Sikhs, and occasionally other communities such as Christians and Parsis, each of whom had specific dietary codes:

- **Hindu Sepoys:** Particularly Brahmins and other high-caste Hindus adhered to strict vegetarianism and ritual purity. For many, even the use of common cooking utensils by other castes or meat-eaters could defile the food. Ghee, rice, dal (lentils), and seasonal vegetables formed the staple diet. Salt was an important ritual and culinary element, and food was often self-cooked or prepared by caste-designated cooks (bawarchis).
- **Muslim Sepoys:** Muslim troops consumed meat (excluding pork) and emphasized the halal method of slaughter. Their diet was richer in protein, often featuring mutton or chicken, along with rice, chapatis, and pulses. Unlike many Hindu sepoys, Muslims used common kitchens, making them slightly easier to accommodate within logistical frameworks.
- **Sikh Sepoys:** The Sikh soldiers, especially those from the Jat community, had a mixed diet, including wheat products like chapati or paratha, pulses, milk, ghee, and meat (excluding beef). While Sikhs shared some dietary norms with Hindus, they were generally more flexible in kitchen arrangements.

The diversity of dietary habits necessitated the establishment of **separate cooking arrangements** and sometimes separate messes based on religious and caste lines. Any perceived violation of dietary codes could trigger unrest, as dramatically demonstrated by the **1857 revolt**, which was partly sparked by rumors about beef and pork fat on cartridge papers.

Typical Components of the Sepoy's Diet:

While regional variations existed, a general pattern emerged across sepoy regiments stationed in different parts of India:

- **Grain-Based Staples:** The foundation of most sepoy diets consisted of grains — either rice in the south and east or wheat in the north. Chapatis

(flatbreads), puris (deep-fried bread), and boiled rice were staple carbohydrate sources.

- **Pulses (Dal):** Various lentils, such as moong dal, urad dal, and masoor dal, were used extensively to meet protein needs, particularly among vegetarian troops. Pulses were often cooked with minimal spices and consumed with rice or bread.
- **Vegetables:** Seasonal vegetables like potatoes, brinjal (eggplant), gourds, spinach, and okra were commonly included. The quality and quantity of vegetables varied depending on the cantonment's location and available supply chains.
- **Milk and Dairy:** Milk, curd (yogurt), and ghee played a prominent role, especially for high-caste Hindus. These were not only nutritionally valued but also considered ritually pure and thus acceptable across most communities.
- **Meat and Eggs:** Muslim and Sikh sepoy consumed meat dishes more regularly than their Hindu counterparts. Military rations often included mutton or chicken, with occasional provision of eggs.
- **Spices and Condiments:** The sepoy's diet was characteristically more flavorful than that of the British soldier. Spices such as turmeric, cumin, coriander, and chili were commonly used, enhancing both taste and digestion.
- **Tea and Sweets:** With time, tea-drinking became popular among sepoy, especially during the late 19th and early 20th centuries. Sweets like jaggery (gur), halwa, and laddoo were sometimes included in ceremonial or festive meals.

Caloric and Nutritional Aspects:

The average caloric intake for sepoy was slightly lower than their British counterparts — estimated between **2,800 to 3,500 calories per day** — depending on region, caste diet, and operational requirements. However, many sepoy derived their energy from carbohydrate-heavy meals, with rice and chapati accounting for a large share. Protein intake among vegetarian troops was lower, though the consumption of pulses and dairy provided partial compensation.

One notable deficiency in many sepoy diets was the **limited intake of fresh fruits and leafy vegetables**, especially during field campaigns. This often led to scurvy and anemia. British military doctors frequently raised concerns over the “inadequate iron levels” and general undernourishment among Indian troops, especially those from poorer agrarian backgrounds.

Health Outcomes and Medical Observations:

The Indian sepoy's diet had mixed health consequences:

- **Lower Incidence of Gout and Liver Disease:** Compared to British soldiers, sepoys — especially vegetarians — suffered less from rich food-related illnesses like gout and fatty liver disease.
- **Higher Vulnerability to Anemia and Vitamin Deficiency:** Lack of diversity in fresh produce led to widespread anemia, especially among low-income, vegetarian sepoys.
- **Better Digestive Tolerance:** Many sepoys, accustomed to local foods and spices, had more robust digestive systems and coped better with the local climate and water quality.

However, over time, military health reports indicated that **both British and Indian troops required dietary reforms**. The rise of modern nutritional science in the early 20th century led to incremental changes, including the addition of iron supplements, vitamin tonics, and efforts to diversify field rations.

Food and Discipline: A Tool for Control

Controlling soldiers' diets was about more than health; it was a disciplinary tool. Rations were part of the structured military life that regulated every aspect of a soldier's existence. Fines or reductions in rations could be used as punishment for disobedience. Moreover, the army sometimes offered food incentives to encourage good behavior or to persuade recruits to enlist. Food thus became both a carrot and a stick in the colonial military apparatus. This was especially true after 1857, when the British became hypersensitive to the religious and dietary sensitivities of Indian soldiers. Special cooking areas were established to prevent contamination, and soldiers were sometimes given separate utensils based on caste requirements.

Health Implications of Army Diets:

Despite the emphasis on proper nutrition, health outcomes for British troops in India were often poor. In the early nineteenth century, mortality rates among British soldiers in India were astonishingly high—up to **70 per 1000 per year** in some areas. Malnutrition, foodborne illnesses, contaminated water, and alcohol abuse contributed significantly to disease and death. Medical officers frequently recommended changes to diet, but logistical constraints and ingrained habits slowed reform. For Indian sepoys, while their diet was culturally appropriate, it often lacked sufficient variety to prevent micronutrient deficiencies. Cases of beriberi and scurvy were reported, especially among troops on prolonged duty away from supply bases.

Broader Political and Cultural Effects:

The management of food in the colonial army had broader implications for colonial governance.

- It forced the British to engage deeply with Indian religious and cultural practices.
- It reinforced racial stereotypes about strength, endurance, and diet.
- It shaped recruitment policies based on dietary and "racial" assumptions (e.g., preference for "meat-eating" races).
- It laid the groundwork for later public health policies in colonial India, where British officials linked poverty, famine, and health to the dietary habits of the Indian population.

Moreover, food-related grievances among soldiers occasionally spilled over into political unrest, highlighting the intimate link between nutrition, morale, and imperial stability.

Conclusion: The study of the British army's diet in colonial India reveals much more than the menus of soldiers; it exposes the entangled relationship between health, power, race, and empire. Through food, the British sought to impose discipline, foster loyalty, maintain military efficiency, and express racial ideologies. Yet the practical challenges of feeding armies in a vast and diverse land like India often forced adaptations and compromises. The experience shaped not only the daily lives of soldiers but also colonial policies toward the wider Indian population. The legacy of these nutritional practices can thus be seen as part of the larger story of how the British Empire attempted to govern and control through the most basic of human needs: food.

Reference:

1. Arnold, D. (1994). *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India*. University of California Press.
2. Harrison, M. (1999). *Climates and Constitutions: Health, Race, Environment and British Imperialism in India, 1600–1850*. Oxford University Press.
3. Hyam, R. (2002). *Britain's Imperial Century, 1815–1914: A Study of Empire and Expansion*. Palgrave Macmillan.
4. Roy, K. (2006). *The Indian Army and the Making of Punjab*. Permanent Black.
5. Spiers, E. M. (1992). *The Army and Society: 1815–1914*. Longman.
6. Sen, A. (2000). *A Subaltern View of the Indian Sepoy in the Revolt of 1857*. In R. Guha (Ed.), *Subaltern Studies VII* (pp. 106–130). Oxford University Press.
7. David, S. (2002). *The Indian Mutiny: 1857*. Penguin UK.
8. Headrick, D. R. (1981). *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*. Oxford University Press.

9. Pati, B., & Harrison, M. (Eds.). (2009). *Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India*. Orient BlackSwan.
10. van der Straeten, J. (2017). "Feeding the Troops: Nutrition, Food Supply and Colonial Military Logistics in British India, 1870–1914." *War & Society*, 36(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/07292473.2017.1312766>
11. Roy, K. (2013). *Military Manpower, Armies and Warfare in South Asia*. Routledge.
12. Roy, K. (2008). *The Army in British India: From Colonial Warfare to Total War 1857–1947*. Bloomsbury Publishing.
13. Marriott, J. (2013). *The Other Empire: Metropolis, India and Progress in the Colonial Imagination*. Manchester University Press.
14. Collingham, L. (2006). *Curry: A Tale of Cooks and Conquerors*. Oxford University Press.
15. Vaughan, J., & Vaughan, D. (2005). "Diet and Discipline in the Colonial Indian Army." *Journal of Military History*, 69(3), 675–699.

Empowering Tribal Women in Junglemahal : Achieving Social and Financial Self-Reliance through Forest Resource Utilization

Sanchayita Sasmal

Independent Researcher

Abstract: This research paper highlights forest resource-based livelihoods and socio-economic empowerment of tribal women in the Junglemahal region of West Bengal. Historically, tribal communities, particularly tribal women, have maintained a harmonious and enduring relationship with forest. Throughout India, agriculture has been primary livelihood for tribal communities. However, geographical limitations of Junglemahal have impacted its agriculture and economy, making forest resources primary income source for the tribal community. Compared to tribal men, women collect larger quantities of sal leaves, kendu leaves, sal seeds, mahua fruits, mushrooms, firewood, sabai grass, and other Non-Timber Forest Products. They crafted handicrafts from these resources and sold them in the market to earn money. Therefore, in 1988, more importance was given to tribal women in JFM policy. Additionally, 'West Bengal Tribal Development Co-operative Corporation Limited' and 'Grameen Mahila Shramik Unnayan Samiti' helped tribal women to improve their economic status and social identity by increasing their rights over forest resources.

Keywords: Junglemahal, NTFPs, JFM, Handicraft, Tribal Women Empowerment, Social Identity.

Introduction:

Social standards of every society in India depend on the social and economic position of women in that society. However, compared to other non-tribal societies in India, women in tribal societies play important social and economic roles because they are involved in all aspects from household work to cultivation to collecting forest resources, taking them to market. In 1987, Fernandes and Menon wrote in their book that a tribal woman works hard for 14 hours a day collecting firewood and food for her family. Even later, when forests were being destroyed extensively, they would walk 3-4 hours to collect fuel to feed family members.¹ Similarly, tribal women in the Junglemahal region of South-Western Bengal wanted to achieve social recognition and economic self-reliance by using dense forest resources. The literal meaning of "Junglemahal" is "expanse of

jungle." We also find the mention of the word Junglemahal in the 'Aitareya Brahmana', where the people of the Savars caste lived during that time.² In 1805, the British government established Junglemahal, a separate district in south-western part of Bengal under regulation XVIII to establish peace and good governance for their interests. This area was formed by combining Bankura, Purulia, and Paschim Medinipur districts. Junglemahal region was rich in natural resources, and most of the population here were scheduled tribes who were largely dependent on the natural resources of forest for their livelihood.³ In 2002, Medinipur District was divided into two separate districts named Paschim and Purba Medinipur within the Junglemahal Region. Therefore, for the convenience of writing, we need to see the ST population of Junglemahal Area in 2001 and how much forest area existed in 2002.⁴ This will show how important dense forests and forest resources were to tribal women of this area.

Forest Area (2002) and Population 2001 (census) in three districts.⁵

District	Forest areas as % of land area	Population in millions	ST as % of population
Midnapore	12.1	9.6	8
Bankura	21.5	3.1	10
Purulia	14.0	2.5	20

Tribal communities in Junglemahal

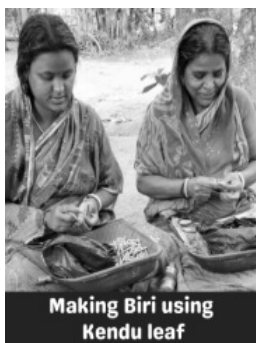
The notable tribal groups in three districts of Bankura, Purulia, and Paschim Medinipur are Santhal, Munda, Bhumij, Kora, Oraon, Lodha, Sabar, Kheria, Kisan, Karmali, Korwa, Birhor, Mahli, Mahali, Mugh, Mech, Mru, Mal Paharia, Saoria Paharia, Rava, Lepcha, Bedia, Ho, etc. Among these, major tribal groups are Santhal, Munda, Bhumij, Kora, Lodha, Sabar and Mahali.⁶

Forest Dependent Livelihood and Women's Economic Activities

My research area, Junglemahal, was densely forested until the beginning of EIC rule. Therefore, forests and non-timber forest products (NTFPs) played an important role in daily lives of millions of tribal communities in India, especially tribal women. Additionally, this region was hilly, and with rocky soil, the land's water retention capacity was low. Therefore, agriculture was completely dependent on rainfall and irrigation systems. But the irrigation system was also underdeveloped. Researcher W.W. Hunter wrote in his book that there were no natural lakes or canals to supply water to agricultural lands in junglemahal area, especially in Bankura district.⁷ Due to these geographical factors, entire tribal community's economy was deeply influenced by forest products.

Generally, tribal women survived by consuming various forest resources such as sal leaves, mushrooms, Haritaki, Banpui, Kusum, and fruits like dates, plums, custard apples, Kendu, Gurmoni, etc., and also earned some

money by selling them in local market. They made their own medicine naturally from the bark, roots, and leaves of various trees, and even some trees produced different types of oils that were used as medicine for various diseases.⁸ Along with tribal women, their daughters would also go to forest to collect forest products. They collected mahua flowers to make liquor, sal leaves for making plates, kendu leaves for making bidis, and firewood, which they sold in market. This was because women had better bargaining power and patience than men. In their leisure time, they also wove chatai from palm leaves and mats from date palm leaves.⁹



Junglemahal's tribal women collected bamboo, cane, sabai grass from forest and made various necessary items, which they sold in the market. Although tribal men collected forest products, women's participation was greater because tribal men mostly went out for work, leaving women to manage the family on their own. Besides forests, there were vast fallow lands used as pastures, also they sustained their livelihood by fishing in rivers.¹⁰ Below is a table showing which forest resources were collected by tribal women of Junglemahal and how they used these to earn money.

List of NTFPs collected by tribal women in Junglemahal area.¹¹

Name of the NTFPs	Part used	Used for
Amlaki	Fruit	Food And Medicine
Bahera	Fruit	Medicine
Chichinga	Fruit and leaves	Food and medicine
Haritaki	Fruit	Medicine
Banpui	Plant	Food
Sal	Leaves and seed	Making plate and oil
Kusum	Seed	Making oil (medicine)
Mahua	Flower and fruit	Making liquor and food

Kendu	Leaves and fruit	Making biri and food
Kontikory	Whole part	Medicine
Kurchi	Bark	Medicine
Karanj	Seed	Making oil
Kul	Fruit	Food
Kalmegh	Whole body	Medicine
Jam	Fruit, leaves and seed	Food and medicine
Neem	leaves and seed	Medicine
Mashroom	Whole part	Food
Sabai grass	Whole part	Making rope
Date palm	leaves and fruit	Making mats and food
Bamboo	Branches, whole	Making baskets, trays, fishingrods, broomsticks, etc.

Joint Forest Management (JFM) and women's participation

Forest is a valuable natural resource in every developing and developed country. Especially in Junglemahal area, tribal communities relied on forest for their livelihood and economy. But from the second half of the 18th century, after EIC established control over Junglemahal area, they began destroying forests excessively. The purpose was simple: to cut down forests, increase agricultural land, and collect excess revenue. JFM was introduced through the National Forest Policy of 1988, where State Forest Department and local forest dwellers work jointly to protect and manage forests. The primary objectives of this program were forest management and conservation, supporting the livelihood of tribal communities dependent on forest and reducing local poverty. The Arabaro Forest Range in Medinipur district of West Bengal was the pioneer of JFM in India.¹² After JFM was implemented, the family income of local tribal communities increased. Additionally, before JFM was introduced, tribal women in Junglemahal could use NTFPs only to a limited extent, but JFM policy gives tribal women complete access to NTFPs and to fuel.¹³

JFM helped numerous tribal women of Junglemahal area to join large-sized multi-purpose cooperative societies (LAMPS). Specific proposals were adopted to increase tribal women's participation in JFM by appointing 50% of the general council and 33% of the executive council as women. Women must have at least one post among the president, vice-president, and secretary. The Forest Department tried to bring forward latent talents among tribal women through cultural programs at various places.¹⁴ The implementation of JFM

significantly reduced deforestation and increased forest resource production by tribal women, such as various types of mushrooms, honey collection, and babui grass collection, which is used to make brooms and rope.¹⁵

Various mushrooms of Junglemahal.¹⁶

Usual Name	Scientific name
Sal Chatu	Amanita (bull) lam
Moudhal Chatu	Amanita vaginatavar alba gillet
Putko Chatu	Astraeus hygrometricus
Shik Chatu	Termitomycesheimi

Government initiatives for tribal women's development

The government has initiated several projects focusing on forest conservation in Junglemahal, empowering tribal women financially, and prioritizing their social identity. First, an organization called '**West Bengal Tribal Development Cooperative Corporation Limited**' (WBTDCCCL) was launched for the economic benefit of tribal women. By 1984, 'WBTDCCCL' was joined by 121 LAMPS, 2 Mahila Samitis, a labour contract cooperative society, all working together to provide financial stability to every tribal woman and showcasing many of their artistic talents. From the seventies, the government had started several projects on Junglemahal.¹⁷

For example, to empower rural tribal women, first '**Grameen Mahila Shramik Unnayan Samiti (GMSUS)**' was formed in 1981 in Jhilimili, Bankura district, and alongside, NTFPs operations were launched for tribal communities in other Junglemahal districts. **Centre for Women's Development Studies (CDWS)**, New Delhi, encouraged tribal women in Bankura district to come together and join this association. Women collected tendu and sal leaves from forest and gave them to GMAUS, which sold them to the local LAMPS unit. As a result, women can take household responsibilities alongside men, paying the minimum wage they can get. Due to this success, two more Mahila Samitis were established in Chendapathar and Bhurkura in Bankura. Additionally, 'Nari Bikash Sangha' was formed in Bankura in 1986 to serve as an apex body for coordinating the activities of village women's committees. CWDS report says, "Bankura Project has reached a plateau. After 16 years of great hardship, women are still happy with the little prosperity they have won and their newfound social status".¹⁸ In this way, 24 associations were established in Bankura, involving over 60 villages and 2500 members working in these associations.¹⁹

In each district of Junglemahal, Sal Trees and Sabai Grass are most commonly found, so the government established 'Sal-Sabai Centre of Excellence' in Jhargram to utilize these valuable forest resources and improve the economic and social conditions of tribal women and other backwards class women. This

center was established through the joint initiative of the **West Bengal Khadi and Village Industries Board (WBKVIB)**. Before this center was formed, tribal women in Junglemahal would collect soft sal leaves from forest, dry them, and make plates and bowls using neem sticks, selling them in the local market for only 8-10 rupees per 100 plates. This was because Local Agents or 'Farias' would buy those plates from tribal women at low prices and sell them in outside markets at higher prices. They did not receive fair value for their hard work. But after WBKVIB's intervention, this activity was stopped, and the center purchased 100 plates directly from rural tribal women artisans for 70 rupees. Even though traditional method was very time-consuming, tribal women were trained in modern technology to make various types of plates in a short time.²⁰



Social Identity and Empowerment

Women from every tribal community in India create their own social identity, just like men, by using forest resources to support their families. Tribal women survived by crafting various items using forest products like sal leaves, sabai grass, palm leaves, and bamboo for handicrafts and selling them in the market. For example, Kharia women in Purulia district collected abundant NTFPs from forest, such as Kendu Leaves, Oil Seeds (Sal, Mahua, Karanj, Kusum, Neem, Haritaki), Mohua Flowers, Sabai Grass, Bahera. They were skilled in making traditional broomsticks and fishing rods. A good-sized bamboo costs 2 rupees, and from this, they made about four to five broomsticks and three fishing rods to sell in the market.²¹



Along with Purulia district, Lodha Women in West Medinipur district collected mushrooms (Parab, Bali and Rutka Chatu) and various forest fruits (Mahul, Kendu, Bhulia) in March-April and made plates and bowls of different shapes from sal leaves, which they sold in the market to earn money. After government projects provided financial solvency, tribal women began using modern techniques like sewing machines for making plates from sal leaves, which doubled Production. Tribal women in Nayagram, Jhargram district, made ropes primarily from Sabai Grass.²²



Making Plates from Sal leaves using sewing machine.

Conclusion:

From the above discussion, it can be concluded that forest resources were essential for tribal women in Junglemahal for their financial self-reliance and social recognition. Despite geographical limitations and social adversities, tribal women's deep knowledge and adaptability regarding NTFPs helped them maintain their traditional occupations. Alongside this, the policies of JFM, WBTDCCCL, and various women's cooperative societies helped strengthen the economic position of underprivileged women in society while also helping to maintain cultural preservation and build respectable identities for them in society.

Reference:

1. Fernandes, Walter and Menon, Githa, 1987, *Tribal Women and forest economy-deforestation, exploitation and status change*, New Delhi, Indian Social Institute, pp-99.
2. Sen, Suchibrata, 2013, *Oscillating Historiocity of the Jungle Mahals: A Query with regard to its legacy*, Sanjoy Mukherjee (ED), Kolkata, Pragatishal Prokashak, pp-28.
3. Das, Binos Sankar, 1973, *Civil Rebellion in the Frontier Bengal (1760-1805)*, Calcutta, Punthi Pustak, pp-22.
4. Dan, Koushik, 2015, *An Inquiry into the demography of jungle mahal as a source of underdevelopment of the region*, Assam, Scholar Publications, pp-265-267.
5. Banerjee, Ajit, Ghosh, Soumitra, Springate-Baginski, Oliver, 2010, *The Creation of West Bengal's forest underclass: a historical institutional analysis of forest rights deprivations*, UK, IPPG Discussion Papers, pp-13.
6. Mandal, Driпти, 2022, *Forest based tribal economy and role of women: A Study from South West Bengal (1947-2006)*, IJCRT, pp-213-214.
7. Hunter, W.W, 1876, *A Statistical Account of Bengal*, Vol-IV, London, pp-210, 265.
8. Hunter, W.W, 1977, *A Statistical Account of Bengal*, Vol-XVII, London, pp-264, 265.

9. Mandal, Driпти, 2022, *Forest based tribal economy and role of women: A Study from South West Bengal (1947-2006)*, IJCRT, pp-214-215.
10. O'Malley, L.S.S, 1908, *Bengal district gazetteer: Bankura*, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, pp-9-12.
11. Mandal, Driпти, 2022, *Forest based tribal economy and role of women: A Study from South West Bengal (1947-2006)*, IJCRT, pp-215.
12. Resolution on JFM committees in the districts of South West Bengal, Government of West Bengal, Forest Department, dated 03.10.2008.
13. Bagchi, Jasodhara, 2005, *The changing status of women in West Bengal (1970-2000)*, New Delhi, Sage, pp-138.
14. Mahadani, Srimanta, 2021, *Joint Forest Management and tribal society of Junglemahal (1865-2006): A Historical Study*, Birbhum, Seacom Skills University, pp-157-158.
15. Ibid, pp-182-183.
16. Khan, Shri Anupam, July 2018, *Rarh Banhlar Khabar Chaty in Banabithi*, West Bengal, Forest Department, pp-37.
17. De, Debasree, 2018, *A history of Adivasi Women in post independence Eastern India: the margins of the marginals*, New Delhi, Sage, pp-67-68.
18. Sarkar, Chanchal, 1998, *Tilting Against Odds: Bankura's Rural Women Organized for Empowerment*, New Delhi, CWDS, pp-48.
19. Ibid.
20. <https://www.wbkvib.org.in/index.php/village-industries/sal-sabai-centre-of-excellence>
21. Sinha, Dikshit, 1984, *The Hill Kharia of Purulia: Impact of poverty on a hunting and gathering tribe*, Calcutta, Anthropological Survey of India, pp-19.
22. Mukhopadhyay, Subrata Kumar, (no year is mentioned, information gathered somewhere in 2001), *Change: A Dying art of the lodha tribes of Subarnarekha Basin*, Paschim Medinipur, Ashirbad, pp-10-11.

*Image collection: images are obtained through personal initiative.

The Burden of the Past : Intergenerational Trauma and Patriarchal Oppression in ‘The Dark Holds No Terrors’

Sangita Halder

Independent Researcher

Abstract: Trauma is not just an event of the past; it is a haunting force that lingers across generations, shaping identities and silencing voices. Shashi Deshpande's 'The Dark Holds No Terrors' explores the psychological and emotional struggles of women navigating patriarchal oppression. This study examines how intergenerational trauma is transmitted through maternal relationship and reinforced by societal conditioning. While previous research has largely focused on Sarita's personal trauma, this paper argues that her suffering is deeply rooted in inherited trauma, shaped by her mother's internalized patriarchal values. Using Cathy Caruth's trauma theory and Freud's psychoanalytic framework, this study analyses how Sarita's childhood experiences- marked by maternal neglect and gender expectations- manifest in her adult struggles with identity, autonomy and emotional repression. The novel reveals that trauma is not an isolated event but a cyclical burden passed down through generations, sustained by silence and societal norms. It can affect both males and females.

Keywords: intergenerational trauma, patriarchy, maternal neglect, psychological repression.

Introduction:

Trauma is a strong psychological and emotional response to a deeply distressing or harmful event. It can leave a lasting impact on a person's thoughts, feelings and behavior. Trauma can come from experiences like violence, abuse or loss of loved one, making a person feel unsafe, helpless or overwhelmed. It can affect mental and physical health, sometimes leading to anxiety, fear or flashbacks. Trauma can be divided into various sections like Acute Trauma, Chronic Trauma, Collective Trauma, Historical Trauma or Intergenerational Trauma. Acute and Chronic Trauma fall under the category of Individual or Personal Trauma. The main difference between them lies on the duration and impact. Acute trauma results from a single distressing event such as an accident causing psychological distress. In contrast, chronic trauma stems from prolonged or repeated exposure to traumatic experiences, such as childhood abuse. It leads to

long-term emotional and psychological effects, including dissociation and difficulty in forming stable relationships.

On the other hand, intergenerational trauma occurs when the pain and struggles of one generation affect the next. It happens when parents pass down their fears, behaviors, or emotional wounds to their children, often without realizing it. This can happen through parenting family relationships or even cultural influences. In 'The Dark Holds No Terrors', Saru's trauma is influenced by how her mother treats her, showing how past pain shapes the next generation. Saru herself thought about her own daughter, Renu who once complained about her own brother, Abhi - "why do you always scold me? You never scold him. You never say anything to him. It's not fair. It's my birthday, my presents. And he cried and spoilt everything. And now you scold me. You always scold me. It's not fair, not fair." (Deshpande, 173). These lines strike the thought of Saru and she herself can relate these as her own objection to her parents. Thus the questions come to her mind-" Do we travel, not in straight lines, but in circles? Do we come to the same point again and again? Dhruva and I, Renu and Abhi-is life an endless repetition of the same pattern?" (Deshpande, 173).

Discussion:

Cathy Caruth is a key figure in the field of literary trauma theory. According to her point of view, trauma is not fully grasped when it happens. Instead, it returns in flashbacks, nightmares or repressed memories. She argues that trauma reflects even in language. The person struggles to put their experience into words, leading to fragmented narratives or silence. Saru's trauma in 'The Dark Holds No Terrors' reflects Caruth's ideas when Saru suffers from her mother's rejection in multiple ways, both emotionally and psychologically. She constantly reminds Saru that as a girl she should have limitations, expecting her to conform to societal ideals of femininity, in contrast to her brother, Dhruva. Even her mother disapproves her decision of becoming a doctor. All these incidents reflect that her mother also wants Saru to behave like a submissive woman in patriarchal structure. Her treatment of Saru exposes her own internalized oppression. Her rejection of Saru and preference for Dhruva suggest that she was also shaped by similar societal restrictions-highlighting how patriarchal conditioning passes from one generation to the next. It becomes clear after her death when Saru's father exposed of his wife's nature- 'she never was a very talkative person. It was the way they were brought up, she and her sister, in their grandfather's house."we always had to remember we didn't really belong", she told me once. "We wear only tolerated." (Deshpande, 194). Thus it's clear that Kamala, Saru's mother, also had gone through sufferings and patriarchal suppression since her childhood

also. Her mother unconsciously transferred her own unresolved struggles onto Saru, perpetuating a cycle of intergenerational trauma.

Sigmund Freud, a psychoanalytic critic, believed that trauma is a deeply distressing event or experience that overwhelms the mind's ability to process it. When a person cannot fully understand the trauma, the painful memories are repressed into their unconscious mind. But it does not disappear. It continues to influence thoughts, emotions and behaviors. It can resurface through dreams, slips of tongue or emotional outbursts. Sarita's trauma reflects in her words- "The hysteria, the screaming, the words that followed me for days, months, years, all my life. *You killed him. why didn't you die? why are you alive, when he's dead?*" (Deshpande, 191)." What about me? Did she think of me at all?...Don't you know how she cursed me?" (Deshpande, 195). "I just didn't exist for her. I died long before I left home." (Deshpande, 32). The memories of her mother after Dhruva's death filled her mind with such a bitterness that she remarked: "I don't have any good memories of my mother. I want nothing of hers" (Deshpande, 59). "I had already detached myself from them. For me, they were already the past and meant nothing." (Deshpande, 39). In an attempt to escape this burden, she seeks relief to prepare herself for becoming a good doctor, as it is the only profession through which she can give life to the dying and the diseased.

However, she remains trapped in a traumatic situation in her married life. Her inability to speak openly with her husband is a result of her repression and trauma. Deshpande thus highlights not only the struggles of female protagonist but also the patriarchal oppression that women endure. Even men suffer under patriarchal expectations, as seen in Manu's insecurity over earning less than his wife, which wounds his male ego. His psychological turmoil reflects on bed at night. He behaves like a hungry animal, leading Sarita to traumatic situation. Manu's inability to support his wife economically is also the cause of his anger. Even Sarita believes "an unemployed husband as a nightmare, horrible humiliation" (Deshpande, 152). Manu's male ego is wounded, not because he is naturally abusive, but because society has conditioned him to see himself as a dominant provider. He inherits rigid gender roles and societal pressures from previous generation, leading to his emotional frustration and psychological turmoil.

According to Freud, what is repressed must return, but in a distorted or disguised form. This means that dreams often reveal hidden guilt or unresolved emotions, and Sarita's dream of her brother can be interpreted in this light. Dhruva's death in childhood is the pivotal traumatic event in her life. Her mother blames her for his death, leading her to emotional repression. Sunita Sengwar rightly observes that "Saru's mother's comments become perennial psychic

problem, as shadow of terror. This terror has been rooted in her mind, which visits her every night and she suffers even after marriage also." (qtd.pp-55) Sunita Sengwar suggests that Sarita 'comes to her father not for him, but just because of herself only. The memory of her mother was as violent as an assault. She never forgives her mother for her misbehaviour. In her father's house she analyses all the dark corners of her soul and her relations with others and peeps into her past and tries to overcome her psychological fears." (qtd.pp-56). According to her analysis, Saru became a 'New Woman', "who couldn't accept her destiny as fate." (qtd.pp-57). I totally agree with her that Sarita not only embodies the New Woman's aspiration for independence but also reveals the psychological and social costs of challenging traditional roles. That's why Sarita mockingly says:"it was so much easier for women in those days to accept, not to struggle, because they believed, they knew, there was nothing else for them. And they called that Fate." (Deshpande, 70). Shashi Deshpande also explores the traditional ideas that women carry with them through generations. In this context, Deshpande wrote- Sarita "thought of her grandmother who had been deserted by her husband only a few years after marriage, leaving her, a young woman, with two little daughters, one of whom had been her mother...yet her grandmother had never, so she had heard, complained. It's my luck, she said. My fate. It was written on my forehead." (Deshpande,70). It means that Kamala, Saru's mother also suffers from patriarchal repressions and it mould her nature according to societal expectations and submissive behaviours. She also tries to put her own oppressions to Sarita and wants to make her believe that. But Sarita constantly resists her parents' expectations and embodies the spirit of the 'New Woman'- one who values independence and choses to break free from the societal shackles and boundaries imposed on her.

'In Effacing the Past: Trauma and Its Amelioration in Shashi Deshpande's *The Dark Holds No Terrors*', Rejoan Ali argues that "A defenceless, emotionally and mentally abused child had been subjected to psychological trauma, which would be the cause of wound in her psyche for lives. When Sarita's mother used to abuse her, her father remained silent." (qtd.pp-705). Here it can be said that even her father is also bound by society's rules and customs that a girl child should have certain boundaries. Rejoan Ali aptly observes that Saru's father initially had no objection against her mother's wrath or accusations towards Sarita but later after Saru's mother's death, "her father declares that he is on her side, hence she finds courage to confront what happens to her" (qtd.pp-708). Saru got solace and comfort from her father and released all her pains.

Conclusion:

In 'The Dark Holds No Terrors' Shashi Deshpande draws the attention how trauma is transmitted from one generation to the next, especially in a patriarchal structure of society. Sarita's struggles are not just her own; they are shaped by her mother's experiences and the expectations placed on women. Sarita does not completely overcome her trauma, but she begins to understand it. Instead of finding a clear solution, she learns to face her past and recognizes how deeply patriarchy has influenced her life. She does not fully escape oppression, but she starts to take small steps towards self awareness. The novel suggests that healing from such trauma is not simple, though she conveys all her sufferings, unhappy married life to her father, leading her to temporary comfort and solace from this burden but it is actually a continuous process of understanding. In our Indian society we often claim that men and women are equal. Many steps, such as scholarships, have been provided to empower women, and help them establish themselves. However, when a woman surpasses a man financially, society does not take it lightly. We see this in the case of Manu, who never acknowledges his guilt towards Saru, and is even unaware of his own faults. Manu, too, is pressured by societal expectations to earn more than his wife.

Thus to conclude, we can say, Sarita, the protagonist of Shashi Deshpande's 'The Dark Holds No Terrors', does not recover from trauma in a traditional or complete sense, but her journey through the novel shows a significant process of self awareness and confrontation that marks the beginning of her healing. Self awareness comes in her mind when she heard from Baba- "the only thing possible was to let go...Your mother is dead. So is your brother. Can't you let the dead go?...They can do nothing. Why do you torture yourself with others? Are you not sufficient for yourself? It's your life, isn't it?" (Deshpande, 217). Then Sarita realizes her own identity, drawing the inspiration from Madhav too when he neglects all other things, tries to overcome all the obstacles to achieve his goal. "It's my life. She knew the words had some relevance to her life." (Deshpande, 218) In this way, Sarita wants to free herself from the burden of trauma and move ahead in her career as a doctor. "And now, there were no thoughts in her, except those of the child she was going to help." (Deshpande, 221). She realizes that she is self-sufficient. Thus, she liberates herself from the cycle of intergenerational trauma and emerges as a transformed, autonomous woman.

Reference:

1. Deshpande, Shashi. "The Dark Holds No Terrors". *Penguin Random House India*. 1990

2. Caruth, Cathy. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History*. Baltimore. *Johns Hopkins University Press*, 2016. *Print*.
3. Freud, Sigmund. *The Interpretation of Dreams*. Translated by James Strachey, *Basic Books*, 2010.
4. Sengwar, Sunita. "A Traumatic Journey of Sarita: The Dark Holds No Terrors", *International Journal of Advanced to Research in Engineering and Management*, Vol.3, no. 3, 2017, pp.54-57.
5. Ali, Rejoan." Effacing the Past: Trauma and Its Amelioration in Shashi Deshpande's *The Dark Holds No Terrors*". *International Journal of Creative Research Thoughts*, Vol.11, 2023, pp.701-710.

Exploring Teacher Perspectives on NEP 2020 in Indian Higher Education

Sital Sing

Assistant Professor, Dept. of Education
Raidighi College, Raidighi

Abstract: Higher education will be significantly impacted by the National Education Policy (NEP) 2020, which reflects a revolutionary vision for the Indian educational system. This study explores the perspectives of educators in Indian higher education institutions regarding the policy's proposed policy reforms. Through qualitative and quantitative methods, including surveys and in-depth interviews, the research captures teachers' awareness, perceptions, and readiness to implement NEP 2020. Key focus areas include multidisciplinary education, academic flexibility, the introduction of a four-year undergraduate program, emphasis on research and innovation, and the integration of technology in teaching and learning. The findings reveal a mixed response: while many educators appreciate the policy's forward-looking and inclusive approach, concerns were raised about implementation challenges, infrastructural constraints, and the need for extensive faculty training and institutional support. Teachers also highlighted disparities across institutions, particularly between urban and rural colleges, in their capacity to adopt NEP reforms effectively. The study concludes that while NEP 2020 has the potential to revolutionize Indian higher education, its success will largely depend on participatory implementation, sustained investment in capacity-building, and continuous engagement with stakeholders, especially educators. By giving voice to teachers' experiences and expectations, this research contributes to a nuanced understanding of policy reform in higher education and underscores the critical role of faculty in driving meaningful educational change.

Keywords: NEP 2020, Higher Education, Teacher Perspectives, Educational Reform, Policy Implementation, Faculty Development.

Introduction: The Government of India's National Education Policy (NEP) 2020 represents a dramatic change in the nation's educational system. It aims to overhaul the existing education system and establish a more inclusive, flexible, and integrated framework. The NEP 2020 envisions a radical transformation in Indian higher education, focusing on enhancing the quality of teaching, fostering innovation, and making education more accessible and affordable (Ministry of

Education, 2020). It is a comprehensive policy that seeks to address several key issues, such as the outdated curriculum, inadequate infrastructure, and the need for a more interdisciplinary approach. However, the success of these reforms depends significantly on how they are perceived and implemented by key stakeholders, particularly teachers.

Educators play a crucial role in translating policy reforms into practice. Their attitudes, perceptions, and readiness to adapt to new changes directly impact the effectiveness of the NEP 2020 in achieving its goals (Chakraborty, 2021). Teachers are at the frontline of these reforms and their understanding of, and responses to, the NEP 2020 is vital for its success. Given the far-reaching changes proposed by the policy, including the integration of technology in teaching, flexible learning structures, and emphasis on research, it is essential to understand how teachers perceive these reforms and their readiness to adopt them (Singh, 2021).

The NEP 2020 brings about a number of significant adjustments for higher education. One of the most notable shifts is the move towards multidisciplinary education, wherein students will have greater flexibility to choose courses from different disciplines (Ministry of Education, 2020). This approach seeks to break down traditional silos in education and promote holistic development. Additionally, the policy encourages the use of digital tools and technology in teaching and learning, aiming to enhance access and improve the quality of education (Kumar & Rao, 2021). The introduction of a four-year undergraduate program, along with the provision of multiple entry and exit points, is another important reform that aims to make education more adaptable and personalized to the needs of students (Chakraborty, 2021).

Despite the promise of these reforms, their successful implementation hinges on the capacity of teachers to adapt to the new system. Previous studies have highlighted the challenges faced by educators in adopting new policies, particularly in a country as diverse as India (Singh & Sharma, 2019). Teachers' readiness to embrace changes in curriculum, pedagogical strategies, and assessment methods will determine the extent to which NEP 2020's goals are achieved in higher education institutions. However, there has been a mixed reception from educators. Some educators have expressed optimism about the potential of the NEP 2020 to bring about positive change, particularly with respect to promoting critical thinking, creativity, and interdisciplinary learning (Sinha, 2021). Others, however, have raised concerns about the feasibility of implementing such wide-ranging reforms in a context marked by resource constraints, lack of infrastructure, and resistance to change in certain educational settings (Kumar & Rao, 2021).

This research aims to explore teachers' perspectives on the NEP 2020, focusing on their awareness of the policy, the challenges they perceive in its implementation, and their readiness to adopt the proposed reforms. Through surveys and interviews with educators from different higher education institutions, this study seeks to provide valuable insights into the ground-level realities of the policy's impact. By understanding teachers' perspectives, this research will contribute to a more nuanced understanding of how NEP 2020 can be successfully implemented in Indian higher education.

Awareness and Understanding of NEP 2020

A primary aspect of implementation is the awareness level among faculty members. Many teachers, particularly those in urban and semi-urban institutions, understand the key principles of NEP 2020, such as flexibility in course structures, multidisciplinary learning, and emphasis on research (Chakraborty, 2021). However, several studies have highlighted that in rural or under-resourced institutions, the awareness is either minimal or limited to superficial aspects of the policy (Singh & Sharma, 2019). The gap in awareness suggests the need for structured orientation and training sessions for educators, tailored to different institutional contexts.

Perceptions of Multidisciplinary and Flexible Curriculum

One of the significant reforms under NEP 2020 is the introduction of multidisciplinary education and flexible degree options, including the four-year undergraduate program with multiple exit points (Ministry of Education, 2020). Teachers generally view this positively, recognizing its potential to enhance student engagement and employability. They appreciate the opportunity for students to choose courses across disciplines, which could foster creativity, innovation, and holistic learning (Sinha, 2021).

However, educators also expressed concerns about its practical implementation. Many faculty members noted that their institutions lack the infrastructure and faculty strength to offer a wide array of courses. Further, integrating diverse disciplines under a single curriculum requires coordination across departments and a rethinking of traditional academic structures (Kumar & Rao, 2021). Teachers also questioned the preparedness of students and institutions to handle multiple entry-exit systems, fearing administrative challenges and academic dilution.

Technology Integration and Digital Learning

NEP 2020 places a strong emphasis on integrating technology into the classroom by using online platforms and building digital infrastructure. (Ministry of Education, 2020). Many educators recognize how digital tools can improve higher education's caliber and accessibility. This shift has already been expedited

by the COVID-19 pandemic, so instructors now need to be digitally literate. (Singh, 2021).

However, digital divide issues remain a major barrier. Teachers from rural or economically weaker institutions reported lack of access to high-speed internet, smart classrooms, and proper training to effectively use educational technology. Additionally, there is a psychological barrier among some senior faculty members who are less comfortable with digital tools (Chakraborty, 2021). While younger educators have adapted better, there is still a need for consistent professional development and technical support to bridge the digital gap.

Faculty Autonomy and Research Culture

Another critical aspect of NEP 2020 is the promotion of faculty autonomy and the strengthening of a research-oriented academic environment. Teachers appreciate the policy's emphasis on moving away from rote learning and towards research-based, inquiry-driven education. The proposed National Research Foundation (NRF) is also seen as a positive step towards enhancing research output and funding opportunities (Ministry of Education, 2020).

Nevertheless, ground realities reveal several constraints. Many teachers feel burdened with administrative work, leaving limited time for research. Further, inadequate research funding, lack of access to academic journals, and limited exposure to global research practices are cited as challenges (Kumar & Rao, 2021). Some educators also raised concerns about the increased pressure to publish, fearing it might prioritize quantity over quality. Strengthening research culture will require not just funding but also mentorship programs, access to resources, and incentives for high-quality work.

Capacity Building and Professional Development

NEP 2020 acknowledges the necessity of educators' ongoing professional development. Teachers strongly support this aspect, especially in the context of curriculum redesign, use of technology, and new pedagogical strategies (Sinha, 2021). However, many argue that existing training programs are too generic and not aligned with the specific needs of higher education institutions.

There is also a call for peer-learning models, collaborative workshops, and institution-specific faculty development initiatives. Teachers believe that active involvement in the design and delivery of these programs will make them more effective and relevant. Furthermore, educators highlighted that capacity building should not be seen as a one-time exercise but as an ongoing, evolving process in response to policy and societal changes (Chakraborty, 2021).

Administrative and Institutional Readiness

Institutional support and administrative flexibility are key to implementing NEP 2020. Teachers reported mixed experiences in this regard. Some institutions have begun aligning their curricula and credit systems with the policy's recommendations. Others remain hesitant due to a lack of clarity, resource constraints, or resistance from management and governing bodies (Singh & Sharma, 2019).

Educators stressed that a top-down approach would not work for a policy as ambitious as NEP 2020. Instead, there should be participatory implementation, where teachers are consulted and actively engaged in decision-making processes. Without their involvement, even the most well-intentioned reforms could fail at the grassroots level.

Equity and Inclusion Concerns

While NEP 2020 emphasizes inclusion and equitable access to education, teachers noted that achieving this in practice is complex. Institutions catering to marginalized communities often lack the infrastructure or financial support to implement reforms. Additionally, language barriers, socio-economic disparities, and regional imbalances remain critical issues (Kumar & Rao, 2021).

Teachers advocate for region-specific strategies and affirmative policies that support institutions and students from disadvantaged backgrounds. For NEP 2020 to truly democratize education, equity needs to be more than a guiding principle it must be embedded in every step of implementation.

Conclusion:

The National Education Policy (NEP) 2020 holds immense potential to reshape Indian higher education by promoting a more inclusive, flexible, and technology-driven framework. However, the successful implementation of the policy largely depends on the perspectives and readiness of educators, who are central to translating policy reforms into practice. Teachers' awareness and understanding of the NEP 2020 are critical in fostering effective teaching and learning environments. While many educators have expressed optimism about the interdisciplinary and flexible nature of the proposed reforms, concerns remain regarding the feasibility of large-scale implementation, especially in institutions with limited resources (Kumar & Rao, 2021). Additionally, there is a need for significant faculty development and training programs to help teachers adapt to new pedagogies and technologies (Chakraborty, 2021).

For NEP 2020 to succeed, a collaborative approach involving teachers, administrators, and policymakers is essential. Addressing the challenges faced by teachers, including infrastructural constraints and resistance to change, will be key to ensuring that the policy's goals are met. Future research should focus on

the longitudinal impacts of NEP 2020 and its specific effects on teaching practices and student outcomes. Ultimately, educators' perspectives provide invaluable insights into the nuances of policy implementation and offer a foundation for creating a more effective and inclusive educational system in India.

References:

- Tiwari, M. (2025). Reimagining Teacher Education in India: Evaluating NEP 2020's Impact and Implementation Challenges. *International Journal of Education Sciences*, 2(1), pp-9–13. <https://journals.stmjournals.com/ijes/article/view/170032>
- Mangat, P. K. (2024). Inclusivity in Higher Education: Analysing the Implementation of NEP 2020 for Marginalized Communities in India. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(1), pp-1–13. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.1990>
- Ghatak, I. (2024). Perceptual charity of school teachers about National Education Policy, 2020. *Educational Administration Theory and Practice*, 30(5), pp-7588-7594. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.4213>
- Kumari, S. (2023). Higher Education Under National Educational Policy (NEP) 2020: A Teacher's Perspective Study. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 4(2), pp- 1877–1888. <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.398>
- Abraham, M.S., et...al (2022). Perception of teachers towards NEP-2020. *International Journal of Health Sciences*, 6(s2) pp. 14314- 14326. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.8754>
- Hariramani, S., & Narang, K. (2022). Evaluating Educators' Perspectives on NEP 2020. *International Journal of Management, Economics and Commerce*. Retrieved from <https://ijmec.org.in/index.php/ijmec/article/view/36>
- Gupta, M. B. (2022). Post-Implementation Impact of NEP-2020 on Teacher's Motivation in Higher Education Institutions in India. *Educational Administration: Theory and Practice*, 28(4), pp 280–284. <https://doi.org/10.53555/kuey.v28i4.6904>
- Chakraborty, S. (2021). NEP 2020 and higher education: A teacher's perspective. *Journal of Education and Development*, 12(3), pp 45-58.
- Kumar, S., & Rao, A. (2021). Adapting to new pedagogies: Teacher readiness for NEP 2020 reforms in India. *Indian Journal of Education Research*, 19(2), pp 123-139.
- Singh, H. (2021). The promise of multidisciplinary education under NEP 2020: Teacher perceptions and challenges. *Higher Education Policy*, 34(2), pp-67–82.
- Sinha, R. (2021). Understanding the challenges of NEP 2020 for teachers in Indian higher education. *Education Today*, 10(4), pp 50–62.
- Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- Singh, V., & Sharma, P. (2019). Barriers to policy implementation in higher education: A study of Indian educators' perspectives. *International Journal of Educational Development*, 68, 32-41.

Concept of Yogāṅga Svādhyāya in the Indian Knowledge Tradition in the light of Manusmṛti

Santosh Mandal

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit

Jatindra Rajendra Mahavidyalaya

Abstract: In the ancient Indian knowledge tradition, the science of yogā is the invaluable heritage of the sages and saints of India. All the śruti smṛtis describe the glory of yogā. Yogā is an undisputed universally accepted religion in all sects and beliefs.

Manusmṛti is that religious text whose recognition and fame is world famous. Not only in India but also in foreign countries, decisions have been made on the basis of its evidence and are still made. Therefore, as a religious text, Manusmṛti is considered to be the invaluable treasure of the world. After the Vedas, Manusmṛti is the most recognized and popular in India. In addition to the four Varṇas, four Āśramas, sixteen Saṃskāra and creation of the universe, advice has been given on the system of the state, the duties of the king, various types of disputes, management of the army etc., all those subjects which are possible to happen in the life of every human being.

Keywords: Indian Knowledge Tradition, Manusmṛti, Yogā, Veda, Varṇa, Āśrama.

Discussion:

Manusmṛti:

The Manusmṛti, often called the *Laws of Manu*, is indeed a foundational text in Indian culture, and its influence on social conduct and governance can hardly be overstated. It is not merely a religious scripture but also a significant work that outlines the duties, responsibilities, and ethical norms that guide human behavior and social interactions. The text, attributed to the ancient sage Manu, is considered one of the most important dharma-shastras (treatises on law and morality) in Hinduism.

While religion and belief are important aspects of the Manusmṛti, the document serves a broader function. It reflects the societal structures and cultural values of ancient India, particularly during the time of its composition. In this sense, Manusmṛti contributes to the philosophical and social underpinnings of Hindu society, touching on various aspects such as governance, law, morality,

gender roles, family structure, caste divisions, and even the relationship between the individual and the state.

It is often stated that the Manusmṛti holds a place after the Vedas in terms of its authority in Hindu tradition. This is because, while the Vedas are considered divinely revealed, the Manusmṛti is seen as a compilation of human wisdom that has been transmitted over time. Despite its position within Hindu scriptures, its interpretation has been subject to debate and criticism, especially in modern times, due to its controversial stance on issues like caste hierarchy and the role of women in society.

The comparative studies of Manusmṛti, especially in Western scholarship, have offered valuable insights into how ancient societies structured themselves and understood the concepts of law and morality. Critics have often pointed to its regressive aspects, particularly with regard to its treatment of women and lower castes. On the other hand, some scholars and proponents argue that the text should be understood in the context of its time, and that it provided a framework for societal stability and ethical conduct, even if some elements might seem out of step with contemporary values.

In modern times, Manusmṛti remains a subject of great interest both in India and abroad. Its ethical prescriptions have been analyzed and critiqued for their role in shaping the social order. It has also inspired discussions about the relationship between religion, law, and social justice in the Indian context. As such, it is integral to understanding not only ancient Indian culture but also the ways in which it has influenced the evolution of social systems, political thought, and cultural norms in South Asia and beyond.

Svādhyāyaḥ:

The word 'Svādhyāya' is derived from the root 'su+āñ+adhi pūrvaka in-adhyayane' with the suffix ghañ. The literal meaning of 'Svādhyāya' is "svasya adhyāyaḥ - svādhyāyaḥ" meaning self-study, study of oneself, self-observation, self-contemplation. Svādhyāyaḥ refers to introspection and self-examination. It involves looking inward to understand one's thoughts, actions, emotions, and consciousness. This inner journey is essential for spiritual growth and personal transformation. It can also refer to the study of sacred texts, scriptures, and teachings, such as the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gītā, and other spiritual writings. In the context of Yogā, this would mean reflecting upon the deeper meanings of these texts and contemplating their relevance to one's life. In the Yogasūtras of Patanjali, Svādhyāyaḥ is listed as one of the Niyamās (the ethical guidelines for personal conduct). It is associated with the practice of disciplined study, contemplation, and understanding of one's true nature and the divine.

“Śaucasantoṣatapāṣṣvādhyāyeśvarapraṇidhānāni Niyamāḥ”.¹

Mahārāja Manusays that-

“Svādhyāye nāstyanadhyāyo brahmasatram hi tat smṛtam.”²

There is no exemption in self-study, because it is called Brahmasatra or Brahmā yajña.

Samnyaset sarvakarmāṇi vedamekaṃ na sanyaset |

Veda sanyāsataḥ śūdraḥ asmādvedaṃ na sanyaset ||³

A Sanyasi can give up all his actions but he cannot give up self-study.

Svādhyāyaḥ is the ultimate hard work-

Yo anadhītya dvijo vedamanyatra kurute śramam |

Sa jīvanneva śūdrhatvam āśu gacchati sāvayaḥ ||⁴

That is to say, the Dvija (brāhmaṇa-kṣatriya-vaiśya) who, instead of doing the work of self-study, gets involved in work elsewhere, very soon becomes a śūdra.

svādhyāyena japairhomaistraividyenejyā sutaiḥ |

mahāyajñaiśca yajñaiśca brāhmīyaṃ kriyate tanuḥ ||⁵

By self-study, by making others think, by performing homa, by reading the Vedas with the relation between words and meanings, by performing isht on full moon day etc., by producing a son and by performing Pañcamahāyajña, the feeling of Brahmin can be brought in this body.

Svādhyāyaḥ is the ultimate penance -

Maharṣi Yājñavalkya and Mahārāja Manu both call self-study as the ultimate penance –

ā haiva sa nakhāgrebhyaḥ paramaṃ tapyate tapaḥ |

yaḥ sragvyapi dvijo’dhīte svādhyāyaṃ śaktitonyaham ||⁶

A Brahmin who wears a fragrant garland and still does daily self-study to the best of his ability, be sure that he is doing the ultimate meditation up to the tip of his nails.

Svādhyāyaḥ is the ultimate religion -

vedamevābhyasennityaṃ yathākālamatandritaḥ |

taṃ hyasyāhuḥ paraṃ-dharmam upadharmo’nya ucyate ||⁷

Always read Vedas as per your convenience without being lazy because this is the ultimate religion of the Brahmins and other religions are below it.

Svādhyāyaḥ is the ultimate branch -

The sage of Chāndogya Upaniṣad has given priority to self-study while describing the branches of the tree of religion –

trayo dharmaskandhā yajño'dhyayanam dānamiti prathamam।⁸

There are three branches of religion, out of which study/self-study and charity are the first.

Svādhyāyaḥ is the ultimate yoga -

Maharṣi Patañjali has also counted self-study in the eight parts of yoga like yama-niyama etc. Where the five yamas are called universal great vows, there he has described the rules as helpful in following those great vows.

śaucasamtoṣatapaḥsvādhyāyeśvaraprañidhānāni niyamāḥ।⁹

Vyāsa Bhāṣya has written that Svādhyāya and Yoga are complementary to each other.

svādhyāyāt yogamāsīt yogāt svādhyāyamāmanet।

svādhyāyayoga sampattyā paramātmā prakāśate॥

A person should restrain the mental tendencies through self-study and contemplate the object under study through the restraint of the mental tendencies. God is revealed by the contemplation of self-study and restraint of the mental tendencies. And where God is revealed, the desired divine qualities are also automatically achieved, which has been described by MaharṣiPatañjaliin this way –

svādhyāyādiṣṭadevatā samprayogaḥ।¹⁰

Through proven self-study, the self-study person realizes the desired qualities (or scholars with desired qualities). Svādhyāya is supreme yoga due to the application of iṣṭadevatā.

Svādhyāyaḥ is the supreme sacrifice -

paṁcātāmstumahāyajñān yathāśakti na hāpayet।

Mahārāja Manu has prescribed Pañcamahāyajñas for every householder and said that no householder should abandon these Pañcamahāyajñas as per his capability. Among these Pañcamahāyajñas, Brahmayaājñā is the most important and foremost. āpastamba sūtrakāra, śatapathakāra and Mahārāja Manu call Svādhyāya as brahmayaājñā.

ve dābhyāso hi viprāṇām paramam tapaḥ ucyate।

brahmayaājñāḥ sa vijñeyāḥ ṣaḍaṅga sahitastu yaḥ॥

brahmayaājñō ha vā eṣa yat svādhyāyaḥ।

Maharṣi Yājñavalkya says –

svādhyāyo vai brahmayajñāḥ tasya vā etasya brahmayajñasya vāgeva
juhū mana upabhr̥t, cakṣudhruvā medhā sra vaḥ satyam avabhṛtaḥ |¹¹

Svādhyāyaḥ is the ultimate pleasure -

“rasa hyevāyaṃ labdhvā ānandī bhavati”¹² after attaining the rasa, the seeker becomes happy. The rasa that the Upanishad writer has referred to is the swadhyaya rasa, by drinking which the person's soul becomes ecstatic and happy.

It is written in the Vedas that –

pāvamānoryo adhyetyṛṣibhiḥ saṃbhr̥taṃ rasaṃ |

tasmai sarasvatī duhe kṣīraṃ sarpirmadhūdakam ||¹³

A person who accepts and studies the Vedas, which are held in oneness of mind by sages like Agni, Vayu etc., receives many supernatural pleasures.

Svādhyāyaḥ is the ultimate initiation-

In the Vedic religion, initiation has great importance. In the vedārambha saṃskāra, where the brahmacārī takes the fast by reciting the mantra "agne vratapate vrataṃ carīṣyāmi", in the samāvartana saṃskāra, he takes initiation from the ācārya.

svādhyāyān mā pramadaḥ |

svādhyāyapracāsanābhyāṃ na pramaditavyam |¹⁴

The ācārya says- O brahmacārī! Never be negligent in self-study, never be negligent in self-study and discourse.

Freedom from re-death-

vedābhyā senasatataṃ śaucena tapasaiva ca |

adroheṇa ca bhūtānāṃ jātīm smarati paurvikīm ||¹⁵

By doing continuous self-study, living a pure life, performing penance and not cheating the living beings, one comes to know about his previous birth. Knowing about this previous birth is freedom from re-death.

paurvikīm saṃsmarañjātīm cājasramanantaṃ sukhamaśnute |¹⁶

Remembering his previous birth, he again practices the Vedas daily. One enjoys eternal happiness by studying Vedas (self-study). The meaning of Shatpath's Akshayaam Lokam Jayati Brahman: Satmatam Gachchati should be understood by combining it with Manu's Brahmabhyasen Chajakham Anantam Sukhamaśnute.

Benefits of Svādhyāyaḥ-

Describing the glory of self-study, Mahārāja Manu says-

yaḥ svādhyāyamadhīte'bdam vidhināniyataḥ śuciḥ |

tasya nityam kṣaratyeṣa payodadhi ghṛtaṁ madhu ||¹⁷

The person who studies the Vedas methodically, with restraint and being pure from inside and outside, throughout the year, that person is given milk, curd, ghee and honey every day.

Benefits of Svādhyāyaḥ according to Maharṣi Patañjali -

"svādhyāyādiṣṭadevatā samprayoga:"

A self-study person gets the realization of desired qualities (or scholars with desired qualities). Ishta Devta is used.

Maharṣi Dayānanda Sarasvatī says -

Humans should convert this body into Brahmi through good deeds like reading and studying of vedādiśāstras, gāyatrī-praṇavādi meaning, meditation, agnihotrādi homa, karma-upāsana-jñānavidyā, paurṇamāsyādi iṣṭi, pañcamahāyājña, agniṣṭoma etc. through good deeds like nyāya, satyopadeśa and yogābhyāsādi etc. That is, do things related to Brahma.

Benefits of Svādhyāyaḥ according to Atharvaveda -

stutā mayā varadāvedamātā pracodayantām pāvamānī dvijānām |

āyuh prāṇam prajām paśum kīrtim draviṇam brahmavarcasam |

mahyam dattvā vrajata brahmalokam ||

That is, to provide life to the self-studyer of vedamātā vedavānī, to provide Brahmavarchas along with healthy soul or life, progeny of natural substances, cow giving milk, etc. animals and resources, fame and glory, wealth in the form of material and spiritual sadhana.

According to Maharṣi Yājñavalkya, benefits of Svādhyāyaḥ -

Śatapathakāra Maharṣi Yājñavalkya has also glorified Svādhyāyaḥ, these are the major benefits of Svādhyāyaḥ. Which are as follows -

athātaḥ svādhyāya praśamsā priyesvādhyāya pravacane bhavato, yuktamanā bhavati, aparādhīno'haraharthānsādhayate, sukham svapiti, paramacikitsaka ātmano bhavati, indriyaśamyamaśaikārāmatā ca prajñāvṛddhiryaśo lokapaṁktiḥ, prajñā vardhamānā caturo dharmān brāhmaṇamabhinīṣpādayati | brāhmaṇyaṁ, pratirūpacaryā, yaśo lokapaṁktiḥ, lokaḥ pacyamānaścaturbhirdharme brāhmaṇa bhunakti, arcayā ca dānena cājeyatayā cāvadyatayā ca |

Maharṣi Dayānandadid indeed emphasize the importance of Svādhyāya as an essential practice for spiritual and intellectual growth. He considered the Vedas as the ultimate source of knowledge, and Svādhyāya, in his view, meant not just reading the Vedas, but also understanding, contemplating, and living by the knowledge contained in them.

Dayānanda's call for Svādhyāya, as the ultimate religion and penance, connects deeply with the idea of self-reliance and self-discipline. The term Svādhyāya emphasizes personal study and reflection, where an individual engages directly with the sacred texts to extract meaning and wisdom.

Your references to the teachings of Mahārāja Manu and Maharṣi Yājñavalkya align with the central idea of Svādhyāya being more than just a ritual or religious activity; it is a practice that transcends external rituals, focusing instead on internal purification and enlightenment. Maharṣi Dayānandaechoed this sentiment by teaching that knowledge of the Vedas is not merely theoretical; it is practical and must be applied to one's life through continuous self-study and reflection.

The phrase "**tasmād svādhyāya adhyetavyaḥ**" (Therefore, one should study the Vedas) perfectly captures the essence of Dayānanda's message: studying the Vedas is not just recommended, but it is imperative for spiritual advancement. For Dayānanda, Svādhyāya was not only the highest form of penance but also the highest form of religion, as it leads to personal transformation and liberation. This concept, deeply rooted in self-realization, reinforces the idea that spiritual growth is a personal, internal journey rather than a mere external observance.

In conclusion, Maharṣi Dayānanda's emphasis on Svādhyāya underscores the importance of self-empowerment through knowledge, and the Vedic teachings are the tool for this transformation. This focus on personal responsibility and direct engagement with sacred knowledge has made Svādhyāya a central tenet of āryasamājaand a guiding principle for many who follow Dayānanda's philosophy.

References:

1. Aranya, Swami Hariharananda, 2002, PatanjalaYogadarshan, Kolkata, Paschimbanga Rajya Pustak Parshad, P. 226
2. Pahari, Dr. Annadashankar, 2012, Manusamhita (Part: II), Kolkata, Sanskrit Book Depo, P. 221
3. Bandyopadhyay, Manabendu, 2016, Manusamhita (3rd edition), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, P.627
4. Pahari, Dr. Annadashankar, 2012, Manusamhita (Part: II), Kolkata, Sanskrit Book Depo, P. 333

5. Bandyopadhyay, Manabendu, 2016, Manusamhita (3rd edition), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, P.266
6. Pahari, Dr. Annadashankar, 2012, Manusamhita (Part: II), Kolkata, Sanskrit Book Depo, P. 331
7. Bandyopadhyay, Manabendu, 2016, Manusamhita (3rd edition), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, P.510
8. Sankhyavedantatirtha, Durgacharan, 2014, Chandogyopanishad (Part: I). Kolkata, Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd., P. 222
9. Sankhyabhushan Vedantachanchu, Purnachandra, 2005, Patanjala Darshan, Kolkata, Paschimanga Rajya Pustak Parshad, P. 146
10. SankhyabhushanVedantachanchu, Purnachandra, 2005, Patanjala Darshan, Kolkata, Paschimanga Rajya Pustak Parshad, P. 160
11. Verma, Dr. Virendrakumar, 2016, Shatapatha Brahmana, Delhi, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, P. 412
12. Swami Gambhirananda, 1962, Upanishad Granthabali, Kolkata, Udbodhan Karyalaya, P. 301
13. Saraswati, Maharsi Dayananda, 2010, Rigveda, Delhi, Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sava, P. 973
14. Swami Gambhirananda, 1962, Upanishad Granthabali, Kolkata, Udbodhan Karyalaya, P. 279
15. Bandyopadhyay, Manabendu, 2016, Manusamhita (3rd edition), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, P.510
16. Bandyopadhyay, Manabendu, 2016, Manusamhita (3rd edition), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, P.510
17. Pahari, Dr. Annadashankar, 2012, Manusamhita (Part: II), Kolkata, Sanskrit Book Depo, P. 222.

Communication as Resistance : A Critical Analysis of Badal Sircar's Third Theatre

Nazrul Ahmed Zamader

Research Scholar, Dept. of Adult,
Continuing Education and Extension,
Jadavpur University
&

Santwan Chattopadhyay

Professor, Department of Adult,
Continuing Education and Extension,
Jadavpur University

Abstract: Badal Sircar's Third Theatre marks a radical shift from traditional forms of performance, prioritizing minimalism, audience engagement, and socio-political activism. This article critically examines how Third Theatre plays as a tool of communication and resistance. Using frameworks of communication and resistance, the study explores how Sircar's work encourages dialogue, empowers marginalized voices and subverts cultural hegemony. To investigate this, a qualitative research methodology is followed. Through a qualitative analysis of his plays, different writings, papers on Badal Sircar, the article argues that Third Theatre is not only a performance art but also a communicative tool for social transformation. The findings highlight the relevance of Third Theatre in contemporary discussion on art, communication, resistance and socio-political change.

Keywords: Communication, Resistance, Third Theatre, Cultural Hegemony, Proscenium Theatre.

1. Introduction:

Theatre has always been one of the most powerful media of sensitization and social and political communication in India. Alternative Theatre is a radical medium in the context of social change and resistance. Badal Sircar is widely considered as one of the most significant and influential theatre personalities in India. He introduced "Third Theatre", a revolutionized concept in the arena of Indian performative art. He broke all commercial interests of Theatre. Through his Third Theatre, he challenged the conventional institution and power dynamics and offered oppressed voices a platform for expression. His "Third Theatre" is featured by its minimalistic approach, non-commercial nature, and

highlights on social issues, making it a powerful medium for communication and resistance. In his book 'Language of the Theatre' (Theaterer Bhasa), he mentioned, "Third Theatre is a philosophy, a perspective, an ideology, and for that reason, the establishment and evolution of this theatre is a movement" (Sircar, 1983).

The socio-political situations of post-independence India played an important role in shaping Sircar's work. The country was grappling with issues of inequality, poverty, and political corruption, and Sircar sought to use theatre as a means of addressing these challenges. By rejecting the elitism of mainstream performance, Third Theatre became a space for dialogue, critique, and collective action.

2. Literature Review:

This study employs multiple theoretical frameworks to examine Third Theatre as a medium of communication and a tool for resistance. Paulo Freire's notion of dialogic communication is especially pertinent, as it highlights the role of dialogue in developing critical consciousness and empowering marginalized groups (Freire, 2005). His idea of 'conscientization' resonates with Sircar's vision of theatre as a vehicle for awareness and social action. Scholars like Stuart Hall and Antonio Gramsci have explored the role of communication as a means of resistance. Hall's encoding/decoding model highlights how marginalized groups can utilize media to challenge dominant ideologies (Hall, 1980). Marginalized groups use Theatre as an alternative media for challenging dominant ideologies. Antonio Gramsci's theory of cultural hegemony offers another perspective on Third Theatre. According to Gramsci, dominant groups sustain power not only through coercion but also by influencing cultural norms and values. Ruling classes exercise their cultural and ideological dominance through some institutions like mass media. Gramsci also suggests it is essential for the counter hegemony of marginalized people to claim power (Gramsci, 1971). In this respect, Third Theatre can be considered as a counter communicative tool. Third Theatre challenges the hegemony of the ruling class by creating alternative narratives and empowering subaltern voices. Bertold Brecht's concept of epic theatre had a significant impact on Sircar's work. Brecht aimed to challenge the illusion of realism in theatre, prompting audience to think critically rather than passively absorb the performance (Brecht, 1964). Similarly, Third Theatre dismantles the fourth wall, incorporating direct address and audience involvement to cultivate a sense of agency and shared responsibility.

There are different opinion on alternative theatre. It is not possible to define alternative theatre in a single definition. It is unconventional, anti-mainstream European proscenium theatre. This type of theater emerged in the

situation after the Second World War in the decade of 1970s. The social, economic and political situation forced to create this type of anti-proscenium theatre. This theatre's ideology, philosophy, thinking, realization, content, form, application, acting, and aesthetics- all are different from mainstream proscenium theatre. This type of anti-proscenium, experimental dramatic thinking was started in different countries like Denmark, Poland, France, Germany, and Latin America. Different experimental theatre named 'poor theatre', 'total theatre', 'invisible theatre', 'intimate theatre' 'environmental theatre', 'immediate theatre', 'open theatre' 'forum theatre' emerged as alternative theatre. (Ghosh, 2022).

Alternative theatre was born for the sake of the common people. However, 18th century French philosopher Jean Jacques Rousseau and Diderot Rousseau were the first who planned a dramatic art for the sovereign people called 'peoples theatre'. According to their opinion, theatre is a direct medium for strengthening people's logic and for educating the whole society. They wanted a social revolution through this people's theatre. 'People's theatre is a movement' (Rolland, 1985). French dramatist Romain Rolland wrote a book, "The People's Theatre". In this book, he described what type of theatre would be done? For whom? Why should this type of theatre be done? He described the features of 'People's theatre'. According to this book, 'People's Theatre is – (1) a must for recreation, (2) a superior source of energy and education, and (3) ought to be a guiding light to the intelligence. So it is clear that people's theatre focused on the building of critical thinking of common people (Choudhuri, 1982).

Irish theatre movement flourished at the time of freedom and nationalist movement in Ireland. This movement is also considered "Irish people's theatre". In the same way, in many other countries, including Latin America, Russia, China, and India, the People's theatre movements emerged (Ghosh, 2022).

Badal Sircar's ideas of Third Theatre were influenced by various western theatres. In 1957, he went to London for his studies, where he watched foreign plays for the first time. He had seen Grotowski's theatre in Poland. Grotowski emphasized the expression and capability of the actor's body in theatrical performance, which deeply influenced Badal Sircar. Grotowski named his theatre "Poor Theatre", where the actor's body was the primary medium of expression. However, his theatre was not free and open but confined. Poor Theatre was entirely an experimental, laboratory-based theatre practice, which did not appeal to Badal Sircar. Grotowski's disciple, Eugenio Barba, supported his ideas in his essay, "The Third Theatre". Both Grotowski and Barba had a theatre philosophy that was highly individualistic and confined. They did not

seek societal change through theatre but rather personal transformation. Badal Sircar learned from their techniques but developed his own unique artistic vision. He shaped the form and performance techniques of his Third Theatre by drawing inspiration from various European Theatre personalities. At the same time, he incorporated elements of India's traditional folk theatre, particularly Jatra. By blending these influences, he created Third Theatre in the Indian context (Zumman, 2020). According to Badal Sircar, rural folk theatre (jatra) is the First Theatre, while urban proscenium theatre is the Second Theatre. Third Theatre emerged as a synthesis of these two forms. Badal Sircar described Third Theatre as the "Theatre of Synthesis". (Zumman, 2020). Third Theatre has two distinct forms: Anganmancha and Muktmancha. Anganmancha is a simplified version of the proscenium stage. In this form, there is no conventional stage or stage setup, and there are no barriers between the actors and audience. The intimacy between actors and audience is much greater than before. Here spectators sit or stand around the performance space, often in a room or an enclosed area. On the other hand, Muktmancha is entirely open. Performances take place under the open sky, without any fixed stage arrangements. While Anganmancha aimed to eliminate the distance between actors and audience, it still had one limitation: a fixed performance space where the theatre group had to wait for the audience to gather. Muktmancha overcame this limitation. In Muktmancha, the performers did not wait for the audience. They carried their performance directly to the people, beyond any fixed space. The actors performed in marketplaces, fields, and open spaces, reaching out to the audiences wherever they were (Choudhuri, 2004)

3. Research Gap:

Although extensive research exists on Badal Sircar and Third Theatre, few studies have explored it from the perspective of communication and resistance. This article aims to address this gap by providing a critical analysis of Third Theatre as a communicative tool for social transformation.

4. Research Questions:

- a. How does Badal Sircar's Third Theatre function as a medium of resistance against societal and political oppression?
- b. What are the key characteristics of Third Theatre that make it an effective tool for communication and resistance?
- c. How does Third Theatre challenge traditional forms of communication and performance?

5. Research Methodology:

This study adopts a qualitative research methodology. Under qualitative research methodology, discourse analysis, content analysis and textual analysis

techniques have been used. Data is collected through different plays of Badal Sircar, different research books, articles and interviews.

6. Findings:

Third Theatre as a Communicative Medium:

Third Theatre disrupts the conventional mode of communication by breaking down the divide between performers and audiences. Unlike proscenium theatre, which maintains a rigid separation between the stage and spectators, Third Theatre takes place in open spaces, often with the audience seated in a circle. This setup creates a sense of intimacy and equality, encouraging dialogue and participation. According to Badal Sircar, a live person communicates directly to another live person (Sircar, 2009). In *Tringsha Shatabdi* (1966), the play concludes with the protagonist directly engaging the audience, asking: “And you? What are you going to do? Have you decided? You? You? You?” Here, the audience is being directly addressed and urged to make a moral decision to take action (Katyal, 2015).

Third Theatre as a tool of participatory and collective consciousness:

A defining characteristic of Third Theatre is its participatory approach, where audiences are not mere passive observers but active contributors to the performance. This aligns with Freire’s ideas of dialogic communication, which highlight the role of dialogue in developing critical awareness. By engaging audience in the performance, Third Theatre cultivates a sense of shared responsibility and agency. This is especially significant in the context of resistance, as it encourages individuals to take action and challenge oppressive systems.

Badal Sircar identified four modes of communication in theatre: from performer to spectator, performer to performer, spectator to performer, and spectator to spectator (Sicar, 2009). Through this entire communication process, mutual feelings and emotion are exchanged, creating a bond between individuals. From this system, a collective consciousness emerges. In the play of Sircar ‘*Michhil*’, for instance, audience members who join the procession develop a bond through their shared response. At the end of the play, the Chorus moves in a procession, weaving through the audience while singing a song:

A song of hope. A song of the future. It is a procession of dreams. A song of dreams. Dreams that Old Man and Khoka have dreamt. The people in the procession are holding hands. Old Man holds Khoka’s hand and leads him up to the procession and finally they become part of it, part of their song. The audience is invited to join. The procession continues (Sarkar, 2009)

Third Theatre as a tool of resistance:

Badal Sircar's Third Theatre is not merely a theatrical form but a revolutionary tool of resistance that challenges socio-political structures, cultural hegemony and traditional norms of performance.

Third Theatre developed as a reaction against the elitism and commercialization of proscenium theatre, which primarily served urban, middle-class audiences. Sircar aimed to make theatre more inclusive by reaching marginalized communities and highlighting their struggles. This rejection of elitism is itself an act of resistance, as it challenges the dominant cultural norms that privilege certain groups over others. Third Theatre of Badal Sircar was entirely free from bourgeois mentality. His intention behind developing alternative theatre was to liberate it from commercial profit-making. Sircar wanted to free theatre in every possible way (Zumman, 2020). That is why he stated, "The audience of free theatre is not a buyer but a human being. The actor is not a seller but a human being. Theatre is a human action, a form of communication between people. When the roles of buyer and seller are imposed on individuals, the essence of true theatre is disrupted" (Sircar, 1983 & Sircar, 2009). Shatabdi, Badal Sircar's theatre group, did not charge any entry fee for its performances. Instead, after the show, group members would ask the audience for voluntary contributions, following the age-old tradition of street performers. People donated whatever they could afford (Katyal, 2015). Third Theatre's minimalist style- featuring simple costumes, minimal props, and the absence of elaborate sets-acts as a form of resistance against the commercialization of art.

Third Theatre disrupts conventional power structures by rejecting hierarchy and fostering a more egalitarian performance space. The use of open spaces instead of a proscenium stage symbolizes this resistance to authority and control. It challenges cultural dominance by offering alternative narratives and amplifying subaltern voices. By highlighting the struggles of marginalized communities and critiquing mainstream cultural norms, Third Theatre resists cultural homogenization while promoting diversity and inclusivity. The play 'Bhoma' is a powerful critique of the exploitation of rural communities by urban elites.

Social and political philosophy of Third Theatre:

Badal Sircar created Third Theatre with the vision of social change. His Third Theatre is grounded in a socio-political philosophy aimed at challenging oppression, uplifting marginalized communities, and cultivating collective awareness. His work is not merely a form of artistic expression but a radical intervention in the socio-political landscape of post-independence India. According to Badal Sircar, Third Theatre is not just a new theatrical form; it is a

philosophy and an ideology. It is a movement (Sircar, 1983). In Third Theatre, people hold the highest value because they are the ones who will build and transform society. That is why Badal Sircar stated that the essence of Third Theatre lies in the urge to change society. However, societal change is impossible without a transformation of people. Therefore, for a Third Theatre practitioner, the audience holds immense significance (Sircar, 1983). Badal Sircar Third Theatre reflects his ideas of socialism and communism. However, he was critical of the communist party. He believe that socialism had not failed; rather, the Communist Party had failed. In an interview with theatre critic Samik Bandyopadhyay, he expressed his views clearly, stating:

Who is saying that socialism is finished? Capitalists claim this. Why are they saying it? Because they want to establish the idea that socialism has failed, which implies that capitalism is the only viable system. But this a massive half-truth. What needs to be said that socialism itself has not failed; rather, Communist parties have failed. That is the real issues (Bandyopadhyay, 2017).

7. Conclusion:

Badal Sircar's Third Theatre serves as a powerful medium of communication and resistance, challenging dominant power structures and empowering marginalized voices. Through its minimalistic approach, participatory nature, and focus on social issues, Third Theatre fosters dialogue, raises awareness, and inspires collective action. By merging art with activism, Third Theatre exemplifies how communication can function as a form of resistance. In an era increasingly shaped by commercialism and inequality, Sircar's work serves as a reminder of the power of theatre to challenge, inspire and unity. The flexible, portable, and inexpensive nature of Badal Sircar's Third Theatre has made it more accessible and widely accepted by people. As a result, it has played a significant role as an important instrument of communication and resistance. Hope, in the future, more in-depth research will be conducted on this study. Further research may explore something new.

Reference:

- Bandyopadhyay, Samik. (2017). Badal Sircar: Ebong Indrajit thekey Third Theatre (Eds). Kolkata: Thima.
- Brecht, Bertold. (1964). Brecht on Theatre: The development of an aesthetic (J. Willett, Eds & Trans.). New York: Hill and Wang.
- Choudhuri, Darshan. (1982). Gononatya Andolon. Kolkata: Anustup.
- Chowdhuri, Darshan (2004). Third Theatre o Badal Sircar. In Paschimbongo Natya Academy Patrika-9, Potho Natak sonkha.
- Freire, Paulo. (2005). Pedagogy of the Oppressed (Myra Bergman Ramos, Trans.). New York, London: Continuum.

- Ghosh, Ankita. (2022). Bikalpa Theatre Charchay Probir Guha. Rabindra Bharati University. <http://hdl.handle.net/10603/549490>.
- Gramsci, Antonio. (1971) Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & Nowell Smit, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Hall, S. (1980). Encoding/Decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. Routledge.
- Katyal, Anjum. (2015). Badal Sircar: Towards A Theatre of Conscience. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage.
- Rolland, Romain. (1985). People's Theatre (Rathin Chakroborti, Eds & Trans.). Kolkata: Natyochinta.
- Sircar, Badal. (1983). Theaterer Bhasa. Kolkata: Raktokorobi.
- Sircar, Badal. (2009). Buying and Selling in the Theatre. In 'On Theatre'. Calcutta: Seagull Books.
- Sircar, Badal. (2009). The Changing Language of Theatre. In 'On Theatre'. Calcutta: Seagull Books.
- Sircar, Badal. (2009). The Third Theatre. In 'On Theatre'. Calcutta: Seagull Books.
- Sircar, Badal. (2009). Three Plays: Procession, Bhoma, Stale News. Calcutta: Seagull Books.
- Zumman, K. A. (2020). Tiritiya Theatre. Kolkata: Som Publishing.

AI Integration in Teacher Education in the Light of NEP-2020

Subhajit Saha

Assistant Professor, Dept. of Education
Jibantala Rokeya Mahavidyalaya

Abstract: The National Education Policy (NEP) 2020 envisions a holistic, flexible, and multidisciplinary approach to education in India, with a strong emphasis on leveraging technology to improve teaching and learning outcomes. One of its significant propositions is the integration of emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI), particularly in the domain of teacher education. The policy underscores the urgent need to prepare teachers not only to use AI tools effectively in the classroom but also to understand their pedagogical implications. This paper explores how NEP-2020 lays the foundation for embedding AI in teacher training programs through digital platforms, virtual simulations, and AI-driven assessment tools. It further examines the transformative potential of AI in enhancing instructional design, enabling data-informed teaching strategies, and fostering inclusive and adaptive learning environments. By critically analysing the opportunities, such as personalized professional development and improved learning analytics, alongside challenges including digital inequity, infrastructural limitations, and ethical concerns, the paper offers a comprehensive understanding of the policy-level vision. The study also emphasizes the importance of curricular reforms, capacity-building initiatives, and cross-sector collaborations to ensure the successful integration of AI in teacher education, thereby aligning with NEP-2020's broader goals of equity, quality, and innovation in education.

Keywords: NEP 2020, Artificial Intelligence, Teacher Education, Digital Pedagogy, Education Policy.

Introduction:

The National Education Policy (NEP) 2020 marks a watershed moment in India's educational reforms, particularly in its commitment to reimagining teacher education within the context of a rapidly evolving digital and knowledge-driven world. The policy recognizes that teachers are the backbone of the education system and emphasizes the need for their continuous professional development to ensure high-quality learning outcomes (Ministry of Education, 2020). In this context, the integration of Artificial Intelligence (AI) into teacher education emerges as both a necessity and an opportunity.

AI, with its capabilities in data analysis, pattern recognition, and adaptive learning, offers innovative solutions to personalize teacher training (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019; Luckin et al., 2016), provide real-time feedback, and support reflective teaching practices (UNESCO, 2021). It helps tailor learning experiences to individual teacher needs and offers insights that guide instructional improvement (Luckin et al., 2016). NEP-2020 highlights the role of digital tools, educational platforms, and emerging technologies—including AI—in enhancing pedagogical skills, instructional design, and formative assessment strategies (Ministry of Education, 2020; UNESCO, 2021). By equipping teachers with AI-related competencies, the policy aims to empower them not only to use technology effectively in classrooms but also to critically evaluate and adapt these tools to address diverse learner needs (Holmes et al., 2019; UNESCO, 2021). The policy also envisions a shift away from rote-based, one-size-fits-all teaching methods toward more dynamic, learner-centric pedagogies. AI has the potential to enable this transformation by facilitating differentiated instruction, identifying individual learning gaps, and promoting inclusive education (Luckin et al., 2016; UNESCO, 2021). Furthermore, AI-driven platforms like DIKSHA and SWAYAM—endorsed by the NEP—support digital capacity building and lifelong learning for educators (Ministry of Education, 2020). The incorporation of AI in teacher education aligns seamlessly with NEP-2020’s broader objectives of promoting equity, access, and excellence in education (Ministry of Education, 2020; Holmes et al., 2019).

NEP-2020’s Vision on Technology and AI in Teacher Education:

The National Education Policy (NEP) 2020 presents a transformative framework for leveraging technology at all levels of education. It emphasizes the importance of preparing teachers for the digital age through the adoption of modern technological tools, including Artificial Intelligence (AI), to improve the quality, reach, and inclusivity of education in India (Ministry of Education, 2020; UNESCO, 2021). The policy recognizes that AI can revolutionize traditional teacher education by supporting adaptive learning, predictive assessment, and continuous professional development (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019; Luckin et al., 2016). A central recommendation in NEP-2020 is the use of platforms like DIKSHA and SWAYAM, which act as digital repositories for open-access learning resources. These platforms, integrated with AI-based analytics, provide tailored content and track individual learner progress—addressing regional disparities in access to quality teacher training (UNESCO, 2021). Such digital ecosystems align with global trends in AI-supported education systems (OECD, 2021). The policy also proposes the creation of the National Educational Technology Forum (NETF), which will serve as a platform for exchanging ideas

on the use of emerging technologies, especially AI, in improving education delivery. It is envisioned to guide evidence-based policy-making, promote interdisciplinary research, and facilitate technological innovations in pedagogy (Ministry of Education, 2020). Another significant provision in NEP-2020 is the integration of AI into the teacher education curriculum itself. Pre-service and in-service teachers are to be trained not only in the operational aspects of AI tools but also in the ethical, legal, and social implications of their classroom applications (Luckin et al., 2016; Holmes et al., 2019). This training includes familiarization with AI-powered learning environments such as intelligent tutoring systems and automated feedback mechanisms, which allow for real-time learner support and instructor intervention (Holmes et al., 2019; UNESCO, 2021). To support this digital transformation, NEP-2020 calls for the enhancement of digital infrastructure—especially in rural and under-resourced regions. Strengthening broadband access, providing digital devices, and deploying technical support systems are necessary steps to ensure equitable access to AI-based education (Ministry of Education, 2020; World Bank, 2020). NEP-2020 does not position AI as a replacement for human teachers, but rather as a complementary tool that can amplify teacher effectiveness, promote innovation in instructional strategies, and support lifelong learning (Luckin et al., 2016; OECD, 2021). The vision is to build a technologically empowered teaching workforce that can confidently navigate and shape the digital learning environment of the 21st century.

Opportunities of AI Integration Under NEP-2020:

The **National Education Policy (NEP) 2020** envisions a transformative shift in the Indian education system through the integration of emerging technologies such as Artificial Intelligence (AI). Within the domain of teacher education, AI offers numerous opportunities to enhance training effectiveness, professional development, and the overall quality of instruction (Ministry of Education, 2020).

Personalized Teacher Training:

A core opportunity presented by AI lies in its capacity to deliver personalized learning experiences for educators. Advanced algorithms can analyze individual performance data, identify learning preferences, and pinpoint specific areas for improvement. This data-driven personalization enables the creation of tailored learning pathways, which significantly improve the efficiency and relevance of teacher training programs (Holmes et al., 2019). AI-based adaptive learning systems can dynamically adjust content complexity, offer supplementary resources, and scaffold instruction in response to each educator's evolving needs.

Efficient Assessment and Feedback:

AI technologies also streamline the assessment process. Automated assessment tools can provide real-time, objective evaluations of teaching performance, particularly in simulated environments. These tools are capable of analyzing inputs such as lesson delivery techniques, classroom management strategies, and learner engagement patterns (Luckin et al., 2016). The immediate feedback generated by such systems facilitates reflective teaching practices and prompt pedagogical adjustments, while also reducing the burden on human assessors and allowing for more frequent evaluations.

Capacity Building on Emerging Issues:

NEP-2020 emphasizes the need for teachers to be not only technologically adept but also ethically aware. AI-enabled learning platforms can support capacity building by educating teachers on essential topics such as algorithmic bias, data privacy, and the ethical use of learning analytics (Floridi et al., 2018). This ensures that educators are equipped to make responsible decisions regarding AI tools and can foster trust among students, parents, and other stakeholders.

Continuous Professional Development (CPD):

AI integration facilitates the creation of dynamic CPD platforms that monitor teachers' progress throughout their careers. By leveraging learning analytics and AI-based tracking, these platforms can identify skill gaps, recommend professional development opportunities, and support goal setting (Zawacki-Richter et al., 2019). Such continuous support encourages lifelong learning and adaptability, ensuring that teachers remain up-to-date with pedagogical innovations and technological advancements. AI integration as envisioned by NEP-2020 offers the potential to revolutionize teacher education by providing personalized, efficient, and ethically informed training and development frameworks. These opportunities not only improve teaching quality but also contribute to building a resilient and future-ready education system.

Challenges in Implementation:

Despite the transformative potential of Artificial Intelligence (AI) in teacher education as outlined by NEP-2020, its effective implementation faces several critical challenges. These obstacles must be addressed to ensure equitable and sustainable integration of AI technologies within India's educational landscape.

Digital Divide:

A primary impediment to AI integration is the persistent digital divide, especially in rural and marginalized regions. Many teacher education institutions still struggle with inadequate digital infrastructure, including poor internet connectivity, limited access to computing devices, and unstable electricity (World Bank, 2020). This technological disparity disproportionately affects

educators in remote areas, making AI-driven training programs inaccessible and exacerbating existing educational inequalities (KPMG & Google, 2017). Unless these foundational gaps are addressed, AI initiatives risk reinforcing rather than reducing the urban-rural education divide.

Lack of AI Awareness and Institutional Readiness:

Another significant hurdle is the lack of institutional readiness and AI literacy among both faculty and administrators. Most teacher training programs have not yet integrated AI or digital pedagogy into their curriculum (Zawacki-Richter et al., 2019). Furthermore, there is a shortage of educators with the requisite expertise to facilitate AI-based teaching and learning processes. This results in a limited capacity to design, deliver, or assess AI-enriched training modules, undermining the policy's goals.

Ethical and Privacy Concerns:

AI usage in education raises serious ethical dilemmas and privacy risks. Issues such as data security, algorithmic transparency, surveillance, and bias in AI systems have yet to be comprehensively addressed in Indian education policy frameworks (Floridi et al., 2018). Educators and institutions often lack knowledge of responsible data practices, which can lead to inadvertent breaches of privacy or biased decision-making by AI systems. Without a robust ethical framework, AI adoption could erode trust among stakeholders, particularly in relation to the autonomy and dignity of teachers and students.

Policy and Curriculum Gaps:

While NEP-2020 articulates a vision for AI integration, policy translation into curricula remains slow and fragmented. Current B.Ed. programs largely omit key components like AI literacy, digital ethics, and the pedagogical use of intelligent systems (National Council for Teacher Education, 2021). This disjunction between policy and practice limits the ability of future educators to meaningfully engage with AI tools and methodologies, thereby weakening the long-term impact of NEP-2020's digital ambitions. The successful integration of AI into teacher education in India depends not only on technological innovation but also on systemic reforms. Bridging the digital divide, enhancing institutional capacity, safeguarding ethical standards, and aligning curriculum reforms with policy goals are essential steps to harness AI's full potential in shaping a modern, inclusive education system.

Recommendations:

To realize the transformative vision of NEP-2020 and effectively integrate Artificial Intelligence (AI) into teacher education, a strategic, inclusive, and ethically grounded approach is imperative. The recommendations outlined below

are aimed at fostering a robust ecosystem that supports AI-enabled teacher education in India.

Integrate AI Modules into Teacher Education Curricula:

Reforming teacher education curricula at both pre-service (B.Ed., M.Ed.) and in-service levels is essential. Dedicated modules on AI should be introduced, encompassing theoretical foundations, ethical implications, and practical applications within educational contexts (Holmes et al., 2019). These modules must emphasize AI-driven pedagogy, digital citizenship, algorithmic bias, and data-informed decision-making to ensure that educators are capable of leveraging technology responsibly and reflectively (Luckin et al., 2016).

Faculty Training and Capacity Building:

The integration of AI requires systematic capacity building among teacher educators. Faculty must be trained in using AI tools for instructional design, adaptive learning, real-time assessment, and personalized feedback (Zawacki-Richter et al., 2019). Continuous professional development (CPD) programs—facilitated through workshops, certifications, and fellowships—should be promoted by governmental agencies and institutional authorities. This effort should also include exposure to international best practices and collaboration with AI experts to build competence and confidence in digital pedagogy.

Foster Collaborations and Innovation Hubs:

Multi-stakeholder collaboration is critical for sustainable AI integration. Partnerships among teacher training institutions, AI research centres, EdTech firms, and universities can lead to contextually relevant innovations. These alliances can facilitate the development of localized AI applications, open educational resources (OERs), and experiential learning platforms (UNESCO, 2021). Innovation hubs can also support student-teacher internships, mentorship, and applied research in AI for education.

Establish Monitoring and Support Frameworks:

To ensure inclusive and equitable implementation of AI technologies, there must be robust monitoring and evaluation mechanisms. These frameworks should track access, usage, outcomes, and challenges, especially in underserved regions. Government bodies like the National Educational Technology Forum (NETF) can play a crucial role in setting standards, conducting audits, and providing technical and financial support to institutions lagging behind in digital readiness (Ministry of Education, 2020). The National Education Policy (NEP) 2020 marks a watershed moment in the evolution of teacher education in India, with its strong emphasis on leveraging Artificial Intelligence and digital technologies to enhance teaching and learning. The integration of AI into teacher training programs holds immense promise for personalizing instruction, improving

assessment accuracy, fostering continuous professional growth, and ensuring data-driven educational decisions. The realization of these benefits is contingent upon addressing foundational challenges such as digital inequality, limited institutional readiness, ethical concerns, and curriculum gaps. Ensuring access to digital infrastructure, developing AI literacy among teacher educators, and framing inclusive and context-sensitive policies are pivotal for the sustainable implementation of AI in teacher education. Ensuring widespread access to digital infrastructure, enhancing AI literacy among educators, and implementing inclusive, context-sensitive policies are prerequisites for success. Importantly, empowering teachers through AI is not merely a technological advancement—it represents a reconceptualization of the educator's role in a 21st-century knowledge society.

References:

1. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
2. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson.
3. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
4. UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policymakers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
5. OECD. (2021). *Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development*. OECD Publishing.
6. World Bank. (2020). *Realizing the future of learning: From learning poverty to learning for everyone, everywhere*. World Bank Publications.
7. Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., ... & Vayena, E. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-0189482-5>
8. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). *Systematic review of research on Artificial Intelligence applications in higher education*. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-01710>
9. KPMG & Google. (2017). *Online Education in India: 2021*. Retrieved from <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2017/05/Online-Education-in-India-2021.pdf>
10. National Council for Teacher Education (NCTE). (2021). *Four-Year Integrated Teacher Education Programme Curriculum Framework*.
11. World Bank. (2020). *Remote Learning During the Global School Closures: Lessons from COVID-19*. World Bank Education Global Practice.
12. Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

DOI : 10.5281/zenodo.15868113

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in



Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn : 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in